শারদীয় সংখ্যা

১৪০০

নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিষয়ক পত্রিকা

পত্রিকাটি ধুলো খেলার প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : হস্তীমূর্খ

স্ক্যান করে দিয়েছেন : সৌমন্দ্র পর্বত

এডিট করেছেন : সৌমন্দ্র পর্বত ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরিক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optimcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

১৯৯৩ সালের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

শরৎ রচনাবলী

(তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ) / প্রতিখণ্ড ৮০.০০

১ম খণ্ড ১০৮০ পৃষ্ঠা ২য় খণ্ড ১০০৬ পৃষ্ঠা ৩য় খণ্ড ৯১১ পৃষ্ঠা

দীনেশচন্দ্র সেন

বৃহৎ বঙ্গ

(দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) / ৪০০.০০

১ম খণ্ডে (১২১৫ পৃষ্ঠা, ৩২ পৃষ্ঠা আর্টকাগজে রঙিন ও সাদা-কালো ছবি)
২য় খণ্ড (৬১০ পৃষ্ঠা, ৮২ পৃষ্ঠা রঙিন ও সাদা-কালো ছবি)

নিহাররঞ্জন রায়

বাঙালীর ইতিহাস

২০০.০০

(৭৯০ পৃষ্ঠা, ৪৮ পৃষ্ঠা আর্টকাগজে ছাপা ছবি)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

আরব্য উপন্যাস

(১৪ পৃষ্ঠা আর্ট কাগজে ছাপা রঙিন ছবি ও বহু একবর্ণ ছবি) / ১০০.০০

॥ আরো কয়েকটি বই ॥

জগদীশ গুপ্তের গল্প	৬০	প্রফুল্ল রায়ের স্বনির্বাচিত গল্প	৬০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প	৫০	প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প	৭৫
দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ গল্প	৪০	প্রবোধ সান্যালের শ্রেষ্ঠ গল্প	৩০
দেবেশ রায় গল্পসমগ্র ১ম	৫০	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প	৪০
দেবেশ রায় গল্পসমগ্র ২য়	৬০	ঐ গল্পসমগ্র ১ম	৭৫
দেবেশ রায় গল্পসমগ্র ৩য়	৬০	ঐ গল্পসমগ্র ২য়	৭৫
মতি নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প	৫০	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প	৫০

—

দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন : ২৪১-২৩৩০ / ৩১-৫২৬৬

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা
৩৩ বর্ষ ॥ ২০ খণ্ড : ১-২ সংখ্যা ; শারদীয় ১৪০০ ॥ সূচিপত্র

এক্ষণ : পত্রিকার কথা

পত্রগুচ্ছ
দাদুর চিঠি : শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্রগুচ্ছ ॥ দেবাশিস ভট্টাচার্য ১

স্মৃতিকথা
পরিচয় ॥ বীণা দে ৮০

জীবনবৃত্তান্ত
বৈধব্য-কাহিনী ॥ কল্যাণী দত্ত ১০৩

প্রবন্ধ
১৪০০ সাল ॥ সুখময় মুখোপাধ্যায় ৯৭
আগন্তুক : প্রান্তিকতা ও সংহতি ॥ চন্দক সেনগুপ্ত ২১৯

গল্প
জিবরাইলের ডানা ॥ শাহেদ আলী ১১৬
অতিথি ॥ সত্যজিৎ রায় ১৩৩

চিত্রনাট্য
আগন্তুক ॥ সত্যজিৎ রায় ১৪৫
আগন্তুক প্রসঙ্গে ২১৬

ক্রোড়পত্র / আত্মস্মৃতি
জীবনকথা (দ্বিতীয় পর্ব) ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ১
প্রাসঙ্গিক তথ্য ইত্যাদি ॥ অনাথনাথ দাস ৯৯

An EKSHAN Supplement
Two Stories ॥ Satyajit Ray ১১৯
সত্যজিৎ রায় : প্রথম দু'টি গল্প ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ১৩৩

চিত্রসূচি
১ অটোগ্রাফ (১৯৫৬) : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ; ২ স্কেচ (১৯৫৯) : বিনোদবিহারী
৩ স্কেচ (১৯৫৯) : বিনোদবিহারী ; ৪ ক্যালিগ্রাফি (১৯৭১ ?) : বিনোদবিহারী
ফোটোগ্রাফ
১ পরিবারবর্গের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী ; ২ সত্যজিৎ রায় (১৯৬৪) : ছবি সুনীল জানা

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক : নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ॥ কলকাতা ৯

এক্ষণ পত্রিকার কথা

১৪০০ বঙ্গাব্দের বাৎসরিক (শারদীয়) সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। এই সঙ্গেই পত্রিকা প্রকাশের ৩৩ তম বৎসর ও ধারাবাহিক প্রকাশনার হিসাবে ২০ তম খণ্ডের সূত্রপাত হল। অচিরে পত্রিকার ২০টি খণ্ডের বিস্তারিত সূচি প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

গতবছর শারদীয় সংখ্যায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'জীবন কথা'-র প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়, এবার দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব প্রকাশিত হল। এ-যাবৎ অপ্রকাশিত এই স্মৃতিকথার প্রকাশ সম্ভব হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে ও অনাথনাথ দাসের অনলস পরিশ্রমে। তাঁদের কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বীণা দে-র আত্মকথা 'পরিচয়'-কে বলা যায় a work in progress—যখন যেমন পারছেন তিনি লিখে চলেছেন। তাঁর লেখনী-চর্চার প্রতি আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টি রয়েছে। একই কথা বলা চলে কল্যাণী দত্ত সম্পর্কে। তাঁর লেখার সরস উপভোগ্যতা ও খুঁটিনাটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পর্যবেক্ষণ বহু পাঠককে মুগ্ধ করেছে।

'আগন্তুক' সত্যজিৎ রায়ের সর্বশেষ ছবি। এর চিত্রনাট্য এ-সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে সন্দীপ রায়ের সক্রিয় সহযোগিতায়। চিত্রনাট্যের সঠিক পাঠ নির্ধারণ ও মুদ্রণের তত্ত্বাবধানে তাঁর ভূমিকা আমাদের কাছে অপরিহার্য ছিল।

প্রসঙ্গত, সত্যজিৎ রায়ের মাত্র ২০ বছর বয়সে লেখা ইংরেজি গল্প দু'টি প্রায় বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার ক'রে পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছে বিজয়া রায়ের অনুমোদনে ও সিদ্ধার্থ ঘোষের অক্লান্ত পরিশ্রমে।

এই সংখ্যার চিত্র-তালিকায় বিনোদবিহারীর 'স্কেচ'গুলির জন্য দেবাশিস ভট্টাচার্যের কাছে এবং 'ক্যালিগ্রাফি'-র জন্য অনাথনাথ দাসের কাছে আমরা ঋণী।

'ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী' ছবিটির জন্য বিশ্বভারতী এবং লণ্ডন থেকে প্রেরিত সত্যজিৎ রায়ের ছবিটির জন্য সুনীল জানার প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্রগুচ্ছ ও চিত্রাবলি ছাপা হয়েছে শিল্পী-কন্যা মৃণালিনী মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

এ-সংখ্যার প্রস্তুতিতে বিশেষভাবে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি: বিমান সিংহ, প্রবীর সেন, অভয় গুপ্ত, এবনারায়ণ ঘোষ, সুনীত সেনগুপ্ত, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল বসু (আনন্দ), শ্যামল ভট্টাচার্য (ঋদ্ধি), বিকাশ বাগচী (অরুণা), বিকাশ সামন্ত (সিটি প্রিন্টিং), পরেশনাথ পান (ইন্দ্রলেখা প্রেস), গৌরাঙ্গ রায় (গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স) ও সুচিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সঙ্গে পত্রিকার সকল শুভানুধ্যায়ীকে আমাদের সকৃতজ্ঞ শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি।

দাদুর চিঠি

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্রগুচ্ছ

দেবাশিস ভট্টাচার্য

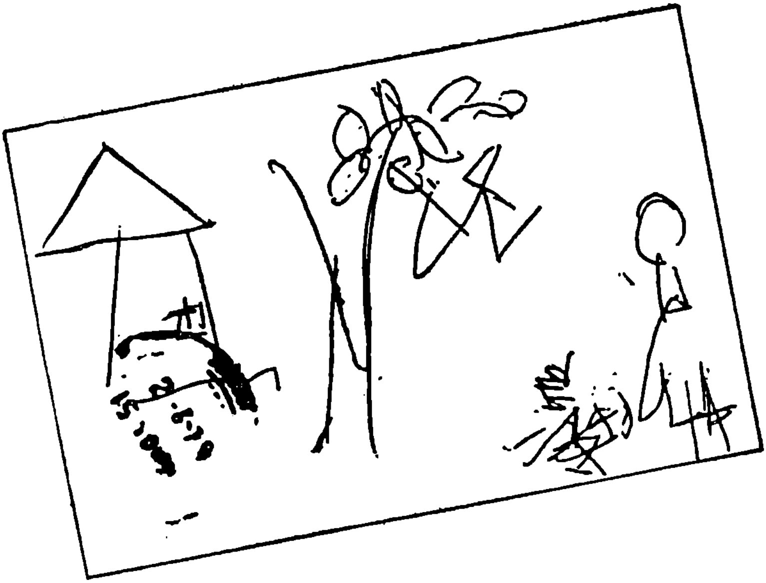

ছোটবেলায় কোনো ছবি কপি করতে হলে মা-র কাছে যেতাম। মা বেশ অবলীলায় হালকা রেখায় এঁকে দিতেন। মামার বাড়ির প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর আঁকতে পারতেন। তাই যদিও তখন স্কুলে ছবি আঁকার কোনো চল ছিল না, আমাদের বাড়িতে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। দাদুদের সঙ্গে আমাদের কচিৎ-কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হতো। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ওপরের ভাই বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁকেই মা 'ছোটকাকা' বলে ডাকতেন। সেই হিসেবে আমরা বলতাম 'ছোটদাদু'।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় সকলের ছোট, কিন্তু মা তাঁকে ডাকতেন 'নন্তকাকা' বলে, আর আমরা ডাকতাম 'দাদু' বলে।

ছোটদাদুর সঙ্গেই আমাদের কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ছিলেন অকৃতদার। কখনো মাসির বাড়ি, কখনো মামার বাড়ি এসে থাকতেন। তাঁর সম্বল ছিল কিছু দামি 'সেভেল্-হেয়ার' তুলি, ক'টা 'উইনসর-নিউটনে'র ক্ষয়ে-যাওয়া রং আর ছোট-বড় কাগজের টুকরো। তাঁর কাছে শুনতাম আমাদের দাদু বিনোদবিহারী একজন মস্ত বড় আর্টিস্ট।

১৯৫৬ সাল। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। সেই প্রথম আমার আর্টিস্ট দাদুকে দেখলাম। কলকাতায় তখন সম্ভবত তাঁর কোনো প্রদর্শনী চলছিল। এসেছিলেন সন্ধেবেলা। মা আমার আঁকা ছবি দেখাতে বললেন। ছবি দেখিয়ে দাদুর সঙ্গে ভাব হল। তখন বাবা আমায় একটা রঙিন অটোগ্রাফ-খাতা কিনে দিয়েছিল। আমি নিয়ে এলাম। দাদু একটা হলুদ কাগজে একটা ফুল আর ক'টা কুঁড়ি এঁকে বললেন, 'এই আমার লেখা।'

ঐ বছরই দিল্লিতে চোখ অপারেশনের পর উনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। এরপর একবার এসেছিলেন ১৯৫৯-এ। বললেন ডট্-পেন আছে? ডট্ পেনে চেপে দাগ কাটলে সেটা কাগজের ওপর অনুভব করা যায়। ডট্ পেন আনতে দু'টো ছবি এঁকে দিলেন। এরপর আর আমাদের বাড়ি আসেন নি।

বড় হয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি। পাশাপাশি ছবি আঁকা চলছে। ১৯৬৬ সাল। মেডিকেল কলেজে তখন আমার চতুর্থ-বর্ষ চলছে। ততদিনে সাহস বেড়েছে। ঠিক করেছি আমার এক শিল্পী বন্ধুকে নিয়ে শান্তিনিকেতন যাব। দাদুকে আমার পরিচয় দিয়ে লিখলাম যে আমি এখনো ছবি আঁকছি। এ ব্যাপারে জানতেও আগ্রহী, তাই আমার শিল্পীবন্ধুকে নিয়ে একবার ওখানে ঘুরে আসতে চাই। পত্রপাঠ জবাব—

১

শান্তিনিকেতন

১।৪।৬৬

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পোস্টকার্ড পেলাম। তোমার মা আমার বাড়ির অবস্থা (খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি) দেখে গেছে। ভালোমন্দ যেমনভাবেই হোক আমি এ অবস্থায় তোমাকে আসতে লিখেছি। তোমার বন্ধুকে aco [accommodate] করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোট কথা, একা যদি আসতে চাও তোমাদের জন্য দরজা সর্বদাই খোলা। কিন্তু অপরিচিত লোকের খাওয়া দাওয়া দেখাশুনা আমি কিছুই করতে পারব না। যদি তুমি কাজকর্ম করতে চাও তবে ভালোভাবেই দিন কেটে যাবে। অনেকদিন আগে ছোট্টুর ছেলে[১] অশোক এখানে আসতে চেয়েছিল তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে। তাকেও আমি বন্ধু আনতে বারণ করেছিলাম। তারপর নিশ্চয়ই সে আমার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তুমি হয়ত ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু উপায় নেই। আমি অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে থাকি, কি রকম অসুবিধা তা তোমাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

তুমি ছবি আঁকা শিখতে ইচ্ছুক, সেই ইচ্ছা অনুযায়ী এখানে এলে নিশ্চয়ই কিছু শিখতে পারবে। অবশ্য কিছুটা নিঃসঙ্গ থাকতে হবে। তবে তুমি যদি কাজ শিখতে চাও, ছবি ইত্যাদি দেখতে চাও, তবে বসবার অবকাশ থাকবে না। অনেক বয়স্ক আর্টিস্টদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে এবং তাঁদের কাজকর্ম দেখতে পারবে। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ।

ইতি—

দাদু

(বিনোদ মুখোপাধ্যায়)[২]

১ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দিদির ছেলে।

২ অন্যকে দিয়ে লেখালেও চিঠির শেষে তিনি 'দাদু' লিখতেন স্বহস্তে। সেই সঙ্গে অনেক সময় নিজের স্বাক্ষরও থাকত।

এরকম ব্যবহার আমার পরিচিত। মা-কে দেখেছি এমনই ভণিতাবর্জিত অপ্রিয় স্পষ্টবাদিতা,অথবা আতিশয্যহীন ভালোবাসার জন্য অনেক দুঃখ পেতে। বন্ধুর কাছে একটু অপ্রস্তুত হলাম এবং একদিন কোনো চিঠি-পত্র না দিয়েই কাঁধের ঝোলায় রং-কাগজ নিয়ে সোজা হাজির হলাম। 'উদয়ন' ছাড়িয়ে 'পৌষালী' হোটেলের দিকে যেতে ডানধারে একটা ছোট বাড়িতে তখন তাঁর

বাস। দাদু টেবিলের ওপর ঝুঁকে একতাল কালো মোম চেপে চেপে নানা-রকম আকার তৈরি করছিলেন। আমি তার উল্টোদিকের তক্তপোষের দখল নিলাম।

সকালে লিপিকার ভদ্রমহিলা এসে চিঠি আর বই-পত্তর পড়ে শোনাতেন—তারপর চিঠির উত্তর লিখতেন। তারপর দুপুরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত আলোচনা। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। সেই সময়টায় আমি ঘুরতে বেরোতাম। সন্ধে থেকে আবার নানা কথা।

পরের দিন দাদু বললেন, 'শান্তিনিকেতন আসতে গিয়ে চোখে পড়েছে এমন কিছু এঁকে দেখাও।' আঁকলাম - এক সাঁওতাল যুবক বসে আছে, পাশে কোদাল, সামনে সাঁওতাল যুবতী - হাতে ঝুড়ি। দাদুর ডান হাতের তর্জনী ধরলাম, বললেন, 'এবার ফিগার দু'টোর আউটলাইন ধরে আঙুলটা চালাও।' এবার মেপে নিলেন চারপাশে কোথায় কতটা জায়গা ছেড়েছি। জেনে নিলেন আকাশ আর মাটির ভেদরেখা কিভাবে কাগজকে ভাগ করেছে। এইভাবে ছবির মধ্যে যে বিমূর্ত প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে, তার গুণাগুণ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন।

এবার জিজ্ঞেস করলেন, ফিগার দু'টিকে আমি যে 'অ্যাঙ্গেলে' এঁকেছি, ছবির দিক থেকে সেটাই কি আমার সবচেয়ে উপযোগী মনে হয়? অর্থাৎ আমি এই ফিগার দু'টিকে নানাদিক থেকে ঘুরে ফিরে কল্পনায় দেখেছি কিনা। এত ভাবি নি, স্বীকার করতে হল। এবার প্রশ্ন, ছবি রচনার কেন্দ্রবিন্দু কোথায়? রঙের বিন্যাস কি ঐ জায়গাটির ওপরই গুরুত্ব কেন্দ্রীভূত করেছে? এমনি আরো কত কথা। এতদিন কলকাতায় শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে কাজ ক'রে আর আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের ক'টি ইংরেজি বই পড়ে নিজের সম্পর্কে বেশ উঁচু ধারণা হয়েছিল। এবার একেবারে পায়ের কাছে বসে 'অ-আ-ক-খ' লেখার হাতেখড়ি শুরু হল।

এরপর মাঝে মাঝে ছুটিতে চলে যেতাম। দাদু বন্ধুর মতো আলাপ করতেন। তখন সবে মার্কস-এঙ্গেলস কিছু পড়েছি। ছবিতেও তেমন কিছু বলতে চাইছি। দেখে শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার ছবি ভালোবাসো?' আমি বললাম, পিকাসো। দাদু বললেন, 'বুদ্ধিদীপ্ত ছবি, তবে রং ঘাঁটতে হলে একবার ভালো ক'রে মাতিস দেখো।' একটু থেমে বললেন, 'Social content নিয়ে ছবি করতে চাইছ পারলে ডমিয়ার আর গইয়া-র ড্রইং দেখো।'

ছবি ভালোবাসি, কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই জীবনদর্শন হবে বৈজ্ঞানিক, এই বিশ্বাসে মন কিছুটা উদ্ধত ছিল। তাই কথা যখন ছবির সীমানায় ধর্ম, সমাজ ইত্যাদিকে ছুঁতো, তখন পদে পদে তর্ক করতাম। দাদুও তর্ককে উৎসাহ দিতেন। বুঝতে চাইতেন আমার চিন্তার উৎসটা কোথায়। জানতে চাইতেন আমাদের প্রজন্ম কী দেখছে, কি ভাবছে।

'৬৮ সালে ফাইনাল এম বি বি এস পরীক্ষা দেওয়ার আগে থেকেই উগ্রপন্থী মার্কসীয় রাজনীতির দিকে মন ঝুঁকছিল। বৃহত্তর মানবসমাজ নিয়ে শিশুসুলভ চিন্তাভাবনা এবং আবেগ-উত্তেজনা মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলেছিল। পড়াশোনা, ছবি-আঁকা দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। কিন্তু ঐসব ব্যাপারে ক্ষতির বদলে লাভের চিন্তা করাটা তখন আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ বলে মনে করছি। বাবা-মা এবং অন্য গুরুজনদের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে চলেছিল। কিন্তু দাদুর কাছে এসব কথা অকপটে বলা যেত। বন্ধুত্বের উষ্ণতা নিয়ে তিনি আমার মানবিক অনুভূতিগুলোকে সহানুভূতি জানাতেন। আমার ছবি-আঁকার ভবিষ্যৎ নিয়ে হয়ত বা চিন্তিত হতেন, কিন্তু হতাশ হতেন না।

'৬৯-৭০ সালটা একটা মত্ত আচ্ছন্নতায় কাটছিল,নিজের মনে সংশয় মিটছিল না। কিন্তু মেটানোর মতো অবসরও ছিল না। একটার পর একটা কাজের সূত্রে ধরে রাত্রি ও দিন জড়িয়ে যাচ্ছিল। পারিবারিক আর্থিক অনটনও কম ছিল না। তাই '৭০-এর জুলাই-এ 'অ্যাড-হক' ভিত্তিতে হেল্‌থ-সেণ্টারের ডাক্তার হিসেবে বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত-প্রদেশে ইন্দাস গ্রামে হাজির হলাম। বিদ্যুৎ-বিহীন আদিগন্ত ধানক্ষেতের দক্ষিণ-সীমানায় জল থৈ থৈ চত্বরের মাঝখানে ইট-বাঁধানো রাস্তা ধরে হাসপাতালে পৌছুলাম। কলকাতার উত্তেজিত কর্মচাঞ্চল্য থেকে এক নির্বাসিত একাকিত্ব। দাদু খবর পেয়েই চিঠি দিলেন—

২

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ১০. ৮. ৭০]

দুলাল,[১]

…সরকারী চাকরিতে প্রথম যারা যোগ দেয় তাদের পক্ষে দু-চার মাসের মধ্যে মাইনে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তোমার কর্তারা কোথায় জানি না। যদি সেখানে কেউ পরিচিত থাকে তবে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সুরাহা হতে পারে। তবে সবই নির্ভর করছে ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের উপর। যাই হোক, তোমার কর্তারা কোথায় থাকেন সেই ঠিকানাটা আমায় পাঠিও। যদি প্রয়োজন বোধ কর আমাকে জানালে কিছু টাকা বিনা সুদে তোমায় ধার দিতে পারি। টাকা পেলে আমাকে আমার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবে। নতুন জায়গায় সহজে ধার করতেও নেই, আর পকেটে পয়সা নেই একথা জানাতেও নেই। তুমি যেখানে আছ সে জায়গাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। শুনলাম ইন্দাস গ্রামে এখনও বিংশ শতাব্দী প্রবেশ করতে সক্ষম হয় নি। তবে 'জিন্দাবাদ', 'দাবি মানতে হবে' ইত্যাদি শুনতে শহরে না-থাকার দুঃখ কিছুটা তোমার কমবে। সিরিয়াস মানুষের পক্ষে কিছুকাল

এমন পাড়াগাঁয়ে বাস করাতে বিশেষ লাভ হয় বলে আমি বিশ্বাস করি। (এ বিষয়ে আমি সেকেলে)।...

মাঝে মাঝে খবর দেবে। আশা করি ভালো আছ। ইতি -

দাদু

১ আমার ডাক নাম।

তখন প্রথম যুক্তফ্রণ্টের আমল, ইন্দাস বর্ধমানের সীমানায় এবং সি-পি-এমের শক্ত ঘাঁটি। সরকারী অফিসাররা কথায় কথায় আক্রোশের লক্ষ্য হয়ে উঠছে। পল্লীসমাজের কুটকচালি, স্টাফেদের ঘরোয়া কোন্দল বুঝে উঠতে আমি হিমশিম খাচ্ছি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বর্জিত এই গণ্ডগ্রামের দুর্বিষহ প্রাত্যহিকী জানিয়ে দাদুকে চিঠি দিলাম প্রায় একমাস বাদে। ১০ই সেপ্টেম্বর ইনল্যাণ্ড এলো

৩

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ৭. ৯. ৭০]

দুলাল,

অনেকদিন পরে তোমার পত্র পেলাম। টুনটুনি[১] ও শীলা[২] তোমার কাছ পর্যন্ত যখন এসেছিল তখন আমার এখানেও ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল। তুমি কি কোয়ার্টার পেয়েছ ?

তোমাদের 'ইজম্' যাই বলুক, একথা অবশ্যই মনে রাখবে যে সরকারী চাকুরের পক্ষে অধীনস্থ কর্মচারীর সঙ্গে ভাই-ভাই করা যেমন বিপজ্জনক তেমনি একেবারে সাহেব বলে দূরে রাখাও চলে না। যদি সরকারী আইন ভাঙা-গড়ার অধিকার তোমার হাতে থাকত তবে তুমি যেমন ইচ্ছে মেলা-মেশা করতে পারতে। কিন্তু তোমার দায়িত্ব আইন মানানো এবং নিজে মেনে চলা। একটি কথা অবশ্যই জেনে রাখবে যে অধীনস্থ কর্মচারী যদি বুঝতে পারে যে তুমি ভয় পেয়ে তাদের সঙ্গে দাদা মামা বলছ তবে কিন্তু বিপদ অনিবার্য। উপদেশ বোধহয় একটু লম্বা হয়ে গেল।

এবার বিগ্‌ ব্রাদার স্ট্যালিনের একটি উক্তি জানাই - তিনি বলেছেন, লিডার যদি জনতার মন যুগিয়ে চলে তবে জনতা তাকে দূর ক'রে দেবে। আর যদি সে জনতা থেকে অনেক দূরে বসে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে তাতেও ফল হবে না। মোট কথা, সাহেব সেজে ছড়ি ঘুরিয়ে কর্তৃত্ব করবার দিন গেছে, একথা মানতে আমি বাধ্য।

তোমার কোয়ার্টারে ভালো বাথরুম ইত্যাদি থাকলে একবার ডাক্তারকে দেখে আসবার ইচ্ছে রইল—ইতিমধ্যে যদি একটা মটর গাড়ি জোগাড় করতে পার, আরো ভালো। ছবি আঁকার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছ। নিন্দাও নেই, প্রশংসাও নেই। আমি ঠিক এইরকম পরিবেশ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি। এ-ও কিন্তু বুর্জোয়া মনোভাব।

শুনছি 'ইনল্যাণ্ডে' আর বেশি জায়গা নেই, কাজেই বাকী কথা পরে হবে।

দাদু

১ বিনোদবিহারীর মেজদা ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, আমার মা।
২ আমার দিদি।

দাদুর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সহজ কৌতুক ছিল যে সহজেই মনকে স্পর্শ করল। আশ্চর্যের কথা, এই প্রথম আমি নিজের মনে নানারকম ছবি করতে লাগলাম। কলকাতায় সব সময়ই মনে হতো আরো শিখতে হবে। এখানে শেখার আর কোনো সুযোগ নেই। অতএব নিজের অপটু হাতেই ছবি আঁকা শুরু হল। দেশ-বিদেশের প্রদর্শনী দেখারও সুযোগ নেই। তাই ক্রমেই চিন্তা-ভাবনা থিতিয়ে এলো। কিন্তু শুধু অনুভূতির উপর নির্ভর ক'রে এগোতে যুক্তিনিষ্ঠায় বাধছে। তাছাড়া পুরনো অভ্যাস অনুযায়ী অ্যাকাডেমি, কফি-হাউসের জন্য মন কাঁদছে। ঠিক feed-back হচ্ছে না। এ ক'রে কি চলে?

মন পিছিয়ে পড়ছে, এই ভয়। অন্যদিকে মার্কসীয় ঔচিত্য-বোধ এমন এক অনুশাসনে মনকে বেঁধে রেখেছে যে আমার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করতেও আমি কুণ্ঠিত। সমস্যাটা নিজের কাছেও সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল না। তাই অকারণ আবেগ ও ক্ষোভে অস্পষ্ট ভাষায় এক দীর্ঘ চিঠি লিখলাম দাদুকে। সম্ভবত দাদুরও এর অর্থ উদ্ধার করতে সময় লেগেছিল। তাই এবার প্রায় মাসখানেক নীরবতার পর উত্তর এলো—

৪

[শান্তিনিকেতন]
১৬।৫।৭১

দুলাল,

আমার সেক্রেটারি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনেকদিন চিঠি লেখার কাজ বন্ধ ছিল।…তুমি বোধহয় 'ইনটুইশান'-এর মানে জানতে চেয়েছিলে। সাধারণ অভিধান মতে 'ইনটুইশান' মানে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ('ইনটেলেক্ট' থেকে স্বতন্ত্র)। আমাদের শাস্ত্রমতে 'ইনটুইশান'কে বলা হয় প্রজ্ঞা তথা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

(1) 'A super-natural divine influence which qualifies men to receive and communicate divine truth.'

Inspiration is well-defined by Webster—

(2) 'The artist who can claim to have been inspired is one who does his work in accordance with "the pattern of all that he had by the spirit".

বর্তমানে আর্টিস্টরা অনেকেই এসব কথা বিশ্বাস করে না। তাদের বিশ্বাস ইনটেলেক্ট-ই সর্বশক্তিমান। কিন্তু কেবলমাত্র ইনটেলেক্টের সাহায্যে 'কনস্ট্রাকশান' হয়, 'ইমিটেশান' হয় ('ইমিটেশান' একরকমের 'কনস্ট্রাকশান') কিন্তু 'ট্রান্সফরমেশান' হয় না।

সম্প্রতি কেমব্রিজের জনৈক অধ্যাপকের লেখাতে দেখছি, যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সাধারণ মানুষ প্রভাবান্বিত সেগুলিকে ঐ অধ্যাপক বড় কিছু বলে মনে করছেন না। তাঁর মতে বিজ্ঞান ও শিল্প তখনই সার্থক যখন এই দুই পথে জীবনের বৃহত্তর চেতনার সন্ধান মেলে। এসব কথা বিশ্বাস কর বা না কর তাতে কিছু আসে যায় না, তবে ছবি করবার সময় যখন অতর্কিতে 'ইনটুইশান' তোমার মধ্যস্থতায় কাজ করে তখন সেই কাজ সার্থক হয় এবং শিল্পী নিজেই নিজের কাজ দেখে বিস্মিত হয়।

আজকাল ছাত্রমহলে প্রায়ই শুনি কালের দাবি মানতে হবে। কালের দাবি অবশ্যই মানতে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কতটা মানতে হবে সে মতভেদ অবশ্যই থাকবে। 'একজিবিশান' ইত্যাদি দেখতে পারলে খুবই ভালো। দেখবার সুযোগ না থাকলে কি করা যেতে পারে সেই কথাই আমি তোমায় লিখেছিলাম। ইতিমধ্যে যা দেখেছ তার সাহায্যেও পরিণতি কোন দিকে অনুমান করা আর্টিস্টের পক্ষে অসম্ভব নয়। এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তবে সে সব কথা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। একবার দেখা হলে বইপত্র-পত্রিকার সাহায্যে তোমার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ত ক'রে দেওয়া যেত। আশা করি ভালো আছ। —দাদু

গ্রামের নিঃসঙ্গ জীবনে এই চিঠিটি আমাকে অনেকখানি ভরসা যুগিয়েছিল। শহরের কোনো সুবিধে নেই, কিন্তু এমন অফুরন্ত নিজস্ব সময় পাওয়াও যে জীবনের একটা বড় সুযোগ, এ-কথাটা বুঝতে শুরু করেছিলাম। এবার পুরোদমে ছবি আঁকা চলল।

আগস্ট মাসে আমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। সেই সুবাদে লম্বা ছুটি নিলাম। অনেক দিন বাদে কলকাতা। বন্ধু-বান্ধব-বিবাহ-উৎসব। বিয়ের পর-পরই দু'জনে শান্তিনিকেতন গেলাম। দাদু বললেন, 'নাতির বৌকে তো একটা

কিছু দিতে হয়। আমার সংগ্রহে একটা প্রদীপ আছে, এটাই মহুয়ার হাতে মানাবে।'

প্রদীপটি বীরভূমের প্রাচীন ঢোকরা রীতির কাজের এক সুন্দর নিদর্শন—এক পূজারীর হাতে ধরা প্রদীপ। আমরা দু'জনেই খুব খুশি। এবার আমায় বললেন, 'তুমি তোমার পছন্দমতো আমার একটা ছবি বেছে নাও।'

এইসব আনন্দ আর হৈ-চৈ-মেলামেশার শেষে এবার ফিরে এলাম সেই হেল্‌থ সেণ্টারের কোয়ার্টারে। হেল্‌থ সেণ্টারে ঝামেলা লেগেই আছে। শ্বাসরুদ্ধকর একঘেয়েমির মধ্যে বৈচিত্র্য বলতে মাঝে-মধ্যে পার্টির দাদাদের হুমকি, অথবা কোনো স্বার্থান্বেষীর মোসাহেবি। ইতিমধ্যে পুজোর মাস শেষ হয়েছে, বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে সঙ্গে গ্রাম-সংসারের দুঃখ-গাথা লিখে চিঠি দিলাম। দাদুর চিঠি এল ৭ই নভেম্বর—

৫

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ৫ ১১. ৭১]

দুলাল,

তোমার পত্র পেলাম। এবার চিঠিতে ছবির কথা কম। সংসারের কথাই বেশি। যেসব অন্যায় দেখে তোমার মন বিচলিত সেইসব অন্যায় দেখে ফসিলের মত নির্বিকার থাকা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। এসব সমস্যা কোনো একজন দূর ক'রে দেবে এমনও কল্পনা করা কঠিন। এইসব দেখার পর ছবি আঁকার অভ্যাস রাখতে পারলে ছবি ভালোই হবে, এইটুকু আমি বলতে পারি। যদি বল, ছবি ক'রে কী লাভ তার জবাব থাকলেও আপাতত আমি দিচ্ছি না। অন্যের রোগ দুঃখ তোমার নজরে পড়ে। ডাক্তার হিসেবে যদি তুমি গ্রামের লোককে কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগ টোটকা চিকিৎসা শিখিয়ে দাও তবে তারা উপকৃত হবে।

একটি ব্যক্তিগত কথা বলছি, অপরাধ নিও না। শান্তিনিকেতনের আশে-পাশের গ্রামের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং কোপাই-এর ওপারে একটা মাটির বাড়িও কিনেছিলাম। সেই সময় গ্রামের লোকের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক হয়েছিল, যে সম্পর্ক আজও অল্পবিস্তর আছে। অনেক দুরারোগ্য অসুখ নিয়ে এরা ডাক্তারের কাছে যায় না। আজকাল হয়ত যায়। এছাড়া আমার যারা চাকর ছিল (ঝি ছাড়া) তাদের সকলকেই আমি কাজ চালাবার মতো লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম। এবার এসে দেখছি তাদের অনেকেই সেই সামান্য লেখাপড়ার দৌলতে কনট্রাক্টর সাব-কনট্রাক্টর ইত্যাদি হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু উল্লেখ করার কারণ—চেষ্টা করলে একজন মানুষ নিজের

আশেপাশের কিছুটা জঞ্জাল সাফ করতে পারে। বৃহৎ সমস্যার সামনে এই কাজ যৎকিঞ্চিৎ। বৃহৎ সমস্যা নিয়ে কাজ করবার শক্তি ও প্রতিভা যাদের আছে তারা অবশ্যই আমাদের মতো ঘরে বসে থাকবে না। তোমার কার্যক্ষমতা কিরকম তা তুমিই জান। আমি নিতান্তই আর্টিস্ট। তবে গ্রামে স্কেচ করতে গিয়ে 'তোরা বেশ আছিস্' —একথা বলি নি। ভূমিকা করতে গিয়ে আদত কথা বলা হল না। ছবি নিয়ে কোনো সময় এখানে বেড়িয়ে গেলে আরো কথা হতে পারে। তবে সে সবই হবে ছবির কথা। ইতি— দাদু

আদত কথা, দাদু চাইছিলেন আমি যেন আমার সামর্থ্য কতটা এটা বুঝে নিতে চেষ্টা করি। আর শিল্প এবং সমাজসেবার মধ্যে কোনটা আমার কাছে আগে সে সম্পর্কেও যেন আমার ধারণা স্পষ্ট হয়।

চাকরির কঠিন আসনে বসে আমি ক্রমশ আমার সীমিত সাধ্যকে মেনে নিচ্ছিলাম। বি ডি ও থানার ও. সি. এরাই তখন আমার সেই বিভুঁই-এর সুহৃৎ। আমার কলেজের বিপ্লব-স্বপ্ন কথায় এবং কাজে টুকরো-টুকরো হয়েছে। ছবিই আমার মনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ছবি আঁকছি ক্ষোভে দুঃখে। '৭১ এর শেষে বাড়ির সকলে—বাবা-মা স্ত্রী—কলকাতা ছেড়ে আমার কোয়ার্টারে এসেছে। তাই সংসারে জমজমাট। এরই মধ্যে দাদুর চিঠি এলো।

৬

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ৭. ১. ৭২]

দুলাল,

…লীলা[১] ২০শে জানুয়ারি এখান থেকে দেরাদুন রওনা হবে। তার পূর্বে এলে মহুয়ার[২] সঙ্গেও লীলার দেখা হতে পারে। শান্তিনিকেতন গেস্ট হাউসে জায়গা হতে পারে, তবে এক সপ্তাহ পূর্বে আমাকে জানাবে। সেখানে জায়গা না হলে এখানে কাটিয়ে যেতে পারবে।

আমার ম্যুরাল শেষ হয়ে এসেছে, এই মাসের মধ্যেই সব কাজ শেষ হবে। ছবি সঙ্গে আনলে ভালো করেই আলোচনা করা যাবে।…

কাজের চাপ পড়লে কিছুটা খাটতে পারছি, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ক্লান্তি দূর হতে অনেক সময় লাগে।

আশা করি সব ভালোই আছ। তোমাকে যা লিখলাম, মহুয়াকেও তাই লিখলাম। ইতি— দাদু

১ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, শিল্পী।
২ আমার স্ত্রী।

নতুন ছবি নিয়ে সস্ত্রীক রওনা হলাম শান্তিনিকেতন। ছবি নিয়ে দাদুর উৎসাহের শেষ নেই। দিদা এবং অন্য কয়েকজন শিল্পী-ছাত্রদের দেখিয়ে মতামত নিলেন। দাদুর উৎসাহের মুখে অন্যদের মৃদু প্রশংসা না ক'রে উপায় ছিল না। ছবির পিছনে কতটা সময় আমি দিতে পারি সেটা শুনে নিয়ে নানারকম পরামর্শ দিলেন। একসময় দাদু কালো-নীল-সাদা এই তিনটি রং মিশিয়ে প্রায় monochrome ধরনের কিছু ছবি করেছিলেন। সেগুলো দেখতে বললেন। অর্থাৎ পছন্দ হলে এভাবে আমি কাজ করতে পারি। শেষে বললেন রোজ রাতে যেন সারাদিনের স্মৃতি থেকে একটা অন্তঃত ড্রইং ক'রে তবে শুতে যাই। এই নিয়মরক্ষা আমার হয় নি। অনেক পরে দাদু আরেকবার বলেছিলেন: 'রোজ কিছু কাজ কোরো। আমি নিজেকে মিস্ত্রী মনে করি। রোজ কিছু-না-কিছু করতে হবে। creation হচ্ছে কিনা ভাবি না। আজকাল অনেক আধুনিক শিল্পী creative urge না এলে কাজ করতে পারে না। আমাদের এ চিন্তা ছিল না। কাজ করতে করতে হঠাৎ একদিন ভালো কাজ হয়ে গেল তো খুব আনন্দ।'

ঠিকমতো পালন করতে না পারলেও তাঁর এই কঠিন নির্দেশ আমার ছবি আঁকাকে জিইয়ে রেখেছিল। ছবিতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-বিক্ষোভ ইত্যাদি প্রকাশের obsession-এ তখনো আমি ভুগছি। দাদু বললেন: 'কিছুদিন মুখ বদলাও, landscape করো। "মিডিয়াম" পালটালে কাজ হয়। কিছুদিন কোলাজ করেও দেখতে পার।'

সত্যজিৎ রায়ের দাদুর শিল্পীজীবন সম্পর্কে তোলা ছবি Inner Eye তখন সবে দেখেছি। সে কথা জানাতে দাদু জিজ্ঞেস করলেন: 'সত্যজিৎ রায়ের কি এখন সিনেমা ক'রে খুব নাম হয়েছে?' আমি তো প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললাম। দাদু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন: 'আন্দাজ করেছি। কারণ ওর ফিল্ম করার পর আমারো নাম-ডাক বেড়েছে বলে এখানে সবাই বলছে।'

চিত্র-ভাস্কর্য বিষয়ে সদাসতর্ক এই মানুষটি অন্য সব খবরে এমনই অদ্ভুতরকম উদাসীন ও নির্বিকার থাকতেন। সেবার ফিরে আসার পর দাদু অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিঠিতে নানা টোট্‌কা ওষুধের খবর পাঠালেন।

৭

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ২৪. ৫. ৭২]

দুলাল,

··· এতদিনে খবর পেলাম ফিল্ম তৈরি হয়েছে এবং ফিল্ম সংক্রান্ত কাগজে কিছু কিছু ছবিও বেরিয়েছে। তুমি কিছু টোট্‌কা ওষুধের খবর চেয়েছিলে। পেচ্ছাব কমে যাওয়া, খুব কম পরিমাণে পেচ্ছাব হওয়া ইত্যাদি উপসর্গে

অমোঘ ওষুধ গোক্ষুর। তিন আঙুলে [তিন আঙুলে ধরার স্কেচ] যতটা তোলা যাবে ততটা গোক্ষুর বীজ এককাপ জলে রাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে, সকালে সেই জল ছেঁকে খালিপেটে খেতে হবে। জলের স্বাদ সামান্য কষা। এই জল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যাবে এবং তিনদিন খাওয়ার পর প্রায় নর্ম্যাল অবস্থা ফিরে আসবে। [স্কেচ] গোক্ষুর দেখতে এই রকম, রং হাড়ের [?] চেয়ে একটু deep—যেকোনো বেনের দোকানে পাওয়ার কথা। নিজে পরীক্ষা ক'রে এখবর তোমায় দিলাম। যাদের 'স্টোন' আছে, তাদেরও এই জল খেলে উপকার হবে।

পাটপাতা—পাটশাকের ঝোল, সম্ভব না হলে ৪-৫টি একগ্লাস জলে রাত্রে ভিজিয়ে রাখবে, পরের সকালে ঐ জল খেলে গ্যাস্ট্রিকের জ্বালা সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে। এই ব্যবস্থাতে আমার গ্যাস্ট্রিকের জ্বালা সম্পূর্ণ সেরেছে।

আশা করি আবার তুমি ছবি আঁকার সুযোগ পেয়েছো। আশা করি বনবিহারী[১], টুনটুনি, তুমি ও মহুয়া ভালো আছ। ইতি—

দাদু

[চিঠির শেষে স্বহস্তে লিখেছেন : 'ড্রইং আমার নয়।']

১ ডাঃ বনবিহারী ভট্টাচার্য, আমার বাবা।

সাধারণ গরীব মানুষদের সামান্য অসুস্থতার জন্য দামি দামি ওষুধ না লিখে টোট্‌কা উপদেশেও কিছু উপকার করা যেতে পারে, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। দাদুর কথা চিন্তা করেই কিছুদিন পর বিষ্ণুপুর সাহিত্যপরিষদের মানিক সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি। তিনিও মহাউৎসাহে দেখালেন যে তাঁদের লাইব্রেরিতে ঐ টোট্‌কা বিদ্যার ওপর লেখা কয়েকশো পুঁথি আছে। অবশ্য এই লিপি উদ্ধার করার জ্ঞান বা অবকাশ আমার আর হয় নি।

ইতিমধ্যে দাদু এবার শান্তিনিকেতন ছেড়ে দেরাদুনে দিদার কাছে চলে যাবেন বলে কথা হচ্ছিল।

৮

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ১৭. ৬. ৭২]

দুলাল,

তোমার পত্র পেলাম। ১৫ই জুলাই পর্যন্ত লীলা এখানে থাকবে। কন্যা দিল্লী চলে গেছে। একবার তুমি ও মহুয়া এদিকে আসতে পারলে ভালোই হতো। যদি সম্ভব হয় বেড়িয়ে যাবে। আমি মোটামুটি ভালো আছি। নতুন কিছু কাজকর্ম করার ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার চিঠিতে যে সব খবর পেলাম সে

বিষয়ে কমেণ্ট করার অধিকার আমার নেই। আমাদের মন্ত্রীদের বোধহয় ধারণা যতদূর পর্যন্ত মোটর রাস্তা আছে ততদূর পর্যন্ত ভারতবর্ষ। বাকি অংশটা 'কিছু নয়'। আজকাল রেডিও শুনছি। রেডিওতে প্ল্যান প্রোগ্রাম এবং টাকার খবর পাওয়া যায়। খাবার 'রেসিপি' পড়ে পেট ভরানোর মতো অবস্থা। আশা করি অল্পস্বল্প ছবি আঁকবার মতো সুযোগ তোমার থাকবে

এখানকার চাকরি শেষ হল, কাজেই ভবিষ্যতে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ নাও হতে পারে। এই কথা মনে ক'রে একবার বেড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। ইতি— দাদু

শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবেন শুনে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এত ঘন ঘন ছুটি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। শেষপর্যন্ত আগস্টের মাঝামাঝি দু'দিনের জন্য ছুটি মিললো। ইতিমধ্যে যা-কিছু ছবি এঁকেছি সব পাকিয়ে 'রোল' ক'রে নিয়ে গেলাম। হাত বুলিয়ে দেখলেন। তখন সোমনাথ হোর শান্তিনিকেতনে। দাদুর নির্দেশে তাঁকেও দেখালাম। সোমনাথ বাবু কি বললেন মন দিয়ে শুনতে চাইলেন। ফিরে এসে এবার ছবি বাছাই ক'রে প্রদর্শনী করার জন্য কলকাতার অ্যাকাডেমিতে হল বুক করলাম নভেম্বরে। জানতে পেরে দাদু লিখলেন—

৯

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ২২. ৯. ৭২]

দুলাল,

Exhibition করছ জেনে খুশি হলাম। কলকাতার বন্ধুবান্ধদের কিছু সাহায্য না পেলে exhibition-এর ব্যবস্থা একা ক'রে তোলা একটু কঠিন। mount করা ছবি ঘরে রাখা খুবই অসুবিধেজনক। এমন কি কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেও অসুবিধে হবে। বিশেষ ক'রে হালফ্যাশানের ১ ফুট ছবির জন্য ৩ ফুট কাঠ-মাউণ্ট আরো অসুবিধে। পয়সা খরচও যথেষ্ট। আমার মতে কাঠ-মাউণ্ট খুব বড় না করাই উচিত। (আমি চিরকাল ছোট হালকা কাঠ-মাউণ্ট ব্যবহার করেছি। বর্তমানে আমার শুভানুধ্যায়ীরা বড় অত্যন্ত দামি কাঠ-মাউণ্ট দিয়ে দিল্লীতে exhibition করেছিল। ফলে যে ছবি একটা সাধারণ ট্রাঙ্কের মধ্যে ক'রে পাঠিয়েছিলাম, সেই ছবি দিল্লী থেকে আনতে হয়েছে ৪'×৩' ফুট দু'টি প্যাকিং বক্সে ক'রে।)

২৫টি ছবিতেও আজকাল exhibition হয়। ৪০ খানা হলে বড় exhibition হয়। রঙিন ছবি কাঠ-মাউণ্ট black and white screen-এ ব্রাউন পেপারের উপর পিন দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তোমার বন্ধুবান্ধব

নিশ্চয়ই দর্শক হিসেবে আসবে। কাজেই একেবারে খালি হলে বসে থাকতে হবে না। ধীরেন ব্রহ্মের[১] কাছ থেকে সকলরকম সাহায্য অবশ্যই পাওয়া যাবে। রথীনবাবুর[২] কাছ থেকেও সাহায্যের আশা অবশ্যই করতে পার। সময়মতো জানালে আমার পরিচিতদের চিঠি দেব।

December পর্যন্ত এখানে আছি···স্বাস্থ্যের অবনতি ধীরে ধীরে ঘটছে। আশা করি সবাই ভালো আছ। ইতি— শুভানুধ্যায়ী

দাদু

১ শিল্পী ও তৎকালীন অধ্যাপক, গর্ভনমেন্ট কলেজ অফ আর্টস।
২ শিল্পী রথীন মৈত্র।

প্রথম প্রদর্শনী, ছুটি মাত্র দশদিনের। মাসখানেক আগে ছবিগুলো কালীঘাটের একটা ছোট দোকানে বাঁধাতে দিয়েছি। উত্তেজনা যথেষ্ট। কিন্তু দাদুর উৎসাহ আমার থেকেও বেশি। অসুস্থতার মধ্যেই ১৬ই অক্টোবর দাদুর চিঠি পেলাম—

১০

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ১৩. ১০. ৭২]

দুলাল,

পূর্বের চিঠিতে সব কথা স্পষ্ট হয়েছে কিনা জানি না। তবে এইটুকু স্পষ্ট বুঝলাম যে আজকাল মাউন্ট বোর্ডে ছবি পিন্ ক'রে দেওয়ালে তথা স্ট্র-বোর্ডে fix ক'রে দেওয়ার রীতি যথেষ্ট প্রচলিত। যে ছবি সম্পূর্ণ রঙিন অর্থাৎ যে ছবিতে সাদা কাগজের সব অংশই হালকা বা গাঢ় রঙে ঢাকা সে ছবি সরু কাঠের ফ্রেম দিলে দেখতে ভালো হয়। যে ছবিতে কাগজ ছেড়ে ছেড়ে রং লাগানো হয় সে ছবিতে কাঠের ফ্রেম না দিলেও চলে। exhibition হলে কাঠের ফ্রেম লাগালে ছবি ঝোলাবারও ব্যবস্থা আছে। জানাশোনা ফ্রেমার ধীরেন ব্রহ্ম এবং তার ছাত্ররা তোমাকে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে। exhibition-এর বন্দোবস্ত করতে বোধহয় সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে। চিঠি বিলি করতে হয় exhibition খোলার সাতদিন আগে। মোট কথা, চিঠি exhibition খোলার একদিন আগে নিমন্ত্রিতদের হাতে যাতে পৌঁছয় সে হিসেব রাখা অবশ্যই দরকার। কাগজের মধ্যে Statesman, আনন্দবাজার, যুগান্তর এরাই প্রদর্শনীর রিপোর্ট দিয়ে থাকে। শুনেছি বামপন্থী কাগজ [গুলো] আজকাল প্রদর্শনীর খবর ইত্যাদি দিয়ে থাকে। চিঠি পোস্ট করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে রাখলেই ভালো।

ছবিগুলি একজন ডাক্তারের কাজের ফাঁকে করা – সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য যদি ক্যাটালগ কর, নচেৎ দরকার নেই। আমার শরীর তেমন ভালো নয়। পেটের জ্বালা ইত্যাদি এখন নেই। হঠাৎ হঠাৎ অতিরিক্ত দুর্বল বোধ করি। হয়ত খাওয়া হজম হচ্ছে না। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের সঙ্গে contact করাই দুরূহ। কাজেই সে চিকিৎসাও চালাতে পারব কিনা জানি না। মোটামুটি শরীরের অবস্থা ভালো নয়। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। ইতি –

দাদু

এরপর যে চিঠি দেন সেটা ইন্দাসে পৌঁছবার আগেই আমি কলকাতায় চলে এসেছি। চিঠি re-directed হয়ে যখন হাতে এল তখন প্রদর্শনী শেষ হতে দু'দিন বাকি।

১১

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ২. ১১. ৭২ ?]

দুলাল,

গতকাল অত্যন্ত তাড়াতাড়ির মধ্যে তোমাকে চিঠি দিয়েছি। ধীরেন ব্রহ্মের ঠিকানায় আর দু'খানি কার্ড পাঠাবে – (১) অজয় ঘোষ, (২) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি exhibition-এর সময় প্রয়োজন হলে ধীরেনের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পার। তার সঙ্গে আমার লৌকিকতার সম্বন্ধ নয়। যদি ছবি বিক্রি করবার ইচ্ছে থাকে, তবে একটা price-list টাইপ ক'রে Desk-এর ওপর রেখে দেবে। Press-এর সঙ্গে contact করেছ কি ? ডাক্তার আর্টিস্ট এই প্রথম অ্যাকাডমিতে ছবি exhibit করছে। review ভালোই পাবার কথা।

যাই হোক কাগজপত্রে কিরকম মন্তব্য বেরলো তার একটু খবর দেবে। যত-দূর মনে পড়ছে, লেডি মুখার্জীর সঙ্গে আনন্দবাজারের বিশেষভাবে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের বেশ ঝগড়া। opening day-তে যদি দু'চারজন তোমার পরিচিত বিশিষ্ট ডাক্তার উপস্থিত থাকেন, তাহলেই হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ভালো review দেবে। ইতিমধ্যে ধীরেনকে আমি চিঠি দেব। ছবি সাজাবার সময় হয়ত সুধীনবাবুর সাহায্য পেতে পার। ফ্রেম, মাউণ্ট ইত্যাদিতে তোমার কত খরচ হল ? বনবিহারী ও টুনটুনিকে আমি বিজয়া উপলক্ষে চিঠি দিয়েছি। আশা করি সকলে ভালো আছ। ইতি –

দাদু

সময়ের অভাবে দাদুর কথামতো সবার সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি। তবে বিনা নিমন্ত্রণেই লেডি মুখার্জী এসে একটা পাতাবাহারের ডাল নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। অচেনা শিল্পী এবং সমালোচকদের থেকেও উৎসাহ পেয়েছিলাম। এবার ফিরে এসে জলরং ছেড়ে 'কোলাজ' শুরু করলাম। ওষুধ-কম্পানির বিজ্ঞাপনের কাগজ, X-ray plate ইত্যাদি লাগিয়ে ছবি শুরু হল। ছবি জুড়তে, সাজাতে অনেক সমস্যা। খুঁটিনাটি জানিয়ে চিঠি দিলাম। দাদুর চিঠি এল –

১২

[শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক ১৫. ১১. ৭২]

দুলাল,

…কোলাজ করার জন্য Fevicol একটিন কিনতে পার। যে কোনো জিনিস এই আঠা দিয়ে জোড়া যাবে। তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে ; তাড়াতাড়ি ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়। একটি প্লেটে খানিকটা জল নিয়ে তাতে Fevicol-টা গুলে পাতলা কাগজ জোড়া যাবে। মোটা কাগজ,চামড়া, পিজ-বোর্ড ইত্যাদি জুড়তে হলে Fevicol পিওর ফর্মে লাগালেই ভালো। আরো মোটা জিনিস যদি হয় তাহলে উপরে চাপ দিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। কেবল কাগজ জুড়তে হলে ভালো ময়দার আঠাতে বেশ কাজ হবে। খুব চকচকে কাগজ গঁদে জুড়তে চায় না।

আমার হিসেবে কোলাজ তুমি ভালোই করতে পারবে। কারণ এই জাতীয় কাজে পার্টিকুলার সেন্টিমেন্ট প্রকাশের সুযোগ কম। তোমার ড্রইং কম্পোজিশান ইত্যাদি সম্বন্ধে আপত্তি কারোরই নেই। আপত্তি পুনরাবৃত্তিতে। কোলাজ করলে এই পুনরাবৃত্তি অবশ্যই বন্ধ হবে এবং নতুন form অবশ্যই emerge করবে তোমার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। এরই নাম method and material-এর প্রভাব। তোমার প্রাপ্য ছবির কথা আমারো মনে পড়ে নি, তবে পাওনা রইল।…আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। ইতি –

দাদু

এরপর শান্তিনিকেতন ছেড়ে দাদু দেরাদুন চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রীও হেল্‌থ সেন্টারের ডাক্তার হিসেবে চাকরি পেয়েছে ইন্দাসের পাশের থানা পাত্রসায়রে। দু'জনে একই হেল্‌থ সেন্টারে পোস্টিং চেয়ে দরখাস্ত করেছি। বদলির কথা হচ্ছে। দাদুকে জানিয়েছি। এবার নতুন লিপিকারের হাতে লেখা পোস্টকার্ড এলো। চিঠির ওপর নিয়মমাফিক স্থান তারিখের উল্লেখ-সহ। সম্বোধনের জায়গায় 'দুলাল'-এর বদলে 'দেবাশিস'।

অটোগ্রাফ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৬

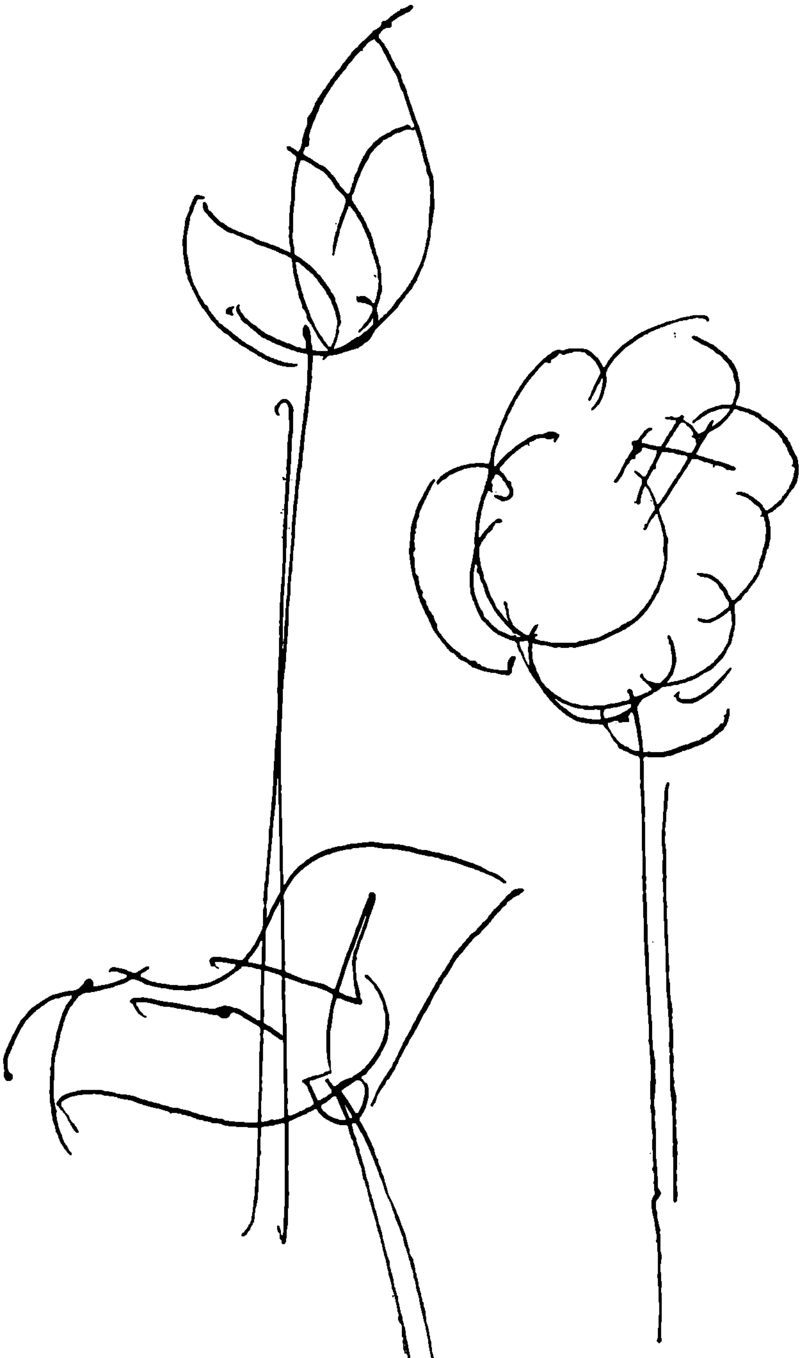

স্কেচ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৭

দেরাদুন
৯. ২. ৭৩

দেবাশিস,

গত ১৬ই ডিসেম্বর দেরাদুন পৌঁছেছি, আমার ঠিকানা ১৭, সারকুলার রোড। পোঃ ডালান ওয়ালা। আসবার পূর্বে আশার অসুখের কথা শুনে এসেছি। সম্ভব হলে তার খবর দেবে। তোমার ঠিকানা সমেত একটা চিঠি দেবে। আশা করি আন্দাজে ঠিকানা লেখা এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে।

দাদু

চিঠির উত্তর দিয়েও এবার অনেকদিন কোনো চিঠি পেলাম না। হয়ত নতুন জায়গায় বাংলায় চিঠি লিখে দেওয়ার লোক পান নি। ইতিমধ্যে ৭৩-এর এপ্রিল আমরা ইন্দাস ছেড়ে 'ওন্দা' হেল্‌থ সেণ্টারে গিয়ে উঠলাম। 'ইদেঁশ' থেকে 'ওদাঁ' গ্রামে গিয়ে জীবনযাত্রা প্রায় একই রইল। তবে ওন্দা যেহেতু বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মাঝামাঝি, তাই এখান থেকে শহরে যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সহজ। বিশেষ ক'রে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলো বারবার দেখার সুযোগ হল। দাদুর কাছে টেরাকোটার মন্দির সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। তাই এ ব্যাপারে আমার কৌতূহল বেড়েছিল। তবে জীর্ণ ছোট ছোট এই মন্দিরগুলো প্রথমদর্শনে আমাকে বিশেষ নাড়া দেয় নি। বিষ্ণুপুর সাহিত্যপরিষদের মানিক সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে তখন বেশ আলাপ হয়েছে। এক একদিন দুপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ডাকতাম। তিনিও অম্লানবদনে চাবি হাতে বেরিয়ে আসতেন। পরিষদের দরজা খুলে অমূল্য সব পুঁথি-পাটা নামিয়ে দেখাতেন। বইপত্তর যতই ঘাঁটছি, ইতিহাস পাচ্ছি অথচ সৌন্দর্য-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে। তাই দাদুর কথা ঘুরে-ফিরে মনে হতো। সেবছর শীতে আমরা দিল্লি বেড়াতে গেলাম। ইচ্ছে দিল্লি থেকে দেরাদুন ঘুরে আসবো। বিষ্ণুপুরের চাকচিক্যহীন টেরাকোটা মন্দিরের স্মৃতি নিয়ে দিল্লির বাদশাহী স্থাপত্য কীর্তির জৌলুস দেখলুম। মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেরাদুন যাওয়া হল না। অতএব সেই চিঠিই ভরসা। প্রথম চিঠির উত্তর আসে না, তাই আবার লিখলাম। এবার উত্তর এলো।

Dehra Dun
13. 12. 73

দুলাল,

দিল্লী থেকে ফিরে গেলে এটা তেমন সুসংবাদ নয়। যাই হোক আবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটাই সান্ত্বনা। দিল্লীতে যারা যাতায়াত করে তারা তো সবাই অফিসার। তবে কি তোমার পদোন্নতি হল? অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। Cardiograph ক'রে ডাক্তার আমায় সাতদিন বিছানায় শুইয়ে রেখেছিলেন। সেজন্যে তোমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি।

ছবির আয়তন (monumental quality) : অনেক ছোট গল্প আছে যার মধ্যে উপন্যাসের বীজ নিহিত থাকতে পারে। অপরদিকে এমন অনেক নভেল আছে যা বড় গল্পের সমগোত্রীয়। তার মধ্যে কোনো বিরাট পরিকল্পনা নেই। বড় ছবিতে একটা সামাজিক আবেদন থাকতে পারে। অনেক লোক একসঙ্গে সে ছবি দেখতে পারে। অনেক বিভিন্ন জিনিসের বর্ণনা বড় আকারের ছবিতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এইসব গুণ সত্ত্বেও অনেক বড় আয়তনের ছবিকে aesthetic মতে বড় বলা চলে না। বড় বড় আকারের poster ছোট ছবিরই enlargement (এখন শুনছি কিছু কিছু poster হয়), কাজেই বড় ছবি করার ইচ্ছে হলে একবার ভেবে দেখতে হবে সে ছবি ছোট করলে ক্ষতি হবে কিনা এবং কি কি ক্ষতি হবে। তারপরের কথা—প্রত্যেক ছবির নিজস্ব demand আছে। কোনো কোনো ছবি আছে যার আয়তন একটু বড় করলে ভালোই হবে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচার করলে দেখা যাবে ছবিটা একটু ছোট হলে ক্ষতি ছিল না। যারা অনেক জিনিস ছবির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চায়, তাদের স্বভাবতই ছবির আয়তন বড় করবার ইচ্ছে হয়। মাটিতে ছবি রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছবির সবটা যদি একঝলকে দেখা যায় (detail-সমেত) তবে সে ছবিকে মাঝারি size-এর ছবি বলা হয়। যে ছবি বসে কোলে রেখে দেখা হয়, তাকে বলা হয় Album painting, আর যাকে হাতে নিয়ে বই পড়ার মতো দেখতে হয় তাকে বলে Miniature painting। আর যে ছবি ঘরের একপ্রান্ত থেকে দেখা হয় তাকে বলা হয় Mural বা বড় ছবি। আজকালকার architecture এমন হয়ে উঠেছে যে সেখানে বড়ছবি public building বা museum-এর জন্য। মোট কথা, focal length-এর ওপর ছবির আয়তন সচরাচর বিচার করা হয়। কাজেই তুমি কতটা দেখাতে চাও তারই ওপর নির্ভর করছে তোমার ছবির size। আমার বক্তব্য বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝলে কিনা জানাবে।

আজকাল আমি লেখবার চেষ্টা করছি। তার এক অংশে এই বড় ছোট

ছবি সম্পর্কে আলোচনা আছে। কাজেই তুমি নানা প্রশ্ন করতে পার। আমার রোগের বিবরণ তোমাকে পাঠাবার ইচ্ছে আছে। আমার বর্তমান ডাক্তার একটু সেকেলে এবং খুবই ভালো। সেইজন্য রুগীকে একটু পরীক্ষা করেন। সম্পূর্ণ সেরে উঠব না একথা তিনি আমায় স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যতক্ষণ চেয়ারে বসতে পারি ততক্ষণ কাজ করবার চেষ্টা করছি। খাওয়া-দাওয়া একদম কৃচ্ছ্রসাধকদের মতন। তবে ভালোই আছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। ইতি — দাদু

নিজের ছবি নিয়ে সমস্যা আছেই, কিন্তু ঐ সময় বিষ্ণুপুরের মন্দির আমাকে বেশি ভাবাচ্ছিল। বিষ্ণুপুর স্থাপত্যের monumental quality সম্পর্কেই প্রশ্ন ছিল। দাদু অবশ্য পরে অনেকবার আমাকে মন্দির সম্পর্কে সবিস্তারে লিখেছেন। তখনকার মতো দাদুর চিঠি পেয়ে আমি আবার নিজের ছবি নিয়ে ভাবিত হলাম। একথা ঠিক যে তখন 'অনেক জিনিস ছবির মধ্যে ঢুকিয়ে' দেওয়ার প্রবণতা কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে কষ্টকর। নকশাল আন্দোলন ততদিনে স্তিমিত, পড়ে গেছে প্রথম যুক্তফ্রন্টও। দোর্দণ্ড প্রতাপে জরুরি অবস্থার শাসন চলছে। আমিও বছর তিনেক চাকরি ক'রে এবং সংসার পেতে অনেক পাকা-পোক্ত হয়েছি। তবু ভেতরে ভেতরে ঢাকনা-চাপা উচ্ছ্বাস থেকে গেছে। সঙ্গে কঠিন বামপন্থী সংস্কার। কোলাজ করতে বসে অবশ্য কিছুটা মুক্তমনে খেলছি। আর পাশাপাশি মধ্যযুগীয় মন্দির-শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। নিজের ছবি, মন্দিরের ছবি--সব মিলিয়ে অনেক প্রশ্ন! দাদুর চিঠিও দীর্ঘতর হল —

১৫

D. Dun
14. 3. 74

দুলাল,

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক দেরি হল। এবারও সমস্যার সমাধান হবে কিনা জানি না। দুই বস্তুর অন্তর্বর্তী শূন্যস্থানের ওপর প্রায় সময়ই ছবির ছোট-বড় আবেদন স্পষ্ট হয়। এরই নাম tension। এই tension spring-এর মতো কাজের আয়তন বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে — বড় করছে, ছোট করছে। মূর্তিতে শূন্য negative পূর্ণ positive volume-এর দ্বারা এই tension-এর সৃষ্টি হয়। (হাতের কাছে বিষ্ণুপুর মন্দিরের relief-work দেখলে সহজেই লক্ষগোচর হবে।)

কাগজের ওপর কোনো আকার আঁকলেই সেই আকার যেমন কিছুটা স্থান

অধিকার ক'রে থাকে তেমনি প্রত্যেক আকার তার পৃষ্ঠভূমি বা সম্মুখভূমি আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণ শক্তিটি বুঝতে হয় অর্থাৎ দেখতে হয় বস্তুটি কতটা শূন্যস্থান দাবি করছে।

বিষ্ণুপুরের চাকে তৈরি ঘোড়া আকারে ছোট হলেও ফটোতে সেটি বড় বলে মনে হয় — দৈর্ঘ ও প্রস্থে তার আকর্ষণ শক্তির কারণে। (চুম্বকশক্তির সঙ্গে তুলনীয়।) সেজানের still-life-এ এই monumental quality অসাধারণ কৌশলে প্রকাশিত হয়েছে। এই কৌশল তিনি অর্জন করেছিলেন, তাঁর কথায়, কতগুলো জ্যামিতিক আকার থেকে। যার নাম তিনি দিয়েছিলেন basic shape যথা — square, cube, cylinder, cone ইত্যাদি)।

সেজান এই আকারগুলি অসাধারণ কৌশলে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ঐসব জ্যামিতিক আকারের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছেন এবং শূন্য অংশগুলিকে জ্যামিতিক pattern-এ গড়েছিলেন। পিকাসো, ভ্যানগক্ ইত্যাদির ছবিতেও এই quality আছে। শুং-period-এ চীনে ছবিতে এই quality পাবে। যদি কলকাতা মিউজিয়মে ভারতীয় মূর্তি দেখ, তবে আমার কথা আরো স্পষ্ট হবে। অবশ্য মূর্তিগুলি দেখবার সময় মূর্তির negative ও positive volume একসঙ্গে দেখবে এবং বিশ্লেষণ করেও দেখবে। কলকাতা মিউজিয়মের ওপরতলার গ্যালারিতে গিয়ে দেখবে। টিবেটান, রাজপুত, মোগল ছবি তুলনা করলেই বুঝতে পারবে। রাজপুত painting-এ বড় ভাব (monumental quality) মোগল painting-এর চেয়ে অনেক বেশি।

অনেকের মতে construction-এর ওপর বড়-ছোটর আবেদন নির্ভর করে। আমার মনে হয় tension-এর ওপরই বড়-ছোটর ভাব নির্ভর করে বেশি।

এইবার বড় ছবি করতে কেন তোমার অসুবিধে হচ্ছে, অপ্রিয় হলেও সেই কথাটা বলছি। Illustrative element-এর দিকে যখন বেশি নজর দিতে ইচ্ছে করে তখন monumental quality ছবি থেকে অদৃশ্য হয়। আধুনিক Russian painting-এ আর যাই গুণ থাক সে ক্ষেত্রে monumental quality-র অভাব বড়ই পীড়াদায়ক। ১০ ফুট লম্বা ছবি impression দেয় যেন পোস্টকার্ড দেখছি। (আমি ৫০০-র বেশি original ছবি দিল্লী exhibition-এ দেখেছি।) 'গ্যারান্টি অফ পিস্', 'স্টোরি অফ্ এ ট্রু-ম্যান' স্ট্যালিন-প্রাইজ প্রাপ্ত এই দুই বই-এর সঙ্গে 'আনা-করেনিনা'র তুলনা করলে ব্যাপারটি তোমার কাছে স্পষ্ট হবে বলে মনে করি।

ছবির কাগজের মাঝখানটাই একমাত্র কেন্দ্রস্থল নয়। idea-রও একটা কেন্দ্রস্থল আছে। সেই idea-কে কেন্দ্রচ্যুত না করলেই বড়-র ভাব ফুটে উঠবে বলেই মনে করি। form এবং content এই দুই-এর যথাযথ সংযোগ

আবশ্যিক। তাহলেই প্রায় সকল সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু এই কাজটি বড়ই কঠিন, দুলাল! তোমার রোগের চিকিৎসা আমি তো করছি। কিন্তু আমার চিকিৎসা কে করে? শরীরটা বড়ই খারাপ। তোমার বাবা-মা-কে আমার কথা জানিও। তুমি ও মহুয়া আশা করি ভালো আছ। ইতি –

দাদু

দাদুর শরীর ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। মামা কলকাতা থেকে একবার দেরাদুন ঘুরে এসেছেন। মাঝে মাঝে মনে হতো এই অসুস্থতার মধ্যে চিঠির পর চিঠি দিয়ে তাঁকে ব্যস্ত করা উচিত নয়। কিন্তু শরীর যতই অসুস্থ হোক তাঁর বোধ ও বোধি ক্রমশই আমার উজ্জ্বলতর প্রেরণাস্থল হয়ে উঠছিল। তাই চিঠি না দিয়েও উপায় নেই। তাই প্রতিটি উত্তর আমাকে আরো চিন্তা করতে, অনুভব করতে, কাজের মধ্যে পরখ করতে এবং খোলা মনে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করত। দাদু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সবসময়ই নিজের কাজের কথা এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু এই চিঠিতে তিনি সেজান সম্পর্কে যা বলেছেন সেই আশ্চর্য কৌশল এবং monumental quality তাঁর হিন্দি ভবনের দেওয়ালচিত্রে মূর্ত হয়ে আছে। দাদুর সঙ্গে কথা বলার পর ঐ ছবি যতবার দেখেছি ততবার নতুন কিছু শিখেছি।

দূর দেরাদুনে অসুস্থতা ও একাকিত্ব যত বাড়ছিল তত দাদু তাঁর স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ছেড়ে আত্মীয়স্বজন ও অতীত স্মৃতিচারণের দিকে ঝুঁকছিলেন। এই প্রথম আমরা অবাক হয়ে দেখলাম আমার চিঠিতে একপাশে আমার মা-কে সম্বোধন করে ক'লাইন নিজে হাতে লিখেছেন

১৬

টুনটুনি। [10. 5. 74]

তোমাদের সঙ্গে আর বোধহয় দেখা হবে না। ইতিমধ্যে মেজদার[১] (তোমার বাবা) এক বন্ধুস্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বগুড়া কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, যখন মেজদা সেখানকার civil surgeon। নাম কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়। তিনিও বেশ বৃদ্ধ। এখনো কেউ কেউ তোমার বাবাকে মনে রেখেছেন এবং বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এই খবরটি দেওয়ার জন্যই এই ক'লাইন লিখলাম। আশা করি বনবিহারী ভালো আছে। ইতি – কাকা

১ ডঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

এই চিঠিটির পাশে যথারীতি অনুলেখকের হাতে লেখা আমার চিঠি – ইতিমধ্যে আমার কোলাজ ছবি নিয়ে একটা প্রদর্শনী হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে –

১৭

D. Dun
10. 5. 74

দুলাল,

কিছুদিন পূর্বে ধীরেনের পত্রে তোমার exhibition-এর খবর পেয়েছি। কোন দিক দিয়ে ছবি প্রশংসনীয় (ভালো হয়েছে) সে কথাও জানলাম। পূর্বের exhibition এবং এখনকার exhibition সম্বন্ধে কোনো তুলনামূলক আলোচনা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে কি? exhibition সম্বন্ধে একটা report তোমার কাছ থেকে পেলে খুশি হব।

ছবির আকার সম্বন্ধে তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম সেগুলি সব তুমি পেয়েছিলে কিনা জানি না। নতুন যদি কোনো প্রশ্ন মনে আসে সময় সুবিধা মতো আমাকে জানাতে পার। এখনকার Artist-দের সামনে যেসব সমস্যা আছে সেগুলিকে কেন্দ্র ক'রে একটি ধারাবাহিক লেখাতে প্রবৃত্ত হয়েছি। কাজেই নতুন নতুন সমস্যার সন্ধান পেলে আমার সুবিধেই হয়। সম্ভব হলে তোমার কোনো একটা ছবির Photograph পাঠাতে পার। ঘটনাচক্রে বর্তমান China-র কিছু খবর পেলাম। পিকিং রেডিও মারফত। তারপর নতুন ক'রে কনফুসিয়াম পড়লাম। আজকালকার অনেক artist-ই social content-এর দিকে লক্ষ্য রেখে ছবি করে। ব্যাপারটা বেশ জটিল। আশা করি তোমার বাবা মা তুমি ও তোমার স্ত্রী সব ভালো আছ। ইতি—

দাদু

আমার কোলাজ অনেকের ভালো লেগেছে। কিন্তু আমি আর করতে চাইছি না। কি হবে শুধু form নিয়ে খেলা ক'রে? শিল্প কি তবে আঙ্গিকসর্বস্ব? কিছু কসরৎ করাই কি আমার লক্ষ্য? পরের চিঠিতে জবাব এল—

১৮

D. Dun
14. 5. 74

দুলাল,

এবারকার প্রশ্ন বেশ জটিল। তবে interesting। লাওৎসে বলছেন: 'Technique is everything, technique is nothing.' কনফুসিয়াস বলেছেন, 'it is easy to administrate a state, but difficult to

teach a person how to play a lute.'

এবার তোমার প্রশ্নের আক্ষরিক জবাব : idea-র পরিবর্তন বা বিবর্তনের সঙ্গে technique-এর পরিবর্তন ঘটে থাকে। এক-এক technique-এর এক-এক বৈশিষ্ট্য। আর্টের ভাষায় মূল উপাদান এই তিনটি—আলো, রং (optical sensation), movement (line), mass (আকার, ঘনত্ব)। যদি optical sensation সর্বপ্রধান লক্ষ্য, তবে water colour উপযুক্ত। যদি movement সর্বপ্রধান হয়ে থাকে তবে 'লাইন' উপযুক্ত। যদি mass, shape ইত্যাদি করার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে oil প্রশস্ত।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে নিশ্চয় ক'রে বলে দেওয়া যাবে যে naturalism সম্ভব হয়েছে oil medium-এর কারণে। oil colour-এর সুবিধে এই যে এই medium-এর সাহায্যে লাইন-প্রধান কাজও করা চলে (মাতিস, পিকাসো, ডুফি ইত্যাদি)। এখনকার অনেক আর্টিস্ট-ই oil medium-এর সাহায্যে নানারকম কাজ ক'রে থাকে, কিন্তু দু'চারজন ছাড়া কেউ-ই টিশিয়ান বা রুবেন্সের মতো oil painting করেন না। oil medium-এ খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ এক sitting-এ কাজ করা চলে বা দীর্ঘকাল ধরে কাজ করা যায়, যাকে বলে build-up। আজকাল অনেকে oil pastel-এ কাজ করে। শুনেছি এই pastel-এ কাজ করতে খুব সুবিধে। (নিজে দেখি নি, করি নি।) অনেকে Fevicol-এর সঙ্গে গুঁড়ো রং মিশিয়ে কাজ করছে, বেশ পুরু রং, পাতলা রং দুই ভাবেই ব্যবহার করা যায়। Fevicol খুব পাতলা ক'রে নিলেও আঠার জোর কমে না।

আমার প্রিয় medium ছিল এই : গুঁড়ো রং গঁদ বা শিরিষ দিয়ে মিশিয়ে, তাই দিয়ে কাজ করা। অনেকসময় ঘনসাদা রঙের বাটিতে তুলি ডুবিয়ে তারপর যে কোনো উজ্জ্বল রঙে তুলির আধখানা বা কম ডুবিয়ে টান-টোন দিলে খুব চমৎকার effect হয়, এইভাবে Fevicol মেশানো রংয়ের কাজ করা যায়। আজকাল যে কেনো ভাবেই কাজ করা যায়, convention অনুসরণ করার দরকার নেই।

কোলাজ : রঙের উজ্জ্বলতা এবং texture এই দু'টো কোলাজের বৈশিষ্ট্য। রঙিন কাগজ, কাপড় ইত্যাদি জুড়ে তার সঙ্গে oil colour-এর patch, water colour-এর line দিলেও কোনো লোকসান নেই। খাঁটি কোলাজে বহুরকমের জিনিস প্রবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। যখন কোলাজ-টেকনিকে social content প্রবর্তনের চেষ্টা হয় তখন বহু জিনিস দেওয়া যেতে পারে। এর নাম Pop Art—জুতোর শুকতলা, ইস্পাতের স্প্রিং, প্লাস্টিকের টুকরো, মটর গাড়ির ফটো, ঘড়ির কাঁটা ইত্যাদি একত্রে সমবেশ ক'রে শিল্পী বললেন Modern Society। রঙিন কাগজে water colour, oil paint, oil

pastel, ফেবিকল-মেশানো রং—এই কয়টি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তুমি বুঝবে কোন method তোমার ধাতে সয়। বাজারের গুঁড়ো রঙের সঙ্গে সাদা রং মিশিয়ে কাজ করলে তা প্রায় oil-এর সামিল হয়। এরই নাম 'ওয়াশ-পেইন্টিং'। oil-pastel-এর সঙ্গে felt pen-এর ব্যবহার ক'রে দেখতে পার। বোধহয় ভালোই হবে। Felt pen অনেক রঙের পাওয়া যায়। oil painting-এ অনেক তোড়জোড়ের দরকার করে। এইজন্য তোমার মতো লোকের পক্ষে oil painting সুবিধে হবে কিনা জানি না। রঙিন কাগজ বা কাপড়ে মোটামুটি structure ক'রে নিয়ে তারপর oil pastel এবং felt pen ব্যবহার ক'রে দেখতে পার। রঙের জৌলুস পাবে রঙিন কাগজ এবং কাপড়ের টুকরো জুড়ে। tone, hue পাবে oil pastel থেকে এবং movement পাবে felt pen-এর লাইনের সাহায্যে। তোমার ছবি সামনে দেখতে পেলে আরো কিছু বলা যেত। emotional content অথবা social content কোনটা প্রধান হবে, সেই নিয়েই বোধহয় তোমার ভাবনা। এই ভাবনার অন্যতম প্রকাশ—technique নিয়ে সমস্যা। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা পরে হবে। —দাদু

Content-এর সমস্যা সহজে মেটার নয়। কি আঁকব, সে কথাটা না ভেবে আঁকা যায় না কি? কোলাজ করতে একঘেয়ে লাগছে। তাই দাদুরই পরামর্শ-মতো Landscape করতে চেষ্টা করছি। গ্রামের পরিবেশে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব নেই। কিন্তু ছবি করতে গিয়ে হতাশাই বাড়তে লাগল। শেষে দাদুকে লিখলাম, পূর্ণিমার চাঁদ সবসময় ঝলসানো রুটি মনে হয় না ঠিকই, কিন্তু যা কিছু মনোরম, তাই আঁকতে ইচ্ছে হবে, এও মানতে পারি না। প্রকৃতিতে যে বিস্তার আর আলোর দীপ্তি (illuminatian) উদ্ভাসিত হয় তার নকল করতে যাওয়া বৃথা। তাছাড়া composition-এর দিক থেকে গ্রাম বড় এক ঘেয়ে। ধানক্ষেতের পর ধানক্ষেত, শালবনের পর শালবন, আর আকাশে বড়জোর মেঘের পরে মেঘ। এর থেকে আমার সেই শহর আর মানুষজন অনেক বেশি প্রাণময়, বৈচিত্র্যময়। জবাব এল ১১ই জুন—

১৯

D. Dun
6. 6. 74

দুলাল,

তোমার এবারকার পত্র প্রণিধানযোগ্য। তোমার সমস্যা সমকালীন সব artist-এরই সমস্যা। এ ক্ষেত্রে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী বলে কথা নেই।

Emotional conflict কথাটি তোমার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতে মোটামুটি তোমার ভালোই লাগছে। অথচ সেই বিষয়ে ছবি করতে ইচ্ছে করছে না। নিজেকে কিছুটা বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার ক্ষমতা তোমার আছে, তাই বলছি নিজেকে যাচাই ক'রে নিলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। আপাতত কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি। দেখো তোমার সঙ্গে মেলে কিনা—১/Landscape ইত্যাদির মধ্যে হয়ত তুমি intellectual content আরোপ করতে পারছ না। অর্থাৎ intellect সেক্ষেত্রে তেমন সজাগ হচ্ছে না। (এ ক্ষেত্রে social-content-এর কথা আপতত তুলছি না।); ২/ যে জিনিসটা দেখতে ভালোই লাগছে সেই জিনিসকে নিজের অধিগত techniqne-এর সাহায্যে ধরা যাবে কিনা এইরকম একটা সন্দেহ হয়ত অবচেতন মনে উঁকিঝুঁকি মারছে। তুমি শহরের ছেলে। এই পরিচয় intellect ও emotion মিলে ঘটেছে। সোজা কথায় শহর তোমার ধাতস্থ। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ ভাগ্য তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছে।

মোটা রকমের কতকগুলো কারণ দেখানো গেল। এরপরে আরো কারণ থাকতে পারে। সে সব কারণ ব্যক্তিগত psychology-র সঙ্গে জড়িত। মোট কথা, একটু আত্মদর্শন করলেই তুমি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তবে সমস্যার সমাধান হলেই যে landscape করতে ইচ্ছে করবে, এমন কথা বলছি না।

যে জিনিস করতে ভালো লাগে না সেই জিনিস exercise হিসেবে একবার যদি করতে পার তাহলেই এই সমস্যার কারণ খুব সহজেই তোমার লক্ষগোচর হবে। অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই উপদেশটি একবার অনুসরণ ক'রে দেখতে পার। কাজ হবেই। মনে কোরো না তোমাকে আমি landscape painter হবার পথে ঠেলে দিচ্ছি। তুমি গ্রামে আছ বটে কিন্তু তুমি শহরেরই লোক। শহরের লোক যেমন গ্রামে camera হাতে গ্রামের ফটো তোলে, সেইরকম তুমি একখানা landscape কর। (দু'খানা করতে হবে না।)

এবার social content-এর কথা। এই মুহূর্তে social condition ঠিক কিরকম—এক নজরে দেখে নেওয়া বা বুঝে নেওয়া সম্ভব নয়, তা তুমি ভালোই বুঝেছ। সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা (emotional conflict), সমাজের অত্যাচার-অবিচার, নীতি-দুর্নীতি, পুরনো সমাজ থেকে নতুন সমাজের আবির্ভাব—এইসব সমস্যাগুলি এমনিভাবে একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে তাকে শিল্পে বা সাহিত্যে প্রকাশ করা সহজ হচ্ছে না। তবু সাহিত্যে কিছুটা হয়েছে। কারণ সাহিত্যের ভাষায় অনেকগুলি সমস্যা খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে প্রকাশ করা সম্ভব। পরিবেশ, মানসিক অবস্থা, নাটকীয় ভাবভঙ্গি ইত্যাদি গল্প-উপন্যাসে বা নাটকে প্রকাশ করা দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়।

ছবিতে এই জটিলতা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি। তবে সমাজের কোনো অংশকে এমনি স্পষ্ট ক'রে দেখানো যায় যা হয়ত সাহিত্যে তেমন সহজ হবে না। সাতো অনেকগুলি দৃষ্টিকোণ একটি কেন্দ্রে এনে মেলানো যেতে পারে।

জমকালো হোটেলে বাবু-বিবিরা খানা খাচ্ছে, সঙ্গের lap dog-এরও কিছু মিলছে, আর সিঁড়িতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কয়েকটা ছেলে বসে আছে। বেয়ারা তাদের গায়ে গরমজল ছিটিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করছে। আরেকটি ঘটনা। বাবু আরাম কেদারায় বসে কুকুরকে কোলে বসিয়ে টেবিলের ওপর রাখা ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট খাওয়াচ্ছে। অনুগত, বিশ্বস্ত, বৃদ্ধ কর্মচারী প্রভুর কাছে এসে কিছু বেতনবৃদ্ধির আবেদন পেশ করল। ছেলে কলেজে ভর্তি হবে, কিছু টাকা না হলেই চলছে না। প্রভু বলছেন, দেখছ তো আমার কত খরচ? এই কুকুরের পেছনেই আমার একশ টাকা বেরিয়ে যায়।

দু'টি ঘটনাই আমার দেখা। এই বিষয় নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি অবশ্যই হতে পারে এবং তার সঙ্গে কিছু যোগ করা যেতে পারে। কিন্তু চিত্রকরের পক্ষে কি এই ঘটনা convincing ক'রে প্রকাশ করা সম্ভব? social content তো আছে। কিন্তু social content intellectually দেখবে, না emotionally দেখবে—এটি হল সমস্যা। আজকাল অনেক artist emotion-এর বিরুদ্ধে। তারা মনে করে intellectual parity হলে হল। মোট কথা, artist-এর social awareness intellect-এর সাথে যুক্ত, না emotion-এর সঙ্গে যুক্ত—এটি বিশেষ ক'রে একবার ভেবে দেখা দরকার।

তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে Communist প্রভাবান্বিত দেশে social content একরকম ধর্মবিশ্বাসের মতো শিল্পীদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। অর্থাৎ একটাই aspect-কে বড় ক'রে দেখানোর চেষ্টা চলেছে। প্রাণবন্ত artist social content সম্বন্ধে সচেতন থাকবে, কেবল সেই চেতনা হবে আবেগপ্রধান (intellect-বর্জিত নয়।) Adler-এর মতে সার্থক artist যে কোনোভাবেই হোক সমাজের হৃদয়কে অনুভব করে, তখন শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও সমাজের নিহিত হৃদয়াবেগ অভিন্ন হয়।

গ্রামের ডাক্তারের জীবন কিরকম হয়? রুগীকের দুঃখ, তাদের চাতুরি, মিথ্যে কথা সবই তোমার নখদর্পণে। এই অভিজ্ঞতার কতটুকু তুমি একটা ছবিতে প্রকাশ করতে পার? রুগীদের ভিড় 'কোলাজ'-এ হয়ত প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু তাদের মুখের হাবভাব কোলাজ-এ হবে না। সেজন্য চাই তুলি-পেন্সিল। তোমার কাছে সমাজের যে অংশ [উজ্জ্বল] অথবা গাঢ় অন্ধকার—এই দুই অংশ নিয়ে সার্থক শিল্পসৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সমাজের যে অংশ middle-tone-এর মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে সে অংশ সাহিত্যিকের কাছে

ছেড়ে দিলেই ভালো।

Intellect সামনে Emotion পিছনে অথবা Emotion সামনে Intellect পিছনে – এ বিষয়ে মনস্থির ক'রে নিতে হবে। এ বিষয়ে confusion থাকলে অসুবিধা ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই confusion থাকার ফলে ভালো লেখক, ভালো artist-এর কাজে ফাটল দেখা যায়। দৃষ্টান্ত : অন্নদাশঙ্কর রায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যতদূর জানি, এ সংঘাত ছিল না। তারাশঙ্করের শেষজীবনে বোধহয় এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। Dadaism এই সমস্যাকেই পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। ক্রুশ্চেভের যুগে রাশিয়ার আর্টিস্টরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ছবি করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। যতদূর জানি social content তাঁরা বর্জন করেন নি – কেবল স্বাধীনতা নিয়েছিলেন আঙ্গিকের ক্ষেত্রে। society, environment, contemplation, identification এগুলির সংযোগ হয়ে ছবির content (এ-বিষয়ে তোমার আপত্তি থাকলে সময় মত জানিও)।

Time factor-কে স্বীকার ক'রে নিলে technique ও style-এর পরিবর্তন অভাবনীয় দ্রুতভাবে হতে থাকে। তোমার হাতে সময় কম। একনাগাড়ে বসে কাজ করা বোধহয় সবদিন সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় ছবির বিষয় সরল এবং direct ভাবে মনে মনে ছকে নিলে ভালো। (এভাবে বড় ছবি হতে পারে না, ছোট ছবি হতে পারে।) আরেকটা কথা – ছবির প্রত্যেক stage সম্পূর্ণ ক'রে নেওয়া সম্ভব এবং সেইরকমই চেষ্টা করবে। এতে তোমার উপকার হবে। অর্থাৎ খাবলে খাবলে কাজ করবে না। এ একরকমের dissection। stage by stage করার অভ্যাস আবশ্যিক। তফাত এই – হাসপাতালে dissection করা হয় চামড়া থেকে হাড়ে, আর ছবির ক্ষেত্রে হাড় থেকে চামড়ায়। আশা করি এই দৃষ্টান্ত থেকে বক্তব্য তোমার কাছে স্পষ্ট হবে।

এবার রঙের কথা। গেরি, এলামাটি, কালো (ivory black, Chinese-stick) ব্যবহার করলেই ভালো। সাদাখড়ি (zinc-white) প্যাকেটে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই রঙ তুমি বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া শহরে পাবে। G. C. Laha-তে আগে গুঁড়ো-রং তিনরকমের পাওয়া যেত – কাগজের প্যাকেটে, টিনের কৌটোতে ও কাঁচের টিউবে। এখন কি পাওয়া যায় জানি না। মোট কথা, ochre, Indian red, সাদা গুঁড়ো ছাড়া বাকি রঙের জন্য কেক বা টিউব ব্যাবহার করতে পার।

আজকালকার কলকাতার artist-রা রঙের বিষয়ে অনেক কিছু জানে, তাদের জিজ্ঞেস করতে পার। কোলাজ-এর কাজে তোমার তো বেশ খ্যাতি হয়েছে। কাজেই কোলাজ-এ আরো কিছু কাজ করতে পার। কোলাজ-এর

কাজের সঙ্গে flow-master-এর লাইন ভালোই মানাবে। আমি দু-একটা করেছি। অভিজ্ঞ-ব্যক্তিরা অপপ্রয়োগ বলে মনে করে নি। আর অপপ্রয়োগ হলেই বা ক্ষতি কি? বাংলাসাহিত্যে গুরু-চণ্ডালির ব্যবহার তো আজ স্বীকৃত।

যদি Linseed oil মিশিয়ে ঘরে oil colour তৈরি ক'রে নিতে চাও, তবে খুব বাছাই ক'রে Linseed কিনবে। কারণ আজকাল রেড়ির তেল ওজন ভারি করার জন্য এই তেলের সঙ্গে মেশায় আর যে তেল কখনো শুকোবে না।

আর্ট, Symbolism-এর দিকে চলেছে। বামপন্থী শিল্পীরা সেকথা স্বীকার করেন কি? গুঁড়ো রং দিয়ে কাজ করার সম্বন্ধে (আঠা ইত্যাদি) ধীরেন ব্রহ্মের কাছ থেকে তুমি সব খবর পেতে পার।

আমার শরীর মোটামুটি ভালো। urinetrouble-এর কষ্ট প্রায় নেই। পেটের গোলমাল, হজম না হওয়া ইত্যাদি আছে। ডাক্তারের উপদেশানুযায়ী দাঁত বাঁধালাম। এখন চিবোতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। দরকার হলে পরে তোমাকে বিস্তারিত লিখব। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ।

ইতি— দাদু

আমার বামপন্থী সংস্কার সম্পর্কে তিনি আপসহীন ছিলেন। কিন্তু আমারই উপলব্ধির জগৎ থেকে যেন আমি পথ খুঁজি, এই ইঙ্গিত তাঁর কথায় এবং চিঠিতে পরিষ্কার ছিল। তিনি বরাবরই কোনো বিশেষ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরার বিরোধী। এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই গুরু বলে মানতেন।

গ্রামে থাকতে থাকতে আমার অভ্যাস পালটাচ্ছিল। বারবার দেখতে দেখতে বিষ্ণুপুরের মন্দিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হচ্ছিলাম। সেইসঙ্গে এই দীর্ঘ পত্রালাপ আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। এইসময় কলকাতায় এসে এক ঘরোয়া আড্ডায় এসব কথাই বলেছিলাম। তখন একজন শিল্পসমালোচক দাদুর সাক্ষাৎকার গ্রহণে আগ্রহ দেখান। কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের প্রতি দাদুর অভিমান যে কত গভীর ছিল তা আমার জানা ছিল না। তাই এবার দাদুর চিঠিতে বিরক্তির সুর—

১০

D. Dun
2. 9. 74

দুলাল,

এবার তোমার চিঠিতে কোনো প্রশ্ন নেই, পরিবর্তে যে অনুরোধ জানিয়েছ তার জবাব দিলাম।

আমাদের এখন museum-এর show case-এ স্থান পাবার সময় হয়েছে। যেসব আর্টিস্ট নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিশ্রম করছে, অথচ সুযোগের অভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না, সমালোচকদের উচিত তাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা।

ইয়োরোপের critic-রা নতুন অনুসন্ধান করেন বলেই এত আর্টিস্টদের নাম আমরা পুস্তক পত্রিকায় দেখি। যাই হোক, তোমার critic বন্ধুকে বলবে, ললিতকলা-প্রকাশিত Contemporary Artist – এই পর্যায়ে আমার সম্বন্ধে যে monogram প্রকাশিত হয়েছে, সেই পুস্তকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই তিনি পাবেন।

ধীরেন ব্রহ্ম (অধ্যাপক Govt. College of Art)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনিও আমার বিষয়ে অনেক খবর দিতে পারবেন। শান্তিনিকেতনে আমার কাজ উনি দেখতে পারেন। এইসব কাজের পর তিনি আমাকে প্রশ্ন-পত্র পাঠালে তার জবাব অবশ্যই দেব।

এখনকার আর্টিস্টরা নিজেদের Psychological make-up, Spiritual experience, Intuition ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসব কথা বলে, সেসব কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

কিছুকাল পূর্বে কানুর[১] অনুরোধে মেজদার কার্টুন সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখে পাঠিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য এই চিঠি পাঠাবার পর কানু বা তার critic বন্ধু আর কোনো উচ্চবাচ্য করে নি। কাজেই তোমার বন্ধু যদি serious হন তবে তিনি যেন তাঁর প্রশ্ন ইত্যাদি পাঠান। আমি বিশেষ কাজে সর্বদাই ব্যস্ত আছি, প্রতিকূল স্বাস্থ্যেও যথাসাধ্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় শৌখিন কৌতূহল মেটাবার সময় বা ইচ্ছে আমার নেই। এ কথাও তোমার বন্ধুকে জানাবে যে কলকাতার শিল্পীসমাজ আমার কাজ পছন্দ করেন না। কাজেই আমার সম্বন্ধে লিখে বিশেষ কোনো লাভ হবে কিনা তাও তাঁর ভেবে দেখা উচিত। তাঁর লেখা প্রবন্ধ পেলে নিশ্চয়ই পড়ব।

আশা করি তোমার বাবা-মা ভালো আছেন। তুমি ও মহুয়া আমার শুভেচ্ছা জানবে। ইতি -

দাদু

১ ডঃ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়–বিনোদবিহারীর মেজদা ডঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।

আমি বুঝলাম, আমার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছি। এ বিষয়ে আর আমি এগোই নি। ৭৫-এর জানুয়ারিতে আমার ছেলের জন্মসংবাদ দিয়ে চিঠি

দিই। ঐ সময় কলকাতার এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনে আমার একটা প্রবন্ধ ছাপে। তাতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে নন্দনতত্ত্ব বিচারের প্রয়াস ছিল। তখন সবে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে দু-একটা বই পড়েছি, তাই, 'হাজার পুষ্প বিকশিত হোক'—মাও-এর এই উদ্ধৃতিও সেখানে বাদ পড়ে নি। লেখাটির একটি কপি দাদুকে পাঠাই। সঙ্গে নিজের ছবি আঁকা সম্পর্কেও কিছু সমস্যার কথা ছিল। বেশ কিছুদিন বাদে দাদুর চিঠি এল।

২১

D. Dun
9. 2. 75

দুলাল,

নাতির ছেলে হয়েছে জেনে এখনকার বুড়ো-বুড়িরা বেশ আনন্দ উপভোগ করছে। ইতিমধ্যে শীলু তার পুত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে। emotional life-এ এই নতুন অভিজ্ঞতা আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত রকমের পরিবর্তন এনে থাকে।

এইবার কাজের কথা: কালো রঙের অভাব কলকাতার বাজারে কেন হল জানি না। cake বা tube অন্তত students quality-তেও পাওয়া যাবার কথা। চীনেবাজারে যদি চীনের ব্যবসাদাররা এখনো থাকে তবে Chinese ink (stick) পাওয়া যাবার কথা। যে সব ink কাঁচের মতো চক্‌চকে তাদের থেকে ভালো mat-surface ink। লাইন দেওয়া বা রঙের সঙ্গে মেশানো চলবে। রাধাবাজারের পুরনো stockist নীলমণি হালদার, বিনোদলাল ইত্যাদি বা অন্য কোনো পুরনো দোকানে পুরনো stick সেদিন পর্যন্ত ছিল। আমিও বছর চারেক আগে ৫০ গজ cartridge-এর roll ধীরেন মারফত কিনেছি। বাজারের গুঁড়ো রং দিয়ে কাজ হবে না। মোট কথা, কালো রং শেষপর্যন্ত পাওয়া না গেলে আমাকে জানাবে, অবশ্যই ব্যবস্থা করতে পারব।

এইবার লেখার কথা: ডঃ দেবাশিসের লেখা পরিপাটি। লেখাতে অতিভাষণ, উচ্ছ্বাস এবং অপ্রয়োজনীয় কথা নেই। লেখকের সঙ্গে আমার মতের মিল হল কিনা তা আমি প্রথমে দেখি না। আমি দেখি লেখক নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করছেন, না অন্যের মুখের ঝাল খাচ্ছেন। 'মাও'-এর উদ্ধৃতি খুবই মনোজ্ঞ। তবে জানতে ইচ্ছে করে এই উক্তি Power পাবার আগে না পরে। Power পাবার আগে অনেকের উদারতা থাকে। যদি চীনে ভাগ্যবিধাতা হবার পরও তিনি এই কথা বলে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই নমস্য। তবে জানতে চাইব, আদর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেছেন কিনা।

রুশ দেশের সাহিত্যের মান যত উচ্চ, painting বা sculpture-এর মান তার কাছাকাছিও কখনো পৌঁছয় নি। ইটালি, ফ্রান্স ইত্যাদির প্রভাবের দ্বারাই Russian Painting বা Sculpture বেঁচে থেকেছে। তুমিও যে লিখেছ modern Russian painting,modern Russian literature-এর মতো হয় নি, তার কারণও বোধহয় এই। এরই নাম বোধহয় জাতিগত প্রতিভা। আমাদের দেশেও দেখ 19th century থেকে Western art-এর চর্চা, কিন্তু আজও একটি উল্লেখযোগ্য Still Life এদেশে হয় নি। এখন দেখা যাক China কি করে। পত্রিকার অন্য লেখা এখনো পড়ি নি। (সেজান, পিকাসো ইত্যাদির সম্বন্ধে বাঙালির লেখা আর পড়তে ইচ্ছা করে না।)

আমার লেখা যদি বেনামে ছাপতে রাজি হও, তবে দু'একটা লেখা পাঠাতে পারি। এ পত্রিকা বোধহয় বেশিদিন চলবে না। তবে বাঁচিয়ে রাখলে ভালো। আমি কিন্তু বামপন্থী নই। বোধহয় দক্ষিণপন্থীও নই। যাই হোক, তোমার বাবা-মাকে আমার কথা বোলো। আশা করি তুমি, মহুয়া ও তার ছেলে ভালো আছে। ইতি — দাদু

সেইসময় আমার প্রিয় ক'টি বিলিতি জলরঙের 'কেক্' ফুরিয়ে গেছে। দিশি রং-এ সেই জৌলুস, গভীরতা পাচ্ছি না। কলকাতায় আমার শিল্পী বন্ধুরা বললেন —'এইজন্যই water colour ছেড়ে দিয়েছি, oil ধরে ফেলো।' শেষে দাদুর কাছেই পরামর্শ চাইলাম। সঙ্গে আগের চিঠির জের টেনে কিছু রাজনৈতিক কথাবার্তাও ছিল। চিঠি এলো —

২২

[D. Dun]
18. 3. 75

দুলাল,

Modern Art-এর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু politics-এর কথা জানতে হয়েছে। Socialism, Communism, Capitalism, Democracy ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যৎসামান্য। তোমার এই পত্রের জবাব পরে দেব। কিছু প্রশ্ন আছে, আপাতত রঙের অভাব কি ক'রে মিটতে পারে সেই কথা।

কলকাতায় রং পাওয়া যায় না? বিশেভাবে জি. সি. লাহা ও অবিনাশ স্থানীয় জানাশোনা artist-দের জন্য রং মজুদ রাখে। কলকাতায় পরিচিত artist-দের সাহায্যে হয়ত রঙের ব্যবস্থা হতে পারে। অবশ্য জোর ক'রে কিছু বলতে পারছি না। Oohre, Indian red (গেরি) Terre-verte (হরা

পাথর) এ ক'টা রং আমরা চিরদিনই ঘরে তৈরি ক'রে নিয়েছি। Chinese white, Indigo এ দু'টো রং অবশ্য জি সি. লাহা থেকে কিনতাম রং তৈরি ক'রে নেওয়া তোমার মতো ব্যস্ত লোকদের পক্ষে কঠিন, কারণ সময়সাপেক্ষ।

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে এখনো কিছু পটুয়া থাকার কথা, অন্তত যারা প্রতিমা করে তারা তো আছেই। এইসব পটুয়ারা তোমার রং তৈরি ক'রে দিতে পারে। রামকিঙ্কর বাবুর সমস্ত oil painting গুঁড়ো রং দিয়ে করা। কাজেই যা লিখছি, তা পরীক্ষিত। রঙে আঠা মিশিয়ে সেই রঙ রোদ্দুরে শুকিয়ে নেবে। শুকোবার পর যদি রংটা ফাটাফাটা হয় তাহলে বুঝবে আঠা বেশি হয়েছে। আর যদি রং হাতে ঘষলে উঠে আসে তাহলে বুঝতে হবে আঠা কম হয়েছে এবং গুঁড়ো রং আঠার সাথে ঠিকভাবে মেশে নি। পটুয়ারা যে রং গঁদে মিশিয়ে কাজ করে সে রং কেকের মতো অনেকদিন রেখে কাজ করা যায়। নষ্ট হয় না। গুঁড়ো রং ব্যবহার করতে হলে কাঁচা Linseed দিয়ে tooth-paste-এর মতো তৈরি ক'রে নিলে হাঙ্গামা অনেক কমে যায়। Linseed ভালো না হলে রং শুকোতে চাইবে না সহজে। মোট কথা, যেরকম দিন-কাল তাতে নিজে নিজে রং করার ব্যবস্থা থাকা ভালো, কিছু দিনের জন্য একটা ছেলে রেখে রং তৈরি ক'রে নিতে পার।

আর একটা ফর্মুলা : টাট্‌কা ডিম (Imp.) যাতে সাদাটা লালের মতো জমে যায় নি বা হলদে ছ'ড়িয়ে পড়ে নি—সেরকম ডিমের হলদে এবং সাদা খুব ভালো ক'রে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর সেই ডিমের emulsion যে কোনো গুঁড়ো রঙের সঙ্গে paste-এর মতো মেশাতে হবে। এ paste জলের মতো পাতলা ক'রে নিলেও রং উঠবে না, কিন্তু একটু গাঢ় অবস্থাতে oil colour-এর মতো হয়। oil colour brush use করা যায়। তবে বিলিতি water colour-এর মতো এতে effect আসে না, তবে রং যদি খুব মিহি হয় তাহলে হবে। মোট কথা, তোমাকে style বদলাতে হবে। এর মধ্যে তোমার কোন medium সম্বন্ধে interest হয় তা জানলে আমি পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে লিখে জানাব।

যাই হোক, সন্ধান করলে কিছু water colour কলকাতার বাজারে পাওয়া যাবে। প্রয়োজন হলে জানাবে দিল্লির বাজার থেকে রং যোগাড় অবশ্যই করা যাবে। Govt. Art Academy-কে রঙের Quota permit দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন artist-দের সাহায্যের জন্য। মোট কথা, কলকাতায় আছেন এমন কোনো আর্টিস্টের সাহায্যে রং পাওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। তবে দিনকালের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আমার কথা ঠিক নাও হ'তে পারে। তবে কাজের style তোমাকে বদলাতেই হবে।

এক কৌটো Fevicol কিনবে। অল্প জল নিয়ে Fevicol-এর সঙ্গে

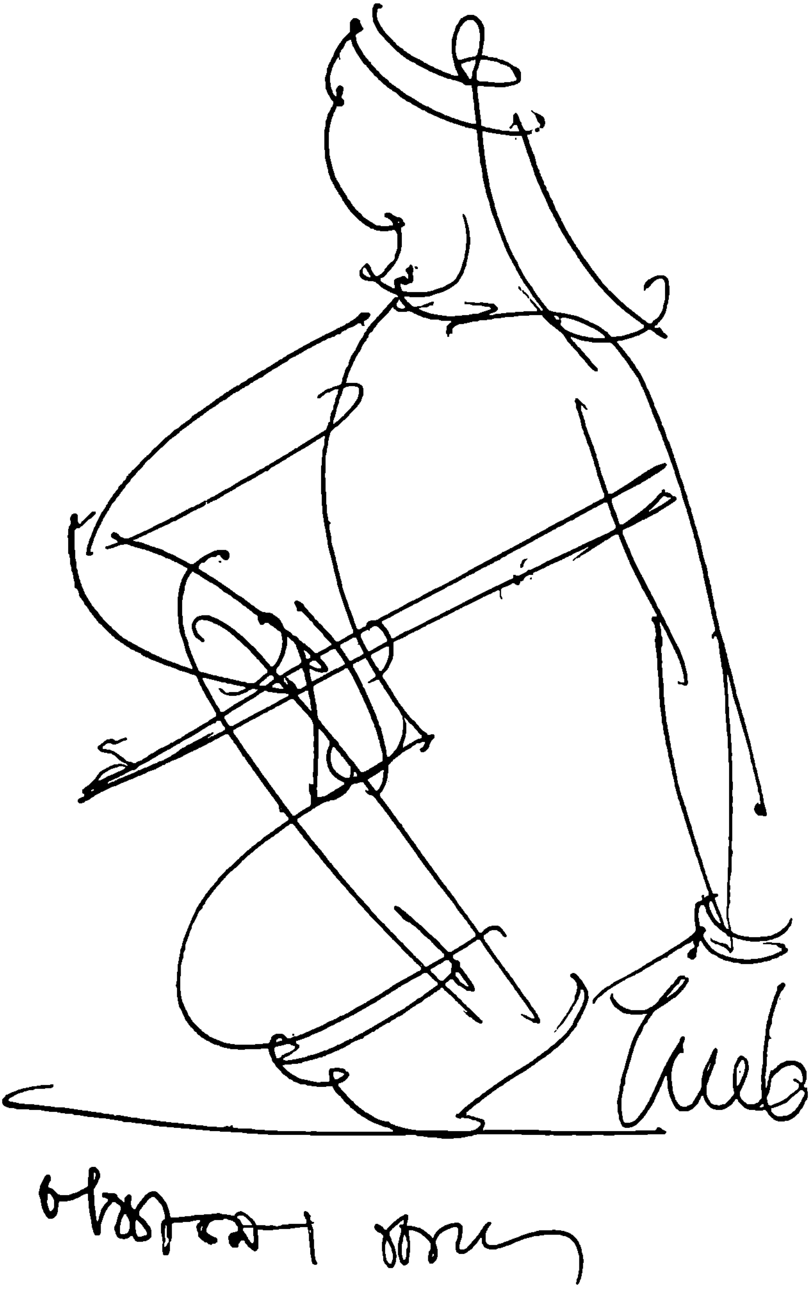

স্কেচ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৯

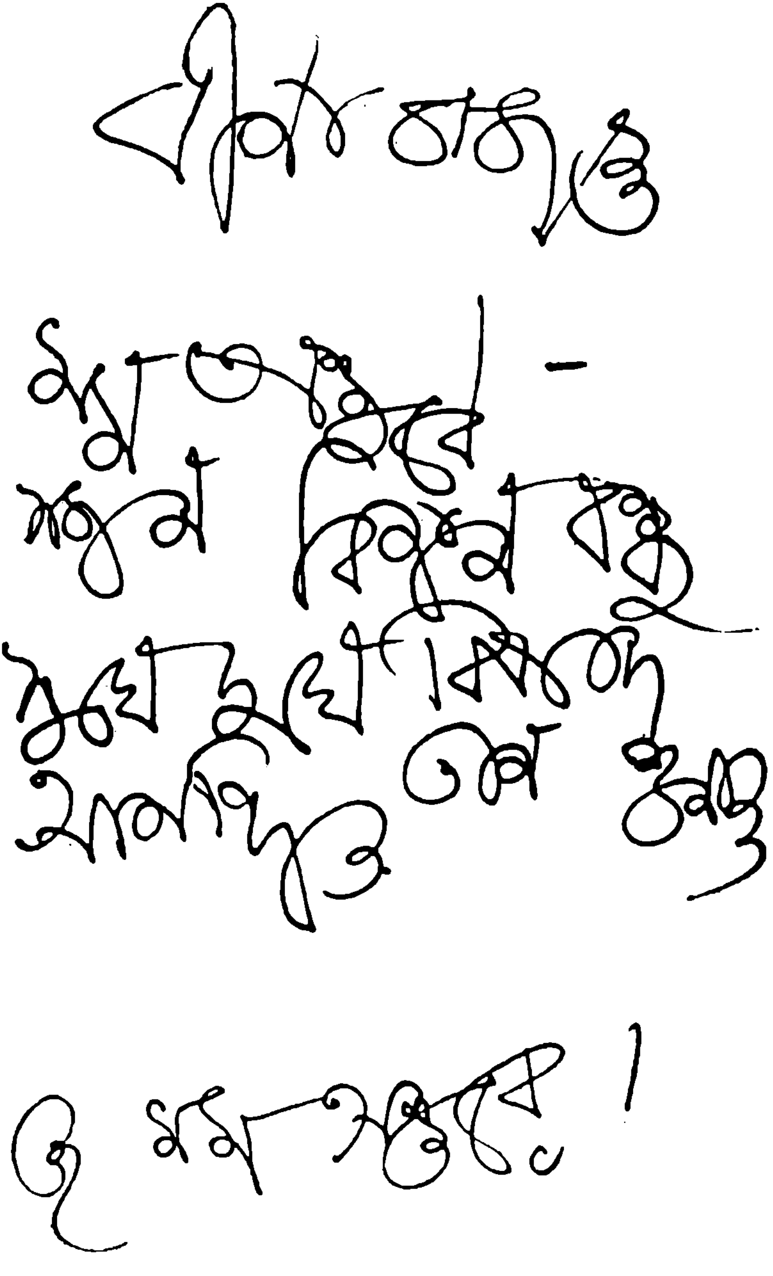

ক্যালিগ্রাফি : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৭১ (?)

যে কোনো রং মিশিয়ে কাজ করা যাবে। অনেকসময় oil colour brush diluted Fevicol-এ ডুবিয়ে নিয়ে যে কোনো powder রং brush দিয়ে তুলে নিয়ে কাগজে লাগালেই রং পাকা হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। এইটা তুমি পরীক্ষা কর। Baroda-র artist-রা এই medium ব্যবহার করছে। এই medium-এ কাজ করলে ভালো হবে। তবে style বদলাতেই হবে। ইতি—

রং তৈরির কিছু অসফল প্রচেষ্টা হয়েছিল, বিষ্ণুপুরে পোটোদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেও হতাশ হয়েছি। কারণ তারা তখন সস্তার poster colour-এর শিশি কিনে কাজ করছে। শুধু একটা কথাই মন্ত্রের মতো কাজ করতে লাগল— 'স্টাইল বদলাতে হবে'। এই সময় বিষ্ণুপুর মন্দির সম্পর্কে আমার অনুসন্ধান প্রাথমিক স্তরে। দাদু জানালেন—

২৩

D. Dun
24. 5. 75

দেবাশিস,

এবার তুমি যে প্রশ্ন করেছ, তার জবাব সহজেই দেওয়া যাবে। স্থানীয় লাইব্রেরিতে Bengal Terracotta by Mukul De, published by Lalit Kala Akademi বইখানি থাকবার কথা (দাম পাঁচ টাকা।) আরো অনেক বইয়ের reference পাঠাব পরে। আমার একটি অনুরোধ—দৃষ্টান্তগুলি, মন্দিরের টেরাকোটাগুলি আরো আরো ভালো ক'রে দেখ।

ঐতিহাসিকদের দেখা ও আর্টিস্টদের দেখার মধ্যে পার্থক্য অনেক। সম্প্রতি জনৈক ইংরেজ[1] Bengal Terracotta নিয়ে research করছিলেন। হঠাৎ মারা যান। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (কলিকাতা) উদ্যোগে যে সভা হয়েছিল, সেই সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে কিনা খবর নিও স্থানীয় Library থেকে। আমি যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম (Aesthetic value) সেই প্রবন্ধ তোমাকে পাঠাবার ইচ্ছে রইল।

রাজপুত tradition-এর সঙ্গে Bengal Terracotta-র মিলও আছে, অমিলও যথেষ্ট। অলংকার মনে মনে eliminate ক'রে form-এর quality আরো ভালো বোঝা যাবে। ইতিহাস ভুলে গিয়ে সাদাচোখে টেরাকোটা ও অন্যান্য লোকশিল্প দেখ, এইটি আমার বিশেষ অনুরোধ। এই অনুরোধের কারণ পরে জানাব। আশা করি সব ভালো আছ। তোমার পুত্রের নাম কি ?

ইতি— দাদু

১ ডেভিড ম্যাককাচিয়ন (১২. ৮. ৩০—১২. ১. ৭২)।

পরের চিঠি—

২৪

[D. Dun]
4. 6. 75

দুলাল,

Art-history তে যা আমরা পড়ি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পার্থক্য যথেষ্ট। আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপাতত বইএর কথা না ভেবে যা দেখছ তারই অভিজ্ঞতা অর্জন করায় artist হিসেবে বেশি লাভ হবে। তবে যেসব বিষয়ে লক্ষ দেওয়া হয় না সেরকম কয়েকটি point জানাচ্ছি। প্রথমে দেখবে সমস্ত form-এর projection কোনো না কোনো ভাবে slab-এর সঙ্গে যুক্ত। কাপড়, হাতের পাতা, আঙুল, পায়ের পাতা ইত্যাদি। এই-ভাবে দু'টি স্তর তৈরি হয়েছে (negative এবং positive volume)।

প্রত্যেক form সামনের দিকে এগিয়ে আসছে (এটি ভারতীয় শিল্পের সাধারণ গুণ। সমগ্র এশিয়াতে এই গুণ লক্ষ করা যাবে।)

আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পে natural form-কে ভেঙেচুরে গড়ার চেষ্টা হয়, যার নাম distortion। ভারতীয় শিল্পে distortion নেই, আছে transformation। অলংকার ইত্যাদি মনে মনে বাদ দিয়ে যদি form লক্ষ কর তাহলে টেরাকোটা শিল্পের strength কোথায় তা বোঝা যাবে। Animal form-এ অলংকার নেই, তাই Animal form থেকে abstract element সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর figure-গুলি দেখলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

অলংকারের প্রবর্তন অধিকাংশ সময় form-এর dimension দেখাবার জন্য। দৈবাৎ এর ব্যতিক্রম হতে পারে। অলংকার আতিশয্য হয়ে উঠেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া অসম্ভব নয়।

আরেকটি লক্ষ করবার জিনিস, Line ও Mass-এর আশ্চর্য রকম সমন্বয়। রোদ্দুর যখন সামনে থেকে পড়ে তখন linear element বেশ স্পষ্ট। যেখানে প্রতিফলিত আলো নেই সেখানে mass প্রধান। বাংলা-দেশের ব্রোঞ্জেও পাবে। (পাল ও সেনযুগের ব্রোঞ্জ দ্রষ্টব্য।)

এইসব form কতটা ভঙ্গিপ্রধান সেটা লক্ষ করার বিষয়। এই কারণে মুখে ভাবের অভিব্যক্তি প্রায় নেই। চোখ মুখ নাক এগুলিকে গহনার মতো texture বলা চলে। এই সব ভঙ্গি tension-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, Geometry-র দ্বারা নয়। তাই টেরাকোটা মন্দির ঘুরে দেখলে নাচের কথা মনে হবে। Animal form-গুলি ভালো ক'রে দেখবে। তাহলে আমার কথা

শাই হবে। (Animal form ঐতিহাসিকরা দেখেন না। ঐতিহাসিকরা কে সুভদ্রা, কে সত্যভামা, কে রাধা এইসব অনুসন্ধান করতেই ব্যস্ত। এইসব অনুসন্ধানের প্রয়োজন আমাদের নেই।)

* রাজপুত চিত্র ও বাংলার টেরাকোটার মধ্যে মিল-অমিল দুই-ইআছে। প্রথম পার্থক্য—রাজপুত more aristrocratic, টেরাকোটা rustic। রাজপুত চিত্রে বস্ত্রহরণ ও টেরাকোটা উৎকীর্ণ ফলকে বস্ত্রহরণ—এই দুটোই বিশেষভাবে তুলনীয়। ভাগবত পুরাণে ও বিশেষভাবে রূপগোস্বামী-রচিত 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের বিরহমিলন ইত্যাদির যে নিখুঁত বর্ণনা আছে সেগুলি যুগপৎ রাজপুত ও বাংলা টেরাকোটাতে পাওয়া যায়।

আধুনিক দর্শক intellectually technique, method অনুসন্ধান করেন, তাই তোমাকে technical সম্বন্ধে লিখলাম।

* Social aspect—স্মরণ রাখা দরকার যে এইসব মন্দির একজন বা একদিন-দু'দিনের মধ্যে রচিত হয় নি। সকল রকমের মানুষ এগুলিকে দীর্ঘকাল ধরে দেখেছে। এবং সকল বয়সের নরনারী এর থেকে কিছু আনন্দ পেয়েছে। তাই মন্দিরের টেরাকোটাগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিকভাব থেকে শুরু ক'রে হাস্য-কৌতুক, ভয় সকল রকমের ভাব আছে। অপ্রধান বিষয়ের মধ্যে কারিগরদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

Bibliography (1) রূপম্, edited by O. C. Ganguli I, II, III বর্ষ, illustrated article on 'Vishnupur Temple'. (2) History of Indian and Indonesian Art by Coomarswamy (3) Bengal Gazetteer-এ বাংলার টেরাকোটা সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্য আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে অশোক মিত্র সম্পাদিত যে গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেও অনেক খবর আছে, কোন বছর আমার মনে নেই।[১] এ বিষয়ে যদি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে চাও, তাহলে পাহাড়পুর স্তূপের কথা পড়তে হয়। কারণ এই স্তূপেই প্রথম রাধাকৃষ্ণের বিষয় উৎকীর্ণ আছে।

আমার suggestion-গুলো যদি তোমার কাজে লাগে তাহলে আমি আরো খবর দিতে প্রস্তুত আছি। আমার প্রবন্ধ পাঠাতে প্রায় তিনটাকা লাগবে। তাই বিশেষ বিশেষ অংশ লিখলাম। দীর্ঘমেয়াদি injection নিয়ে urine trouble অনেক কমেছে। গত বছরেও এই injection নিয়েছিলাম। আশা করি তোমরা সব ভালো আছ। ইতি—

দাদু

১ Census Report, 1951.

পরের চিঠি—

২৫

D. Dun
3 7. 75

ডাক্তার,

…ইতিমধ্যে আমার সেক্রেটারি কয়েকদিনের জন্য দেরাদুনের বাইরে যাচ্ছেন। কাজেই কাজকর্ম বন্ধ থাকবে।

ইতিমধ্যে তুমি একটা কাজ করবে। টেরাকোটা panel-এর মতো border দেওয়া চারদিকে একটি border দিয়ে একটি কাগজ তৈরি করবে। সেই panel-এর মধ্যে তোমার পরিচিত যা তুমি রোজ দেখছ, এইরকম; একটি বিষয় অবলম্বনে একটি drawing করবে। drawing এমনি হবে যে টেরাকোটা panel-এর কাছে খাপ খাওয়ানো যায়। (মানুষ, গাছ, গরু-বাছুর ইত্যাদি নিতে পার।) এই কাজটি করতে গিয়ে কারিগরদের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করবে। কেবল স্কেচ ক'রে তেমন ভাবে বিষয়টি বোঝা যায় না। যদি পূর্বের করা ছবি থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করতে চাও, তাও করতে পার। কিন্তু সামনে যা প্রতিদিন দেখছ সে বিষয় অবলম্বনে drawing করলে টেরাকোটায় কতটা সরলতা (simplicity) আছে তা ধরা পড়বে।

আমাদের পরের যুগের শিক্ষিত বাঙালিরা ইংরাজি শব্দ প্রায় ব্যবহার করে না। তোমার চিঠিতেও প্রায়ই ইংরাজি শব্দ থাকে না। আমাদের কথায় কথায় ইংরাজি শব্দ এসে যায়। অবনীন্দ্রনাথ distortion-এর পরিবর্তে 'কিমাকার' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যাই হোক, সব প্রশ্নের জবাব পরের চিঠিতে পাবে। অত্যন্ত বেশি স্মৃতিভ্রম হচ্ছে। কাজকর্মের একটু অসুবিধে হচ্ছে। আর বেশিদিন বোধ হয় আমার শিল্পতত্ত্ব লেখা চলবে না। আশা করি তোমাদের সব খবর ভালো। ইতি—

দাদু

ইতিমধ্যে আমার পছন্দমতো কিছু টেরাকোটার কাজ ড্রইং ক'রে, বর্ণনা দিয়ে দাদুকে পাঠালাম। এর মধ্যে একটি কাজে রথের উপর দণ্ডায়মান যুদ্ধরত বীরমূর্তি (সম্ভবত রাম) ধনুতে শরযোজনা করছেন। মূর্তির মুখ এবং পা পাশ থেকে দেখানো এবং বুক অপেক্ষাকৃত সামনে থেকে দেখানো হয়েছে। এই সবক'টি ছবিতেই মূলভাব প্রকাশের জন্য যেভাবে ড্রইং ভাঙা হয়েছে তা লক্ষ করার মতো। দাদু এবার একটা মোটা খামে দীর্ঘ চিঠি দিলেন—

Dehra Dun
21st July 1975

দুলাল,

···বিচারবুদ্ধি সামনে রেখে যাঁরা শিল্পসৃষ্টি করছেন তাঁদের পক্ষে অনুরূপ কাজ অসম্ভব। এরই নাম ধারণাত্মক (conceptual) সৃষ্টি। conceptual-এর মোটামুটি সংজ্ঞা Psychology Dictionary থেকে দেওয়া গেল – 'The type or level of cognitive process which is characterised by the thinking of qualities, aspects and relations of objects at which therefore comparison, generalization, abstraction and reasoning become possible, of which language is the great instrument, and the product the concept normally represented by a word.'

রদাঁর মতে movement দেখাতে হলে দু'টি ভিন্নমুখী movement-এর সংলাপ দরকার। বিখ্যাত গ্রীকমূর্তি Disc-thrower আলোচনা প্রসঙ্গে রদাঁ এই উক্তি করেন। রদাঁর মতে ঐ মূর্তির উপরার্ধ যে দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে নিম্নাংশ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয় নি। অনেক প্রাচীন বা আদিম মূর্তিতে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে। এই জাতীয় মূর্তি বা চিত্র করতে হলে mass অপেক্ষা ছন্দ তথা Line (tension)-এর প্রয়োগ দরকার।

বুকটা খুব অস্বাভাবিক উঁচু করা একটি প্রাচীন পদ্ধতি। একটা বিখ্যাত নিগ্রো মূর্তি আছে যার উঁচু বুকের গড়ন প্রায় তোমার ছবির অনুরূপ। (নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া দেখানোর জন্যই কি এই convention? আমার জানা নেই।)

বীরভূমের ইলামবাজার গ্রামের কাছে বাঁশবেড়ে গ্রামে পিতলের মূর্তিতে অনুরূপ বুকের গড়ন আছে।

হাত দু'টো কেন সরু করেছে? হাতের কোনো ক্রিয়া নেই। পিকাসোর একটি ছবির উল্লেখ করি। stage-এর ওপর বিরাট আকারে Dancing figure – তার পাশে প্রায় line-এ করা একটি বাদকের মূর্তি। প্রায় drawing কাঠির মতো দাঁড়ানো। একটিতে আছে বেগ, অন্যটি স্থির। ইংরেজিতে static ও dynamic-এর discord। বাংলার লোকশিল্পে বুকের গড়নের এই বিশিষ্টতা কোথা থেকে এল? অনুসন্ধানের বিষয়। এবার তুমি বুঝে দেখ এটা Geometry-তে ব্যবহার করা যায় কিনা।

Impression বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য এবার একটি দৃষ্টান্ত দিই।

শান্তিনিকেতনে একজন ভালো পটুয়াকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের কার্য-প্রণালী দেখবার জন্য। গতানুগতিক বিষয় সে ভালোই আঁকতে পারত। তার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝবার জন্য আমরা তাকে একটি মটর গাড়ি বা ট্রাক আঁকতে বলেছিলাম। সে বললো একটু সময় দিতে হবে, একটু ভেবে নিই। তারপর সে একটা প্রায় কাগজজোড়া ডিমের মতো আকার করল। তারপর সে দু'টো জানলা লাইন দিয়ে কেটে বার করল। বেশ বড় ক'রে স্টিয়ারিং দিল। ইঞ্জিন বেশ বড় হল এবং হেড লাইট বেশ ভালো ক'রে দেখালো। এটা মটর গাড়ি হুবহু হল না ঠিক। এইভাবে যদি আর্টস্কুলের ছাত্রকে বলা হতো তাহলে সে বলত—দাঁড়ান একটু জিনিসটা দেখে নিতে দিন (observation)।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। অভিজ্ঞ বয়স্ক আর্টিস্টরা এসেছেন ছোট ছেলেদের ছবির বিচারক হয়ে। একটি ছেলে একটি ট্রাক করেছে (বড় কাগজে)। ট্রাকের মধ্যে অনেক লোক নানা বর্ণে রঞ্জিত। ট্রাকেতে রং দেওয়া আছে। ট্রাকের নম্বরও লেখা আছে। কেবল চাকা দু'টোতে রং নেই। যদিও টায়ারের ওপর texture দিতেও সে ভোলে নি। অভিজ্ঞ পরীক্ষক বলছেন ছবিটি অসম্পূর্ণ, কারণ চাকায় সে রং দেয় নি। যে ছবি এঁকেছে সে বলছে, টায়ারে তো রং থাকে না। টায়ারে যে রঙের আবেদন নেই তা তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে। মোট কথা, তুমি যেভাবে দেখেছ তার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই।

Border-এর মতো panel texture-এর রূপ প্রায় সকল মন্দিরেই কম বেশি আছে। অনেক সময় এগুলো ছাপ নিয়ে করা। টেরাকোটা মন্দিরে অনুরূপ replica ব্যবহার হয়েছে।

উত্তীর্ণ শিল্পকর্ম খুব বেশি হয় না। কাজেই সকল মন্দিরেই এরকম তারতম্য থাকবে। কোন ঘরানা থেকে কোন উপাদান এসেছে, সে বিচার করতে হলে তোমাকে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসতে হয়, মন্দির আর দেখতে হয় না। এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা। টেরাকোটা মন্দির যাঁরা করেছেন, তাঁরা আধুনিক মতে specialist ছিলেন না। প্রয়োজনমতো তাঁরা মূর্তি ও ছবি করতেন। এটা অনুমান নয়। এই কারণে style-এ হেরফের হয়েছে। বাংলার কারিগরিতে বিশুদ্ধ চিত্র খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এই দু'টি উপাদান এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে মেশা যে সেটিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখানো অসম্ভব না হলেও দুরূহ কাজ। Pure painting, pure sculpture—এ হল প্রায় সোনার পাথরবাটি। তাই modern artist-রা আর pure করবার চেষ্টা করছেন না।

তোমাকে পূর্বের চিঠিতে যা task দিয়েছি সেটি করবার চেষ্টা করবে।

তাকে যৎকিঞ্চিৎ বলে উপেক্ষা করবে না। কাজটি করতে বসলেই বুঝবে যে কাজটি বেশ কঠিন। এই কাজ করলে তুমি টেরাকোটার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক কিছু হৃদয়ঙ্গম করবে। আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি এখন ইতিহাস উল্টাতে যেও না।

Distortion ও Transformation পরের চিঠিতে ব্যাখ্যা ক'রে জানাবো। বিষয়টি আমার টেরাকোটা লেখাতেও যোগ করব। অতি-শয়োক্তি বলে যদি মনে না কর তাহলে বলতে পারি তোমার দেখার ভঙ্গি খুবই ভালো। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রভাবে artist-এর নজর art-এর দিকেই পড়েছে, খানা-খন্দে পড়ে নি।

বেশ পিঠ ব্যথা করছে। ৫-টা থেকে কাজে বসেছি। এখন সাড়ে এগারোটা। সকালে মোমের পুতুল তৈরি করি। তারপরে লেখাপড়া।···

তুমি কি কমল মজুমদারের লেখা[১] পড়েছ ? আমি এই প্রথম তাঁর লেখা পড়লাম। তোমার ছেলের নাম ঠিক হল ? সকলে আমার যথাযথ সম্ভাষণ জানবে। যদি বেয়ারিং হয়ে যায় তাহলে চিঠি ফেরত পাঠাবে না। ইতি—

দাদু

১ এক্ষণ-সম্পাদক প্রেরিত 'অন্তর্জলী যাত্রা' এই সময়ে পড়েছিলেন।

পরের পোস্টকার্ড—

২৭

D. Dun
11. 8. 75

দুলাল,

বিশ্বভারতীর লাইব্রেরির অধ্যক্ষ ডঃ বিমলকুমার দত্তের গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হল। নাম : Bengal Temple (এই গ্রন্থে বাংলার ছবি, টেরাকোটা ইত্যাদি বিষয়ে লেখা হয়েছে)। গ্রন্থকার যা লিখেছেন সে বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। অর্থাৎ যা তিনি লিখেছেন, তা তিনি দেখেছেন।

এবারকার প্রশ্নের জবাব দিতে কয়েকদিন বিলম্ব হবে। শিল্পী, কারিগরদের জীবনযাত্রা জানবার জন্য নতুন, পুরনো গ্রন্থের অভাব নেই। এ বিষয়ে 'জাতক' অবশ্যপাঠ্য। এ দেশের আর্টের দুর্দশা, দুরবস্থা সম্বন্ধে তুমি যে সিদ্ধান্ত করেছ সে সিদ্ধান্ত খুব ঠিক নয়।

সম্প্রতি বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন থেকে একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে বীরভূম-বাঁকুড়ার পটুয়াদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। লেখাটি

আমি দেখে এসেছি। কুমারস্বামীর ইতিহাসে The Early Asiatic অধ্যায়টি তোমার একবার পড়ে নেওয়া দরকার। আমি নিজের গবেষণার ওপর নির্ভর করেই তোমার চিঠির জবাব দিই। ইতি—

দাদু

এক সপ্তাহ বাদে আরেকটি পোস্টকার্ড—

২৮

D. Dun
20th August '75

দেবাশিস,

টেরাকোটা সম্বন্ধে প্রবন্ধটি এইবার 'এক্ষণ' পত্রিকার পূজাসংখ্যায় ছাপা হবে[১]। টেরাকোটা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পত্র বিনিময় ক'রে কিছু নতুন বিষয় যোগ করবার প্রয়োজন বোধ করছি।

তোমার Diagram-সমেত শেষ পত্রের প্রশ্ন ও জবাব আমি এ লেখার শেষ অংশে যোগ করব। টেরাকোটা মন্দির উৎকীর্ণ ফলক সম্বন্ধে যদি একটি প্রশ্নপত্র তৈরি ক'রে পাঠাতে পারো তাহলে আমার সুবিধে হয়। যথাসাধ্য চেষ্টা করব কারিগরদের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য তথ্য যোগ করতে।

সম্ভব হলে রথের (চৌকো চাকাওয়ালা) নিম্নার্ধের close-up পেলে ভালো হবে। বুক অস্বাভাবিক উঁচু এবং হাত দু'টো লাইনের মতো—এর একটা diagram এবং উপরার্ধের photo বা কেবলমাত্র ভালো diagram হলেও চলবে।

মোট কথা, একটা ভালো প্রশ্নপত্র তৈরি ক'রে পাঠাও। লঘুপাক কিছু খাদ্যের তালিকা পেলে উপকৃত হব। শরীরের অবস্থা তেমন ভালো নয়। কাজের চাপ বাড়িয়ে দেখছি তাতে কিছু উপকার হয় কিনা। ইতি—

দাদু

১ 'টেরাকোটা কাজের বৈশিষ্ট্য', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮২।

উত্তর দেওয়ার আগেই, ক'দিনের মধ্যে আরেকটি পোস্টকার্ড—

২৯

D. Dun
22. 8. 75

দেবাশিস,

পূর্বের পত্রে photograph চেয়েছিলাম। photograph-এর কোনোই প্রয়োজন নেই, প্রশ্নপত্র অর্থাৎ তোমার মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে সেইসব প্রশ্ন যতদূর সম্ভব সত্বর পাঠাও। আর ডাক্তারের কাছ থেকে খাদ্য সম্বন্ধে যে উপদেশ চেয়েছিলাম, সেটি পরে পাঠালেও হবে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে লেখাটি 'এক্ষণ' আপিসে পৌছনো দরকার।

বাঁধানো দাঁত, পাকা চুল, টাক, মেরুদণ্ড প্রায় ধনুকের আকার—এই হল টুনটুনির কাকার বর্তমান অবস্থা। কাজ বাড়িয়ে শরীর ভালো করবার ওষুধ এখনো তেমন কাজে লাগে নি।

তোমার পুত্রের নামকরণ হল? মহুয়াকে বলো বেশ সুস্বাদু পথ্যের তালিকা সে যদি আমাকে পাঠাতে পারে তাহলে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি কতটা হল জানাব। ইতি—

দাদু

[চিঠির শেষে দাদুর নিজের হাতে লেখা একটি লাইন—'তোমার ছেলে দেখতে কেমন ?]

এবার আমায় তড়িঘড়ি প্রশ্নপত্র তৈরি ক'রে উত্তর দিতেই হল। সঙ্গে আমার জ্ঞান বুদ্ধি মতো একটা পথ্যের তালিকা। তিন সপ্তাহ বাদে 'ইনল্যাণ্ড' এল—

৩০

D. Dun
9. 9. 75

দুলাল,

তুমি আমার পথ্যের যে তালিকা দিয়েছ, তার সঙ্গে আমার এখনকার খাওয়া-দাওয়ার ঘনিষ্ঠ মিল আছে। ডিম এবং মাংস কমই খাই। মাংস (কীমা) দই-এর জলে সেদ্ধ ক'রে খাই। মাঝারী size-এর সুপ বোল-এ যতটা খাদ্য ধরে ততটা পরিমাণ খাদ্য আমি দুপুরে খাই। রাত্রে যে কোনো ফলের স্টু, একখানা হাতে করা রুটি। কেবল দই কিছু পরিমাণে বেশি খাই। দই-চিঁড়ে সপ্তাহে একদিন-দু'দিন ভাত-রুটির পরিবর্তে খাই।

Far-East Research Institute-এর প্রধান chemist অবসর গ্রহণের পর শখ ক'রে কবিরাজি ওষুধ তৈরি করেছেন। তাঁর তৈরি ওষুধ খেয়ে

বোধহয় ভালো আছি। অন্তত পেটের গোলমাল কমেছে।

টেরাকোটা সম্বন্ধে লেখাটি 'এক্ষণ' পত্রিকাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার পত্রে এবার অনেক প্রশ্ন ছিল। সে সব প্রশ্নের মোটামুটিরকম জবাব এবং বিস্তারিতভাবে শোষণ, সমাজ ইত্যাদির আলোচনা না করার কারণ প্রবন্ধের শেষে দিয়েছি।

অসুস্থ শরীর সম্বন্ধে সকল খবরই Medical College Hospital-এ পাওয়া যায়। জীবনের উত্থানে মানুষের আর এক পরিচয়। শিল্প-সাহিত্য আর এক উত্থান। এই উত্থানের পরিচয় পেতে হলে উপভোগ করার ইচ্ছে থাকা দরকার। তাই তোমাকে ভালোভাবে দেখতে বলেছি। রসোত্তীর্ণ শিল্প ও সাহিত্যে সমাজের অন্তরের আশাআকাঙ্ক্ষার খবর অবশ্যই পাওয়া যাবে। সমাজের surface-এ যেসব সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার খবর তেমন নাও থাকতে পারে। আমি যতদূর জানি শিল্পসাহিত্যের social interpreter যাঁরা তাঁরা সমাজের কতকগুলি সাময়িক সংস্কারের সাহায্যে শিল্পসাহিত্য বিচার করেন।

এই কারণে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বিশ্লেষণ social interpreter-রা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন নি। অপেক্ষাকৃত সাধারণ শিল্পীদের সম্বন্ধে এঁদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে Social History of Art এবং Philosophy of Art History (A. Hauser-এর)—প্রামাণিক এই দু'খানি গ্রন্থ দেখতে পার। নিশ্চয়ই জানি তোমার সঙ্গে আমার বড় রকমের পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য বয়সের এবং শিক্ষা-দীক্ষার। সে যাই হোক, আমার প্রবন্ধ পড়লে টেরাকোটার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য বুঝতে সুবিধা হবে বলেই মনে করি। তোমার প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা পরে দেব।

এখানে প্রবল বর্ষা। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। ইতি—

দাদু

১৯৭৪-এর শারদীয় এক্ষণে 'টেরাকোটা কাজের বৈশিষ্ট্য' নামে দাদুর লেখাটি বেরলো। শুধু বিষ্ণুপুর নয়, সাধারণভাবে বাংলার টেরাকোটা কাজের মূল বৈশিষ্ট্য কী, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সেই সময়কার তফাত কোথায় এবং বাংলার কাজ হিসেবে এর গুরুত্ব কতখানি এসব নিয়ে একটি মূল্যবান রচনা। স্বাভাবিক কারণেই আমার প্রশ্নের যে অংশটি রাজনৈতিক, সামাজিক খুঁটিনাটির সঙ্গে যুক্ত, তার উত্তর এতে তিনি রাখেন নি। পুজোর পরে এবার যে চিঠি এল তাতে পাল্টা প্রশ্ন ক'রে পাঠালেন—

[Dehradun]
6. 11. 75

দুলাল,

তোমার সম্প্রতিকালের প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ অর্থনীতির সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ অর্থনীতির প্রভাব কতটা গভীর মানুষের জীবনে সে বিষয়ে সত্যিই আমি চিন্তাও করি নি। পড়াশোনাও করি নি।

Aesthetic নিয়েই আমার কারবার। আমার এই মনোভাব যে সমকালীন আদর্শের দ্বার প্রভাবান্বিত তা তুমি সহজেই বুঝবে। যদি 'এক্ষণ' পত্রিকা ইতিমধ্যে তোমার হাতে পৌঁছে থাকে তাহলে লক্ষ করবে আমার লেখা এক্ষণ-পত্রিকার অন্যান্য লেখার মধ্যে বেশ একটু খাপছাড়া। কেন খাপছাড়া হল তাও আমি বুঝি। যদি Aesthetic সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকে তার জবাব দিতে আমি সদাই প্রস্তুত। পছন্দ হোক বা না হোক তাতে আমি চিন্তিত নই।

এবার তোমায় একটা প্রশ্ন করি - কার্ল মার্কস বলেছেন, মানুষ নিজের জীবন ধারণের উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহের জন্য capital হিসেবে নিজ নিজ talent-কে ব্যবহার করে (in exchange of talent) ('Capital' opening chapter দ্রষ্টব্য।) এখন আমার প্রশ্ন আমরা কি অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়ের জন্যই talent বিক্রি করি ? আমাদের talent কি অন্য আদর্শের জন্য ব্যবহার করি না ? কার্ল মার্কসের মতো মহাপণ্ডিত কি একটা প্রফেসারি, মাস্টারি করে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাকে একটু ভালো করতে পারতেন না ? তুমি ডাক্তার। ডাক্তারির বিনিময়ে তুমি ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করেছ। এরপর ছবি আঁকার কি প্রয়োজন ? aesthetic talent-এর বিনিময়ে ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না। মোট কথা, যে-talent এর কোনো return পাওয়া যাচ্ছে না, সেই talent-এর চর্চা কেন মানুষ করে ?

তোমার সময় সুবিধেমতো এবং ইচ্ছে হলে আমার এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিও। তর্ক করার জন্য লিখছি না। আমি জানতে চাইছি আধুনিকের সাথে আমার পার্থক্য কোথায় এবং কেন ? আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। ইতি -

দাদু

ইতিমধ্যে এক্ষণে প্রকাশিত দাদুর লেখা পড়ে আমি আরেকটা চিঠি দিয়েছি। তাতে দাদুর প্রশ্নের জবাব ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে দাদুর পোস্টকার্ড এলো -

D. Dun
21. 11. 75

দুলাল,

টেরাকোটা প্রবন্ধ পড়ে কিছু নতুন খবর পেয়েছ জেনে খুশি হলাম। খুব সরলভাবে লেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তোমার দুরূহ মনে হল কেন?

'শিল্প বিষয়ে আলাপ' এ-প্রবন্ধটিও[১] সময়মতো পড়বে। তোমার প্রশ্নের জবাব ঐ প্রবন্ধে আছে। সময়সুবিধেমতো আমার প্রশ্নের জবাবও লিখে জানাবে। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতির পটভূমি অবশ্যই দরকার, আবার সামনের দিক থেকেও দেখবার দরকার আছে। আমি টেরাকোটা দেখেছি সামনে থেকে, আমি এখন যে লেখাটি লিখছি, সে লেখাও এ-ধরনের হবে। লেখাটি কেন তোমার কঠিন মনে হল, সে বিষয়ে একটু জানাবে। কারণ আমি ভাবছি যে আমি খুব সরলভাষায় সহজ ক'রে লিখছি।

ভাইফোঁটার জন্য টুনটুনি কলকাতায় গিয়েছে জেনে অনুমান করছি সে ভালো আছে। তুমি মহুয়া ও রাহুল সবাইকে ভালোবাসা জানালাম। আশা করি বনবিহারী ভালো আছে। ইতি –

দাদু

১ 'শিল্পবিষয়ে আলাপ', এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা ১৩৮২ ; সত্যজিৎ রায় ও পৃথ্বীশ নিয়োগীর কথোপকথন।

এবার দাদুর প্রশ্নের জবাব। কম্যুনিস্ট দেশে শিল্পীর কাজকর্ম যে কতটা ব্যাহত হয় সেটা তখন যে আমি বুঝতাম না তা নয়। তবু অন্যায়টা রাজনৈতিক নেতাদের ওপর চাপিয়ে তত্ত্বকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়াস ছিল, তাই লিখলাম – মার্কস লেনিন বা গান্ধিজী – যে কোনো চিন্তানায়কের কোনো উক্তির বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণে অসংগতি থাকার সম্ভাবনা আছে। মার্কসীয় দর্শন বলতে আমরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে বুঝি। Capital বইটি ঐ দর্শনের একটা applied form বলা যায়। তর্কের খাতিরে আলোচনা না করলে মূল দর্শনের আলোয় সমস্যাটা দেখাই সংগত। যারা ভাববাদী তারা মানুষের talent-এর বস্তুনিরপেক্ষ দিকটিই দেখে। তাকে 'আনন্দ', 'অসীমের উপলব্ধি' যাই বলুন না কেন। যারা জড়বাদী তারা জাগতিক উপযোগিতার কথা বলে। দুই-ই সত্য। যখন যে দিকটা মানুষের জীবনে তার মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এবং পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে মুখ্য হয়ে ওঠে তখন সেই দিকটাই মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দেয়। যে শুধু টাকার জন্য ছবি আঁকে তার যেমন পছন্দ-অপছন্দ পুরো লোপ পায় না, তেমনি যে টাকার কথা না ভেবে ছবি আঁকে সেও অন্তত যশ, খ্যাতি বা অন্য

কোনো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে না। কিছুদিন পর সংক্ষিপ্ত চিঠি এলো –

৩৩

D. Dun
18. 12. 75

দেবাশিস,

আমার প্রশ্নের জবাবে তুমি যা লিখেছ তা বেশ Convincing – বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই বলেই চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হল।

বাড়ি বদল করেছি। নতুন ঠিকানা তোমায় পাঠালাম। লীলা retire করেছেন। ঘরসংসার, রান্না নিয়ে তাঁর দিন কাটছে। আমার কাজকর্মের উৎসাহ বা শক্তি আরেকটু কমেছে। তবে মোটামুটি শরীর ভালোই আছে। আশা করি শীতের মধ্যে রাহুলের energy আরেকটু বেড়েছে।

টেরাকোটা বা সমকালীন আর্ট সম্পর্কে প্রশ্ন পেলে ঝিমিয়ে পড়া বিদ্যা-বুদ্ধি একটু সতেজ হয়ে উঠতে পারে। এ জন্য জানিয়ে রাখলাম, প্রশ্ন জাগলেই পাঠাবে। সকলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবে। ইতি –

দাদু

নতুন ঠিকানা –
B. B. Mukherjee
26-B Pritam Road
P. O. Dalanwala, Dehra Dun.

ছিয়াত্তরের প্রথম থেকে হাসপাতালের কাজের চাপে ছবি আঁকা কমে আসে। তার উপর সেইসময় আমার কলকাতায় বদলি হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। তাই বিষ্ণুপুরের ছবি তোলার কাজ শেষ করতে চেষ্টা করছিলাম। এসব কারণে কিছুদিন চিঠি লেখা বন্ধ ছিল। প্রায় মাস তিনেক বাদে টেরাকোটা কাজ আর ভারতীয় শিল্পরীতি সম্পর্কে আবার কিছু জানতে চেয়ে চিঠি লিখি। এক সপ্তাহের মাথায় উত্তর এলো –

৩৪

[D. Dun]
29. 3. 76

দুলাল,

এবার তোমার প্রশ্নের জবাব সহজেই দেওয়া যাবে। অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'ভারতশিল্পে মূর্তি', ইংরেজিতে Six Limbs of Indian Paintings ও

'ষড়ঙ্গ' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে কিনে নিও।

পশুপাখি ছাড়াও তাবৎ জীবজন্তুতে অনুরূপ সাদৃশ্য (সাহিত্যের ভাষায় উপমা) পাবে। এর পেছনে tradition অবশ্যই রয়েছে। tradition-টির মূলে আছে সম্ভবত কারিগরের পর্যবেক্ষণ, বলতে পার কারিগরের শব্দ ব্যাবহার-রীতি। গ্রামের লোকের মুখে সাদৃশ্যযুক্ত কথা আজও পাবে। যথা - প্যাকাটির মতো রোগা, গণ্ডারের চামড়া। অনুরূপ শতশত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আপাতত কাজের কথায় আসা যাক।

হুবহু যথাযথ অনুকরণ যে শিল্পে নেই, সেই শিল্পেই সাদৃশ্য ব্যবহার করতে হয়েছে। হাতির কান পাতার মতো করার অর্থ হাওয়ায় দোলা পাতার মতো কান দুলছে, এইটি বোঝাবার জন্য। শঙ্খের মতো কান সম্ভবত Structure বোঝাবার জন্য। (প্রাচীন 'ল' অক্ষরের সঙ্গে কানের তুলনা আছে। গৃধিনীর সঙ্গে আছে। এগুলি সবই Structure)। আমি যদি তোমাকে বলি যে pelvis যেন প্রজাপতি বা মথের মতো দেখতে,ধারণার দিক দিয়ে এই সাদৃশ্য বা উপমা কি ভুল হবে? ডাক্তারি শিক্ষার পক্ষে এই তুলনা যথেষ্ট নয়, কিন্তু একটি ছেলেকে বোঝাতে হলে এই ধারণাত্মক রূপ দিয়ে কাজ চলে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব সাদৃশ্যের ভাষাকে অত্যন্ত ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা 'করপল্লব': এখানে বুঝতে হবে পাতার ভেতরের angle ও (তার বাইরের angle এই বোঝাবার জন্য। আর কনুই থেকে কব্জির অংশ মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। Radius ও Ulna-র movement-এর সঙ্গে মাছের নড়াচড়ার তুলনা কর। শহুরে লোকের observation-ও বদলে গেছে। ভাষাও বদলে গেছে। তাই আজ জ্যামিতিক আকার অথবা যন্ত্র সাদৃশ্যের স্থান অধিকার করেছে।

তাল-মান জানবার জন্য 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণম্' by Stella Kramrisch এবং আরো বহু প্রাথমিক ইংরেজি বই পাবে। তার মধ্যে একখানা বই - Indian Iconography - লেখকের নাম আমার মনে পড়ছে না [J. N. Banerjee, Elements of Hindu Iconography?] অবনীন্দ্রনাথের ছোট্ট বই থেকে মোটামুটি জানতে পারবে। দাম বোধ হয় দু'টাকার বেশি নয়।

তোমরা Family Planning নিয়ে ব্যস্ত আছ, আর আমরা Family Planning-এর বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। Radio খুলতে ভয় হয়। ব্যাপারটা কি? তোমাদের মতো অভিজ্ঞ লোক পেলে একবার জেনে নিতাম। বিষয়টি এতই অজানা যে এর সপক্ষে বিপক্ষে কিছুই ভাবতে পারি না। এদিকে ডাক্তাররা Family Planning করছে. ওদিকে নব্যকালের নব্যমহাপুরুষ বলছেন, আদর্শ রাজা রামের দুই পুত্র ছিল। অতএব তোমাদের দুই পুত্রের অধিক হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম করলেন না কেন?

বিংশ শতাব্দীতে art movement শুরু হল স্বাধীন মনোভাব নিয়ে। পরবর্তী আচার্যরা চট ক'রে চলে গেলেন গুপ্তযুগে। নিজে ধুতি-পাঞ্জাবি পরছেন, কিন্তু ছবিতে ধুতি-পাঞ্জাবি করলে ভারতীয় ঐতিহ্য আর রইল না। ভারতের ধ্রুব শিল্প আদর্শের পতন হল তখুনি। (তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে Indian Art-এ কোথাও এরকম পুনরাবৃত্তির চেষ্টা নেই।) তাই ভাবছি তথাকথিত ধর্মের ধোঁয়া থেকে রক্ষা করতে না পারলে বোধ হয় কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না।…

Modern Russian Art (ক্রুশ্চভের যুগের) সম্বন্ধে কিছু লেখা পড়লাম। China-তে artist-দের কিরকম চালিত করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো ভালো বই-এর নাম আমাকে দিতে পার?

'এক্ষণ' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হচ্ছে[১]। সম্ভব হলে দেখবে এবং মতামত জানাবে। আমরা মোটামুটি ভালো আছি। আশা করি রাহুল, মহুয়া, বনবিহারী, টুনটুনি সবাই ভালো আছ। ইতি—

দাদু

পুনঃ গান্ধিজী যে Family Planning-এর বদলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে বলেছিলেন, তার কি হবে? তাঁর কথা তো আমরা অমান্য করতে পারি না।

১ 'শিল্প-জিজ্ঞাসা' (প্রস্তাবনা অংশ) এক্ষণ ১-২ সংখ্যা ১৩৮৩।

ঐসময় বাঁকুড়া ছেড়ে আসার আগে, বাঁকুড়ার জেলা লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ও বিষ্ণুপুর সাহিত্যপরিষদের মানিকবাবুর কাছ থেকে আশাতীত সাহায্য পেয়েছি। যেসব বই বাড়িতে আনার কথা নয়, সেসবও সপ্তাহের পর সপ্তাহ এনে রেখেছি। তখন 'জেরক্সে'র প্রচলন হয় নি, তাই এই সময় না পেলে আমি বইগুলো ব্যবহার করতে পারতাম না। যত বাঁকুড়া ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছে, ততই নানাভাবে সেখানে আমার মন জড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় বদলি হয়ে ফিরে এলাম। এরপরও দু-তিনবার আমাকে বিষ্ণুপুর যেতে হল নিজের তাগিদে। এইসময় বিষ্ণুপুরের অপেক্ষাকৃত নতুন গড়ে ওঠা মন্দিরগুলো সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিলাম। তাই বোস পাড়ার মন্দিরের স্থূলরুচির কয়েকটি টেরাকোটার ফটো নিয়ে ঐ বিষয়ে দাদুকে জানাই। দাদুর চিঠি redirected হয়ে কলকাতায় এলো—

দেরাদুন
২২।৬।৭৬

দুলাল,

দীর্ঘকাল তোমাকে চিঠি লেখা হয় নি. বার্ধক্যের অবসাদ – চিঠি না লেখার এই হল প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত এবারের প্রশ্নের বিশেষ কিছু জবাব দেবারও নেই। আমি কখনো 'মৃতকল্প' আর্ট সম্বন্ধে কিছু লিখি নি। সেরকম প্রয়োজনও হয় নি এবিষয়ে আলোচনা করবার। তুমি যেসব লক্ষণ সম্বন্ধে লিখেছ – সেগুলি যে মৃত শিল্পের লক্ষণ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর্টের প্রাণশক্তি যখন ফুরিয়ে যায়, তখন tradition বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। এবং বোঝা যায় tradition-এর শক্তি কি শ্রেণীর। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় শিল্পে (চিত্র ও ভাস্কর্য) texture-এর খুব প্রাধান্য ঘটেছিল। তেমনি এদেশের শিল্পে অবনতির মুখে তুমি পাবে জ্যামিতিক প্যাটার্নের বাহার। (এ বিষয়ে তুমিও লক্ষ করেছ।) এই সঙ্গে আছে ধার-করা natura-lism। আমার সন্দেহ হয় যে এই সময় বউবাজার আর্ট স্কুলের কয়েকজন শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগর ঐখানে কাজ করেছিলেন কিনা। অবশ্য আমার এই উক্তির কোনো পাকা প্রমাণ আমি দিতে পারছি না। যদি ওরকম কোনো বাইরের প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তবে মুখচোখে একটু বেশি realism ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হবে। কাপড়-চোপড়ের ভঁ.জেও ঐ ধরনের realism থাকতে পারে।

তোমার কলকাতায় যাবার কি হল ? আমার অবস্থা অনেকটা বিমানের [দাদা ?] মতো হয়ে আসছে। আমি কখনো একেবারে হাল ছেড়ে দিই নি। চিন্তার শক্তি কাজের শক্তি বাঁচিয়ে রাখবারই চেষ্টা করেছি। এখন মনে হচ্ছে সে শক্তিও শেষ হল। তুমি ডাক্তার বলেই তোমাকে এসব কথা লিখলাম। মনের রোগই এখন প্রধান। ওষুধ দিয়ে এ-রোগ সারানো যাবে বলে আমার মনে হয় না। আশা করি তোমার বাবা-মা ভালো আছেন এবং রাহুল সমেত তুমি ও মহুয়া ভালো আছ। ইতি –

দাদু

বার্ধক্যের এই অসুস্থতা থেকে যে মুক্তি নেই সেটা বুঝতে পারছিলাম। তবু ডাক্তারিশাস্ত্রের যুক্তি সাজিয়ে চিঠি দিলাম। সান্ত্বনা দিচ্ছি মনে হলে দাদু যে কিরকম বিরক্ত হবেন তা জানি। তাই ভয়ে ভয়ে চিঠি পোস্ট করলাম। জবাব এলো না। ইতিমধ্যে দাদুও দেরাদুন ছেড়ে দিল্লী গেছেন। সম্ভবত

নতুন জায়গায় চিঠি লেখার জন্য তখনো কাউকে পাওয়া যায় নি। বছরের শেষে একটা পোস্টকার্ড পেলাম –

৩৬

[New Delhi]
21. 12. 76

দেবাশিস,

বহুদিন পত্র লেখা হয় নি। শরীরের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করার বা তোমাদের কাছে পরামর্শ চাওয়ারও আর প্রয়োজন দেখি না। কানু একটা ওষুধ পাঠিয়েছে, সেটা খেলাম। সময় থাকলে 'শিল্প-জিজ্ঞাসা' লেখাটি[১] পড়ে আমাকে তোমার মতামত জানালে ভালো হয়। লেখাটি পুস্তকাকারে ছাপা হতে পারে। এই জন্যই লেখাটি একটু ঘষামাজা করার ইচ্ছে আছে। তোমাদের মতামত পেলে এই কাজে সুবিধে হয়. যে দু-একজন আমার লেখা মন দিয়ে পড়েন, তাঁদের কারুরই সময় নেই। তোমারো হয়ত সময় নেই। Family Planning এর programme speed-up করার জন্য যে চেষ্টা চলছে, তার খবর Radio ও কাগজে পাই। কাজেই আমার অনুরোধ রক্ষা করতে না পারলে বিস্মিত হব না। নতুন কোনো লেখা বোধহয় আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। গুরুতর বিষয় নিয়ে চিন্তা করার শক্তিও যেন কমে আসছে। এ বিষয়ে কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ মানসিক ব্যাধির বোধহয় কোনো প্রতিকার নেই। দিল্লীর ডাক্তারদের বিধিব্যবস্থা, pathological test-এর খবর শুনে অসুস্থ হতেও ভয় হয়। আশা করি তোমার বাবা-মা, তুমি, মহুয়া ও রাহুল ভালো আছ। ইতি --

দাদু

১ 'শিল্প-জিজ্ঞাসা', এক্ষণ ১-২ সংখ্যা ১৩৮৩ ও শারদীয় ১৩৮৩।

'শিল্প-জিজ্ঞাসা'র ভাবনাচিন্তার সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। দাদু বলতেন, 'আধুনিক শিল্পের দু'টো বড় অবদান Tension আর Texture নিয়ে চিন্তা।' ছোট ছোট কথায় তিনি যা প্রায়ই বলতেন, সেই সব কথা যখন সবিস্তারে লেখা হয়, তার আবেদন আলাদা। কিন্তু লেখা যতই ভালো লাগুক, মতান্তর কিছু থেকে যায়। তাই লিখলাম, 'Socialist দেশের শিল্প সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তা বাস্তব সত্য। দর্শনের সমাজবাদ বাস্তবে আজও অনেক অসৎ, সংকীর্ণ। কিন্তু "তন্ত্র-আর্ট" চর্চার পেছনে সমকালীন যে সুবিধাবাদ, বিদেশীদের আকর্ষণ করায় ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেটা উল্লেখ না ক'রে আপনি তাদের জাতে তুলেছেন।'

২ রা জানুয়ারি ভোরবেলা দিল্লীর নতুন বাড়িতে দাদু পড়ে যান এবং বেশ আঘাত পান। পাঁজরের দু'টি হাড় ভেঙে যায়। শয্যাশায়ী অবস্থায় আমায় একটা পোস্টকার্ড পাঠান—

৩৭

[নয়া দিল্লি]
13. 1. 77

দেবাশিস,

…বসে কিছু করবার শক্তি অর্জন করি নি, অবশ্য Fracture সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। বাঁকুড়ার টেরাকোটা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ, সে সম্বন্ধে ধীরেন আমায় জানিয়েছে। ঐ লেখা ছাপানো বোধহয় সহজেই হতে পারে। যদি ছাপানো হয়, copy পাঠাবে। কানু আমার অসুখের খবর করেছে। লিখেছে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব। এতই ব্যস্ত তুমি। Serious লেখা বোধ হয় আর লিখতে পারব না। নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে tape-এ কিছু বলে যাই মাঝে মাঝে আর মহাভারত পড়ি। 'শিল্প-জিজ্ঞাসা' লিখে মনে বেশ শান্তি পেয়েছি। যারা নেই তাদের কথা বার বার মনে পড়ে। এই মানসিক অবস্থাতেই বোধহয় লোকে autobiography লেখে। আশা করি সকলে ভালো আছ। ইতি—

দাদু

অন্ধত্বের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন রোগযন্ত্রণা ও জরা যখন শরীরকে কাবু ক'রে ফেলছে, ভারাক্রান্ত মন যখন অতীত স্মৃতিচারণে মগ্ন, তখনো তিনি এই স্মৃতিচারণকে কিভাবে শিল্পসম্মত রূপে ধরা যায়, সে কথা ভাবতে ভোলেন নি। একেই হয়ত বলে artistic passion। আমি তখন কল্পনাও করতে পারি নি যে তিনি সত্যিই নিজের শৈল্পিক আত্মকথা লেখার জন্য মনকে গুছিয়ে নিচ্ছেন। তাই আশ্চর্য হলাম যখন দাদুর পরের পোস্টকার্ডটি আমার নামে নামে না এসে মা-র নামে এলো—

৩৮

17. 2. 77

টুনটুনি,

পাকশীর কথা কি তোমার মনে আছে? পাকশীতে যখন ছিলে তখন তুমি ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াতে বেশ মনে আছে। কানুর বোধ হয় পাকশীতেই জন্ম। কাজেই কোন সালে আমরা সব পাকশীতে ছিলাম, সেই তারিখটা

আমার বিশেষ দরকার। এখনকার বয়স, তখনকার বয়স হিসেব করলেই বছর পাওয়া যাবে। আশা কলকাতায় আছে কি পাটনায় আছে জানি না। তাই ওকে লিখলাম না। কিন্তু তুমি এই চিঠির জবাব দিতে ভুলবেও না, দেরিও করবে না। আমি একটা স্মৃতিকথা বা আত্মচরিত লিখছি, সেইজন্য এই তারিখ আমার বিশেষ দরকার। সন তারিখ আমার কিছুই মনে নেই। তোমাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে আরো কতকগুলো প্রয়োজনীয় তারিখের তালিকা পাঠাব। কে এই কাজ করতে পারবে? তুমি, কানু অথবা আশা?···আশা করি রাহুলকে নিয়ে বনবিহারী ও তোমার দিন ভালোই কাটছে। আমি এখানে বসে ছেলেবয়সের কথা ভাবছি আর কিছু কিছু লিখছি। মেজ বৌদির কাছে অ-আ-ক-খ, A-B-C-D শিখেছিলাম। সেই দিনের কথা মনে পড়ছে। আর সেই মেজবৌদি ময়মনসিংহতে বাংলায় একটা চিঠি লিখে দিতে বলেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি লিখছ না কেন? মেজবৌদি বলেছিলেন, 'লেখাপড়া ছেলেদের কাজ, তুই-ই চিঠি লিখে দে।' যাক এসব কথা। তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছাপূরণ হবে না। তবু বসে বসে ভাবি আগের দিনের কথা। আশা করি ভালো আছ। বনবিহারী ও তুমি আমার ভালোবাসা জানবে। তোমার পুত্র, পুত্রবধূ নাতি সবাইকে আমার ভালোবাসা জানালাম। ইতি—

কাকা

পরের চিঠিও যাকে—

৩৯

[New Delhi]
3. 3. 77

টুনটুনি,

···সবই তোমার চিঠিতে পাওয়া গেল। পাকশীতে ছোট্টু জন্মেছিল, সেকথা আমার মনে ছিল না। পাকশীর অনেক কথাই আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। যাই হোক আশা-ছোট্টুকে একটা চিঠি লিখব। কারণ আমার আরো কিছু খবর দরকার। মেজদার সঙ্গে গোদাবাড়ীতে বাস—বেশ সুন্দর ক'রে লিখলাম। মেজবৌদির কথা আমাদের বাড়িতে বড় শোনা যায় না। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে মেজবৌদির কাছে আমি বাংলা প্রথমভাগ এবং ইংরেজি A-B-C-D শিখেছিলাম। তবে কানু-ছোট্টু কেউ-ই চিঠির জবাব দিতে অভ্যস্ত নয়। আশাকে লিখব, কারণ আশাকে লিখলে জবাব পাওয়া যায়। পুরনো দিনের কথা খুবই মনে পড়ে। কারণ আর কিছু করবার নেই

কিনা।···নির্মলেন্দু ও শীলার সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত চিঠিপত্র চলত। তাদের ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছি না। সুযোগমতো তাদের ঠিকানা Pin No. সমেত আমাকে পাঠিয়ে দিও। এখন বোধহয় দুলালের কাজকর্ম কম। ছবি আঁকবার সময় নিশ্চয়ই পেয়েছে। তোমরা সকলে আমার যথাযথ সম্ভাষণ গ্রহণ কর। ইতি—

কাকা

মা কে লেখা আরেকটি চিঠি—

৪•

[New Delhi]
29. 3. 77

টুনটুনি,

চিঠি পেলাম। কতকগুলি প্রয়োজনীয় খবরও পেলাম। ছোট্ট পকেটে ক'রে গুবরে পোকা রাখত এইটে আমার মনে পড়ছে। আর বাকিটা blank। বাবার মৃত্যু বর্ষাকালে, তা মনে আছে। কারণ ভিজতে ভিজতে আমি বোলপুর থেকে কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমার মা-র মৃত্যু বোধহয় 1919-এর পূজোর কাছাকাছি বা পুজোর পরে। ছেলেবয়সের কলকাতা, নানারকম ফেরিওয়ালাদের হাঁক—টাকায় তিনখানা কাপড়, দুপুরবেলা বাড়ির মেয়েরা গামছা কিনছে, চুড়ি পড়ছে, এইসব মনে করতে বেশ লাগে। তোমাদের কাছে কয়দিন কাটাতে পারলে পুরনো দিনের গল্প ক'রে বোধহয় সময় বেশ ভালোই কাটত। আসল কথা কাজের কাজ আর কিছুই করার শক্তি নেই। তাই বাজে কথা, বাজে ভাবনা নিয়ে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। দুলাল অবশ্য মাঝে মাঝে লেখে যে বয়স যতই হোক, শরীর যতই খারাপ হোক, তবু চিন্তা করার শক্তি চলে যায় না। কিন্তু তার উপদেশে আমার কোনো কাজ হল না।···আমার শরীর খারাপ থেকে আরো খারাপ হয়ে আসছে। বাথরুমে যাওয়া, স্নান করা এসবের জন্য যেটুকু হাঁটতে নড়তে হয়, সেটুকুও ভালো ক'রে পারছি না। ভাবছি কোন রোগে যাব? কানুর ওষুধও খেলাম। কিন্তু এখনো ভালোমন্দ কিছু বুঝছি না। সুস্থ লোকদের অসুস্থ করার শক্তি ডাক্তার-দের আছে, কিন্তু অসুস্থ লোকদের সুস্থ করার কোনো পথ তো তারা দেখাতে পারছে না। আমার ডাক্তার কেবলই বলছেন, 'সাবধান আর পড়ে যেও না। পড়ে গেলে সমূহ বিপদ, বিছানা থেকে আর উঠতে পারবে না।' কিন্তু পড়ে না যাওয়ার উপায় কি, তার কোনো হদিশ তারা দিতে পারে না। লীলাকে তোমার কতটা মনে আছে জানি না। সেও আজকাল আগের মতো সুস্থ নয়।

মেয়ে ভালোই আছে। কিন্তু সে নিজের কাজকর্ম নিয়ে এতই ব্যস্ত যে তার সঙ্গে দেখা হওয়া দুরূহ। লীলা বই পড়ে Bio-chemic ওষুধ খাওয়ায় আমাকে, আর নিজে খায়। এই ক'রে মোটামুটি দিন কাটে। ভাগ্যক্রমে চমৎকার একটি গাড়োয়ালি ছেলে পেয়েছি। সে অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের দেখাশোনা করে, রান্না করে এবং আমার চেঁচামেচিও সহ্য করে। এই হল আমাদের খবর। কানু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে জেনে খুবই আনন্দ হল। আমি ভুক্ত-ভোগী কিনা তাই চোখ operation সম্বন্ধে আমার বিশেষ উদ্বেগ ছিল। আমাদের পরিচিত একজন বারো বছরের ছেলেকে চোখ অপারেশন করল (detachment of retina), বলল খুব successful অপারেশন এবং তার কয়েকদিন পরে বলল 'sorry'! চিঠিখানা বেশ লম্বা হয়ে গেল। ভালো করলাম কি মন্দ করলাম জানি না।··· আশা করি বনবিহারী, তুমি, মহুয়া, রাহুল সকলে ভালো আছ। দুলাল নিশ্চয় এতদিনে ওষুধপত্র খেয়ে ভালো হয়ে গেছে।

চিঠির নিচে কোনো সই নেই। ফেলে আসা দিনের স্মৃতি তাঁকে নিশ্চয়ই অন্যমনস্ক করেছিল। যদিও তিনি চাইছিলেন তাঁর সব স্মৃতি, বার্ধক্যের সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে শিল্পসম্মত রূপ দিতে এবং সেইমতো লেখার কাজও শুরু করে-ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এই সময়টায় হয়ত তাঁর চেনা মানুষজনের একটু উষ্ণ সান্নিধ্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সবাই যে যার বৃত্তে বদ্ধ।

পুরনোপন্থীদের প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। অন্যদিকে আমরা যখন কোনো চল্‌তি ধারণাকে সংস্কারের মতো আঁকড়ে ধরতে চাইতাম, তখনো তিনি সে ব্যাপারে আপসহীন ছিলেন। নিজের বোধ-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে প্রাচীন অথবা নব্য কোনো প্রথাকেই তিনি মেনে নেন নি। তাই তাঁর যাত্রাপথে তিনি এত একা, দুঃখ নয় গভীর বোধ ও প্রত্যয়ই তাঁর এই একাকিত্বের সঙ্গী ছিল। এই প্রত্যয়ই তিনি আমাদের অনেকের মধ্যে সংক্রামিত করতে চেয়েছেন।

শারীরিক অসুস্থতা এবং হয়ত বা মৃত্যুভয় দাদুকে ইদানীং শংকিত কর-ছিল। তাই তিনি চাইছিলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতের কাজগুলো সেরে ফেলতে। যেসব কাজ হয়ত আর করা হয়ে উঠবে না। সেসব সম্পর্কেও জানিয়ে যেতে চাইছিলেন। এপ্রিলের শেষে তাঁর এমনি একটা কাজের খসড়া তিনি আমায় পাঠান—

[New Delhi]
26. 4. 77

দুলাল,

অনেকদিন থেকে animal motif সম্বন্ধে লেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে আর হয়ে উঠবে না। তাই তোমাকে উত্তরাধিকারীরূপে আমার সম্পত্তি দান করছি। memory-র উন্নতি তোমরা ক'রে দিতে পারলে না, তাই কতকগুলো অসংলগ্ন ইঙ্গিত দিচ্ছি, জোড়াতাড়া দিয়ে নেবে।

তোমার প্রশ্ন : (১) reference book (২) জন্তুজানোয়ারের ভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, naturalistic, idealistic, symbolic। শিল্পে জীবজন্তুর ভাবপ্রকাশের reference সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলতে পারব না, ফার্গুসন-এর বই থেকে কুমারস্বামী জীবজন্তুর যে অংশটি তাঁর ইতিহাসে উদ্ধার করেছেন, সেটি অবশ্যপাঠ্য। আমি যেভাবে এ-ইতিহাস অনুসন্ধান করেছি, সেটি তোমাকে জানাচ্ছি।

ভারতীয় জীবজন্তু সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে অবশ্যই জাতক বই পড়া দরকার। জাতক পড়লে তুমি বুঝতে পারবে জীবজন্তু সম্বন্ধে তখনকার পর্যবেক্ষণ কত তীক্ষ্ণ ছিল এবং তাদের Psychology কত গভীরভাবে তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন। মহেঞ্জোদারোর সীলের ওপর যে জীবজন্তুর ছবি পাওয়া যায় সেইগুলি ভারত-শিল্পে স্থায়ী হয়েছে। ভরুতে এসব জীবজন্তুর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তারপরেই মমল্লপুরম্। এইবার যেসব জিবজন্তু শিল্পের ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা—হাতি (realistic, symbolic ইত্যাদি সকল শ্রেণীর form এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।) ভাজা cave-এর হাতি একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম, অবশ্যই লক্ষ করবে। বৃষ—মৌর্য থেকে শুরু ক'রে সকল সময়েই চিত্রে ও মূর্তিতে ভারতের সর্বত্র লক্ষ করা যাবে। বানর—বুদ্ধের জীবনকাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত (বৌদ্ধশিল্প দ্রষ্টব্য।) (বৌদ্ধ-প্রভাবান্বিত জীবজন্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে—'ভরুত', দু'খণ্ড, গ্রন্থকার : বেণীমাধব বড়ুয়া। সাঁচী—Publication by Bhopal Archaeological Deparment এবং মহেঞ্জোদারো—দ্বিতীয় খণ্ড, সার জন মার্শাল)। সিংহ, বাঘ ইত্যাদি অত্যন্ত হিংস্র জন্তুর মূর্তিমান রূপ ভারতীয় শিল্পে খুব প্রাধান্য পেয়েছে বলতে পারি না। কোনারক মন্দিরের নিচের অংশে বহুরকমের জানোয়ার আছে (জিরাফ ইত্যাদি), সেগুলি অন্য কোথাও আছে বলে জানি না। কোনারক সম্বন্ধে একটা বাংলা বই আছে। (লেখকের নাম মনে নেই।) সেই বই-এ এসব জীবজন্তুর সম্পূর্ণ বিবরণ আছে, নির্মলবাবুর [নির্মল-

কুমার বসু] বইয়েও এসব জীবজন্তুর বিবরণ আছে। কুমির, কচ্ছপ এগুলি সবই symbolic। মোট কথা, 'জাতক' গ্রন্থে এবং বৌদ্ধশিল্পে যেগুলি ছিল স্বাভাবিক, সেইগুলি দেবদেবীর বাহনরূপে যখন আত্মপ্রকাশ করল, তখন সেগুলি হল symbolic। শৈবধর্মের মতো বৈষ্ণবধর্ম যে animal motif-কে খুব প্রাণবন্ত করেছে বলে মনে হয় না। আমি যা লিখব ভেবেছিলাম তা হল –

প্রাচীন কথাসাহিত্যে জীবজন্তু যেন চলে মানুষের আত্মীয়রূপে। কথাবার্তা, expression এগুলির মধ্যে অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ,জৈন শিল্পে এগুলি হল নৈতিক symbol – যদিও form-এর দিক দিয়ে জীবজন্তুর reality নষ্ট করা হয় নি, শৈবধর্মাশ্রিত জীবজন্তুদের স্বাভাবিকতা আরো স্পষ্ট (naturalism নয় । এই প্রসঙ্গে মমল্লপুরমের হরিণ, বানর-দম্পতি, মঙ্গাবতনের হাতি,বৃষ ইত্যাদি লক্ষ করা দরকার। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দেবদেবীর বাহন মকর, কচ্ছপ ময়ূর,হাঁস, তোতা, নাগ ইত্যাদি symbolic। তাৎপর্য তুমি ধীরেনের কাছে জেনে নিতে পার। এ বিষয়ে বইও আছে যথেষ্ট। তন্ত্রের প্রভাবে আরো অনেকগুলি জীবজন্তু বিশদভাবে চিত্রে পাওয়া যাবে। সাধনার বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে এইসব জীবজন্তুর Psychological relation জানতে পারলে ভালো হয়। আর একটি কথা – চীন, জাপান, মেসোপটেমিয়া,ব্যাবিলন, ইজিপ্ট ইত্যাদি দেশের প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং কতকগুলি জীবজন্তু প্রায় সকল স্থানেই প্রাধান্য পেয়েছে ; কতকস্থানে পায় নি। চীন – গণ্ডার, পেঁচা, কচ্ছপ, সাপ ইত্যাদি জীবজন্তুর প্রভাব প্রায় চিরস্থায়ী (Art and Architecture of Ancient China, Pelican Art Book Series, গ্রন্থকারের নাম মনে নেই)। Art and Architecture of Ancient Orient by Frankfort [?], Pelican Art Book Series, অবশ্যপাঠ্য। এই বইখানি তথ্যের খনি বলতে পার। আরেকটি কথা – সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে কেন animal motif পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে গেল, সে বিষয়ে চিন্তা করলে তুমি পুরনো দিনের artist দের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে পার। আরো কিছু বলবার আছে। পরে দেখা যাবে। আশা করি সকলে ভালো আছ। ইতি –

দাদু

ইনল্যাণ্ড চিঠিটির শেষে সই করার মতো জায়গাও ছিল না। তাই সই করতে হয়েছে চিঠির প্রথম পাতায়। স্থানাভাবে যা বাদ গেল, তা চিরকালের জন্যই বাদ হয়ে গেল। এই গবেষণার উত্তরাধিকার পাবার যোগ্য আমি নই। যারা আজ শিল্পবিষয়ে নানা গবেণায় রত, তাদের চিন্তায় যদি এই চিঠিটি কোনো প্রেরণা যোগায়, তাদের কাজে যদি এটুকু তথ্য কোনো সহায়তা করে, তাহলেই

নিশ্চয় দাদুর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে। এই বিষয় নিয়ে মাস দুই-এর মধ্যে দাদু আরেক বার আমাকে একটা পোস্টকার্ড পাঠান –

৪২

3. 6. 77

দুলাল,

Animal motif সম্বন্ধে যা লিখেছ তা ঠিক। বই দেখা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আমার করবার আর কিছু নেই, তাই উত্তরাধিকারসূত্রে তোমাকে আমার research paper-এর খসড়া দিয়ে দিয়েছি। বইপড়া বিদ্যা আমার বেশি নেই। museum, বই এবং ছবি ইত্যাদি দেখেই আমি শিখেছিলাম এবং সবসময়ই যতদূর পেরেছি অন্যযুগের বা অন্যদেশের জিনিসের সঙ্গে তুলনা করেছি। মহেঞ্জোদারো থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত হাতির form ইত্যাদি বলতে পারব, কিন্তু date অনুযায়ী হয়ত সাজাতে পারব না, আগে-পিছে ক'রে হয়ত বোঝাতে পারব। মহাভারতে বিভিন্ন জাতের ঘোড়ার বেশ detail বর্ণনা আছে। স্বৈরিণী বেশে দ্রৌপদী বিরাট সভায় চলেছেন কাশ্মিরি তুরঙ্গির গতিতে। পার্সিয়ান ঘোড়ার সঙ্গে এখানে তুলনা করা হয় নি, যদিও পারস্যের ঘোড়ার বহুরকমের বর্ণনা আছে মহাভারতে।) সময়মতো বাঘ সম্বন্ধে তোমাকে আরেকটু জানাবার চেষ্টা করব। Anatomy সম্বন্ধে আমার note অনুযায়ী বা অন্যভাবে কিছু কাজ করার চেষ্টা কর। Natural animal form কীভাবে symbol-এ পরিণত হল সে-বিষয়ে বোধহয় তোমাকে একবার লিখেছিলাম। আপাতত তুমি বিষ্ণুপুরের animal সম্বন্ধে লেখা শেষ ক'রে ছাপিয়ে ফেল।

দাদু

দাদুর আশাপূরণ করতে পারি নি। কিন্তু এই চিঠি দু'টি পড়ার পর বিষ্ণুপুরের মন্দির আবার নতুন ক'রে দেখতে হয়েছে। মন্দিরের নিচের দিকে পাড়ের মতো বেড় দিয়ে আছে এইসব জীবজন্তু আর সাধারণ মানুষের ছবি। সমাজজীবনের সহজ, সুন্দর চিত্ররূপ দেখে আবার প্রশ্ন করি তাহলে social realism নিয়ে শিল্পচর্চায় আপনার আপত্তি কোথায়? প্রশ্ন শুনে দাদু লিখলেন –

৪৩

30. 7. 77

দুলাল,

আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী এই বাঘের ছবি সম্ভবত expressionism-এর পর্যায়ে পড়ে না। অতি-আধুনিক neo-expressionism অথবা abstract

expressionism—এসবের সঙ্গে মিল আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। Sensual তো বটেই।…যতদূর মনে পড়ে'Art and Society' by Herbert Read-এর লেখা বইয়ে তোমার প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। বহু উত্তম ছবি দেখিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্য বুঝিয়েছেন। Social interpretation of art আমার subject নয়। সমাজের সঙ্গে আর্টের গভীর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ যখন অগভীর হয় (skin-deep) তখন তার নাম হয় Social-realism (Stalin যুগের Russian Painting)। বাংলার folk-art সম্বন্ধে একজন বেশ ভালো কাজ করছে ; সে এখন কোথায় জানি না। যে ফরাসি ভদ্রমহিলার কথা তুমি বলেছ তার নাম আমি শুনি নি। তুমি যে সব খবর চাইছ, সে বোধহয় অভিজ্ঞ anthropologist-দের কাছে পাওয়া যাবে। তোমার প্রশ্নের উত্তর এইখানেই শেষ করি। নতুন medium কাজের চেহারা বদলে দেয়। একথা খুবই সত্যি।…

দাদু

কলকাতায় ফিরে আসার পর আমি 'সোসাইটি অফ ওয়ার্কিং আর্টিস্ট' গ্রুপের সদস্য হয়েছি। নানা স্ববিরোধী চিন্তাভাবনার আবর্তের মধ্যে মন পাক খাচ্ছে। পুজোর শেষে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে দাদুকে যে চিঠি দিয়েছি, তাতে আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথাও ছিল। উত্তর এলো মাসখানেক বাদে—

৪৪

7. 11. 77

দেবাশিস,

দীর্ঘকাল পরে তোমার পত্র পেলাম। এই পত্রের উত্তর দিতে হলে অনেক-কথা ভাবতে হয়। সেই জন্য কিছু সময় দরকার। আপাতত বলতে পারি যে intellect ও intuition তথা subjective / objective-এর দ্বন্দ্ব চলেছে। পদে পদে analyse যদি কেউ করে, তবে সে ছবি আঁকতে পারে না। emotional release—আর্টের অন্যতম সংজ্ঞা। Creative work করার জন্য যা দরকার সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়, তৎসত্ত্বেও সেগুলি মিথ্যা নয়। সে হল সত্যের আরেক দিক—another aspect। যাই হোক, ভেবেচিন্তে পরে বিস্তারিত জবাব দেবার চেষ্টা করব। 'এক্ষণ' পত্রিকার পুজাসংখ্যায় যে লেখাটি বেরিয়েছে, সেটি প্রবন্ধ নয়। এ একরকমের আত্মকথা[১]। প্রথম অংশটি তোমার মা-কে পড়তে দিতে পার। কারণ ঐ অংশে কিছু কিছু কথা আছে যা তার হয়ত মনে পড়বে। বাকি অংশ তারপরে পড়ার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। এই লেখাতেও কিছু

art-এর কথা আছে।

আমার শরীর যে আর ভালো হবে না, এই খবরটি শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পেরে স্বস্তিতে আছি। আশা করি ভালো আছ।

দাদু

১ 'চিত্রকর', এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮৪।

বিচার-বিশ্লেষণের ঝোঁককে (analysis) যখন দাদু কড়াভাষায় সমালোচনা করলেন, তখন আমার মনও রুখে দাঁড়ালো। যুক্তি দিয়ে আঁকি বা না-আঁকি, যুক্তি-বিচার করেই তো চলি। মানুষ আমি আর শিল্পী আমি কি তবে আলাদা? আমার প্রতিটি দিন, সকাল থেকে সন্ধে, যে যুক্তিতে আমি বাঁচি, তাকে ত্যাগ ক'রে ছবিতে কি আমি অন্য কোনো নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করব ? যুগ পালটাচ্ছে, জীবনধারা নতুন বাঁক নিয়েছে, আর শিল্পীর মানসিকতা পালটাবে না ? তাহলে জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগ কোথায় ? এসব নানা প্রশ্ন সাজিয়ে আমার প্রতিবাদ-লিপি পাঠালাম। এবার দাদু আমার চিঠি থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে যে চিঠিটি লেখেন সেটিই সম্ভবত তাঁর আমায় লেখা দীর্ঘতম চিঠি।

৪৫

১০. ১. ৭৮

দুলাল,

শরীর ভালো থাক বা না থাক তোমার এবারকার প্রশ্নের জবাব দেবার মতো কিছু আছে বলেই লিখতে বসলাম।

শিল্পীর জীবনে সামঞ্জস্য সব সময় আসে না। কেন আসে না, সে অন্য কথা। তুমি যে জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যের কথা লিখেছ, এসবের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হলে বেশ বড় রকমের intellectual grasp দরকার। এই grasp না থাকলেও ছবি বা কবিতা ভালোই লেখা যায়। Tolstoy, Turgenev উভয়ের মধ্যে তুলনা করলে বুঝতে পারবে আমার কথার তাৎপর্য। গেটে, রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই জীবন (সমাজ ইত্যাদি) বুঝেছিলেন। বোঝবার ভঙ্গি আলাদা হতে পারে। মাইকেল এঞ্জেলো, বা লিয়োনার্দোর মতো intellectual grasp টিশিয়ানের ছিল না। তা বলে টিশিয়ান কিছু ছোট আর্টিস্ট নয়। আমার ধারণা এ একধরনের mental method লেখাপড়া করিয়ে অনেকটা মার্জিত করা যায়। কিন্তু ঠিক কিরকম হয়, এখনই দৃষ্টান্ত দিতে পারছি না।

'সুস্থির চিত্তের পেছনে অস্থির মননের অস্তিত্ব অস্বস্তিকর হলেও অস্বীকার

করার উপায় নেই…'। আপাত স্থির এবং অন্তরালে অস্থির এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্যই যোগসাধনার বিধান শাস্ত্রকাররা দিয়েছেন। ছবি আঁকাও একধরনের যোগসাধনা। ছবি আঁকার সময়, লেখার সময় বা হৃদযন্ত্রের অবস্থা পরীক্ষা করার সময় মুহূর্তের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিতে হয় এ কথা তো তুমি বিশ্বাস কর এবং অনুরূপ অভিজ্ঞতাও তোমার আছে। কাজের interest মানুষকে অনেক সংঘাত থেকে রক্ষা করে। interest যত গভীর হয়, তত তার স্থায়িত্ব। কিন্তু তবু সংঘাত আছেই।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রেরণা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ, সেই কথাই আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললাম।

'শিল্পের জন্য যুক্তি আদর্শ এসবের আবশ্যিকতা না থাকলেও শিল্পীর জন্য তো আছে…'—এই প্রশ্নের উত্তর: হিটলারের যুগে একজন জার্মান আর্টিস্টকে একজন বড় critic জিজ্ঞাসা করেছেন যে হিটলারের সম্বন্ধে আর্টিস্টের কি মত? আর্টিস্ট বলেছিলেন, হিটলারের political মত কি, তা আমি জানতে চাই না—হিটলার কে, তাকেও আমি care করি না। আমার একমাত্র problem—glass factory-গুলি হিটলার রাখবেন, না বিনাশ ক'রে ফেলবেন। আধুনিক কালের ইনি একজন বিখ্যাত glass-designer। বলতে পার এ একরকম অন্ধের মতো সংসারে চলা। তবু এই উক্তিতেও যুক্তি একেবারে নেই তা নয়। অবশ্য তুমি আমি এবং আরো অনেকে এরকম মনোভাব নিয়ে বেশিক্ষণ চলতে পারব না।

Highly organized society-তে এরকম মনোভাব রাখা বোধহয় কঠিন। creative mind, creative intellect—এইরকম কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন। এই creative mind যে logic-কে অনুসরণ ক'রে চলে, সেই logic দিয়ে ব্যবসা করা চলে না। বিড়লা, হেনরি ফোর্ড প্রতিভাবান ব্যক্তি। কিন্তু তাঁদের বুদ্ধি, তাঁদের বিচার দিয়ে তুমি ছবি আঁকতে পারছ না, এই হল সমস্যা। তুমি যে এত যুক্তির পথে চিন্তা করছ, এইটাও একরকমের creation—এতে তুমি আনন্দ পাও। তাই এতে তুমি সময় নষ্ট করছ। যখন ছবি আঁকো একরকম মন নিয়ে। তারপর সেই চিত্রকরকে অনুসন্ধান কর বিচারের পথে। আবার অনুসন্ধানের পথে যে তথ্য পাও সেই তথ্য চিত্রের জগতে প্রয়োগ করার চেষ্টা কর। কেবল তুমি যে এই কাজ কর তা নয়, অনেকেই ক'রে থাকেন। ক্রমে একটা প্রধান হয়ে ওঠে, তখন অন্যদিকটাকে সে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এই হল দ্বন্দ্বের একটা কারণ। (এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করার আছে, কিন্তু আপাতত চিঠিতে এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।)

Non-cooperation-এর সময় আমি নির্লজ্জের মতো ছবি এঁকে-

ছিলাম। শুধু তাই নয় যিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে এসেছিলেন, তাঁকে আমি বলেছিলাম, 'যখন আপনি দেশ স্বাধীন ক'রে ফিরে আসবেন,আমাকে এভাবেই কাগজে রং লেপতে দেখবেন।' (এই কথাটা অবশ্য 'চিত্রকর'-এ আমি লিখি নি।) এই বিষয়ে তোমার সিদ্ধান্ত আমি অস্বীকার করি না। আমার কোনো কোনো বন্ধু বলতেন যে আমার intellect নাকি কুয়োর মতন,কেবল খুঁড়ে খুঁড়ে ভেতর দিকেই চলি, বিস্তার চাই না। কথাটা কিন্তু ১৬ আনা ঠিক নয়। তোমাকে বলতে বাধা নেই যে আমি যথেষ্ট লেখাপড়া করেছি। তবে সব সময়ই আমি যা পড়তাম, সেটাকে art-এর term-এ বুঝবার চেষ্টা করতাম। (কথাটা কিন্তু এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়।) তাই অনেক বই পুরো পড়া হয় নি আমার। Emerson-এর একটা বই পড়ছিলাম, তাতে লেখা ছিল, মানুষ সাতদিন silence observe করার পর একদিন কাজ করার মতন সে-ক্ষমতা অর্জন করে (intellectual aesthetic)। আমি দেখলাম কথাটা খাঁটি সত্য, art-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারপর আমি আর Emerson বেশি পড়ি নি। গীতা, চণ্ডী, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণের জীবনী ও বাণী, অরবিন্দ সব জায়গা থেকে গুটিপোকার মতো কেবল আহরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম। তোমাকে এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য যে আমার মধ্যে বালককাল থেকেই এক রাস্তায় চলার ঝোঁক ছিল (হয়ত আমার সঙ্গীহীন যৌবন, বাল্যকাল, হয়ত চোখ খারাপ হওয়ার দরুণ বেশি হুড়োহুড়ি করতে পারি নি বলেই এরকম ধারণা হয়েছে।) ছেলেবয়স থেকেই আমি introvert।

অন্ধ হওয়ার পরেও এই মনোভাব আমার যায় নি। সেইজন্যই আমি পাগল হই নি, দুলাল! সংসারের ঝুঁকি অনেকখানি আমার স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। আমি খুব গর্বিতও ছিলাম। একবার নন্দবাবু এবং আমার সতীর্থরা আমাকে বলেছিলেন যে Chinese এবং Western Landscape-এর যে tradition তার সমকক্ষ তুমি কী ক'রে হবে? ভারতবর্ষে তো Landscape-এর কোনো tradition নেই। শুনলে তুমি বিস্মিত হবে যে তাঁদের মুখের ওপর আমি সেদিন বলেছিলাম যে, কেন, আমি tradition তৈরি ক'রে যাব। (একথা অত্যন্ত personal, বাইরে প্রকাশ করার জন্য নয়।)

মানুষের একটা confidence থাকে। তুমিও জান তুমি কি পার, কি তুমি পার না। আরো আমার সৌভাগ্য আমার এই আত্মপ্রত্যয় আমাকে দাম্ভিক ক'রে তোলে নি। তোমার এবারকার প্রশ্ন খুব relevant, তাই তোমাকে এত কথা লিখলাম। এ বিষয়ে আরো আলোচনা করতেও আমার আপত্তি নেই।

নন্দলাল, অসিতকুমার সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি আর তুমি যা ভেবেছ তা ঠিক – আর আমার এ confession তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবে। তাই আলাদা ক'রে আর কিছু লিখলাম না।

আমাদের তুমুল আন্দোলনের যুগে কি ক'রে আত্মস্থ রইলাম, তার সঠিক জবাব দিতে পারি না। তবে ব্যাপারটা ঢেঁকি গেলার মতো নয়। আবার একদল যারা থলে কাঁধে non-cooperation করতে বেরিয়ে গিয়েছিল তারা আমাদের মনোভাবকে বিদ্রূপই করেছে। প্রথমত শান্তি-নিকেতনে সাধনার উপযুক্ত অনেক মানুষ ছিলেন। রোজ দেখতাম, হরিবাবু[১] একাগ্রচিত্তে Dictionary লিখে চলেছেন। জল, ঝড় কিছুই তাঁকে বাধা দেয় নি। আর আমি ছবি আঁকাকে যৎকিঞ্চিৎ বলে মনে করি নি। আমি 'নাইট স্কুলে' সাঁওতালদের পড়িয়েছি, যতগুলো চাকর রেখেছি, প্রত্যেককে পড়াশোনা শিখিয়েছি এবং তারা যেন বাসন মাজার চেয়ে ভালো কাজ করতে পারে তার চেষ্টাও করেছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলও হয়েছি। যেসব ছাত্ররা পড়াশোনা করতে পারছে না, তাদের অর্থসাহায্য ক'রে তাদের শিক্ষিত ক'রে তুলেছি। এই হল আমার social activity। এ সব কথা কোথাও কখনো ভ্রূণাক্ষরেও প্রকাশ করবে না।

শেষ কথা – 'শিল্প-জিজ্ঞাসা'ই হল আমার সত্যকারের আত্মকথা। যা আমি জেনেছি, তাই লিখেছি। ভুল হল কি ঠিক হল, জানি না।

তোমার মা আমার লেখা পড়ল ? পাকশী পর্যন্ত তার interst লাগতে পারে।

সম্ভবত একটা বড় লেখায় হাত দেব। শিল্পের বিষয় নিয়ে এই আলোচনা বেশ একটু বিস্তৃত হবারই সম্ভাবনা। এবার ভেবেচিন্তে যথেচ্ছ প্রশ্ন তৈরি কর। ডাক্তারের কথায় স্বস্তি পেলাম। তিনি বলেন যে তিনি আমায় ভালো করবার চেষ্টা করছেন না, যাতে আমার deterioration abrupt না হয় তারই চেষ্টা করছেন। আশা করি ভালোই আছ।

দাদু

১ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক সময়ে যা 'ভ্রূণাক্ষরে'ও প্রকাশ করার অধিকার তিনি দেন নি, তাই আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ না করলে যে অনেকটাই ফাঁক থেকে যায়। শিল্পী বিনোদবিহারী মানুষ বিনোদবিহারী সম্পর্কে কৌতূহল কখনো পছন্দ করতেন না। কিন্তু শিল্প ও জীবনের যোগ কতটা এবং কেমনতর, সেকথা তাঁর তত্ত্বকথা শুনে যত না বুঝেছি, এই ছোট ছোট জীবনকথা জেনে তার থেকে অনেক সহজে হৃদয়ঙ্গম করেছি। সকলের না হোক শিল্পীসমাজের অনেকের জীবনেই

এই দলিলটি সহায়ক হবে। এই বিশ্বাসে দাদুর নিষেধ না মেনে আজ তাঁর চিঠিটি খুলে ধরলাম।

আমি সবে মনোযোগ নিয়ে পড়াশোনার জন্য স্নাতোকত্তর কোর্সে ভর্তি হয়েছি। শুরু হয়েছে এক নতুন অধ্যায়। পাশাপাশি কলকাতায় ফিরে আসায় আবার নানা শিল্পী ও বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শে আসছি। ইণ্ডিয়ান আর্টের স্টাইলে কাজ করেন এমন এক প্রবীণ শিল্পীও আমাকে বিনোদবিহারীর নাতি হিসেবে যথেষ্ট স্নেহ ও সান্নিধ্য দিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে থেকে মনে হল, এ এক অন্য মেরু। মার্কসীয় ভাবাদর্শের মোহ ঘুচেছে. কিন্তু তাই বলে পুরাকল্প আর আধ্যাত্মিক রসে যে মন মজে না সেই অতৃপ্তি নিয়ে দাদুকে সব জানালাম। দাদুর স্পষ্ট জবাব --

৪৬

4. 4. 78

দুলাল,

যে Artist সম্বন্ধে তুমি লিখেছ, তাকে আমিও খুব ভালোবাসি। সে অনেক পরিমাণে অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছে। Intuition-এ আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু Intuition-এ বিশ্বাস করলে যে সমাজকে অস্বীকার করতে হবে এমন কথা নেই। আমি কট্টর modern artist নই। তবে আধুনিক কাল অনেক কিছু আমাকে শিখিয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিতেই আমি অতীতকে দেখেছি। শিল্পশাস্ত্র মিলিয়ে অতীতকে বিচার করি নি। এর সঙ্গে আমার মতভেদ অনেক। তাকে আমি বোঝাবারও চেষ্টা করেছি। সে যা চায় সে হয়ত ভাষায় প্রকাশ করা যায়। কিন্তু রূপের জগতে তার কোনো স্থান নেই। গান্ধিজীর আন্দোলন আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। এই সাহস তিনি অনেকগুলো শিক্ষিত অশিক্ষিত লোককে দিতে পেরেছিলেন (ক্ষণস্থায়ী হলেও . । মানুষের সংকীর্ণ অভ্যাস, কুসংস্কার তাকে আজও ঘিরে রেখেছে। সেই সংস্কারগুলি-কে প্রভাবান্বিত করেছে। আরো অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু সে আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। · মোট কথা artist সম্বন্ধে তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের কোনো বড় বিরোধ নেই। তোমার সমস্যা তুমি নিজেই analyse ক'রে সমাধান করতে পারবে। সমাজ অর্থনীতি আছে, রাজনীতি আছে—দর্শন, ধর্ম, শিল্প, সৌন্দর্য—সবই তো আছে। যদি আমার জীবনে কোনো একটা অংশ প্রধান হয়ে ওঠে, আপত্তি কি ?

সমাজ বাদ দিয়ে মানুষের অগ্রগতি হয় না। কিন্তু সমাজের দাস হয়েও বিশেষ কোনো লাভ হয় কি ? সমকালীন কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ

নিশ্চয়ই ক'রে দেওয়া যায় দিলীপ রায় একবার বার্টাণ্ড রাসেলকে প্রশ্ন করেছিলেন যে দেশের কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন কিনা এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সংগীতকে তিনি দেশের জন্য বর্জন করবেন কিনা। রাসেল উত্তর দিলেন, কেবলমাত্র ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেশের উন্নতি হয় না। দেশকে উন্নত করতে হলে culture-এরও দরকার। তাই রাসেল বলেছিলেন যে তুমি দেশের কাজও কর আর নিজের সাধনাকেও রক্ষা করবার চেষ্টা কর। তারপর রাসেল বলছেন : এই সমস্যার সমাধান তোমাকে নিজেকেই করতে হবে। (দিলীপ রায়ের 'তীর্থঙ্কর' দ্রষ্টব্য)। আমিও তোমাকে বলব : তুমি নিজে যা ভালো বোঝো তাই করবে। তুমি যদি honest ডাক্তার হয়ে থাক, honestly নিজের কাজ ক'রে যাও। ডাক্তারি ক'রে লাখপতি হবার প্রলোভন যদি ত্যাগ করতে পার, তাহলে ডাক্তারি কখনো ছেড়ো না। আর্টের যে inspiration সেটা কখনো নিভে যাবে না। তার বিকাশ হবেই। হতে পারে তুমি বছরে ৫০ খানা ছবি আঁকতে পারবে না। এত ছবি আঁকবারই বা দরকার কি? এটা নিশ্চয় ক'রে জানবে যে তুমি professional artist নও, vocational artist। দু'জনের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি একটা বড় লেখায় হাত দিয়েছি। যদি পারি সেই লেখায় তোমার সমাজ সম্বন্ধে উত্তর দেবার চেষ্টা করব। ইতি –

দাদু

এরপর চৈত্রের শেষে একটা পোস্টকার্ড পেলাম।

৪৭

[New Delhi]
7. 4. 78

দুলাল,

আনন্দবাজার 3rd April এর 'সম্পাদক সমীপেষু' column-এ 'খেলা মেলার ভেলায়' heading-এ একটা খবর বেরিয়েছে। প্রতি বছর কলকাতায় একটা ছবি মূর্তির exibition হয় তা আমি জানতাম। এ বছর এখানেও একটা art fair হল (ললিতকলার পৃষ্ঠপোষকতায়)। কলকাতায় যে ছবির মেলা হচ্ছে সে বিষয়ে যদি পোস্টকার্ডে একটু খবর দাও তো ভালো হয়। প্রগতিবাদীরা করছেন, তা আমি বুঝি। সমাজকে তারা কি বোঝাতে চান তা অবশ্য এখনো ঠিক বুঝছি না। এখানে যে exhibition হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল যে সমস্ত artist-রা hall ভাড়া ক'রে one-man show করতে পারে না। অথবা dealer-এর through-তে ছবি বিক্রি করতে পারে না।

তারা যৎসামান্য খরচা ক'রে exhibition করতে পারবে। এদিক দিয়ে এই fair successful। সময়মতো খবর দিয়ে চিঠি দিও। আশা করি ভালো আছ। ইতি—

দাদু

আমি art fair-এর খবর দিলাম। এও লিখলাম যে আমাদের দিশি প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর চিন্তার কোনো প্রয়োজন বোধহয় নেই। জীবনযাত্রা এখানে বাম ডান দুয়েরই সমান। শিল্পীদের মধ্যে গভীর দার্শনিক অন্বেষণ নিয়ে ক'জন এপথে এসেছে জানি না। তবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর আজ আদর্শ আরো সংকটাপন্ন। দাদুর চিঠি এলো ১২ই মে।

৪৮

10. 5. 78

দুলাল,

তোমার পত্র পেলাম। তোমার অনুমান ঠিক আছে। এখনো তাহলে খুব বেশি সেকেলে হয়ে পড়ি নি। Leftist আন্দোলন (progressive group) যাঁরা শুরু করেছিলেন যথা রথীন মৈত্র (organiser), গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, প্রদোষ দাসগুপ্ত—নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের group ভেঙে যায়। এরকম সকল সময় হয়েছে, আজও হবে, কালও হবে। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর : 'style' 'শৈলী' কথাটির ঠিক অর্থ রীতি। যদিও style-এর পরিবর্তে একথা ব্যবহার হচ্ছে। 'মেজাজ' কথাটি style-এর স্থানে বোধহয় ব্যবহার করা যেতে পারে বলেই মনে করি। এখন coin করার যুগ। অনেক ইংরেজি শব্দেরই প্রতিশব্দ নেই। 'style' এবং 'stylisation' ঠিক এক অর্থে ব্যবহার হয় না, এই আমার ধারণা। এখুনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না। 'composition'-এর ঠিক বাংলা হওয়া উচিত 'বাঁধন' (ভূমিবন্ধন)। আকারের বাঁধন, রঙের বাঁধন, গড়নের বাঁধন, রেখার বাঁধন। (কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঁধুনিও চলবে)। 'দৃশ্যরচনা' কোনোও দিনই আমি লিখব না। 'বুনোট'-এর ইংরেজি texture। আজকাল অভিধানেও এই কথাটি ব্যবহার হয়। 'কাপড়ের বুনোট' ইত্যাদি।···

তোমার চিঠির উত্তর হয়ত খুব বিস্তারিতভাবে দিতে পারলাম না। কিন্তু আমি 'চিত্র-প্রকরণ' সম্বন্ধে একটি বেশ বড় লেখা শুরু করলাম। বিষয়সূচি ক'রে ফেলেছি, কাজেই তোমার প্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্ন থাকলে তালিকা ক'রে পাঠাতে পার।

টুনটুনি বাতে ভুগছে। সহানুভূতিতে বাত সারে না। কাজেই এসব

অবান্তর কথা লিখলাম না। মোটামুটি সকলেই ভালো আছ আশা করি। আমাদের তরফ থেকে নতুন আর কোনো খবর নেই। ইতি – দাদু

নতুন লেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু দিল্লীর পরিবেশ দাদুকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। পরের চিঠি –

৪৯

20. 7. 78
New Delhi

দুলাল,

··আমি technique সম্বন্ধে লিখছি না, লিখবও না। Art-form-এর different element, composition, structure, modelling, dimension, line এইরকম নানা শিল্পের প্রয়োগবিধি বা convention-গুলোই লেখবার ইচ্ছে।···

চিরদিন আমি ছবিই এঁকেছি। কিন্তু আজ আর আমার কিছু মনে থাকে না। আজকাল রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির প্রভাবই বেশি। আমরা শহরের বাইরে থেকে মানুষ হয়েছি। শহরের সমস্যা বোঝবার চেষ্টা করি নি। রবীন্দ্রনাথ culture সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট আধুনিক রেখেছিলেন। কিন্তু Parliament-এ কী হচ্ছে, দেশের black-market-এর পরিধি কতটা, বিশেষজ্ঞরা কি ক'রে রুগীর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান, bed-side doctor হওয়া কতটা নিন্দার বিষয় – এসব জানা ছিল না। বর্তমানের মানুষ যদি হতাম, তাহলে কি করতাম বলতে পারব না। এত কথা জানাচ্ছি এই জন্য যে আমি যদি ছেলেবয়স থেকে এই শহরে থাকতাম তাহলে শিল্পীজীবনে একাগ্রতা থাকত কিনা জানি না।

আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। ইতি –

দাদু

পুনশ্চ – শরীরের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়, এ তো সব ডাক্তারই জানে। বৃদ্ধকালে মানসিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়, তার সবটাই Freudian সংজ্ঞাতে বিচার করা সম্ভব নয়। শরীরের অবস্থা যেমন মনের ওপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করে, তেমন মনের অবস্থা শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে (মাঝে মাঝে)।···

আমরা আধুনিক কিন্তু সাম্প্রতিক পশ্চিমী পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্ভরযোগ্য খবর না রেখেই সহজেই তাকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিকৃত প্রতিফলন বলতে দ্বিধা

করতাম না। Action Painting, Pop Art ইত্যাদি সম্পর্কে এইরকম অতিসরলীকরণকে আরেক ধরনের সংস্কার বলতে দাদু দ্বিধা করেন নি—

৫০

[Postmark ? 28.10.78]

দেবাশিস,

কলকাতা বা শান্তিনিকেতন থেকে চিঠিপত্র আসা যাওয়া বন্ধ ছিল। সেই খবরে আমি এবার আর কাউকে চিঠি লিখি নি। সম্প্রতি ডাক ও রেল চলাচল শুরু হয়েছে, তাই তোমাদের চিঠি পেলাম। আমার বিজয়ার সম্ভাষণ জানবে তোমরা এবং বনবিহারী ও টুনটুনিকে আমার সম্ভাষণ জানাবে। তুমি Art সম্বন্ধে যা লিখেছ তা নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য। এইসব চিন্তার প্রভাব তোমাকে কিন্তু একটু কুসংস্কারগ্রস্ত করতে পারে। তোমার ছবির আকার প্রকার যে বেশ বদলাচ্ছে তা আমি সহজেই অনুমান করতে পারি। সময় সুযোগ মতো তোমার এ চিঠির আমি জবাব দেব।

চিন্তার উজ্জ্বলতা কমে আসছে, তবু কিছু লিখছি। আমার লেখা 'এক্ষণ' পত্রিকায় বেরিয়েছে জানি, কিন্তু এখনো পত্রিকা পাই নি। ভালো মন্দ জানি না, তবে লেখাটা পড়ো[১]। Professional ও Vocational—এই দুই আর্টের যে পার্থক্য চিরকালই স্বীকৃত আজ সেই পার্থক্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিন্তাধারায়, আঙ্গিক, বিষয়, সবেরই পার্থক্য ঘটছে এবং ঘটবে। আমাদের দেশে আধুনিক আর্টের fashion আছে, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যে সাধনা বা পরিশ্রম দরকার, তার দৃষ্টান্ত খুবই কম। এ হল manifesto brand-art !···

দাদু

১ 'কালুডোমের বংশধর', এক্ষণ শারদীয় ১৩৮৫।

বছরের শেষে আমার আগের একটি চিঠির রেশ ধরে দাদু আমাকে একটি সুসংবদ্ধ নির্দেশ দেন—

৫১

[New Delhi]
14. 12. 78

দেবাশিস,

বেশ কিছুদিন আগে তোমার একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। বন্যার সময় লেখা সম্ভবত, সেই চিঠির জবাবে ঠিক এই চিঠি লিখছি না। তবে কতক-

গুলি এমন কথা ছিল, যা মোটামুটি সকল artist-এর মনেই এসেছে বা আসবে। (তুমি technique-এর কথা আর ভেবো না। শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ —আধুনিক বা প্রাচীন—সকল সময়ই বদলাচ্ছে। প্রত্যেক ছবি আমাদের সামনে নতুন সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়। নতুন experience পুরাতন experience-এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত করে artist। এর বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে বলে আমি মনে করি না)।

অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধান (enquiry) তথা বিজ্ঞান: friction-এর ফলে আগুন উৎপন্ন হয়। এ হল বিজ্ঞান। ঐ আগুনে নরম মাটি পুড়িয়ে শক্ত করা যায়, আবার ঐ আগুনে গাছের ডাল ফেলে দিলে পুড়ে ছাই হয়, এ হল অভিজ্ঞতা। আর্ট বিজ্ঞান-বর্জিত নয়, বা enquiry-বর্জিত নয়, কিন্তু experience প্রধান। মানুষ যেদিন প্রথম শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াল, দৌড়ল, সেদিনই সে সমভঙ্গ, আভঙ্গ ভঙ্গি নিজের শরীরের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করল। তারপর কালক্রমে এই অভিজ্ঞতাই শিল্পশাস্ত্রে স্থান পেল। সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ—শ্রেণীভাগ করা হল। তুমি যে বর্ষার দিনে একা ঘরে ছবি এঁকেছিলে—এটা হল experience, ঠিক enquiry নয় (enquiry থেকে ১৬ আনা বিচ্ছিন্নও নয়। তবে ১৫-আনা experience)। অনেক ক্ষেত্রে ১৫-আনা enquiry, ১-আনা experience (প্রায় রেডিয়াম আবিষ্কার)।...

বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্বে ছবি ও মূর্তিতে তথা তাবৎ শিল্পরূপের মধ্যে একটি জীবনপ্রবাহ লক্ষ করা যায়। তাবৎ টেরাকোটা মন্দিরগুলি মনে করলেই তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে। বর্তমানে ঘটনাপ্রবাহ আছে, কিন্তু ঘটনাগুলি জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন (যে কোনো বড় exhibition-এ ঢুকলেই তুমি আমার একথা বিশ্বাস করবে)। তুমি একটু অনুসন্ধান করলেই লক্ষ করবে যে যারা বড় আর্টিস্ট বা আর্ট যখন সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত বা প্রাণবন্ত, তখন technique ঘনঘন বদলায় নি। 'গথিক' আর্টিস্টদের মধ্যে দেখবে যে তারা সারাজীবন একই বিষয় নিয়ে কাজ ক'রে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি বৈচিত্র্যহীন মনে হলেও এসব চিত্রের মধ্যে প্রবাহও আছে, গভীরতাও আছে। আধুনিক কালে বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য যথেষ্ট। বলতে পার, এও তো জীবনপ্রবাহের একটা দিক। তা যদি হয় তবে বলবার বিশেষ কিছু নেই। (দশ হাড়ি জল পাশাপাশি রাখলে জলপ্রবাহের গতি পায় না)। তোমাকে যা লিখছি সে হল বার্ধক্যের চিন্তা। ইতি—

দাদু

১৯৭৯-তে আমার পুত্র চারবছর পূর্ণ করেছে। এক হালফ্যাশানের বসে-আঁকা প্রতিযোগিতায় বসে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সে ব্যাপারটা বিশেষ না বুঝলেও

আমরা খুব খুশি। দাদুকে জানিয়েছি। মার্চের শেষে 'ইনল্যাণ্ড' কাগজে চিঠি এলো—

৫২

[New Delhi]
১৯।৩।৭৯

দুলাল,

অনেকদিন চিঠি লেখা হয় নি। সুসভ্য দিল্লী শহরে বাস ক'রে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি জানি না। বিরুদ্ধ ভোজনের মতো দিল্লীর জীবন আমাকে দিনে দিনে পিষে মারছে। রাস্তার মাঝে মাথা ঘুরে পড়লেও taxi, scooter পাওয়া যাবে না। ২ মাইলের কম distance হলে যাত্রী নেবে না। activities অবশ্য অনেক। exhibition, meeting, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অভিযান ইত্যাদি অনেক চিত্ত-বিনোদনের বিষয় আছে। এইসবের মধ্যে আর্টের স্থান কোথায় তাই ভাবছি।

তোমার ছেলে ছবি এঁকে পুরস্কার পেয়েছে, সবাই অবাক। কেবল সে অবাক হয় নি। এখনকার আর্টিস্টরা নিজেদের ছবি দেখে নিজেরাই অবাক। এ এক উল্টো ব্যাপার। তোমার ছেলে অবাক হল না কেন এবং দিল্লীর আর্টিস্টরা নিজেদের ছবি দেখে অবাক হচ্ছে কেন—এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে লক্ষ করছি যে যারা ছোট ছেলের মতো নিজের ছবি দেখে অবাক হয় না কিন্তু আনন্দিত হয়, তারাই ঠিক আর্টিস্টের ধর্ম পালন করছে। কিন্তু যারা নিজেদের ছবি দেখে অবাক হচ্ছে কিন্তু আনন্দ পাচ্ছে না তারা ঠিক creative artist নয়। তারা ভেল্কি দেখাবার চেষ্টা করছে।

তোমার শেষ চিঠিতে একটা বিশেষ প্রশ্ন ছিল, তার ঠিক জবাব এখনো আমি খুঁজে পাই নি। তবে সমস্যা বোধহয় খুব গুরুতর নয়। কাজ করতে করতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েই যায়। আঙ্গিকের সমস্যা সমাধানের উপায় অভ্যাস। ভাব-সৌন্দর্যের সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায় যুক্তির প্রাধান্য কমানো। বিশ্লেষণ অপেক্ষা অভি-নিবেশ। আর আর্থিক সমস্যার সমাধানের উপায় কি তা এখনো ঠিক করতে পারি নি। ইতিপূর্বে তোমাকে লিখেছিলাম যে মহাভারত আর ভারতশিল্প নিয়ে একটা তুলনামূলক আলোচনা করছি। সেটা প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভারতশিল্প জনতার জন্যই রচিত হয়েছে। গণ-শিল্প ?) শ্রেণীযুদ্ধের কথা নেই, কিন্তু জীবনযুদ্ধের ইতিহাস আছে। ভারতশিল্প নৈরাশ্যবাদী নয়। কিন্তু দুঃখের ছবি আছে। ভারতশিল্পে কাম আছে কিন্তু Pornography নেই।

পদে পদে জন-নেতাদের ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু elemental power মূর্তিমান হয়ে দেখা দেয়। মহাভারতে এইসব বৈশিষ্ট্য বা গুণ প্রকাশ পেয়েছে আকার প্রকার আর ভঙ্গির সাহায্যে। লেখা শেষ হলে 'এক্ষণ' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হবে[১]।

আমার বই এতদিনে ছাপা হয়ে বাজারে বেরিয়েছে[২]। এই বই-এ আজকালকার করা কয়েকটি স্কেচ আছে। এইসব স্কেচ তুমি দেখ নি। কলকাতার একটা কাগজে আমার, রামকিঙ্করবাবুর ও আরেকজন কোন আর্টিস্টের interview বেরিয়েছে। পত্রিকার নাম আমি মনে করতে পারছি না। বাংলাভাষার আধুনিকীকরণ সম্বন্ধে কোনো এক সভা আছে, সেই সভার মুখপত্র হল এই পত্রিকা।...ইতি—দাদু

১ 'মহাভারত ও ভারতশিল্প', এক্ষণ শারদীয় ১৩৮৬।
২ চিত্রকর, অরুণা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯।

'গাঙেয়-পত্র' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৮৫) একটি সাক্ষাৎকার বেরোয়। সম্ভবত এই চিঠিতে তারই উল্লেখ।

জুন মাসের ৩ তারিখ একটা পোস্টকার্ড এলো। আমার ছেলে রাহুলের জন্য এক পিঠে বাড়ি, গাছ আর মানুষ আঁকা। [এই লেখার প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে।—সম্পাদক] পেছনে দাদুর হাতে লেখা একটা লাইন। সম্ভবত লেখা—'রাহুল তোমার দাদু ইংরেজি পড়তে পারবে না বাংলায় লিখবে।' তারপর আমাকে লিখেছেন : 'নাতিকে ছবিতে জবাব দিলাম। 'দুর্ভাগ্য এই যে পোস্ট-অফিস থেকে আঁকা ছবিটির ওপর সযত্নে একটি স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে।

এই বছর 'সোসাইটি অফ ওয়ার্কিং আর্টিস্টে'র বার্ষিক যৌথ প্রদর্শনীতে ছবি দিয়েছি। ছবি মনমতো হচ্ছে না। ছবি ফটো পাঠিয়ে দাদুকে জানালাম। রং-তুলির সমস্যা নিয়েই চিঠি ছিল। দাদুর নির্দেশ এল—

৫৩

১১।৭।৭৯

দুলাল,

...এবার বর্ণলেপনের কথা। 'বর্ণলেপনের প্রথম পাঠ' এই নামে আমার একটি লেখা আর্ট স্কুলের পত্রিকায় বেরিয়েছিল। লেখাটি ধীরেনের কাছে থাকার কথা, লেখাটি অবশ্যই পড়বে।

জলের পাত্রে যদি নানা রঙের গুঁড়ো ফেলতে থাক, তবে তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে তরল হয়ে আসবে এবং নানা রঙের মিশ্রণে আরেক

রকমের রং তৈরি হবে (tone)। কাঠের মূর্তিতে যদি রং কর তবে তার আবেদন হবে অন্যরকম। এক্ষেত্রে রঙ নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে যুক্ত। Proportion, কালো-সাদার প্রয়োগ এবং অবস্থা - এই তিন নিয়ে রঙের বিন্যাস (আমার লেখাতে এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট ক'রে দেওয়া আছে)। ব্যাকরণমতে বলা চলে, contrast, proportion and position—এই তিন নিয়ে হল রঙের খেলা। রঙের proportion ভুল না হলেও খুব সম্ভবত position-টা (dark এবং light-এর) বোধহয় তোমার কাছে clear নয়। রঙিন জৈন চিত্র এবং অবনীন্দ্রনাথের ছবি পাশাপাশি রাখলে বোধহয় বিষয়টি তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। টিশিয়ানের ছবিতে কালোসাদার প্রয়োগ অতুলনীয়। তোমার ড্রইং বোধহয় tonal value সহ্য করে না।

তোমার ছবির যে ফটো পাঠিয়েছিলে তা আমার মনে আছে। Contrast বোধহয় তোমার ছবির পক্ষে উপযোগী। (Diagnosis-টা ঠিক হল কিনা আমায় জানাবে।) রং যদি ক্যাসফ্যাসে (anaemic) দেখায়, বুঝবে তাতে dark রঙের অভাব। যদি অনেক রঙ দিয়েও উজ্জ্বল না হয় তবে বুঝতে হবে সাদা রঙের অভাব (highlight, cast-shadow)। Impressionist যুগ থেকে এই cast-shadow-র প্রয়োগ প্রায় চলে গেছে। আমি ঠিক colourist নই। আমি হলাম রঙের ক্ষেত্রে grammarian।

Method and Material খুব বড় সমস্যা। তোমার ড্রইং-ই তোমার method-এর material-এর কথা ভালো ক'রে মনে করিয়ে দিতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। তোমার surrounding-এর মধ্যে রং নেই, কিন্তু form আছে। হাসপাতাল, কলকাতার রাস্তা, লোকজনের পোশাক পরিচ্ছদ —কোথায় তুমি রং পাচ্ছ? 'শিল্প-জিজ্ঞাসা'য় East আর West সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা আছে তা দেখবে। ধীরেনের কাছ থেকে 'বর্ণলেপনের প্রথম পাঠ' লেখাটি অবশ্যই পড়বে।

রাহুলকে কি ক'রে তুমি ছবি আঁকা শেখাচ্ছ জানতে কৌতূহল হয়। তোমরা সকলে আমার সম্ভাষণ গ্রহণ কর। ইতি—

দাদু

নিজের কোথায় ঘাটতি (Limitation) এটা না বোঝা গেলে, রসসৃষ্টির সম্ভাবনা (Scope) কতটুকু সেটাও আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তাই ইদানীং দাদু বারবার মনে করিয়ে দিয়েছিলে Professional আর Vocational শিল্পীর পার্থক্য সম্পর্কে। এবার আমার আঙ্গিকের সম্ভাব্য দুর্বলতা নিয়ে সজাগ ক'রে দিলেন।

'৭৯-র জুলাই-এ দাদু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

করছেন শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেতে বলে চিঠি দিলাম। দাদু লিখলেন—

৫৪

[পোস্টমার্ক ২৫. ৭. ৭৯]

দুলাল,

ক'দিন থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছি। তুমি যে চিঠি ম্যালেরিয়া জ্বর সম্বন্ধে লিখে পাঠিয়েছিলে সেটা misplace করেছি। তুমি যদি আর একবার Prescription-টা লিখে পাঠাও তবে বিশেষ উপকৃত হব। আশা করি অন্যায় অনুরোধের জন্য কিছু মনে করবে না। কানুকেও লিখলাম। এর পূর্বে কানু আমাকে অ্যালোপ্যাথি treatment করতেই বলেছে। তাই তোমাকে লিখলাম। আশা করি বাড়িতে সব ভালো আছে। ইতি—

দাদু

স্বাভাবিক কারণেই দাদুর চিকিৎসা আমার চিঠির জন্য থেমে থাকে নি। ক'দিন বাদেই আবার চিঠি পেলাম—

৫৫

29. 7. 79

দুলাল,

কয়দিন আগে তোমাকে যে চিঠি দিয়েছি ঔষধপত্র সম্বন্ধে, সেটা cancel করলাম। স্থানীয় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার কন্যা ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছে। অনর্থক তোমাকে বিব্রত করার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত। ভবিষ্যতে আর এরকম হবে না আশা করি। ইতি—

স্বাঃ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চিঠিতে সই নেই, বুঝলাম শরীর খুবই খারাপ। অথচ আমার যেন কিছুই করার নেই। দিল্লীতে আমার যে ডাক্তার বন্ধুবান্ধব আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু দাদু কি আমার এই আগ্রহ পছন্দ করবেন? অভিমান হল, আমি জানতাম দিল্লীতে যাওয়ার পর শুধু শরীর নয় মনমেজাজও দাদুর ভালো যাচ্ছিল না। অথচ বন্ধু পরিজনদের কাছে একথা সহজে স্বীকার করতে তাঁর আত্মাভিমানে লাগত। যাই হোক, আমি আমার ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে একটা চিঠি দিই। চিকিৎসার ব্যাপারে আমাকেও একটু ভাবতে দেওয়া হোক, এ আবেদনও ছিল। আমার চিঠিতে অবশ্য কোনো ফল হয় নি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন—

৫৬

২০. ১০. ৭৯

দুলাল,

তোমার পত্র পেলাম। হৃদয়বৃত্তির মূল্য যে এখনো সংসার থেকে লোপ পেয়ে যায় নি সেকথা জেনে মনে খালি আনন্দ হল তা না, এ সান্ত্বনা পেলাম যে মানুষ এখনও gadget-এ পরিণত হয় নি, মনুষ্যত্বের দাম এখনো আছে। দিল্লীতে না এলে অনেককিছু জানতে পারতাম না। যথা :—(১) শিক্ষিতা মা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছে। সেই মেয়ের বিবাহের পর মা এসেছে মেয়ের কাছে থাকতে। তেরাত্তির যেতে না যেতে মেয়ে মাকে বলছে —কবে তুমি যাবে মা? মেয়ে বলছে—মা এত সেকেলে যে আমাদের সঙ্গে খাপ খায় না। (২) বোন এসেছে ভাই-এর বাড়িতে দরিদ্র নয়), প্রথম রাত্রে dinner-এ বসে ভাই বলছে বোনকে, তোমার influence-এ ছেলে-মেয়েদের একটু ক্ষতি হতে পারে, তাই তুমি একসপ্তাহের বেশি এখানে থেকো না।

অবশ্যই আমি স্বীকার করছি, অন্যের থেকে সাহায্য চাইতে আমিও সংকোচ করতাম। তবে এখন একটু কম করি। নাতি হিসেবে তোমার সঙ্গে আর্ট সম্পর্কে অনেক আলাপ আলোচনা করেছি। কিন্তু অসুখ সম্পর্কে যখন লিখেছি, একজন ডাক্তারকে লিখেছি। এখন থেকে সে সম্বন্ধে ডাক্তারকে নয়, নাতিকে লিখব।

ধীরেনকে লম্বা একখানা চিঠি লিখলাম। লিখলাম অসুখ লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়। দর্প, অহংকার ছেড়ে দিয়ে তোমাকে সব কথা জানাতে বলেছি। গতকাল আর্টস্কুলের কানাই সরকার ও অমলা এসেছিল। তাদের মুখে ধীরেনের অসুখের কথা detail-এ শুনলাম। শুনে অত্যন্ত শঙ্কিত হলাম।···

কলকাতায় দুর্গাপুজো আর এখানে দেওয়ালি। আজকের দিনে লোকেরা বাড়ি বাড়ি মিষ্টি নিয়ে যায় ও দেওয়ালির শুভেচ্ছা জানায়। আমিও তোমায় দেওয়ালির অভিনন্দন জানাই। ভালোভাবে এ পরীক্ষায় পাশ কর। তারপর তোমার কাছে আমি চিকিৎসা করাব। মহুয়া তুমি ও রাহুল আমাদের প্রীতি, শুভেচ্ছা জেনো।

দাদু

এরপর দাদু আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। মামা দিল্লী ঘুরে এসেছেন। মামার থেকে খুঁটিনাটি খবর জানলাম। চিঠি দিলেই উত্তর দেবেন। তাই কিছুদিন আর চিঠি দিই নি। ফোনে মামার থেকেই খবর পাই। বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসে দাদুর একটা পোস্টকার্ড এলো—

৫৭

[পোস্টমার্ক ১৭. ১২.৭৯]

দুলাল,

…সায়াটিকা রোগে শয্যাশায়ী, আমার clot [?] এর symptom দেখা দিয়েছিল। ডাক্তারদের মতে মাথাখারাপও হতে পারত। কিন্তু হয় নি। তারপর ব্রংকাইটিস। তারপর সায়াটিকা। এই তিন অসুখে যে পরিমাণ ওষুধ খাচ্ছি, সারাজীবন তা খাই নি। চিঠি লিখতে বসলেই রাহুলকে একটা স্কেচ পাঠাবার কথা মনে হয়, কিন্তু আপাতত তা সম্ভব হচ্ছে না।

ইতি—

স্বাঃ রমিতা ঘোষ

for বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ইতিমধ্যে আমার বাঁকুড়ার টেরাকোটা কাজের ওপর লেখাটি 'অর্কিড' পত্রিকায় বেরিয়েছে। আমি তার একটা কপি পাঠিয়েছি। অসুস্থতার মধ্যেই দাদু লিখলেন—

৫৮

[New Delhi]
31. 12. 79

দুলাল,

তোমার পাঠানো পত্রিকা সময়মতো পেয়েছি।…আমি এখনো সবটা পড়ি নি। কারণ আর কিছুই নয়, বিছানায় শুয়ে কাটাচ্ছি। যাই হোক পড়া হলে একটা criticism নিশ্চয় পাঠাব। ছবির ক্ষেত্রে এখনো তোমার বোধহয় কোনো বাধা হয় নি। ডাক্তারিতেও নয়।

শরীরের কথা এখন আর কাউকে জানাই না। (কানুকেও নয়।) কিছু মনে থাকছে না। রাত্রে tranquillizer খেয়ে ঘুমোতে হয়, তাও সবদিন হয় না। ৩।৪ মাস ধরে ৩।৪টি tablet সমানে খাচ্ছি। একটা tablet Hythalton-R—alternate day-তে খাচ্ছি। এছাড়া Vitamin, Calcium ইত্যাদি তো আছেই। আমার [অবস্থা] এখন প্রায় vegetative existence-এর দিকে চলেছে। প্রত্যেক complaint-এর জন্য একটা ক'রে আলাদা ওষুধ আছে। total habit সম্বন্ধে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না। ভালো ভালো খাবার prescribe করে। হজম হচ্ছে কি না হচ্ছে তার কোনো খেয়াল নেই। হজম না হলে একটা হজমের ওষুধ দিয়ে দেবে। আমার মনমতো diet বদলাতে দিচ্ছে না! মাংস আমি খেতে পারছি না, এতদিনে

ডাক্তার তা বিশ্বাস করেছে। ডাক্তারের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কথাবার্তা কমই হয়।…

এবার তোমার চিঠিতে ধীরেনের নাম দেখলাম না। আশা করি সে ভালো আছে। আগামীকাল January মাস শুরু হচ্ছে। তোমার স্ত্রী ছেলে ও তুমি আমাদের Happy New Year জানবে। তোমার মা ও বাবাকে আমাদের কথা বলবে।…

* সায়াটিকার ব্যথা প্রায় নেই।

স্বাঃ রমিতা ঘোষ
for B. B. Mukherjee

বিষাদ আর উদ্বেগ নিয়ে নতুন বছর শুরু হল। প্রকৃতির বিধানের কাছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষমতা যে কত নগণ্য তা আমি জানি। চিকিৎসা যে বিশেষ বিশেষ সময়ে যান্ত্রিক নিয়মমাত্র হয়ে ওঠে সে-কথাও চিকিৎসক হয়ে আমি ভালো করেই বুঝি। তাই সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো ঔদ্ধত্য আমার নেই। ক'দিন বাদে আরেকটা পোস্টকার্ড আসে।

৫৯

4. 1. 80

দেবাশিস,

তোমার লেখা আদ্যোপান্ত বিশেষ যত্নসহকারে পড়লাম। লেখা খুব সুন্দর হলেও একটু পুনরাবৃত্তি আছে। রূপসনাতন গোস্বামীর প্রভাব সমস্ত বাংলা পটের লেখাতে যথেষ্ট আছে। ভাবব্যঞ্জক অনেক মূর্তি—dramatic element। আরো অনেক কথা তোমায় বলবার আছে। শরীর কিছুটা সুস্থ হওয়া দরকার। আপাতত আমার লেখা 'টেরাকোটা কাজের বৈশিষ্ট্য' এক্ষণ পত্রিকা শারদীয় ১৩৮২ (1975) দ্রঃ। ঠাণ্ডা ও বাদলে শরীর অবসন্ন।

দাদু

এই লেখা যে শুধু সংক্ষিপ্ত তা না, কিছুটা খাপছাড়া। মনে হয় dramatic element বলে আরো কিছু জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মন ততক্ষণে অন্যত্র সরে গেছে। চিঠিটা পড়ে মন আরো দমে গেল। রোগ ও জরায়—'ঠাণ্ডা ও বাদলে' দাদুর প্রাণশক্তিকে যেন নিঃশেষ ক'রে দিতে চাইছে। পরের চিঠিতে ইনল্যাণ্ডে বড় ক'রে লেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেখানেও অনেক কাটাকাটি—খেই হারিয়ে যাচ্ছে বারবার—

২১. ২. ৮০

দেবাশিস,

তোমার পত্র পেলাম। বাংলার টেরাকোটা যে তোমার এখন নখদর্পণে তার প্রমাণ এই চিঠি। ভক্তের সঙ্গে মিল-অমিল নিয়ে তুমি যে বিচার করেছ, তার উপর আমার কিছু বলার নেই। (আমি অনেক কিছুই ভুলে গেছি। তার উপর আমি দেখেছি বিশেষ ক'রে বীরভূমের টেরাকোটা।) অতি উজ্জ্বল আলোতে টেরাকোটার একটা side-movement হয়, সেটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। যেখানে রোদ্দুর reflect করছে না সেখানে reflectior-টা ওপর-নিচ, side নয় – অন্তত এইরকম আমার ধারণা। আমার এক অত্যন্ত পরিচিত Scholar পট-পাটা নিয়ে রিসার্চ করছেন। তিনি কলকাতা ঘুরে এসে আমায় খবর দিলেন যে কলকাতায় অনেক পুরনো বাড়িতে সব পট-পাটার যে সংগ্রহ আছে তা অমূল্য এবং তারা খুব যত্ন ক'রে রেখেছে। এইসব জিনিস দেখতে যা ঘোরাঘুরি করা দরকার তা বোধ-হয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর তার দরকারও নেই। টেরাকোটা নিয়ে যা করেছ তা যথেষ্ট।

আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার memory কিরকম খারাপ হয়েছে। যা বলতে চাচ্ছি তা ভুলে যাচ্ছি। আমার brain-এ যে clot পড়েছিল, তখন ডাক্তার বলেছিল (আমার আত্মীয়দের) যে আমার hysteria হতে পারে। এমনকি পাগলও হতে পারি। Hysteria ভাব যে হয়েছে তা বুঝতে পারি। কারণ কেউ কিছু জানতে চাইলে ভীষণ nervous হয়ে পড়ি।···

তোমরা অনেক দূরে আছ। এক এক সময় দেখা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার উপায় নেই। তোমাকে লিখতে গিয়ে এই মুহূর্তে মনে পড়ল যে আশুতোষ মিউজিয়ামে টেরাকোটার collection ভালোই আছে। আর একজনের কাছে টেরাকোটা ও folk art এর খুব ভালো collection আছে। তার নামটা মনে পড়লেই জানিয়ে দেব। তার কথা কলকাতার অনেকেই জানেন। তোমার চিঠির জবাব খুব ভালো ক'রে দেব বলে ভেবেছি-লাম। কিন্তু confused brain এ সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবে তুমি যেভাবে study করেছ সেভাবে কেউ study করে নি। বাঁধাপথে অনুসন্ধান কোরো না, এইটুকু উপদেশ আমি তোমায় দিতে পারি। রূপ গোস্বামীর বই পড়লে তুমি যে বিশেষ উপকৃত হবে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আশা করি বনবিহারী ভালো আছে। তোমরা সবাই ভালো আছ আশা করি।

দাদু

আমার এম. ডি. থিসিসের কাজ চলছে পুরোদমে। মনোবিজ্ঞান চর্চার ফলে যুক্তিতর্কের বাইরে যে বোধ ও অনুভূতির একটা জগৎ আছে সেকথা বিজ্ঞানের ভাষায় শিখছি। দাদুর পুরনো অনেক কথা এখন বৈজ্ঞানিক সংস্কার নিয়ে বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে না। তাই মন বাঁক নিচ্ছে। এই সময় একবার দাদুর সঙ্গে দেখা হলে বড় ভালো হতো। নিজের পড়াশোনার জন্যই তখন এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে আমার যাওয়া-আসা, খবর পেলাম শিল্পী রামকিঙ্কর বাবু নিউরোলজি বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। দাদু লিখলেন—

৬১

19. 5. 80

দেবাশিস,

অদ্য পত্র পেলাম। রামকিঙ্কর বাবুর খবর ইতিমধ্যে আমি কিছু সংগ্রহ করেছি। সময়সুযোগ থাকলে visitor হিসেবে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর। তিনি যদি normal থাকেন, তবে তুমি একটি বিশেষ ধরনের চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে। যতদূর জানি এখন তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে কলকাতাতেই রাখতে চাইছেন। দুলাল, আমারো memory খারাপ হয়ে আসছে। তাই লিখতে বসেও লিখতে পারছি না। পদে পদে বাধা হচ্ছে। অনিদ্রা রোগে ভুগছি। অবশ্য দিনে ঘুম হয়। রাতে এই অনিদ্রার কারণে সকালে concentrate করতে পারি না। যাই হোক এইসব কথা থাক এখন।...

ছবি আঁকার সময় হয়ত এখন পাচ্ছ না, নিশ্চয় জেন তাতে কিছু আসে যায় না। সময় পেলেই আবার ছবি আঁকা শুরু করবে। হাতের জড়তা কাটাতে কয়েক ঘণ্টা বা একদিন যথেষ্ট। একবার যখন ছবি আঁকার স্বাদ পেয়েছ, তখন আর ভাবনা কি ?

'পরিচয়'—মার্চ ১৯৮০, ৪৯ বর্ষ—৮ সংখ্যা—এই সংখ্যাতে মেজদা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে—'বনবিহারী মুখোপাধ্যায়—একটিবিস্মৃত নাম'। যদি পারি কানুকে এই পত্রিকাটি পাঠাব। তোমরা সকলে ভালো আছ আশা করি।

দাদু

শিল্পী রামকিঙ্কর বাবুর অবস্থার আর উন্নতি হয় নি। বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে ২রা অগস্ট তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার দু'দিন আগে চলে গেছেন শিল্পী গোপাল ঘোষ। একে একে নিভিছে দেউটি। এসব কথা দাদুকে কি লিখব? বরং দাদু শুনলে খুশি হবেন যে এখন মনোবিদ্যা পড়তে গিয়ে আমাকে যোগ, Transcendental Meditation, Bio feed-back

ইত্যাদি জানতে হচ্ছে। সত্যিই বিষয়টিতে আমার কৌতূহল বেড়েছে। সত্যানন্দ স্বামীর এক আধুনিক আশ্রমে যোগনিদ্রা অভ্যেস করতে যাচ্ছি। মনকে ইন্দ্রিয়জাত সব অনুভবে সজাগ কর—প্রদক্ষিণ কর দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ। আবর্তিত কর নানা রূপকল্পে। মন্দির প্রদক্ষিণ কি তবে এরই বিকল্প? তাই কি বিষ্ণুপুর মন্দিরের চারপাশ ঘিরে ফুটে উঠেছে সারি সারি চিত্র-কল্প? এ-সবই লিখলাম চিঠিতে। অগস্টের শেষে চিঠি এল –

৬২

[New Delhi]
25. 8. 80

দুলাল,

মামুলি চিঠি হলে চটপট উত্তর দিতাম। কিন্তু এবারের চিঠিতে এমন কিছু কথা আছে যে বিষয়ে বলার আমি কিছু যোগ্য নই। তবে চিঠি পড়ে খুবই ভালো লাগল। কারুর উপদেশ অনুযায়ী আমি কখনো যোগ-অভ্যাস করি নি। তবে শিল্পের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করেছি এটা তোমার কাছে নিঃসংকোচে বলতে পারি। বিষ্ণুপুরের মন্দির প্রদক্ষিণ ও ভারতশিল্প সম্বন্ধে তোমার নতুন অভিজ্ঞতা খাঁটি সত্য বলে আমি মনে করি। তথাকথিত Indian Art যাঁরা করেন তাঁরাও অনেকে এই জিনিস উপলব্ধি করেছেন কিনা জানি না।

তোমাকে উপদেশ দেবার মতো কিছু নেই। প্রত্যেকের সাধনা এবং উপলব্ধি ভিন্ন হয়েও অভিন্ন। যদি যোগনিদ্রা উপলব্ধি ক'রে থাক তাহলে অনেকখানি তুমি উপলব্ধি করেছ, এটুকু আমি বুঝি। আর্টের সঙ্গে যোগের কিছু সম্বন্ধ আছে বলেই তোমার কথা আমি কিছুটা উপলব্ধি করলাম (Psychiatry-র সঙ্গে যোগসাধনার এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে জানতাম না)।

খুব ভালো আছি বলতে পারি না। এখনো লাঠির সাহায্য নিয়ে নিজে নিজে হাঁটতে পারছি না। এই অসমর্থতা হয়ত psychological, কারণ উঠে দাঁড়ালেই মনে হয় যদি পড়ে যাই। তবে যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজে করছি। সিগারেট, চা যথেষ্ট কমিয়েছি। লীলা মোটামুটি সুস্থই আছে।

রাহুল কি একাধিক form মিলিয়ে ছবি করা শুরু করেছে? আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। তোমাদের শুভানুধ্যায়ী

দাদু

নিচে নিজে হাতে সই করেছেন। লেখার বাঁধুনি অনেক স্বাভাবিক। দাদু নিশ্চয় তাহলে ভালো আছেন। অসুস্থতা মনের জোরে বার বার কাটিয়ে উঠেছেন দাদু। এটাই আমার কাছে স্বাভাবিক। খুশি হয়ে চিঠি দিলাম। উত্তর নেই। সম্ভবত অনুলেখিকা আসছেন না। মামার কাছ থেকে শুনেছিলাম তিনি ছুটি নেবেন। মামা বললেন শরীর একই রকম, উন্নতি হয় নি।

তিনমাস ঘুরতে চলল। আমার দিন রাত রুটিন বাঁধা পথে কাটছে। আরেকটি চিঠি দিয়েছি, এখনো উত্তর আসে নি। ২০শে নভেম্বর। সকাল। হকার জানলা দিয়ে খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে গেল। একি! কাগজের প্রথম পাতায় আমার introvert দাদু বেরিয়ে এসেছেন। চারিদিকে বিবর্ণ ফুল আর কালো হরফের ভিড়। কালো চশমার আড়ালে চোখ ঢাকা। ঠোঁটে চাপা আছে দুঃখের হাসি!

—

রচনা-পরিচয়

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের (৭. ২. ১৯০৪—১১. ১১. ১৯৮০) কাছে আমাদের ঋণ অনেকখানি। একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় শিল্পের মূলগত পরিচয় তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে যেমন প্রাণ পেয়েছে তেমনটি আর কোথাও পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

বিনোদবিহারী শুধু অনুপ্রেরণা ও সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর ক'রে শিল্পচর্চা করেছেন, তা নয়। অনুশীলন ও অধ্যয়ন তাঁকে শিল্প-প্রত্যয়ে পৌঁছাতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। তার উপর তিনি ছিলেন শিল্প-শিক্ষক। এইসব কারণে তাঁকে 'বুদ্ধিজীবী' শিল্পী বলার সংগত ঝোঁক অনেকের মধ্যে আছে। তিনি 'শিল্পীর শিল্পী'—এমন কথাও বলা হয়। বোধহয় তার কারণ রসিক ও বোদ্ধার ধরাছোঁয়ার বাইরে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তাঁর একটা মার্জিত দূরত্বে অবস্থিতি।

শিল্পচর্চার পাশাপাশি লেখক হিসাবেও বিনোদবিহারী এক বিরল প্রতিভার অধিকারী। তাঁর ধ্যান ও মননের অনেকখানি পরিচয় তাঁর নানা জাতীয় রচনার মধ্যে ধরা পড়েছে। 'এক্ষণ' পত্রিকায় তাঁর শেষজীবনের অধিকাংশ প্রধান লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল। 'চিত্রকর' ও 'চিত্রকথা' নামে বই দু'খানিতে সেসব লেখা অনেকখানি স্থান পেয়েছে। এর আগে এক্ষণ-এর একটি সংখ্যায় (শীত-বসন্ত ১৩৮৭ / ১৯৮১) বিনোদবিহারীর অনেকগুলি চিঠি ছাপা হয়—এক্ষণ-সম্পাদককে লেখা চিঠিগুলি থেকে ২৮টি এবং সত্যজিৎ রায়কে লেখা ১টি।

উপরে 'দাদুর চিঠি' হিসেবে যে ৬২টি চিঠি ছাপা হয়েছে সেগুলি এক নাতি ও এক দাদুর স্নেহ-সম্পর্কের মামুলি পরিচয় নয়—এগুলি চিঠির ফর্মে শিল্প-বিষয়ে

বিনোদবিহারীর আজন্ম ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতার বাণীকেই বহন করছে।

এই অমূল্য চিঠিগুলি শিল্পী লিখেছিলেন তাঁর এক নাতি, দেবাশিস ভট্টাচার্যকে—যিনি পেশায় চিকিৎসক, প্রেরণায় শিল্পী। কোন পটভূমিতে এবং কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব হিসেবে এই চিঠিগুলি লিখিত হয়েছিল তার চমৎকার সূত্র নির্দেশ করেছেন চিঠির প্রাপক নিজেই। তার পুনরুক্তি অপ্রয়োজনীয়। শ্রী ভট্টাচার্যের বিন্যাস ও গ্রন্থনা ছাড়া কেবল চিঠিগুলি ছাপা হলে এর অনেক বক্তব্যই দুর্বোধ্য ও অসংলগ্ন মনে হতো। অনুমান করা যায়, দাদুকে লেখা শ্রী ভট্টাচার্যের চিঠিগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-জিজ্ঞাসায় প্রশ্নসংকুল এবং প্রাসঙ্গিক ভাবের উপযুক্ত আদান-প্রদানে সক্ষম হয়েছিল। সেই জন্যই প্রবীণ শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ককে সাধ্যমতো বাইরে রেখে শিল্প-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের ক্রমান্বয় উন্মীলন ঘটাতে পেরেছেন এক তরুণ চিত্রকরের কাছে। তাই স্বচ্ছন্দে এই পত্রাবলিকে 'এক তরুণ শিল্পীকে লেখা পত্রগুচ্ছ' বা 'Letters To A Young Artist' বলে চিহ্নিত করা যায়।

দেবাশিস ভট্টাচার্য

জন্ম ১৫. ৬. ১৯৪৫; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা; পেশায় মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রোফেসর, সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেণ্ট, ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ (PGME&R), কলকাতা।

শিল্পচর্চা ছাত্রবয়স থেকেই; কার্টুন-শিল্পে একটি ডিপ্লোমার অধিকারী; অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ স্কেচ-ক্লাবে দু বছর (১৯৬৫-৬৬) শিল্পচর্চা; সোসাইটি অফ ওয়ার্কিং আর্টিস্টস (প. বঙ্গ)-এর সভ্য হিসাবে গ্রুপ শো-তে অংশগ্রহণ—কলকাতা : ১৯৭৮-৮১, ১৯৮৪-৮৫; দিল্লি : ১৯৮৩; একক চিত্র-প্রদর্শনী ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯ ৭, ১৯৮৫, ১৯৮৭ ও ১৯৮৯ তে; অনেকগুলি সর্বভারতীয় যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন কলকাতা ও বোম্বাইতে; 'দিশা' নামে একটি গ্রুপ তৈরির অসফল চেষ্টা; আপাতত শেষ প্রদর্শনী ১৯৯০-তে; বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিল্প বিষয়ে চিন্তাশীল ও গবেষণাধর্মী রচনার প্রকাশ; বর্তমানে চিত্র-চর্চা অব্যাহত।

—

॥ কৃতজ্ঞতা ॥

বিনোদবিহারীর একমাত্র কন্যা, যিনি নিজেও শিল্পী, সেই শ্রীমতী মৃণালিনী মুখোপাধ্যায়ের কাছে—পিতার পত্র প্রকাশে তাঁর সহৃদয় সম্মতির জন্য।

বিশেষ সহায়তা : রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়।

পরিচয়

বীণা দে

প্রয়াত শিল্পী মুকুল দে-র স্ত্রী শ্রীমতী বীণা দে-লিখিত অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথার অপর অধ্যায়

১

সেই ট্রেনের কামরায় সহযাত্রী অসিত হালদারের স্ত্রীর মুখ থেকে শুনে অবধি যতবার বোলপুর স্টেশনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি, সব সময়েই মনে হয়েছে : কোথায় সেই শান্তিনিকেতন, কখনো কি কবিগুরু ট্রেনে ওঠেন না, একবার কি দেখতে পাব না ? এই রকম কত কি !

সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে যখন এলুম, তাঁর দর্শন, স্নেহ-আশীর্বাদ ওঁর সঙ্গে নিপ্পন ক্লাবে গিয়ে যখন পেলুম, আমার তখনকার সেই আনন্দ অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করার শক্তি আমার নেই। তবু 'আনন্দ-স্মৃতির টুকরো' বলে অন্যত্র সামান্য যা লিখেছিলাম (দ্র. রবীন্দ্রসাহিত্য পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯২) তারই কিছুটা পুনরুক্তি দিয়ে এ-লেখা শুরু করি।

ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন আমার ধ্যানের বস্তু। সত্যি সত্যি যে জীবনে কখনো কবিগুরুকে দেখতে পাব, শান্তিনিকেতনে থাকা তো দূরের কথা কখনো আসতে পাব, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

তাই যখন ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার নিপ্পন ক্লাবে ওঁর সঙ্গে গিয়ে গুরুদেবকে প্রথম দর্শন করলুম, মাথায় তাঁর আশীর্বাদ-ভরা হাতের স্নেহস্পর্শ পেলুম আমার যেন নবজন্ম হল। সে যে কী অনির্বচনীয় আনন্দ-অনুভূতি তা ব্যক্ত ক'রে বোঝানো যায় না।

'খাসা বৌ হয়েছে' বলে কাছে টেনে নিয়ে হাতে-ধরা কাগজপত্রগুলি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলি ধরে থাকো।' যতক্ষণ ক্লাবে থাকলেন আমাকে নিজের কাছে কাছে রাখলেন। আমি একটু লাজুক প্রকৃতির ছিলুম, কোনো বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারতুম না। ফোটো তোলার সময় গুরুদেব আমাকে পিছন থেকে টেনে সামনে নিজের কাছে দাঁড় করালেন। আমি যেন মোহাবিষ্ট। গাড়িতে ওঠার সময় প্রণাম ক'রে কাগজপত্রগুলি হাতে দিতেই, ওঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর বোয়ের নামটা কিরে ?'

উনি বললেন, 'বীণা'। অমনি হেসে বলে উঠলেন, আরে বীণা নিয়ে তো আমার কারবার, আমি কবি, বীণা আমার ; তুই বাঁদর বীণার মর্ম কি বুঝবি ? তার-টার ছিঁড়ে একাকার ক'রে ফেলবি' — বলে ওঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

আমি তো অবাক। এতবড় মহান কবি, এত বড় লোক এমন হাস্ত পরিহাস করতে পারেন এমন সহজভাবে! ভাবতেই পারা যায় না।

১৯৩৪ সালে প্রথম এলাম এই বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত শান্তিনিকেতনে। মাটির বাড়ি খড়ের চাল। চালে খড় কোথাও আছে কোথাও নেই। দু'বিঘা জমির চারধার ঘিরে বেড়ার বাঁশ ক'টি, কাঁটাতার জড়িয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ শুয়ে পড়েছে। উই-এর মাটিতে আধখানা ঢাকা দক্ষিণদুয়ারি বাড়ি। বাড়ি ঢুকতে চুনবালি দিয়ে গাঁথা ইঁটের থাম দু'টি দাঁড়িয়ে আছে, গেট নেই। একটি থাম সোজা দাঁড়িয়ে আছে, একটি থাম বাঁকা হয়ে হেলে পড়েছে, শীঘ্রই শুয়ে পড়বে।

বাড়ির পশ্চিমদিকে একটি বুনো খেজুর গাছ, তার ঝাঁকড়ামাথা আর বেঁটে খাটো দেহটি নিয়ে ঠিক একটি সাঁওতাল ছেলের মতন দাঁড়িয়ে আছে। আর পুবদিকে একটি নাম-না-জানা জংলি গাছকে জড়িয়ে একটি বনমল্লিকার লতা অজস্র শাদা ফুলে ভরে হাওয়ায় দুলে দুলে সুরভি ছড়াচ্ছে। বাড়ির চারপাশে উঁচুনিচু জমি কাঁকর আর কাঁটায় ভরা। মাঝে মাঝে বনফুলের ঝোপ। পশ্চিম দিকে খেজুর গাছের পাশ দিয়ে গিয়ে একটি শানবাঁধানো কুয়ো, শুকনো।

বাড়িটি একেবারেই গ্রামবাংলা সংস্করণের। মাঝখানে দু'খানি ঘর, উত্তর, দক্ষিণ আর পূর্ব তিনদিকে বারান্দা, পশ্চিম দিকে ছোট্ট ছোট্ট তিনখানি ঘর। একটি শৌচাগার, তার পাশে স্নানাগার, তার পাশ রান্নাঘর। রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে একটি দরজা,উত্তরের বারান্দার দিকের একটু জায়গা নিয়ে একটি ছোট ঘর, সেটি ভাঁড়ার ঘর। মাঝখানে যে বড় দু'খানি ঘর তার একটিতে 'আট্টু' অর্থাৎ আস্তরণ দেওয়া। মানে কড়ি বরগা দিয়ে তার উপর স্লেটের টালি পেতে বালি সিমেণ্টে মেঝে তৈরি করা, তার উপর উঁচু খড়ের চাল। ঐ ঘরটিতে বৃষ্টি হলে জল পড়ে না। তার পাশেই যে ঘরখানা সেটি উঁচু চালের নিচেই ; তার কোনো আস্তরণ নেই। এই ঘরের ভিতর দিয়েই একহাত ক'রে উঁচু উঁচু কাঁচিকাটা সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। দশটি সিঁড়ি বা দশ ধাপ উঠলেই একতলার উপরের ঘরে যাওয়া যায়। উপরের ঘরের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায়, চাল মাথায় ঠেকে না, বেশ উঁচু। পাশের চাল এত নিচু যে, বসলেও প্রায় মাথায় ঠেকে, গুঁড়িমেরে বসতে হয়। ঘরটির উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমে ছোট্ট ছোট্ট জানলা, ঘুলঘুলি বললেই ঠিক হয়। সত্যিকার গবাক্ষ।

পূর্বদিক অর্থাৎ সিঁড়ির পাশটি একেবারেই খোলা। ছোট ছেলেমেয়ে উঠলেই বা বড়রাও একটু অসাবধান হলেই একেবারে নিচের ঘরে পড়ে যাবে। নিচের ঘরটি উঁচু চালের নিচে, কোনো আস্তরণ নেই। কাজেই খড়বিহীন চালার ভিতর দিয়ে সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো, বর্ষার জল সবেরই ঘরের মধ্যে অবাধগতি।

নিচু চালা দিয়ে ঘেরা চারদিকে বারান্দা। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব তিনদিকে খোলা বারান্দা, পশ্চিমদিকে আগেই বলেছি—চারটি খুপরি ছোট্ট ছোট্ট ঘর একটি শৌচাগার, একটি স্নানাগার। সে দু'টির মাঝখানে একটি দরজা আর ঐ আস্তরণ দেওয়া শয়নঘরটি দিয়ে স্নানাগারে যাবার একটি দরজা। অবশ্য শৌচাগারে যাবার জন্য বারান্দার দিকেও একটি দরজা আছে। আর দুটি ঘর—একটি রান্নার, একটি ভাঁড়ার ঘর। তাদের মাঝখানেও একটি দরজা। আর বারান্দা দিয়ে যাওয়া-আসা করার একটি দরজা।

উনি ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে জিগেস করলেন, 'কেমন দেখলে আমার বাড়ি?'

বললুম, 'খুব ভালো, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। খাঁটি শিল্পীর বাড়ি।' হেসে বললুম—'ঘরে শুয়ে শুয়েই চাঁদের আলো, রোদের ঝাঁঝ বৃষ্টির ধারা সবই উপভোগ করা যায়।' উনি খুব খুশি, বললেন, 'তাহলে কিছুদিন থাকো।'

বাড়িটি বাসোপযোগী করার জন্য আমার শাশুড়িমাকে ও আমাকে রেখে উনি চলে গেলেন। চাল ছাওয়ানো আরম্ভ হল। সপ্তাহান্তে শনিবার সন্ধ্যায় আসতেন গাছপালা জিনিসপত্র নিয়ে. আবার রবিবার সন্ধ্যায় চলে যেতেন। বাগান ভালোবাসি বলে বাগানের সাজসরঞ্জাম, দু'জন মালী সব এল। হর্টিকালচার সোসাইটির মেম্বর হলেন। লেজলি কোম্পানির লোক এসে লোহার খুঁটি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে গেট বসিয়ে দিয়ে গেল। বাগান হবে, জল কৈ? নিজেদের কুয়ো শুকনো। এই অঞ্চলের মধ্যে দুটিমাত্র কুয়োয় জল আছে ও থাকে। এক পান্থশালা [বর্তমানে 'সুবর্ণরেখা'] আর এক শৈলদির কুয়োর জল সারা পাড়ার পানীয়। তা নেওয়া চলে না। বাঁধে জল নিতে গেলেও আপত্তি উঠল, কারণ সারা ভুবনডাঙার লোকের স্নানাহারপানীয়তে ঐ একমাত্র বাঁধের জলই ভরসা। কাজেই বাগান তৈরি করতে সে জল নেওয়া চলে না। অগত্যা উনি ব্যবস্থা করলেন—আবুর গরুর গাড়ি সারা দিন, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের জল আনবে নদী থেকে! আটটা টিন কিনে দিলেন। আবু সারাদিনে তিনবারের বেশি যাওয়া আসা করতে পারত না। আর আট টিন জল ভরে গাড়িতে চাপাতো আবু, কিন্তু তখনকার সেই এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো রাস্তায় গরুর গাড়ির ঝাঁকুনিতে বাড়ি পৌঁছত জল তিন চার টিনের বেশি নয়।

কাঁদন আর পুন্নু মাঝি রোজ আট আনা মজুরিতে উদয়াস্ত এই শুকনো কাঁকুরে জমিতে কোদাল চালিয়ে মাটি কেটে সমান করত। আর দৈনিক চার আনা মজুরিতে রাধি আর সুকুরমণি কাঁটা ও পাথর বেছে জড়ো করত। একজন ঝুড়ি ভরতি ক'রে মাথায় তুলে দিত, আর একজন মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে জমির বাইরে পিছনের গর্তে ফেলে আসত। ওদের ছন্দোবদ্ধভাবে কাজ করা দেখতে আমার খুব ভালো লাগত। যাই হোক এইভাবে তো বাগানের গোড়াপত্তন হল

--ইঁট পুঁতে কেয়ারি করা রাস্তায় কাঁকর ফেলা সেরে আমরা একজন মালি ও কাঁদনকে রেখে চলে এলুম।

পরে মালির কাছে শুনেছিলুম, বারান্দার কোলে চারদিক ঘিরে যে রজনীগন্ধা লাগানো হয়েছিল, সব নাকি একসঙ্গে শীষ সহ ফুল ফুটেছিল। গুরুদেব শুনে পিছনে হাত দিয়ে হেঁটে দেখতে এসেছিলেন এক জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায়।

উনি একবার সপ্তাহান্তে এসে শুনলেন গুরুদেব শান্তিনিকেতনে আছেন। আমায় নিয়ে উত্তরায়ণে গেলেন। আনন্দে দুরু দুরু বুকে গিয়ে দেখি গুরুদেব এখন যেটা হলঘর সেখানে একটি ইজিচেয়ারে পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে বসে প্রতিমাদির তৈরি বাগান দেখছেন আর বাগান সম্বন্ধেই কি কথা বলছেন। প্রতিমাদি আছেন, আরো দু'তিনজন মহিলা কারা আছেন। আমরা গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে বেশ খুশি। আমাকে পাশের আসনটি দেখিয়ে বললেন, 'বোসো'। ওঁকে বললেন, 'তুই বাঁদর ওখানে গিয়ে বোস' – বলে বাগানে নামবার দোরের পাশে যে বেদীর মতো জায়গা সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে হাসলেন।

আমি শান্তিনিকেতনের বাড়িতে থেকে বাগান করছি, বাড়িটি বাসোপযোগী করছি জেনে বেশ খুশি হলেন। একথা সেকথার পর জিগেস করলেন, 'হ্যাঁরে তোর বৌ রাঁধতে জানে?'

উনি বললেন, 'হ্যাঁ তা জানে বৈকি।' 'তাহলে একদিন খেয়ে দেখা যাক – কি বল বৌমা?' বলে প্রতিমাদির দিকে চেয়ে হাসলেন। প্রতিমাদি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন 'বেশ তো।'

আমি অবাক। এও কি সম্ভব? দুরু দুরু বুকে ভাবতে লাগলাম – এত সৌভাগ্য আমার হবে?

আনন্দ-উদ্বেলিত বুকে বাড়ি ফিরে এসেই ওঁকে জিগেস করতে লাগলাম – গুরুদেব কি খান, কি খেতে ভালোবাসেন; কবে সব জিনিস এনে দেবেন ইত্যাদি।

উনি দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই এক শনিবারে গুরুদেব যা যা খেতে ভালোবাসতেন – বরফের বাক্স ক'রে তোপসে মাছ, ইলিশ মাছ, জলের হাঁড়িতে কৈ মাছ, নানারকমের সব্‌জি (তখন বোলপুরে এত সব্‌জি পাওয়া যেত না), নারকোল, আইসক্রিম করার জন্য সেই কাঠের বালতির মতো বরফ জমানোর হাতে ঘোরানো যন্ত্র সব নিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে বেয়ারা দুরবালি রামকেও নিয়ে এলেন আইসক্রিমের মেশিন ঘোরানোর জন্য।

আমি তো মহা উৎসাহে সেই রাতেই চন্দ্রপুলিটা ক'রে রাখলুম। পরদিন ভোর থেকেই রান্না শুরু। মা সুক্তো, শাকের ঘণ্ট এইসব নিরামিষ রান্না করলেন। আমি তোপসে মাছ ফ্রাই, কাঁচা ইলিশের ঝালসরষে, কৈ মাছের পাতুড়ি এইসব করলুম।

গুরুদেব তখন কোণার্ক-তে থাকতেন। কোণার্ক-তে ঢুকে সামনের ঘরেই খাবার টেবিল পাতা। আমরা ঠিক বারোটার মধ্যেই সব নিয়ে পৌঁছলুম। টেবিলে খাবার জায়গায় সব সাজিয়ে দিতে দিতেই গুরুদেব এসে চেয়ারে বসে হেঁকে বললেন, 'ওরে সুধাকান্তকে ডাক, বৌমাকে খবর দে—মুকুল গন্ধমাদন বয়ে এনেছে, বৌকে দিয়ে কত কি রাঁধিয়েছে, এত কে খাবে—'

আমি আনন্দের আতিশয্যে এখন জড়ভরত হয়ে গেলুম যে, গলা দিয়ে একটা কথা বার হল না। হাত দিয়ে একটি জিনিসও বোধহয় এগিয়ে দিতে পারি নি। যা করার বলার উনিই সব করলেন বললেন। আমার সেদিনের কথা বর্ণনা করার শক্তি নেই।

তারপর কতবার গেছি, গুরুদেবের কাছে বসে থেকেছি অতি নিকটেই, কিন্তু একটা কথাও কোনোদিন বলতে পারি নি। মনে মনে কত কথা বলেছি, কত কথা জানতে জানাতে চেয়েছি, কিন্তু ওঁকে দেখলে ওঁর কাছে গেলেই গলা যেন বুজে যেত। একটি কথাও বার করতে পারতুম না। সে এক অদ্ভুত অবস্থা!

২

১৯৩৬ সাল। মেয়ে হল। উনি গুরুদেবের কাছে গিয়ে মেয়ে হওয়ার সংবাদ দিলেন। মেয়ের জন্য নাম চাইলেন। গুরুদেব বললেন, 'তোর বাড়ির নাম তো দিয়েছি 'চিত্রলেখা', মেয়ের নাম রাখ কলিকা', মুকুলের মেয়ে 'কলিকা' বেশ হবে।' আমি তখন কলকাতায়, উনি এসে বলতে বেশ খুশি হয়ে জোড়াসাঁকোয় গেলুম ছোটবাবুকে (অবনঠাকুরকে) মেয়ে দেখাতে প্রণাম করতে। ছোটবাবু ছোটমা দু'জনেই মেয়ে দেখে খুব খুশি। ছোটবাবু জিগেস করলেন, 'মেয়ের নাম কি রাখলি রে?'

উনি বললেন, 'গুরুদেব দিয়েছেন কলিকা'।

ছোটবাবু জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, 'কিসের কলিকা রে? ফুলের কলিকা না গাঁজার কলিকা? ওরে খবরদার মেয়ের নাম কলিকা রাখিসনে। তোর পদবি দে। ইস্কুলে তোর মেয়েকে সবাই খ্যাপাবে 'কোলকে দে' 'কোলকে দে' বলে!'

আমি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললুম, 'তা হলে কি নাম রাখা হবে? আপনি নাম দিন।'

একটু ভেবে বললেন, 'মেয়ের নাম রাখ 'মঞ্জরী' রবিকার নামের মানেটা ঠিক থাকল, মুকুলের সঙ্গেও মিল হল।'

আমি বলে উঠলুম, 'আমি তো আগেই মঞ্জরী বলেছিলুম, উনি বললেন পুরনো সেকেলে নাম।'

ছোটবাবু হেসে বললেন, আমিও তো পুরনো সেকেলে মানুষ, তাহলে

আমাকেও তো বাদ দিতে হয়।'

উনি তাড়াতাড়ি ছোটবাবুর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'না না, মঞ্জরী নামই থাকবে। আপনি লিখে দিন'—বলে কাগজ কলম এগিয়ে দিলেন, ছোটবাবু লিখে দিলেন।

গুরুদেবের দেওয়া 'কলিকা' নাম উনি ফেলেন নি, পরে ওঁর স্টুডিওর নাম রাখলেন 'কলিকা'। 'কলিকা' স্টুডিওতে বাপুজী এসেছিলেন। পণ্ডিত নেহরুও এসেছিলেন। আচার্য তুলসী, সুশীল মুনিও এসেছিলেন এই স্টুডিওতে।

প্রায় বছর দুই পরে আবার শান্তিনিকেতনে গেছি। মেয়ের তখন প্রায় আড়াই বছর বয়েস, বেশ হাঁটতে পারে। গুরুদেব তখন 'শ্যামলী'তে আছেন। মেয়ের হাত ধরে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালুম। মেয়েকে দেখে বেশ খুশি। বললেন, 'সুন্দর মেয়ে হয়েছে। আমি প্রণাম ক'রে উঠে মেয়েকে যত বলছি, 'নোমো কর, নোমো কর'—মেয়ে কিছুতেই প্রণাম করছে না। ঘাড়বেঁকানো ঘোড়ার মতো গুরুদেবের হাঁটুতে হাত দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। গুরুদেব হেসে আমাকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'আঃ কেন ওকে জোর ক'রে মাথাটা নিচু করার চেষ্টা করছ ? যে ক'দিন পারে, থাক্ না মাথাটা উঁচু ক'রে'—বলে মেয়ের হাতে একটি লজেন্স দিলেন। গুরুদেবের লেখার টেবিলের উপরেই একটি কাঁচের বয়েমে লজেন্স ছিল। আমি বললুম, 'আশীর্বাদ করুন, যেন ভালো হয়।'

হেসে বললেন, 'তুমি বলার আগেই আশীর্বাদ হয়ে গেছে।' বলে মেয়ের মাথায় হাত দিলেন। আমি প্রণাম ক'রে চলে আসছি, মেয়েকে বলছি, 'চল বাড়ি চল,' সে আসবে না—হাঁটুতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

হেসে বললেন, 'ও আরেকটা না পেলে, যাবে না'—বলে মেয়ের হাতে আর একটা লজেন্স দিলেন। মেয়ে হাঁটু ছেড়ে দিয়ে গুট্ গুট্ ক'রে বেরিয়ে এল। দোরের কাছে এসে আর একবার গুরুদেবের দিকে ফিরে তাকালুম। দেখি, আমাদের দিকেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

৩

প্রায় বছরখানেক পরে গুরুদেব জোড়াসাঁকোয় আছেন, দেখতে গেলুম। মেয়েকে বাড়িতে আমার কাছে রেখে এসেছি, উনি আমায় নামিয়ে দিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করেই কোথায় কাজে চলে গেলেন, বলে গেলেন, ফেরার পথে তুলে নেবেন।

গুরুদেব লালবাড়িতে বিচিত্রা হলে বসে আছেন। সকালবেলা প্রায় দশটা হবে। কাছে বিশেষ কেউ নেই। যাঁরা দু'একজন ছিলেন একে একে এগারোটার মধ্যেই উঠে গেলেন। দু'একজন ভৃত্য বা সাহায্যকারীর মতো লোক আসছে যাচ্ছে। আমার সৌভাগ্যক্রমে সেই দিন আমার রুদ্ধকণ্ঠ থেকে একটু বাক্‌শক্তি

পেলুম, কথা বলতে পারলুম। গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলা আমার সেই দিনই প্রথম আর সেই দিনই শেষ।

বসে থাকতে থাকতে সাহস ক'রে জিগেস ক'রে ফেললুম, 'আচ্ছা, মানুষ যা চায় সব পায়? আপনি যা চেয়েছিলেন, সব পেয়েছেন?'

বললেন, 'পেয়েছি। সবটা পাই নি, কিছুটা পেয়েছি।'

তবু বলতে পারলুম না মুখ ফুটে যে, আমি একবার আপনাকে দেখতে চেয়েছিলুম, এখন এত কাছে পেয়েছি।

মুখে বললুম, 'চাওয়া জিনিসটা কি মন্দ?'

বললেন, 'কে বলেছে মন্দ? চাওয়া তো মানুষেরই ধর্ম। তুমি যদি না চাও, তো তুমি পাবে কি ক'রে? হবে কি ক'রে? তুমি চলবে, পড়বে, দেখবে, শুনবে, গাইবে,নাচবে, রান্না করবে, খাওয়াবে—এ সবই তো চাওয়া; মানে ইচ্ছা করা। তোমার ইচ্ছা তোমার চাওয়া যদি না থাকে, তো তুমি চলবে পড়বে দেখবে শুনবে গাইবে নাচবে রান্না করবে খাওয়াবে কি ক'রে? চাইতে হবে বৈকি।'

বললুম, 'তবে যে গীতায় আছে কিছু চাইবে না। নিষ্কাম ভাবে সব করবে—'

বললেন, 'হ্যাঁ গীতায় আছে আসক্তি ত্যাগ ক'রে কাজ ক'রে যাও। ফলের আশা ত্যাগ ক'রে কাজ কর। তার মানে এ নয় যে তুমি কিছু চাইবে না। তার মানে হচ্ছে তুমি তোমার ক্ষুদ্র তুমিত্বকে বাদ দিয়ে কাজ কর। তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত সুখ, ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য ক্ষুদ্র লোভীর মতো না চেয়ে, উপরের দিকে চাওয়াকে জাগিয়ে তোলো। সমষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে তোমার ইচ্ছা তোমার আকাঙ্ক্ষা হোক। দেখবে তুমি তোমার মনকে তোমার ঊর্ধ্বে জাগিয়ে তুলতে পারলে, তখন কোনো বাইরের অবস্থাই তোমার বাধা হবে না। দেখ, কত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে শান্তিনিকেতন আশ্রমের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখো, দেখবে আরো বড় হবে, আরো বাড়বে। কারণ আমি তো আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইচ্ছা করি নি, ইচ্ছা করেছি ভেবেছি চেয়েছি সকলের জন্য ব্যাপকভাবে। তাই সকলকে পেয়েছি। তোমরা এসেছ, আরো কত আসবে। ইচ্ছা করবে চাইবে সকলের জন্য। আমার ভালো হোক না চেয়ে, চাইবে সকলের ভালো হোক।'

প্রায় সাড়ে এগারোটায় উনি এলেন। আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। সেই পূর্ণতা, সেই আনন্দ-স্মৃতিই আজ আমার এই দীর্ঘ জীবনের চলার পথে পাথেয় শক্তি।

৪

এর পর গুরুদেবকে আর আমার ভালো অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য হয় নি। দেখলাম একেবারে রোগশয্যায়।

আমার স্বামীর কি একটা মিটিং ছিল দিল্লিতে, সঙ্গে কন্যাসহ আমিও ছিলুম। ইচ্ছা ছিল দিল্লির দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে আসব। কিন্তু দিল্লিতে মিটিং চলাকালীনই কাগজে না কিসে খবর পেলেন, গুরুদেব খুব অসুস্থ, তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই খবর পাওয়ামাত্র ভীষণ মন খারাপ। বারংবার বলতে লাগলেন, 'সব গুছিয়ে তৈরি থাকো। মিটিং শেষ হওয়া মাত্রই চলে যাব কলকাতায়, রথীদা গুরুদেবের মন না বুঝে যদি অপারেশনে করতে মত দেন, তাহলে গুরুদেবকে আর বাঁচানো যাবে না '

আমরা উঠেছিলুম 'হোটেল সিসিল'-এ। ম্যানেজারকে বলে দিলেন– পনেরো দিনের জন্য ঘর বুক করেছিলুম, কিন্তু পনেরো দিন থাকা হবে না। আমরা দু'তিনদিনের মধ্যেই চলে যাব।

সারা ট্রেনপথই ঐ এক কথা, প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে এলেন। কিন্তু হলে হবে কি। এসেই শুনলেন– অপারেশন হয়ে গেছে। ছুটলেন জোড়াসাঁকোয় গুরুদেবকে দেখতে, সঙ্গে আমাকেও নিলেন।

দোতলার বারান্দায় বহু লোক। গুরুদেব নিজের ঘরে খাটে চোখ বুজে শুয়ে। ঘরের মধ্যে সুরেন কর, বীরেন সেন, রানী চন্দ, অমিতা ঠাকুর, নন্দিতা (গুরুদেবের দৌহিত্রী) এরা বিছানার পাশে।

উনি পিছনে কোমরের নিচে একটা কারবাংকল হয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তখন, তা সত্ত্বেও আমায় নিয়ে তার পরদিনই আবার গেলেন জোড়াসাঁকোয়। ঘরের মধ্যে ঢোকার আগেই কেমন একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল। বাড়িভরতি লোক। গুরুদেবের ঘরে ঢোকা দায়। কোনোরকমে একনজর দেখেই উনি আমায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সোজা গাড়িতে উঠে চলে এলেন স্কুলে। এসে স্কুলে ঢুকেই বোর্ডে লিখে দিলেন– গুরুদেবের জন্য স্কুল ছুটি। অফিস বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েই আবার জোড়াসাঁকোয়।

গাড়িতে বসে ওঁকে জিগেস করলুম, 'তুমি যে নোটিসবোর্ডে লিখে ছুটি দিয়ে এলে, যদি গুরুদেবের কিছু না হয়, তাহলে?' উনি বাধা দিয়ে বললেন, 'দেখতে পেলে না কী অবস্থা গুরুদেবের? উনি আর বেশিক্ষণ নেই। ঐ আওয়াজটা তো ওঁর শ্বাসকষ্টের।'

বলতে বলতেই গাড়ি জোড়াসাঁকোয় পৌছল। বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য। উনি আমাকে এ বাড়িতে ছোটবাবুর কাছে পৌছে দিয়েই ওবাড়ি চলে গেলেন, সেই জনসমুদ্র ঠেলে, একেবারে দোতলায়। গুরুদেব তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

গেটের কাছে সারা কলকাতা যেন ভেঙে পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গেটও ভেঙে পড়ল। আমরা এ-বাড়ির দোতলা থেকে দেখছি। এ-বাড়ির দোতলায় অনেক দর্শক আমরা, সবাই নির্বাক। ও-বাড়ির বারান্দাও ভর্তি– নীরব, নিস্তব্ধ!

বাড়ির সামনে, পথে গোলমাল ঠেলাঠেলি হৈ হৈ 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ' চিৎকার। বাড়ির গেটের ভিতর থেকে রাস্তা পর্যন্ত যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষের মাথা। উন্মত্ত জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জনতাকে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! উন্মত্ত জনতা-স্রোত রোধ করে কার সাধ্য!

উপর থেকে নন্দদা, সুরেন কর, বিশ্বরূপের তৈরি শেষশয্যায় শায়িত গুরুদেবকে উনি, সুরেন কর, বীরেন সেন, সুবীর ঠাকুর কাঁধে ক'রে নামিয়ে আনছেন, সিঁড়ির শেষধাপে পৌঁছতে না পৌঁছতে উন্মত্ত জনতা চিৎকার ক'রে—'রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র তাঁর পরিবারের বা শান্তিনিকেতনের নয়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের'—বলে চিৎকার করতে করতে ভাঙা গেট ঠেলে ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে ছোঁ মারার মতো ক'রে গুরুদেবের দেহ-শায়িত খাট কেড়ে নিয়ে একেবারে চোখের নিমেষে রাস্তায়! মনে হল যেন জন-সমুদ্রের উপর দিয়ে নৌকায় ভেসে গেলেন রবীন্দ্রনাথ।

এ-বাড়ির বারান্দায় জানলায় বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবুর পরিবারস্থ আমরা সকলে, আরো অনেকে বসে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে, কারো মুখে কথা নেই। মহর্ষিভবনের বারান্দাও লোকে ভর্তি। তার মধ্যে রথীদাও বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে। মুহূর্তে সব শব্দহীন, স্তব্ধ।

উনি এসে দাঁড়ালেন রক্তবর্ণ মুখ, ঘর্মাক্ত দেহ। নীরবে উঠে এসে ওঁর সঙ্গে গাড়িতে বসলুম। বিরাট জনস্রোতের পিছু পিছু ধীরগতিতে গাড়ি চলল। জনসমুদ্রের উপরে ভাসমান গুরুদেবকে কখনো দেখা যাচ্ছে, কখনো দৃষ্টির অন্তরালে। এইভাবে অনুগমন ক'রে পরে রাস্তা বদলেও শেষপর্যন্ত গাড়ি শ্মশান-সীমার মধ্যে ঢোকানো সম্ভব হল না। বাঁদিকে পথের একপাশে রেখে, ড্রাইভার-কে নামতে বারণ ক'রে পাগলের মতো দোর খুলে বেরিয়ে উনি সেই জন-সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেলেন। আমি শোক ও শংকা দুই নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইলুম সেই উদ্দাম জনস্রোতের দিকে চেয়ে।

প্রায় আড়াই-তিন ঘণ্টা পরে উনি ফিরলেন, ঘর্মাক্ত দেহ, রক্তবর্ণ মুখ, নিষ্পেষিত কারবাংকলের রক্তমাখা কাপড় পরে, সঙ্গে এক সর্বশুক্লা সরস্বতী শিশিরভেজা রজনীগন্ধার মতো তন্বী সুন্দরী শোকাচ্ছন্না মহিলাকে নিয়ে। মহিলা যেমন সুন্দরী, তেমনি স্নিগ্ধ, মৃদু থর থর ক'রে তখনো কাঁপছেন। চোখের জলে ঘামে তাঁর সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র, জামা, উত্তরীয় ভিজে গেছে। মাথার কাপড় খুলে গেছে, চুল ছেলেদের মতো ক'রে ছাঁটা। নিরাভরণা হাতের মুঠিতে কয়েকটি শাদা পদ্মফুল ধরে আছেন। আমার পাশে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে, উনি গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসলেন।

কথা বলতে বলতে জানতে পারলাম মহিলার নাম অদিতি দেবী। ঠাকুর-

বাড়ির দৌহিত্র বংশের মেয়ে, ঠাকুরবাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের অল্পকাল পরেই বিধবা। দাদা অবনী ব্যানার্জি ব্যারিস্টার। উনি তাঁর কাছেই থাকেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ সংবাদ পেয়েই জোড়াসাঁকোয় না গিয়ে দাদা বৌদির সঙ্গে বাড়ির গাড়িতে সোজা শ্মশানেই এসেছিলেন পদ্মফুল নিয়ে। অপেক্ষা করতে থাকেন ফুল দিয়ে প্রণাম করার জন্য। কিন্তু আগে থেকে এসে থাকলে কি হবে, গুরুদেবের দেহ আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভিড়ের চাপ ও কোলাহল শুরু হল যে ওঁরা কে কোথায় ছিটকে পড়লেন। ভিড়ের চাপে দলছাড়া হয়ে হারিয়ে গেলেন। না পেলেন গুরুদেবের দেহের কাছে গিয়ে ফুল দিতে, না পেলেন দাদা বৌদি ভাইপোকে দেখতে। দলছাড়া হয়ে ভিড়ের ধাক্কায় যখন প্রায় পড়ে যাবার মতো অবস্থা, তখন উনি দেখতে পেয়ে ভিড় থেকে টেনে বার ক'রে এনে বাঁচালেন। এই মুক্ত বাতাস পেতে আর একটু দেরি হলেই অজ্ঞান হয়ে যেতেন—এমন অবস্থা!

পরে শুনেছি—রথীদা শ্মশানে আসতেই পারেন নি। সুবীর ঠাকুর রাস্তা দিয়ে এসে ঢুকতে না পেরে, শেষে গঙ্গা পার হয়ে শ্মশানে এসে মুখাগ্নি করেন!

বাসায় এসেই উনি অবনীবাবুকে ফোন ক'রে দিলেন - ওঁরা যেন চিন্তা না করেন। অদিতি দেবীকে উনি ভিড় থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসেছেন। সুস্থ আছেন। ওঁরা যেন ২৮ নম্বর চৌরঙ্গিতে এসে নিয়ে যান।

রাত প্রায় ন'টার সময় এসে মিস্টার অবনী ব্যানার্জি তাঁর বোনকে নিয়ে গেলেন এবং সেই থেকে প্রায়ই আসতেন বেড়াতে। অদিতি দেবী তো সেইদিন থেকে আমাদের চিরদিনের বন্ধু হয়ে গেলেন। এমন কি ১৯৪৩ সালে উনি যখন কর্তৃপক্ষর সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় অসময়ে পেন্সনের দরখাস্ত দিয়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে; কায়েমীভাবে আশ্রমবাসী হলেন; তখন অদিতি-দেবীও পূর্বপল্লীতে জমি নিয়ে খড়ের চালের কুটির বানিয়ে কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনবাসিনী হলেন। পরে, আমাদের গুরুভগ্নীও হলেন। সে কথা পরে বলার ইচ্ছা রইল।

এখন গুরুদেবের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথার পরই ওঁর শিক্ষাগুরু শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আগে বলে নি। জানি না কতটুকু কি বলতে পারব।

৫

সাগর-স্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ। অতল অপার অসীম সমুদ্রের মতোই ছিলেন অবন ঠাকুর। সাগর-স্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ কি সাধে বলছি? সমুদ্রের মতোই ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা আর সমুদ্রের মতোই অতল অপার তাঁর ভাব-তরঙ্গ। সমুদ্র কি মাপা যায়? শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কথাও বলে শেষ করা যায় না।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে আমি যা আদর যত্ন স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি, তাও বলে শেষ করা যায় না।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখে আমার মনে হয়েছিল—যেন হিমালয়। হিমালয়ের মতোই নির্বিকার মহিমময় সৌন্দর্যে ভরা অনন্ত সুন্দর। যাঁর প্রসন্ন দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালে বাক্য স্তব্ধ হয়ে মাথা আপনি নত হয়ে যায়।

অবনীন্দ্রনাথকে মনে হতো যেন সমুদ্দুর। সমুদ্দুরের সামনে তীরে বসে, খেলা কর, ঝিনুক কড়ি কুড়িয়ে আঁচল ভর, বালি খুঁড়ে মন্দির গড়, খুব মজা। অবগাহন করতে চাও ভয় ছেড়ে নেমে পড়, আরো মজা। সমুদ্রে নামলে যেমন সময়ের জ্ঞান থাকে না, ছোটবাবুর সামনে বসে কথা শুনলেও তেমনি সময়ের জ্ঞান থাকত না—ঢেউয়ের পরে ঢেউ, অগুন্‌তি ভাব-তরঙ্গ। শেষ নেই।

আমরা প্রায়ই যেতুম বিকেলে জোড়াসাঁকোয়। ছোটবাবু সবুজ লুঙ্গি পরে তাঁর ইজিচেয়ারে বসে, ছোটমা তাঁর খাটে কখনো শুয়ে কখনো বসে। ছোট-বাবুর পায়ের কাছে তাঁর 'পোড়ারমুখী' বসে। না, 'পোড়ারমুখী' কোনো মেয়ে নয়, একটি অতি কদর্য বেড়াল। তার একটি চোখ কানা। গায়ে কেউ গরম জল ঢেলে দিয়েছিল, খানিকটা লোম ওঠা। ধূসর রঙের খোঁচা খোঁচা খসখসে লোম, দেখলে ঘেন্না করে। সেই তাঁর অতি আদরের 'পোড়ারমুখী'! তাঁর শুঁড় ওলটানো তালতলার চটির উপর পায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যার পর গেলে এই দৃশ্য। আর মারুতির পুঁথির গল্প। তখন পুঁথি লেখা শুরু হয়ে গেছে। অন্দরের উঠোনে পুরনো রান্নাঘরের পাশে ভাঙা বাথটবের মধ্যে লাগানো পেঁপেগাছ বেশ বড় হয়ে উঠেছে। পেঁপেতলায় গাঁদালকুঞ্জের মধ্যে তাঁর চাঁইবুড়ি আর চ্যাংড়াবুড়ো পাশাপাশি বসে গেছে।

শনি রবিবারে যেতুম সকাল ক'রে। তখন দেখতে পেতুম দক্ষিণের বারান্দায় নিজের চেয়ারে বসে কুটুম কাটাম গড়ছেন। নয়ত প্যাস্টেল দিয়ে ছবি এঁকে চলেছেন। তা সে ব্রাউনপেপার হোক, পিচবোর্ড হোক, হাতের কাছে চোখের সামনে যা পেতেন তাতেই। কাগজের কোনো বাছবিচার নেই। একদিন প্যাস্টেল দিয়ে আমার পোর্ট্রেট এঁকে দিলেন বেশ বড় একখানি পিচবোর্ডের উপর। ওঁরও তাই। ছবি দু'খানি এখন দিল্লির ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে আছে।

রবিবারে আমরা বেশিরভাগ সময় সকালের দিকেই যেতুম। সকাল প্রায় ন'টায় গিয়ে দেখতুম ছোটবাবু দক্ষিণের বারান্দায় তাঁর চেয়ারে বসে একমনে কুটুম কাটাম গড়ছেন, চেয়ারে শেকল দিয়ে বাঁধা মস্ত বড় এক কাঠের গুঁড়ির কুকুর। আর তাঁর ক্যালামেয়ে যাকে আমরা 'কুড়ুনি' বলতুম, সে বাগানে ঘুরে ঘুরে যত ফেলেদেওয়া জিনিস—ভাঙা কাঁচ, কাঠের টুকরো, শুকনো আমের আঁটি, সুপুরির খোলা, সিগারেটের বাক্সর রাংতা সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে ওঁর কাছে দিচ্ছে। আর উনি সেইসব ফেলেদেওয়া জিনিস দিয়ে রূপকথার রাজত্ব

গড়ে তুলছেন - সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলছে – দানও হচ্ছে। একদিন পেলুম 'পাথরের প্রজাপতি', একদিন পেলুম 'কাফ্রিডান্স'। গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নামকরণও হয়ে যাচ্ছে। অফুরন্ত প্রাণ-রস, অনন্ত ভাব-তরঙ্গ!

আমার বিয়ের পর সবচেয়ে বড় আপনজন ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সবচেয়ে বড় সহায়তা, স্নেহ, আশ্রয় আশীর্বাদ পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে। সকলের কাছে 'আমার বৌমা' বলে পরিচয় দিতেন আমার। ভালো বাসতেনও তেমনি। নিজের পুত্রবধূরই মতন।

আমাদের বিয়ের দু'তিন বছর পরের কথা। আমাদের বিয়েতে যিনি পৌরোহিত্য করেছিলেন, গিরিজাকান্ত গোস্বামী, তিনি খুব বড় পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনিও আমায় নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। আমি একদিন তাঁকে আমাদের বিয়ের ফলাফল কেমন জিগেস করায় তিনি বললেন, – 'বিয়ের ফল খুবই ভালো – পক্ষপুটে যথা রক্ষেৎ শাবকশ্চ বিহঙ্গমী – তেমনিভাবে তুমি সর্বদা রক্ষা করবে। তবে তোমার উনত্রিশ বছর সাতমাস বাইশ দিনে খুব বড় একটা ফাঁড়া আছে ওঁর। সেই দিনটা ওকে সাবধানে থাকতে ও রাখতে হবে। ওঁকে কিছুতেই বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না। ওঁর বাইরে মৃত্যু। তুমি ওঁর বিছানা ছাড়বে না, সর্বদা পাশে থাকবে; তা হলে ফাঁড়া কেটে যাবে।'

আমার ওঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে প্রায় সাতাশ বছর বয়সে। আমি তো সমানে দিন গুনছি। আশ্চর্য গণনা। ১৯৩৪ সাল। ঠিক যেদিন আমার উনত্রিশ বছর সাতমাস বাইশ দিন, সেদিন ওঁর জাপানি বার্বার এল চুল ছাঁটতে। বার্বার ফুজিমোতো মাসে দু'বার আসত চুল ছেঁটে ম্যাসাজ ক'রে দিয়ে যেত। সেদিন উনি চুল ছাঁটার পরে অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে পেটে ম্যাসাজ করালেন। বললেন – পেটের ডানদিকে বোধহয় লিভারে ব্যথা করছে, ম্যাসাজ করলে ভালো লাগছে। আমার কিন্তু ঐ ভাবে ম্যাসাজ করানোটা ভালো লাগে নি। যাই হোক, ম্যাসাজ ক'রে টাকা নিয়ে বার্বার বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণা, হাত পা ঠাণ্ডা, প্রস্রাব বন্ধ। অবস্থা সাংঘাতিক, প্রায় সংজ্ঞাহীন। আমাদের সঙ্গে ছাত্র ছিল তখন সুশীল সেন, পূর্ণেন্দু বোস, রাধা বাগচী। নির্মল মুখুজ্যে বিয়ে হওয়াতে বাড়ি গিয়েছিল। পূর্ণেন্দুরা প্রাণপণে সেবা করছে, হাতে পায়ে গরম জলের ব্যাগ, বোতল দিয়ে সেঁক দিচ্ছে, কিন্তু ওঁর আদেশ পালন করছে, ডাক্তারকে খবর দিচ্ছে না। আমি কারো কথা না শুনে ডাক্তারকে ফোন করলুম। ওঁর পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ স্ট্যানলি নেরন যখন এলেন প্রায় সন্ধ্যা। এসে নানারকম পরীক্ষাদি ক'রে বললেন, অ্যাপেণ্ডিক্স বার্স্ট করেছে। ইমিডিয়েট্‌লি অপারেশন করা দরকার। এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

আমি পড়লুম বিপদে। আমার মনের মধ্যে তখন অবিশ্রান্ত গুঞ্জন চলছে: বাড়ির বাইরে যাবে না, বাইরে মৃত্যু। বিছানা ছাড়া হবে না – ইত্যাদি। আমি যত

বলি, 'না, আজ রাতে নয়, কাল সকালে যাবেন হাসপাতালে' – ডাক্তার ততই রেগে যায়। শেষ পর্যন্ত রাগে লাল হয়ে ঘামতে শুরু করলেন, মুখে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আমি আর উপায়ান্তর না দেখে, পাছে আমার কথা না শুনে জোর ক'রে নিয়ে যায় – ডাক্তারের কর্তব্য রোগীর প্রাণ বাঁচানো – বলে, তাহলেই তো গেছি।

আমি জোড়াসাঁকোয় ফোন করলুম। পারুলদি ধরতেই বললুম, 'খুব বিপদ ওঁর অবস্থা সাংঘাতিক, ছোটবাবুর সঙ্গে কথা বলব।' ছোটবাবু অর্থাৎ অবন-ঠাকুর এসে ফোন ধরতেই আমি সব খুলে বললুম। বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। বললেন, 'কাঁদিসনি, জোর ক'রে বল্ কিছুতেই এই রাতে নেওয়া হবে না। তোর অমতে কিছু করা হবে না। তুই ভয় পাস নি। এখুনি ব্যবস্থা করছি।'

আমি ফোন ক'রে অফিসঘর থেকে রোগীর ঘরে আসার আধঘণ্টার মধ্যেই দেখি সেই রাতে গগন ঠাকুরের বড়ছেলে কনক ঠাকুর, অবন ঠাকুরের বড় ছেলে অলক ঠাকুর, তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক ক্যাপ্টেন সুশীল চ্যাটার্জিকে নিয়ে উপস্থিত। কনকদা অলকদাকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ এল। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি এসে সব দেখে-শুনে ডাঃ নেরনের সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে বললেন, 'খুবই ঠিক কথা, ইমিডিয়েটলি অপারেশন করা এবং সেজন্য এখন হস্পিট্যালে নিয়ে যাওয়া খুবই দরকার, কিন্তু ওঁর স্ত্রীর যখন এত প্রবল আপত্তি, তখন সেটাও তো শুনতে হবে। কাজেই এখনই অ্যাম্বুলেন্স না ডেকে, ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব বার ক'রে দিলে, হয়ত কিছুটা রিলিফ হবে। তারপর ভোর হয়ে গেলেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। তখন রাত দশটা বেজে গেছে। প্রায় এগারোটা বাজে। ডাঃ নেরন নিজেই গেলেন ক্যাথিটার আনতে। একমাত্র 'ফ্র্যাঙ্ক রস' খোলা। সবচেয়ে যা সরু ক্যাথিটার তাই নিয়ে এসে প্রস্রাব করিয়ে দিতে অনেকটা সম্বিত ফিরে পেলেন। একটা দু'টো কথাও কইলেন, জল খেলেন।

ডাঃ নেরন 'গুডনাইট, সকালে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি 'ভয় নেই' বলে কনকদা অলকদাকেও বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ওঁকে একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে আমাকে বললেন, 'ভয় নেই। উনি এখন ঘুমোবেন, আপনি খাওয়া দাওয়া করুন। আমি তো এই কাছেই থাকি, দরকার হলে পার্ক নার্সিং হোমে ফোন করলেই আমি চলে আসব। দরকার হবে না। আমি সকালেই চলে আসব, ভয় নেই' – বলে চলে গেলেন। আমি ওঁর বিছানাতে বসেই ফিরিঙ্গিরাম যা এনে দিল, একটু খেলুম। ছেলেরাও খেল। তিন ছেলে পালা ক'রে এক একজন ক'রে সারারাত আমাদের কাছে থাকল।

পরদিন সকালে দেখি আটটার মধ্যেই ডাঃ নেরন এসে গেছেন। ক্যাপ্টেন

চ্যাটার্জিও। অ্যাম্বুলেন্সও হাজির। অ্যাম্বুলেন্স দোরে থাকতে থাকতেই দেখি, ওমা, ছোটবাবু নিজে উপস্থিত!

ছোটবাবু এসেই আমার হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে বললেন, 'তোর কাছে রেখে দে, কখন কি দরকার হয়। ভয় নেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' আমি অবাক। কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ। একটা কথাও বলতে পারলুম না। শুধু প্রণাম করলুম।

অ্যাম্বুলেন্সে ওঁর সঙ্গে ডাঃ নেরন আর দু'জন ছাত্র গেল। আমায় নিল না। আমি পরে গেলুম বাড়ির গাড়িতে। ছোটবাবু অফিস-ঘরে বসে থেকে অফিস খুললে রমেন চক্রবর্তীকে ডেকে ওঁর সামনে বসে সব চার্জ বুঝে নিতে বললেন। অপূর্ব চন্দ তখন ডি. পি. আই। ফোন ক'রে অপূর্ব চন্দকে ডেকে ওঁর ছুটির ব্যবস্থা এবং অসুস্থ থাকাকালীন মাইনে পাবার ব্যবস্থা ক'রে আমার শাশুড়িকে ও দুই দেওর পরাগ ও মনীষীকে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা ক'রে, তিনকড়িবাবুকে সব বলে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর গেলেন। যতদিন উনি হাসপতোলে ছিলেন, রোজ দু'বেলা ফোন ক'রে খবর নিতেন। প্রতিদিন এক জন ক'রে লোক পাঠাতেন সব দেখে যাবার জন্য। কে করে এত! এ জিনিস কখনো ভোলবার নয়। কত বলব।

৬

১৯৩৫ সাল আমি অন্তঃসত্বা। ভয়ানক অরুচি। কিছু খেতে পারি না। সারাক্ষণ বমি। ছোটবাবুর উদ্বেগের অন্ত নেই আমার জন্য। কখনো ধনে পলতা সেদ্ধ ক'রে খেতে বলছেন। কখনো নানা রকম জিনিসের স্যাণ্ডউইচ ক'রে পাঠাচ্ছেন, কিসে আমি একটু খেতে পারব। সুরমাদির বাবা কনকদা-র শ্বশুর অমরনাথ মুখার্জি খুব বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। তাঁকে বলে কয়ে তাঁর হাতে আমাকে সুস্থ ক'রে তোলার ভার দিলেন।

ডাঃ মুখার্জি বড় ভালো ছিলেন। যেমন সুন্দর সৌম্য চেহারা, তেমনি মধুর সহানুভূতি ভরা ব্যবহার। তাঁকে দেখলেই আমার যেন অর্ধেক অসুস্থতা সেরে যেত। আমি তখন সিগারেটের গন্ধ একেবারেই সইতে পারতুম না। আর আমার স্বামী তখন চেনস্মোকার। ঠোঁটে সদাসর্বদাই সিগারেট ঝুলছে। এক টিন গোল্ডফ্লেক অর্থাৎ পঞ্চাশটি সিগারেটের ধোঁয়া রোজ চাই। উনি ঘরে ঢুকলেই বলতুম, 'দয়া ক'রে বাইরে যাও।' ডাক্তার মুখার্জিকে একদিন সেকথা বলতে, উনি এক দিন ওঁকে বললেন, 'আপনি বেশি এঘরে ঢুকবেন না, হোমিওপ্যাথি ওষুধ তো, আপনি সবসময়েই সিগারেট খান তো।' কথাটা মনে হল ওঁর ভালো লাগে নি, একটু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তাহলে ওকে দেখবে কে?'

ছোটবাবু দেখেশুনে একদিন ওঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি কিছুদিন একলা

থাকো বাবা। বড়পুটি শান্তিনিকেতনে যেতে চাচ্ছে ওর সঙ্গে বীণাকে পাঠিয়ে দাও। তোমার ঘরে তো কোনো মেয়েমানুষ নেই, ওর এখন একটু ভালোমন্দ খাওয়া, যত্ন-পরিচর্যা পাওয়া দরকার—শরীরটা যাতে সেরে ওঠে। বড়পুটি হচ্ছেন সমর ঠাকুরের যমজ মেয়ের মধ্যে একজন মাধবিকা। উনি গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে মাধবীদি-র সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। মাধবীদি তাঁর স্বামী শচীন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য, তাঁদের ছোটমেয়ে আর আমাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। আমাদের এই খড়ের চাল মাটির বাড়ি চিত্রলেখা'তেই উঠলেন। মাধবীদি-র যত্নে আর নানারকম মুখরোচক খাদ্য বদল হতে হতে থাকায় একমাসের মধ্যেই আমার সেই নিদারুণ অরুচি ও মর্মান্তিক বমি প্রায় সেরে গিয়ে আমি বেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলুম। মাস দেড়েক পরেই উনি এসে আমায় কল-কাতায় নিয়ে গেলেন। মাধবীদি শচীনদা রয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে বাড়ি করার জন্য।

কলকাতায় আসার পর জোড়াসাঁকো থেকে প্রায়ই ভাজাভুজি, নানারকম মুখরোচক খাবারের আগমন ও দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ চলতে লাগল। একদিন অবাক হয়ে গেলাম দেখে—একটি বেশ বড় গোল থালায় সাতটি বাটিতে সাত রকমের আচারসহ এল সুন্দর জরিপাড় তাঁতের শাড়ি, ঢাকার উপরে লেখা 'সাতমাসের কাঁচা সাধ'—সরলা দেবী পাঠিয়েছেন। আমি অবাক অভিভূত। সরলা দেবীর কথা পরে বলার ইচ্ছা রইল। সরলা দেবী বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়ি এসেছেন, আমরাও গেছি ওঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে, 'ভারত-স্ত্রীমহা-মণ্ডলের' কথা শুনেছি। কিন্তু সব সময়েই একটু সমীহ ক'রে চলেছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভ্রমবোধ একটু যেন দূরে সরিয়ে রেখেছে। ওঁর তেজস্বী ভাবভঙ্গি কথা-বার্তার ধারাধরনে একটু যেন ভয়ভয়ও করেছি ওঁকে। ইন্দিরা দেবীর মতো অমন কোমল মধুর মনে হয় নি ওঁকে। ওঁর মধ্যে যে আমার জন্য এমন ফল্গুধারার মতো এতখানি মর্মস্পর্শী স্নেহধারা বইছে, কোনোদিনই বুঝতে বা ভাবতে পারি নি। শ্বশুরবাড়ি থেকে যা আদর যত্ন স্নেহ পাওয়ার তার চেয়ে বেশি পেয়েছি জোড়া-সাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে। কত বলব।

১৯৩৬-এর ১৭ই জুন মেয়ে হল। সপ্তাহখানেক পরে ইডেন হসপিটাল থেকে বাড়ি এসে দেখি—ওমা, ছোট ছোট ফ্রক, পেনি, কাঁথা, ন্যাপকিন এসে গেল ছোটবাবুর বাড়ি থেকে। পারুলদি নিজহাতে সব তৈরি ক'রে পাঠিয়েছেন। পিঠখোলা জামা, পা-ঢাকা লম্বা ফ্রক সব কিছুই।

৭

অবনঠাকুরের ছোট ছেলে 'টোটো'র বিয়ে, তোড়জোড় চলছে। গায়েহলুদের তত্ত্ব পাঠাবার সব সাজ সরঞ্জাম কেনাকাটা হচ্ছে। আমরা প্রায় রোজ বিকেলেই বেড়াতে যাই, দেখি। ছোটমা (সুহাসিনী দেবী) একদিন ওঁকে ডেকে বললেন, 'মুকুল, তুমি বৌকে দু'চারখানা জড়োয়া গয়না ক'রে দাও না কেন? বিয়েবাড়ি নেমন্তন্নবাড়ি শুধু সোনার গয়না পরে যায় আসে, আমার মনে কষ্ট হয়, খারাপ লাগে।'

উনি বাড়ি এসেই জিগেস করলেন, 'জড়োয়া গয়না কাকে বলে?' আমি হেসে বললুম, 'আচ্ছা আর্টিস্ট তো, তাও জানো না? ছবির মেয়েদের গায়ে তো অনেক জড়োয়া পরাও। লাল নীল সবুজ শাদা কত কি! হীরে মুক্তা চুনি পান্না বসানো গয়নাকে জড়োয়া গয়না বলে।' উনি তখনি জেদ ধরলেন, 'চল সাৎরাম-দাসে চল।' আমি কিছুতেই গেলুম না। উনি চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি—সাৎরামদাসের একজন কর্মীসহ এসে গেছে বেশ কিছু গয়না। টেবিলের উপর সাজিয়ে দিয়ে বললেন 'কোন্‌টা কি নেবে দেখে নাও।'

আমি অনেক ওজর আপত্তি ক'রে খরচের ধাক্কা বুঝিয়েও কিছুতেই ওঁকে নিরস্ত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওঁর মান রাখতে গেলুম গয়নার টেবিলের পাশে। অনেক উল্টে পাল্টে দেখে শুনে আমাদের সাধ্যমতো দামের মধ্যে একজোড়া চুনি মুক্তো বসানো চুড়ি আর জয়পুরী মিনার কাজ করা লকেট ও ফুল দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট মুক্তো গাঁথা তিনলহরি নেক্‌লেস একটি নিলুম। কানের গয়নার জন্য বার বার বলাতে বললুম, 'আছে'। সত্যিই ছিল, ভবানী লাহার বাড়ি থেকে বিয়েতে পেয়েছিলাম পোক্‌রাজ আর পান্না বসানো ইয়ারিং একজোড়া।

পরদিন প'রে গিয়ে ছোটমাকে দেখাতে খুব খুশি। বললেন, 'দেখ তো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে. খাসা মানিয়েছে!' চুড়িটি ঘুরিয়ে দেখে বললেন, 'আর দু'গাছা নিলে না কেন?' বললাম 'না, এই একজোড়াই ভালো। এতেই দু'মাস সময় লাগবে শোধ করতে।' হেসে বললেন ছোটবাবুর দিকে চেয়ে, 'বৌ বেশ হিসেবি আছে।' ছোটবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'ভালো, যা রয় সয় তাই করতে হয়।'

আমি তখন একা একা দোকানে গিয়ে কিছু কিনতে কাটতে পারতুম না। চৌর'ঙ্গর বাসায় একজন ট্যাস ফিরিঙ্গি মেম মোটরে চড়ে শাড়ি বেচতে আসত —সব জর্জেট শিফন ভয়েল। আমার জর্জেট শিফন পরতে একেবারেই ভালো লাগত না। কাজেই খুব একটা কেনা হতো না। যাও কেনা হতো, তা পরতে ভালো লাগত না। ফলে বিয়ের সময় যে ক'খানা মুর্শিদাবাদী সিল্কশাড়ি পেয়েছিলুম, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প'রে বেরোতুম।

একদিন ছোটমা জিগেস করলেন—এই গরমে রোজ সিল্কের শাড়ি প'রে আস

কেন? জর্জেট শিফন ও ফিরিঙ্গি মহিলার কথা শুনেই ছোটবাবু বলে উঠলেন, 'না না ওদের কক্ষনো বাড়ি ঢুকতে দিস নি, ঐসব ট্যাস মেয়েদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই। কি মতলবে ঢুকছে কে জানে! আমাদের ঐ তাঁতি ছেলেটাকে বলে দেব কাপড় নিয়ে যেতে।'

পরদিনই দেখে ওঁদের তাঁতিছেলে গুরুপদ নাথ এক বোঁচকা ধনেখালি, টাঙাইল শান্তিপুরী ঢাকাই শাড়ি নিয়ে হাজির। আমি তো বোঁচকা খুলে সব শাড়ি দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। তখনি তাড়াতাড়ি চারখানি ধনেখালি কিনে নিলুম ঘরে পরার জন্য। কি সুন্দর সে শাড়ি। হালকা তুঁতে, গোলাপী, নীল, চাঁপা রঙের খোলে চওড়া কালো পাড়ের উপর এক দেড় ইঞ্চি শাদা ধাক্কা দেওয়া। তেমনি মিহি খোল, ঝাড়া এগারো হাত শাড়ি—দাম শুনলে অবাক হবে। দশবারো থেকে ষোল টাকার মধ্যে। এখন সে রকম শাড়ি একশো টাকাতেও পাবে কিনা সন্দেহ।

গুরুপদও খুব অবনীন্দ্র-ভক্ত। কেনই বা হবে না? অবনী ঠাকুরের কথা শুনেই তো ওর এত উন্নতি। অনেকক্ষণ ধরে সব গল্প করল। গুরুপদ এসেছিল কলকাতায়, ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির ছবি দেখে ছবি আঁকা শিখতে। দু' তিন দিন মাত্র অবনঠাকুর তার কাজ দেখে তাকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখ, তুই তাঁতির ছেলে, তাঁত বোনাই তোর ধর্ম। সে গল্প শুনিস নি? নারদ এসে যখন তাঁতিকে স্বর্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁতি হাত নেড়ে বলেছিল, ঠাকুর, ও কথাটি বোলো না। তাঁতের ছেলে স্বর্গে গেলে তাঁত বোনা তো হবে না! তুই নিজের ধর্ম ছাড়িস নি। তাঁতবোনার মধ্যে মস্ত বড় আর্ট আছে। সেই পথ ধর। ছবি আঁকবি খেতে পাবি না। ছবির দাম কেউ দেবে না। হাত আছে, ভালো ভালো পাড়ের নক্সা কর, নতুন নতুন পাড়ের ডিজাইন কর, ভালো ভালো পাড়ের ডিজাইন সংগ্রহ ক'রে নিজে বুনে দেখা, অন্যদের শেখা। ভালো নতুন ডিজাইনের পাড় শাড়ি হু হু ক'রে বিক্রি হবে। সাপ্লাই করে উঠতে পারবি না।'

'সত্যিই তাই হয়েছে এখন এইসব শাড়ির এত চাহিদা, আমি দিয়ে উঠতে পারছি না, গ্রামেরও অভাব ঘুচেছে, সবাই বুনতে ব্যস্ত। আমি শুধু এখন ডিজাইন দি, অর্ডার দি, আর বিক্রি করি। কলকাতার প্রায় সব বড় বড় বাড়িই আমার ক্রেতা। ঠাকুরবাবুই ঠিক ক'রে দিয়েছেন' ইত্যাদি।

আমি সান্ধ্যসম্মিলনে ও বৈকালিক চায়ের আসরে যাবার জন্য দু'খানি ঢাকাই শাড়ি কিনলুম। একখানি হাল্কা গোলাপি জমির উপর শাদা ফুল ও জরির বুটি দেওয়া। আর একখানি গাঢ় নীল জমির উপর শাদা ফুলছড়ি নীল শাড়িখানা ছিল অপূর্ব সুন্দর। বেলুড় মঠের 'ট্যানটিন' (মিস ম্যাকলাউড) প্রায়ই আমাদের কাছে আসতেন। সেই নীল ঢাকাই শাড়ি দেখে তাঁর এত পছন্দ হল যে, গুরুপদকে অর্ডার দিয়ে বারোখানা শাড়ি করিয়ে আমেরিকায় নিয়ে গেলেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ তিন চার বছর পরেই দেখলুম, কলেজ স্ট্রিটের উপর গুরুপদ নাথের বেশ বড় দোকান হয়েছে। দোকানে শাড়ি ক্রেতার ভিড় বেশ। অবনঠাকুর যাকে ছুঁয়েছেন সেই সোনা হয়ে গেছে।

৮

গুরুদেব যাওয়ার পর থেকে এবাড়িতেও যেন ভাঙন শুরু হল। জোড়াসাঁকোয় গেলেই দেখতুম, পারুলদি জিনিসপত্র গোছানো নিয়ে ব্যস্ত। ছোটবাবু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, 'মায়ের বাড়ি ছেড়ে এবার মাসির বাড়ি যেতে হবে।'

বরানগরে 'গুপ্তনিবাস' ওঁদের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল। সেখানেই জিনিসপত্র সরানো হচ্ছিল। গুপ্তনিবাসকেই ছোটবাবু বলতেন 'মাসির বাড়ি।' একদিন ওঁকে বললেন, 'একখানা ক'রে পাথর খসাচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন আমার বুকের একখানা ক'রে পাঁজর খসে যাচ্ছে!'

'মাসির বাড়ি' যাবার দিন সকাল থেকে সে কী ব্যস্ততা। ভাবলে এখনো বুকের ভিতর মোচড় দেয়। ছোটবাবু ছোটমা আর ওঁদের নারায়ণশিলা আমাদের সঙ্গে আমাদের গাড়িতেই 'গুপ্তনিবাসে' গেলেন। পারুলদিরা আগেই রওনা হয়ে গিয়েছেন।

ছোটমা গুপ্তনিবাসে গিয়ে অসুস্থ হয়ে আর সুস্থ হতে পারেন নি। শেষ সংবাদ পেয়ে যখন গেলুম, দেখি দক্ষিণের বারান্দায় নিজের চেয়ারটিতে পাথরের মতো বসে আছেন। আমাদের দেখে বললেন,'এসেছো, যাও দেখোগে, এতদিনে চাঁদ রাহুমুক্ত হল।' দেখলাম ভিতরকার উঠোনে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন ছোটমা, রাঙা বেনারসী ঢাকা। মুখটুকু খোলা, যেন ঘুমোচ্ছেন পরম শান্তিতে।

আমরা রোজ না হলেও প্রায়ই যেতুম বরানগরে। 'গুপ্তনিবাস'ও বেশ বড় বাড়ি—মস্ত বাগান, বাগানের মধ্যে পুকুর, দক্ষিণ দিকে বেশ বড় বারান্দা। সবই ছিল, কিন্তু সেই জোড়াসাঁকোর পুরনো আবহাওয়াটা তো ছিল না। দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে কুটুম কাটামও গড়া হতো। 'মাসির বাড়ি'র পুকুরের দিকে পুবদিকের নোনা ও শ্যাওলাধরা দেয়ালে কতরকম যে ছবি দেখতেন। মাসির বাড়ির ফ্রেস্কোর বর্ণনা দিয়ে গল্পও করতেন। কিছুই দৃষ্টি এড়াত না। সবের মধ্যেই রূপ দেখতেন, অতি তুচ্ছ জিনিসেও রসের সঞ্চার হতো, রূপের প্রকাশ হতো। বিশ্বরূপের শ্রেষ্ঠ পূজারীর চোখে কোনোকিছুই তুচ্ছ ছিল না।

৯

বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়ে এলে শান্তিনিকেতনে। প্রায় রোজ বিকেলেই কোণার্কের পাশের চাতালে বসে গল্প করতেন; আমরা সবাই জড়ো হতুম গল্প

শুনতে। মাঝে মাঝে উনি হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন কলাভবনে, মাঝে মাঝে চলে আসতেন 'চিত্রলেখা'তে। উদয়নে ঢুকতে বাঁদিকের ছোটঘরটায় বসে 'কুটুম কাটাম'ও গড়তেন কখনো কখনো। এক দিন ঐরকম বসে 'কুটুম কাটাম' গড়ছেন, দেখতে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে, 'কেমন আছেন' জিগেস করতেই বলে উঠলেন, 'বন্ধনে পড়িয়া হনুমান, বলে রাম গেলাম গেলাম, যায় যাক্ প্রাণ থাকে যেন মান।' সঙ্গে সঙ্গে একটুকরো কাগজে ফাউণ্টেন পেন দিয়ে স্কেচ ক'রে হাতে দিলেন দানের শেষ নেই। এই রকম দানের স্কেচ যে রানী আর রতি পেটিট কত পেয়েছে, জানি না। সৃষ্টি ও দান সমানে চলেছে।

১৯৫১ সাল ৫ই ডিসেম্বর। খবর এল—অবনঠাকুর মহাপ্রয়াণ করেছেন। উনি আমায় নিয়ে তখনি রওনা হলেন। যখন আমরা পৌছলুম, তখন মাসির বাড়ি শূন্য। চলে গেছেন গঙ্গাতীরে শ্মশানে। আমরা আর বাড়িতে না ঢুকে সোজা শ্মশানে। ছোটবাবুকে তখন চিতায় শোয়ানো হয়েছে। খুব একটা ভিড় নেই। আত্মীয়স্বজন ও শিষ্য-প্রশিষ্যরা কয়েকজন। নীরব গম্ভীর মৌন পরিবেশ। গাছপালাও যেন শোকাচ্ছন্ন।

আমার পাশেই ছিলেন উনি দাঁড়িয়ে, হঠাৎ আমায় ঠেলা দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওগো দেখ দেখ কী আশ্চর্য!' ওঁর কথায় চমকে তাকিয়ে দেখি—ছোটবাবুর ডান হাতটি ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে। হঠাৎ একেবারে সোজা হয়ে মুহূর্তের মধ্যে আবার পড়ে গেল। উনি বললেন, 'আমাদের শেষ আশীর্বাদ ক'রে গেলেন।' ব্যাপারটি আর কেউ লক্ষ করেছিলেন কিনা জানি না। এ সম্বন্ধে আর কারো সঙ্গে কোনো কথাও হয় নি। হাতটি কিন্তু আশীর্বাদের ভঙ্গিতেই ছিল—আঙুলের ডগাগুলি ঈষৎ বাঁকানো। এখনো ভাবলে রোমাঞ্চ হয়।

আমরা শ্মশান থেকে সোজাই ফিরে আসি। আমি আর কখনো ছোটবাবুর 'মাসির বাড়ি' যাই নি। উনি গিয়েছিলেন শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে—একবাক্স উৎকৃষ্ট সিগার নিয়ে। ছোটবাবু চুরুট খেতে ভালোবাসতেন। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে সিগার দিয়ে আসার পর উনি আর ধূমপান করেন নি। সিগারেট তো আগেই ছেড়েছিলেন।

১০

সিগারেট ছাড়ার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমরা অজন্তা থেকে ফেরার পথে এলাহাবাদে কয়েকদিন ছিলাম। সেই সময়েই উনি পণ্ডিত নেহরুর ইন্দিরা গান্ধীর ও শিশু রাজীবের পোর্ট্রেট করেন। সেকথা পরে লেখার ইচ্ছা রইল। উপস্থিত সিগারেট ছাড়ার কথাটাই বলে নি।

আমরা এলাহাবাদে নেমে প্রথমে 'হোটেল কিনারো'তে উঠেছিলাম। তখন

শিল্পী ক্ষিতীন মজুমদার এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে আর্ট-এর অধ্যাপক। উনি গিয়ে দেখা করতেই ক্ষিতীনবাবু এসে আমাদের তাঁর বাসায় বাইকাবাগে নিয়ে গিয়ে তুললেন এবং আর কোথাও থাকা হবে না বলে দিলেন। বড় আনন্দেই ছিলাম আমরা ক'দিন বাইকাবাগে। চলে আসার আগে আমরা প্রয়াগে সঙ্গমে স্নান করতে গেলুম। ক্ষিতীনবাবু আমাদের সঙ্গে গেলেন, কিন্তু জলে নামলেন না। আমরা একটি নৌকা ভাড়া ক'রে সঙ্গমে গিয়ে তিনজনে জলে নামলুম। ক্ষিতীনবাবু নৌকায় বসে থাকলেন। কন্যাকে আগে কোলে ক'রে স্নান করিয়ে নৌকোয় তুলে দিয়ে আমরা দু'জনে ডুব দিতে লাগলুম। আমি সাঁতার জানি না, কাজেই নৌকো ধরে কোনোরকমে গোটা পাঁচেক ডুব দিয়েই উঠে পড়লুম। উনি সাঁতার জানেন, কাজেই সাঁৎরে সাঁৎরে বেশ ডুব দিতে লাগলেন। পরে কচ্ছপ তেড়ে আসতে দেখেই, তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে পড়ার জন্য জলে হাঁচড় পাঁচড় করছেন, কিন্তু মোটা ভারী দেহ নিয়ে কিছুতেই নৌকোয় উঠতে পারছেন না। যেই নৌকো ধরে ওঠবার চেষ্টা করছেন সেই নৌকা এমনভাবে কাৎ হয়ে যাচ্ছে যে মাঝি চেঁচিয়ে উঠছে। উনি কচ্ছপের ভয়ে জলের মধ্যে হাঁক পাঁক করছেন। আমি মজা ক'রে বললুম, 'প্রয়াগে স্নান ক'রে কিছু ত্যাগ করতে হয়; সেজন্য দেখ না অনেকে মাথা মুড়িয়ে ন্যাড়া হয়ে ফেরে, কিছু ত্যাগ কর মনে মনে, উঠতে পারবে।'

উনি বড় সরল বিশ্বাসী লোক ছিলেন। বললেন, 'হাঁ ছাড়লুম।' তারপর ক্ষিতীনবাবু ও মাঝির সাহায্যে কোনোরকমে নৌকোয় উঠে ভিজে কাপড়েই গোল্ডফ্লেকের কৌটোটি ক্ষিতীনবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে সিগারেট ছাড়লুম।'

ক্ষিতীন মজুমদার স্বভাবত একটু তোৎলা ছিলেন। ওঁর ব্যাপারে অবাক হয়ে আরো তোৎলা হয়ে গেলেন। ওঁর হাত ধরে বললেন, 'তা তা তা কি ক'রে হবে, আ আ আ আপনার এত-ত-ত দিনের অভ্যাস!' উনি হেসে বাধা দিয়ে বললেন, 'সিগারেট আর খাব না। হুঁকোয় তামাক খাব।'

সেই থেকে সিগারেট আর খান নি, কিন্তু হুঁকোয় তামাক খাবার জন্য যা সমারোহ আড়ম্বর শুরু হল—প্রায় প্রাণান্তকারী। গড়গড়া ফরসি, সট্‌কা, খেলোহুঁকো সব একে একে এসে হাজির। নানারকমের কল্‌কে, নানা ধরনের নল, নানান জাতের তামাক আসতে লাগল। গয়া, বালাখানা আরো কত কি? শুনেছি ওঁর পিতা অর্থাৎ আমার শ্বশুর মহাশয়ও বেশ তামাক-বিলাসী ছিলেন। তাঁর একটি রুপোর তৈরি ছোট পাইপ ছিল, গড়গড়ার নলের কাঠের মুখে সেটি লাগিয়ে তামাক খেতেন। উনি মায়ের কাছ থেকে সেই পাইপটি চেয়ে নিয়ে তার মুখ আবার সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিলেন, সেইটি নলের মুখে লাগিয়ে তামাক টানতেন। একটি জলচৌকিতে দু'টি ফোকর করা হল। তাতে

ছ'টি কল্‌কে সবসময় সাজানো থাকত। যখন যেটি চাই, তখনি সেটি ধরিয়ে দিতে হবে। তার জন্য একজন ঠায় মোতায়েন। একমাত্র কল্‌কে সাজানো তামাকের তদ্বির তদারক করাই তার কাজ। হুঁকোয় জলভরা, কল্‌কের ঠিক্‌রে তাওয়া ঠিক করা, সব মেজে ঘষে পালিশ ক'রে রাখা এই নিয়েই সে ব্যস্ত। একটি ফরমাস করার উপায় নেই তাকে। কল্‌কের উপর ঢাকা দেবার সরপোষই কত রকমের কত বাহারের।

এলাহাবাদ থেকেই তামাকের সরঞ্জাম কেনাকাটা শুরু হল। তারপর যেখানেই গেছেন, নানা রকমের কল্‌কে, গড়গড়া, নল, সরপোষ কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন রকমের বিচিত্র সংগ্রহ সরপোষই ছিল বেশি। দিল্লি, আগ্রা, পাটনা, মথুরা, বেনারস, মুরাদাবাদ, জয়পুর থেকে নানা রকমের নতুন পুরনো সুন্দর সুন্দর কারুকাজ করা সরপোষ কিনেছিলেন। পিতলের উপর রুপো ইন্‌লেড করা, তামার উপর সোনা রুপো ইনলেড করা বিচিত্র কারুকাজ করা সব সরপোষ। ধূমপানের জন্য মহা ধূমধাম।

সেই ধূমধাম একেবারে বন্ধ হয়ে গেল ছোটবাবুর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে সিগার দিয়ে আসার পর। ছোট একটি গড়গড়া, নতুন নল সমেত কল্‌কে সরপোষসহ জগদীশবাবাকে দান করলেন। আর সমস্ত গড়গড়া, ফরসি সট্‌কা, সরপোষ সব ঘষেমেজে কলিকা বাড়ির তাকের উপর তোলা হয়ে গেল। ১৯৫১-র ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৫-র ডিসেম্বর পর্যন্ত স্টুডিওতে ছবির সঙ্গে ওগুলিও দর্শনীয় ছিল। ১৯৮৫-র ডিসেম্বরে ৭ই পৌষের মেলা ভাঙবার মুখে কলিকা বাড়ির তালা ভেঙে সব চুরি হয়ে গেল। ছ'টি একটি সস্তার সরপোষ ছাড়া আর কোন চিহ্ন নেই।

১১

আজ প্রায় বেয়াল্লিশ বছর হয়ে গেল নরদেহ ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথ চলে গেছেন, কিন্তু এখনো তাঁর কথা ভাবলেই যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে তাঁর সেই হাত মুখ চোখ নেড়ে গল্পবলার ভঙ্গি।

আর্টস্কুলে অবনীন্দ্র-জয়ন্তী করা হচ্ছে। ঢুকেই ডানদিকের বড় হলঘরটি ব্ল্যাকবোর্ডক্লাস সম্পূর্ণ খালি ক'রে শতরঞ্চি পেতে সকলের বসার জায়গা আর একটি মঞ্চ ফুলটুল দিয়ে অবনঠাকুরের বসার জায়গা করা হয়েছে। সকলে এসে বসে অপেক্ষা করছি, অবনঠাকুরের দেখা নেই। উনি গাড়ি নিয়ে আনতে গেছেন।

পরে শুনলুম জন্মদিনে তাঁকে ধুতি পাঞ্জাবি পরতে বলাতেই রাধুর সঙ্গে বকাবকি এবং সেটাই দেরির কারণ। ছোটবাবু নিমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে সভা-সমিতিতে যেখানেই যেতেন, পা-জামার উপর জোব্বা চড়িয়ে চলে যেতেন। কোট প্যান্ট তো নয়ই, কখনোই পরেন নি, ধুতি চাদরেও মহা আপত্তি।

কিছুতেই ধুতি পাঞ্জাবি পরতে চাইতেন না।

শেষ পর্যন্ত উনি অনেক অনুনয় বিনয় সাধ্যসাধনা ক'রে ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। গাড়িতে কথা না বলে বিরস মুখে বসে থাকলেও স্কুলের গেটে ঢোকার মুখে বেশ হাসিখুশি আনন্দমনা। মঞ্চে বসিয়ে চন্দন-তিলক স্বর্ণতুলিকা অর্ঘ্যদান হতে না হতেই 'আজ আমার জন্মদিন তো—এই ভূমিষ্ঠ হলুম', বলে মঞ্চ থেকে নেমে মেঝেতে শতরঞ্জির উপর সবার সঙ্গে সমান হয়ে বসে পড়ে হাতনেড়ে কথাবার্তা শুরু ক'রে দিলেন। কত রকম যে মুখ করতেন কথা বলার সময়। ও. সি. গাঙ্গুলি প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের দিকেই বেশি মন চোখ দিয়ে কথা বলতে লাগলেন, এমনই মমতা ছিল তাঁর। সাধে কি বলেছি সাগর-স্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ! দয়ার সাগর ভাবের সাগর!

আমার শাড়ির কথা শুনে যেমন নিজেদের বাড়ির তাঁতির ছেলে গুরুপদ নাথকে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি আমার জ্যোতিষে বিশ্বাস দেখে নিজেদের বাড়ির জ্যোতিষী কৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। আমার তখন জ্যোতিষচর্চায় খুব ঝোঁক হয়েছিল। তাঁর কাছে নানারকম কথা গল্প শুনতাম। জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করতেন। আমাকে তাঁর লেখা 'জ্যোতিষ প্রভাকর' বইও একখানি দিয়েছিলেন। তাঁকে একদিন আমি প্রশ্ন করি ছোটবাবুর কথা বলতে বলতে, 'ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে তো ছোটবাবুর জন্ম, তার ফলাফল আপনি কি দেখছেন'?

বললেন, 'সে তো আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। উনি শুধু মহাশিল্পী নন, উনি মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম। ওঁকে কেউ চিনতে পারল না।'

সত্যিই তাই। কেউ চিনতে পারল না। উপলব্ধি করতে না পারা, নিজেদেরই দুর্ভাগ্য। অবনঠাকুরের আঙুলগুলির অগ্রভাগ ছিল উপরদিকে তোলা। হাত নেড়ে যখন কথা বলতেন, হাতের উপরপাতাটি প্রায় নৌকোর মতন হয়ে যেত। এই অভিনব হাতের গড়নের কথায় জ্যোতিষার্ণব মহাশয় বললেন, 'ঐরকম আঙুলের লক্ষণ - মহাশিল্পীর লক্ষণ। আর মহাদাতার লক্ষণ। ওঁর দানের তুলনা নেই। নিজের কিছুই রাখবেন না, সবই দিয়ে যাবেন। অতুলনীয় দান।'

সত্যিই তাই। ঐ হাত দিয়ে সৃষ্টি আর দান সমানে চলেছে। সে দানের মর্যাদা কি আমরা দিতে পেরেছি? না, দেবার চেষ্টা করেছি?

ওঁর মুখে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন ঐ একই আক্ষেপ শুনেছি, 'ছোটবাবুকে কেউ চিনতে পারল না। অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি আর রবীন্দ্রনাথের রচনা দুই-ই অনন্ত। এক জীবনে কেউ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা পড়ে শেষ করতে পারবে না। তবে বই আকারে প্রকাশ হয়েছে. সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে হচ্ছে হবে। কিন্তু

অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ছবি সব কোথায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে পড়ে আছে কেউ জানে না। কিছুই করতে পারলুম না। কোনোদিনই কি সম্ভব হবে না অবনীন্দ্রনাথের ছবির সন্ধান ক'রে সব একত্র ক'রে প্রকাশ ক'রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ? বাড়িটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ছবিও কোথায় হারিয়ে লুকিয়ে গেল। হায়রে—'

আমার সৌভাগ্য আমি এই দুই মহাপুরুষেরই স্নেহ-সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছি। লিখতে বসে ওঁর আক্ষেপটাই বড় হয়ে মনে পড়ছে।

বৈধব্য-কাহিনী

কল্যাণী দত্ত

ফরাসি পিসিমা

এক্ষণ-এ দু'বছর আগে চার পাঁচ জন বিধবার কথা লিখেছিলুম (বৈধব্য-কাহিনী, শারদীয় ১৩৯৮)। তা পড়ে কেউ কেউ বলেছেন—'শুধু নিষ্ঠাবতী বিধবাদের কথাই লেখা হয়েছে কেন? অন্য ধরনের মানুষও তো ছিলেন—নিয়মনিষ্ঠায় আর জীবনযাত্রায় যাঁদের রীতিমতো শৈথিল্য ছিল!' কিন্তু আমি তো বিধবা-চরিত নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখি নি, একান্নবর্তী পরিবারে গণ্ডির ভেতর থেকে যাঁদের দেখেছি তাঁদের সম্বন্ধে যা মনে পড়ে তাই লিখেছি। আজকেও সেই পুরনো পুঁজি ভাঙিয়েই বলতে চলেছি।

প্রথমে যাঁর কথা মনে পড়ছে তিনি আমার বাবার দূর সম্পর্কের দিদি, অর্থাৎ আমার পিসিমা। গুরুজনদের সঙ্গে বয়সের হিসাব ধরে দেখা যায়—এর জন্ম আন্দাজ ১৮৭০-এ যে বছর কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু হয়। সত্যিই আমার এই পিসীকে বলা চলে বাবু কালচারের প্রত্যক্ষ শিকার।

পিসিমার নাম ক্ষীরোদবাসিনী। বাপেরা ছিলেন হুগলির বহু সম্পন্ন জমিদার গোষ্ঠীর কোনো এক শাখা। দশ বছর নিঃসন্তান থাকার পরে অনেক সস্ত্যয়ন আর যজ্ঞের শেষে মায়ের কোলে তাঁর আগমন। আদরে মাটিতে পা পড়ত না। মেয়েকে নিয়ে কি করবেন মা-বাবা ভেবে পেতেন না। তাঁর নিজের ভাষায় 'মাথায় রাখলে উকুনে খায়, ভূঁয়ে রাখলে পিঁপড়েয় খায়'! ক্ষীরোদার মা বলেছিলেন—'আমি বাঁজা বলে সকালে উঠে কেউ আমার মুখ দেখত না। তোমার জন্মের পর থেকে মহালের আয় বেড়ে গেল। কর্তা মামলা জিততে লাগলেন একের পর এক।' তিনি বলতেন, 'ক্ষীরো আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী'। আমি যখন বলতুম—'মেয়েকে অত আদর দিও না, শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হবে।' কর্তা বলতেন—'এমন ঘরে বিয়ে দোব, যে জল গড়িয়ে খেতে হবে না।' তা হয়েছিলোও তাই।

দশবছরে পা দিতে না দিতে সম্বন্ধ আসতে লাগল। এই সম্বন্ধ আনলেন গোঁদলপাড়ার মিত্তিরেরা। খোঁজ পত্তর নেওয়া হল সব দিক দিয়ে, টাকা-পয়সা স্বভাব-চরিত্র কোথাও কোনো খুঁৎ নেই। এগারোয় পা দিতেই চন্দননগরে

বোসেদের বাড়ি বিয়ে হয়ে গেল, যাদের সেই স্বরূপ বোসের ঘাট। মির্জাপুর থেকে নৌকোয় লালচে পাথরের বড় বড় টালি আনিয়ে বাঁধানো আটকোণা দুই মস্ত চাতালওয়ালা বিরাট ঘাট। ওরকম ওদিকে আর ছিল না * বাড়িঘর তদুপযুক্ত, রথ দোল অন্নসত্র বাঁধা। পাত্র সিদ্ধেশ্বর অতি সুদর্শন, ছিপছিপে লম্বা মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, আবার এনট্রান্স পাশ। বাড়ি বাড়ি সামাজিক সিধে পাঠানো হল। পড়শি কুটুমেরা সাত দিন ধরে ভোজ খেয়ে শতমুখে সুখ্যেৎ ক'রে গেলেন। বাজি পোড়ানো হল, গড়ের বাজনা, বাই নাচ—যা যা হবার কথা সবই হল।

শাশুড়ি ছিলেন মাটির মানুষ, কোনোদিন উঁচুগলায় কথা বলেন নি। সংসারে ভাসুর দেওর ননদ কেউ ছিল না—সবেধন নীলমণি এক সিদ্ধেশ্বর। শ্বশুর বলেছিলেন ছেলেকে এফ-এ পাশ করিয়ে নিজে জমিদারি কাজ শেখাবেন। পর পর একটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে হবার পরেই মহাল থেকে টাকা নিয়ে ফেরার পথে প্রায় নৌকোর মধ্যেই ক্ষীরোদের শ্বশুরের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। নায়েব-গোমস্তা কিংবা ছেলে কেউ এর জন্যে তৈরি ছিলেন না। ছেলেকে লেখাপড়া ছাড়তে হল। একদল চতুর মোসাহেব ঝাঁপিয়ে পড়ে বৈঠক খানা জুড়ে বসলেন, সিদ্ধেশ্বর হলেন সিধুবাবু। তারপর একে একে যা ঘটতে লাগল সেই বাবু-বৃত্তান্তের ইতিহাস নতুন ক'রে আবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। শেষের পালার কথাই সংক্ষেপে বলি।

একে একে অন্নসত্র রথ দোল বন্ধ হল, মহালের পর মহাল বাঁধা পড়তে লাগল। নায়েব মশাই কোনোমতে অতি সামান্য কিছু টাকা এনে দিয়ে লুকিয়ে রাখতে বল্লেন, মেয়ের বিয়ের জন্যে। বাবু কখনো-সখনো বাড়ি এলেও আমার সঙ্গে কথা কইতেন না। চাবি নিয়ে সিন্দুক থেকে মোহরের থান নিয়ে যেতেন। ক্রমে ক্রমে ঘরে বাইরে সব জানাজানি হয়ে গেল।

ভয়ংকর সব ঘটনার যুগ যুগান্তর পরে পিসিমা বোধহয় নিজে থেকেই মাকে বলেছিলেন—মাথার ওপরে শাশুড়ি ছিলেন সংসার সামলাতেন, আমি ঘোমটা দেওয়া বৌ ছিলুম। তিনটে কচি ছেলে নিয়ে পথে বসব ভাবতে ভাবতে দজ্জাল হয়ে উঠলুম। বাইরে দু'টো রক্তচোষা ছিল, ইয়ারগুলো সব্বদা ভনভন করত। ঘরে তো আমি একটু শান্তি দিই নি! দেখা হলেই চেঁচাতুম—ঐ এলেন আমার সব্বোনাশ করতে। এদানী একটা মিষ্টি কথা আর বলি নি, দু'দণ্ড বসতে বলি নি, একঘটি জলও দিই নি।

* পিসেমশায়ের মৃত্যুর পরে ঘাটের চাতাল ও সিঁড়ি ভেঙে পাথর বিক্রি ক'রে ফেলা হয়। এলাহাবাদের রামধন মুখুয্যে যাঁকে রামকমল সেন ওদেশে আনেন, কীডগঞ্জে যমুনার পাড়ে পাথরের বাঁধানো তাঁর বিরাট ঘাট ছিল। সে ঘাটের সুন্দর পাথরও এভাবে নিলাম হয়ে বিক্রি হয়ে যায়। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

নায়েব মশায় এসে বলে গেলেন বাড়িখানাও যাবে, বাবুকে মুখের কথায় কেউ আর ধার দিচ্চে না। আমি বল্লুম - গলায় কাটারি মারব, ছেলেগুলোকে আমি কি বাপের বাড়ি থেকে এনেছিলুম - ওরা ভিক্ষে করবে - কেন? কাটারি হাতে নিইচি আর চেঁচাচ্চি। ঐ সব শুনে বাবু এসেই বল্লেন - 'আহা তাই দাও।' কাছে এসে বল্লেন, 'তুমি মরো, আমি ফাটকে যাই - ষোল আনার ওপর আঠারো আনা হোক।' মরতে পারলুম না, এলোমেলো কাটারি চালিয়ে কিছু রক্তারক্তি হল। চারিদিকে শত্তুর, কে যেন গিয়ে পুলিশে খবর দিলে বাবুকে ধরে নিয়ে গেল - স্ত্রী হত্যে করতে যাচ্ছিলেন রটে গেল।

ভর দুপুরে বেরিয়েছিলেন, ফিরতে বিকেল বয়ে গেল। টকটকে লাল চোখ নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জ্বর গায়ে বিছানা নিলেন - বল্লেন, 'বোস বাড়ির বৌ যাবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে।' ঐ শেষ কথা। তিনদিনের জ্বর বিকারে চলে গেলেন। দেখে শুনে শাশুড়ির যেন বাক্‌রোধ হল, একবারও কাঁদেন নি। হুড়মুড়িয়ে কাশী চলে গেলেন পাছে ছেলের শ্রাদ্ধ দেখতে হয়। তারপর কি কি হল মনে নেই। অত সম্পত্তি একা মানুষ ক'বছরে ওড়াতে পারে না। কিসে সই দিচ্চেন, কেন দিচ্চেন, কাকে দিচ্চেন চেয়েও দেখতেন না। পাকা বাবুরা নাকি তাই করে! এগারো বছর বয়েসে ও-বাড়িতে ঢুকেছিলুম, তিরিশ না পেরুতে সব ফুরুলো। নায়েব মশাই ছেলেদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে চুঁচড়োর ক্যাঁকশেয়ালিতে (কনকশালি একটা ছোট ভাড়া বাড়িতে আমাদের রেখে এলেন - সেই থেকে আজ হেতা, কাল হোতা, মা যেমন চালাচ্চেন - রথ তেমনি চলচে।

আমাদের বাড়িতে এই ক্ষীরোদা পিসিমা বছরে একবার আসতেন কোম্পানির কাগজে সুদ ভাঙাতে - থাকতেন মাসখানেক। পিসিমার বয়েস তখন আন্দাজ পঁয়ষট্টি হবে। শরীরের গড়ন খুব আঁটসাঁট। গায়ের রং উজ্জ্বল টকটকে। মাথার চুল ছাঁটা, কিন্তু কুচকুচে কালো। ধবধবে সাদা থান পরা গায়ে জামা দিতেন না। কিন্তু খুব আব্রু রক্ষা ক'রে চলতেন - ঘরে নতুন কেউ এলেই মাথায় কাপড় দিতেন। ভোরবেলায় গায়ে মাথায় সরষের তেল মেখে বারোমাস ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন। গলায় থাকত শুধু একটি রুপো-বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা। আর কোনো গয়নার বালাই ছিল না। একটি আঙটিও পরতেন না। আমাদের কাছে এলে মা ওঁকে কাশীর কাল ভৈরবের ডোর কিংবা তারকনাথের তাগা পরিয়ে দিতেন। তাতে আপত্তি করতেন না।

আমাদের নিতান্ত গেরস্তালী ধরন, কমদামী বাসন কোসন, সামান্য রকম খাওয়া শোওয়া তাঁকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল। একে অসম্ভব জলজ্বলে চেহারা, তায় তাঁকে ঘিরে নানা রগরগে জমাটি গল্প। যে জন্য তাঁকে আড়ালে বলা হতো 'ফরাসি পিসিমা'। আমি মুগ্ধ ভক্তের মতো দিন রাত্তির তাঁকে ঘিরে

থাকতুম। তেল মাখতে খুব ভালোবাসতেন। কাছে গেলে বলতেন তুই আগে পিঠে তেল ঘষে দে—অনেকক্ষণ ঘষলে তবে তোর হাত একটু নরম হবে, যে শক্ত কাঠের মতো হাত! পা-টা বড্ড কামড়াচ্ছে—দে একটু টিপে। আপনমনেই বলতেন বাড়িতে দু'টো দাসী ছিল, একটা মাথায় তেল দিত অন্যটা পা টিপত—তারাও ছিল সুন্দরী।* একদিন হঠাৎ বললেন, নাঃ—তুই খুব লক্ষ্মীমেয়ে আর কোনোদিন তোকে কুচ্ছিৎ বলব না। বউকে বলে যাবো বিয়ের সময় তোকে কিছু ঢিবি-ঢাবা সোনা দেবে অখন। ডিবি-ঢাবা কেন শুধোতে বললেন—তা তোর তো বাপু নিরেস চেহারা, গরীবের বাড়ি পড়বি। আজ এটা কাল সেটা ফ্যাচাং লেগে থাকবে—আজ ছেলের কলেরা হবে, কাল বাড়ি বাঁধা পড়বে,তখন জড়াও গয়নার কেউ দাম দেবে না, তাছাড়া গয়না সুন্দর হলে বেচবার সময় ভারী কষ্ট হয়। এই সব উৎপাত কেন হবে জিজ্ঞেস করতে বললেন—আমি কি অত জানি, না ওদের সঙ্গে কখনো মিশেচি। দূর থেকে শুনেচি কাঠ চেলানো, সাবাং ঠেঙানো, ভাত ফুটোনো এই সবই ওদের কাজ।

অথচ মানুষটি ছিলেন নানা গুণের আধার। পুরোপুরি নিরক্ষর, কিন্তু অসামান্য স্মরণশক্তি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না। যেমন সহজে মানুষ পা ফেলে চলে তেমনি অক্লেশে মিল বজায় রেখে যে কোনো বিষয়ে ছড়া আর গান বাঁধতে পারতেন গাইবার গলা ছিল খুব ভালো। বিয়ের গান, বাসরের গান, ছেলে ভুলোনো, ইঁদুর ভায়া আর শেয়াল পণ্ডিতের ছড়া, পালকি বেয়ারা আর ভিখারীর গান—সবই তাঁর মুখে শুনেছি। বহুকাল হয়ে গেছে তাই সব গানের সব লাইন মনে নেই। দু'টি মাত্র গান সম্পূর্ণ মনে আছে,অন্যগুলো দু-চার লাইন। ভারতচন্দ্র পড়বার ক্ষমতা ছিল না, তাই শুধু শুনে শুনে পঞ্চাশ অক্ষরের কালীস্তুতি মুখে মুখে বানিয়েছিলেন। গত দু'তিন বছরের গোলমালে সে সব সংগ্রহ চুলোয় গেছে। নিজের হাতে রান্না সম্ভবত কোনোদিনই করেন নি, কিন্তু রান্নার তাগবাগ খুব জানতেন। সন্ধেবেলা ধুনো দেওয়া হচ্চে, দাসীকে বললেন—বউকে বল একটু জটা মংশী ফেলে দিক আগুনে।

একদিন দিনের বেলা ভাতের পাতে প্রচুর ক্ষীর আর ল্যাংড়া আম খেয়েছিলেন। তাই মা রাতে আর ওঁকে লুচি দেন নি। ভিজে মুগের ডাল মিছরি মাখন আর একটিমাত্র সন্দেশ। তাই দেখে বললেন অ্যাঁ, লুচি দেয় নি? খাবো কিগো! মনের দুঃখে তাঁর গান এসে গেল—গান দু'টো অন্যত্র ছাপা হয়েচে, কিন্তু পিসিমার নাম তো নেই সেখানে—তাই আবার দিলুম:

* আমার কমবয়েস ওরা সব বলত—বৌয়ের পা দু'টি যেন পদ্মফুল। পা সুন্দর হলে ভাগ্যিও ভালো হয়, লক্ষ্মীর থলে ওঠে, লোকে বলে। কই, হাড়চামড়া রয়ে গেল, শুধু কপালটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বলি শুনো পরানের ভাজ দুখো দিও না
বিধবার বরাদ্দ লুচি কেড়ে নিও না
বিবাহে ছেরাদ্দে লুচি ভুঞ্জাইলে মুচি শুচি
কুলবধূ হয়ে ছিছি ধর্ম ছেড়ো না।
পোড়াড় মুখে লুচি চাঁদের কি দিব বাখানা—

দু'চারদিন বাদে গুরুজনেরা কেউ কেউ বললেন, দিদি, বেনা বনে জংলীদের সামনে মুক্তো ছড়ালেন! নতুন গান শোনান। পিসিমা বললেন যেমন খাওয়াবে তেমন গান হবে। একা তো খাবো না—ঘরশুদ্ধ কচুরি জিলিপি খাওয়াও দিকিনি। তারপর তুড়ি দিতে দিতে গুণ গুণ ক'রে গান ধরলেন—

আহা, ঘৃতঝরা সুধাভরা কচুরিরো সহোদরা
ওগো, ফুলকো লুচি, ফুলের কুচি না দেখিলে চক্ষে বহে পানি।
হ্যাদে, সংসারো বৃক্ষেরো ফলো ক্রেমে ক্রেমে টলমলো
এখন কান ফোঁড়াব, যুগি হব, কুল তেজিব, সঙ্গে নিব
জপের মালা, উঁহু, লুচির ঝোড়া খানি॥

চুঁচড়োয় ভাড়া বাড়িতে থাকতে একবার পাড়ার কোন হারানবাবু (যাঁর ডাক-নাম হারু) এক্‌এ পাশ করেন। পিসিমারা দল বেঁধে গিয়ে গান ধরলেন—

শুনচি নাকি পাশ করেচে এল্‌এ-বিএতে
ওলো হারুর মা, আমাদের কি দিবি খেতে।
লিচু আর গোলাপি জাম বড় বড় ফজলি আম
জিভে গজা খেতে মজা রসোগোল্লা রসেতে॥
যদি না দিবি খেতে তবে পড়িয়েছিলি কেন ছেলের এল্‌এ-বিএতে।
ওলো হারুর মা, আমাদের কি দিবি খেতে॥

সধবাবেলায় চন্দন নগরে থাকতে গঙ্গার ঘাটে বাঁধা ও গাওয়া একটি পদ্য শুনুন। পিসিমাদের নিজস্ব ঘাটে বেলা তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত মেয়েদের যাবার নিয়ম ছিল ঐ সময় পুরুষেরা বড় কেউ আশপাশেও থাকতেন না। তাই মেয়েরা দিব্যি ঘোমটা আর চুল খুলে গল্প গাছা করতেন, কেউ কেউ বাটি ভরে ব্যাসম কিংবা হলুদ-বাটা নিয়ে হাতে পায়ে মাখতেন। একদিন ঘাটে যাবার পথে দেখেন তাঁর বন্ধু মানকুমারী ওরফে মানী ছুটতে ছুটতে ফিরে আসচেন। ক্ষীরোদা শুধোলেন—'কিলা মানী, অমন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসচিস কেন?' মানকুমারী বল্লেন, 'দিদি আমি সবে চুল এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসেচি, অমনি তিন নৌকো ধনীর বাপ নৌকো চেপে এসে হাজির। তোমরা ভাই, কেউ নেই। যদি—আমাকে টেনে নে যায় তাই ব্যাসমের বাটি ফেলে রেখে ছুটে ছুটে ফিরে এলুম।'

এখন মানকুমারী বা মানীর মেয়ের নাম ধনী আর তাঁর স্বামীর নাম গোরা।

তিন নৌকো গোরা সেপাই না বলে তিনি সোজাসুজি ধনীর বাপ বলে বোঝাতে গেছলেন। সেদিন আর ঘাটে যাওয়া হল না। পরদিন ক্ষীরোদার সঙ্গে গিয়ে আর পাঁচজন মিলে গাইলেন—

ধন্যি মেয়ে মানকুমারী ধন্যি মানি তাকে।
তিন নৌকো বোঝাই পতি কিসের গুণে রাখে॥

এ-পদ্যটা আরো ছিল, মনে নেই।

মানকুমারীর গল্প শুনে সুকিন্দের মামা বল্লেন—দিদির বেশ রসের গানটানও চলত দেখচি। পিসিমা বল্লেন দোহার দেবার মানুষ থাকে তো রসের ফোয়ারা ছোটানো যায় দাদা। এরা সব বড় গোমড়ামুখো, গান বোঝে না। তাতে বোয়ের কাছে গলা খুলে শুধু রাতে দু'টো পেসাদী শোনাই। মামার সেকেলে গান খুব পছন্দ ছিল। হেসে বল্লেন—দিনের বেলা খেউড় গেয়ে, পেসাদী গাও রাতে! উনি শোনা মাত্তর হাতে তালি দিতে দিতে গাইলেন—'গঙ্গামরণ হরির চরণ তাতেও পাব হাতে।'

রোজ রাত্তিরে বারোটার পর তাঁকে গানে পেত। অজস্র রামপ্রসাদী গান তাঁর মুখস্থ ছিল। গান শুনতে শুনতে সারাদিনের পরে ক্লান্তিতে মায়ের ঘুম এসে যেত। খুব রাগ ক'রে তিনি মাকে গালমন্দ করতেন। বলতেন—সারাদিন চাষার বলদের মতো খাটতে পারে বৌটা। তোদের পিসে বলেছিল আমার গলায় টপ্পার দানা আছে, আর বউ বোঝে শুধু ঘোড়ার দানাপানি।

এমন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে শুনে আমরা একবার তাঁকে পরীক্ষা করেছিলুম। তখন শ্রাবণের শেষ, ঘোর বর্ষা, ভিজতে ভিজতে গামছার পুঁটুলি হাতে দলেদলে মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্চে—প্রশ্ন করি—বলুন তো পিসিমা, এরা ভিজতে-ভিজতে যাচ্চে কোথায়? একটুখানি হেসে শুধোলেন—আজ কি বার গো? আমরা সোমবার বলা মাত্তর—তুড়ি দিয়ে বলে উঠলেন—

সোমবার শ্রাবণ মাস, শিবের নাম গেয়ে—।
পাপ ধোওসে মাগী মিনসে গঙ্গা পানে ধেয়ে॥

সুন্দর চেহারা রঙিন সাজপোশাক দুনিয়ার সুন্দর জিনিষের প্রতি পিসিমার গভীর মমতা ছিল। নিজের দুই মেয়ের নাম রেখেছিলেন অতসীপ্রভা, আর মালতীলতা, ছেলের নাম বসন্তকুমার। মেয়েদের ডাক নাম দেন আতা আর মালা। সোনার আতা আর দানার মালা। মুখোমুখি তাঁর সঙ্গে তর্ক করার দুঃসাধ্য সাহস কারো ছিল না। আড়ালে কিন্তু নিন্দের ঢেউ বইত বিধবার মতো চাল নয়, বড় বেশি খাওয়ার ঝোঁক। অমন ঘটি ঘটি ঘানির তেল মাখলে আমাদেরও রঙের জেল্লা খুলত, ইত্যাদি।

অনেক যাগযজ্ঞের পরে পিসিমার জন্ম এটা সেকালের ঘটনা আর সেই যজ্ঞের বেদীতে চণ্ডালের হাড় পাওয়া গেছল এটা রটনা। ওঁকে বাবার মৃত্যুর পরে

শেষবার দেখি—সুর ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—কাঁদছিলেন। বেশ খারাপ লেগেছিল। বুঝতে পারি নি যে ওটা সেকালের দস্তুর।

বাবা হঠাৎ চলে যেতে গোটা সংসারে তখন দারুণ ওলোট পালোট। আমরা বিভ্রান্ত। পিসিমার আর খবর নিতে পারি নি। ঠিকানাও রাখি নি। বিস্মৃত ক্ষীরোদবাসিনীকে আজ আমার কুণ্ঠিত প্রণাম জানাই।

'বেম্মা ঠেকানো'

অধ্যাপিকা লতিকা ঘোষের দেওয়া এই কাহিনীটি। তাঁর মা শ্রীমতী শৈলবালা তাঁর দিদিশাশুড়ি ভুবনমোহিনীর গল্প তাঁকে এভাবেই বলেন।

আমার দাদাশ্বশুর পালকি চেপে মহালে যাচ্ছিলেন—পথে কোথায় যেন বেয়ারারা জল খেতে থামলে দাদাশ্বশুর গাড়ি থেকে নেমে একটু এদিক ওদিক করতেই দেখেন কিনা এক সাকারা সুন্দরী মেয়ে বাঁ হাতে গোবরের তাল নিয়ে ডান হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। ঠাকুর্দা মশাই তখুনি গিয়ে সেই মেয়ের নাম ধাম জিগ্যেস করলেন। যেই দেখলেন স্বজাতের মেয়ে, তাঁদের পালটি ঘর, অমনি মেয়েকে নিয়ে সোজা গেলেন তার বাপের কাছে। বয়েসের অনেক তফাত, তাই গরিব হলেও মেয়ের বাবা দোনামোনা করতে লাগলেন। তখন ঠাকুর্দা স্পষ্ট ক'রে বল্লেন—'না ওর সতীন হবে না, আমার দ্বিতীয় পক্ষ গত হয়েচেন। তাঁর সন্তান ছিল না। এখন আপনার মেয়ের ছেলে জন্মালে সব সম্পত্তি সে-ই পাবে।' বলার সঙ্গে যেই নিজের বার্ষিক আয় উল্লেখ করলেন, অমনি মেয়ের বাপ রাজি হয়ে গেলেন। শুধু শাঁখা আর সিঁদুর পরিয়ে বৌ নিয়ে সে যাত্রা ঠাকুর্দা ঘরে ফিরে এলেন।

গরিবের ঘরের ছোট মেয়ে প্রচুর আদরে ধীরে সুস্থে থিতু হয়ে গিন্নি হয়ে বসলেন। স্বামীর প্রতিজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল। তাই ছেলে হবার পরে একরকম অল্প বয়েসেই তার বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনলেন। ছেলের বৌ ঘরে আনার পর থেকে ঠাকুরর্দার শরীর ভাঙতে লাগল। একদিন তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে আনিয়ে বল্লেন—'দেখ, আমার যাবার সময় হয়েচে, সব সম্পত্তি তোমাকেই দোব, তবে তুমি আমার কথা রেখ, তাহলে আমার আশীর্বাদও পাবে। তোমাদের মাকে আমি খুব ছোটটি ঘরে এনেছিলুম, ও বিধবা হলেও মাছ খেতে দিও, বন্ধ কোরো না। আমি নিজে শখ ক'রে ওকে তামাক ধরিয়ে ছিলুম, তামাকটি দু'বেলা খাবে—ছাড়তে পারবে না। এতে তোমার কোনো পাপ হবে না, তুমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করবে। বৌমাকে বোলো পাড়া পড়শি যাতে জানতে না পারে সেটা দেখবে।'

ঠাকুর্দা চোখ বুজলেন। শ্বশুর মশাই এই ভয়ংকর পিতৃ আজ্ঞা পালনের সব দায়িত্ব আমার শাশুড়ির ওপর ছেড়ে দিলেন। শাশুড়ি খুব সাবধানে আর যত্নে দুই ভীষণ কাণ্ডই চালিয়ে যেতে লাগলেন। কাকপক্ষীতে টের পেল না। শাশুড়ির মেয়ে ছিল না, আমি তাঁর প্রথম ছেলের বৌ, আমাকে যত্ন করতেন ভালোও বাসতেন। কাজকর্ম তাঁর কাছেই সব লিখলুম। রাঁধাবাড়া সব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেও ঠাকুমাকে খেতে দেওয়া আর তাঁর বাসন মাজা নিজেই করতেন। আমাকে বলতেন—'তুমি ও তল্লাটে যেও না'। আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করলেও শাশুড়ির কথার অবাধ্য হই নি বা তাঁর সঙ্গে তর্ক করি নি। হঠাৎ একদিন মনের ভুলে, মানে পুরোপুরি বেখেয়ালে, লম্বা গলি পেরিয়ে দিদি-শাশুড়ির ঘরে গিয়ে উপস্থিত। দোর বন্ধ ছিল না। শাশুড়ি বেশ রাগ করেই বল্লেন—'তুমি নাচতে নাচতে এ ঘরে এলে কেন? তোমাকে না বারণ করা হয়েছিল।' দিদিশাশুড়ি তখন মাছের মুড়ো চুষচেন, গোটা পাত মাছের ঝোলে মাখামাখি।

এমন কাণ্ড আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। সত্যি আমি ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেল্লুম। তারপর কোনো রকমে সামলে বল্লুম যে ইচ্ছে ক'রে আসি নি মা, তোমার পা ছুঁয়ে সত্যি বলচি। গলির মধ্যে ছুটোছুটি করছিলুম, মনের ভুলে এসে পড়েচি।

আমাকে ক্রমাগত কাঁদতে দেখে দিদিশাশুড়ির দয়া হল। তিনি বল্লেন—'দেখেচে ত, বড় বয়ে গেচে—ঘরের বৌ ত পর নয়। তুমি বরং এখন থেকে আমাকে খাওয়ানোর ভার নাতবোয়ের ওপর ছেড়ে দাও।' খুব সহজে বিনা অশান্তিতে ব্যাপার চুকে গেল।

দিদিশাশুড়ি খুব আমুদে মানুষ ছিলেন। নাতবোয়ের সঙ্গে এতদিন শুধু রঙ্গ-রসিকতা চলত, এখন কোনো পর্দাই রইল না। নিজের তামাকের অভ্যেসের কথা নিজেই বল্লেন, লজ্জা সংকোচের কোনো বালাই তাঁর ছিল না। সোজাসুজি ডেকে মুখে মুখে তামাক সাজতে শেখালেন। কল্কের মুখে রিঠের বিচির মতো কি একটা পুরে তামাকের গুলি দিয়ে সাজিয়ে টিকে সাজানোর পর আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে ঠাকুমার গড়গড়ার ওপর বসিয়ে দিতুম। এতেও পালা সাঙ্গ হতো না। বিকেল চারটেয় গা ধুতে যাবার আগে ঐ লম্বা গলির এঁটো কুলুঙ্গি থেকে একটা টিনের লম্প ঠাকুমার ঘরের সামনে এনে জ্বেলে তাঁকে দেখিয়ে গোটা কতক টিকে এনে ঐ লম্পর আগুনে সামান্য ঠেকিয়ে মাটির সরায় রেখে তবে কাপড় কাচতে যেতে পেতুম। এই কাজটার নাম ছিল 'বেম্মা ঠেকানো'।

কিছু দিন যাবার পরে ভরসা ক'রে একদিন জিগ্যেস করলুম—'হ্যাঁ ঠাকুমা, টিকেতে কেন আগুন ছোঁয়াতে হয়?' ঠাকুমা বল্লেন—'ওমা, তা জানিস নি, মুসলমানের ঘরে ঝি বৌরা কয়লার মিহি গুঁড়োতে ভাতের মাড় মেখে ওগুলো তৈরি করে। ভেন্ন জাতের ভাতের ছোঁয়া পড়লে বিধবা মানুষকে সাবধান হতে

হবে না ?' 'সে না হয় হল, বেম্মা কোত্থেকে এল ?' 'ওমা তুই কি হাবা মেয়ে রে, আগুনেই যে বেম্মা থাকেন। নতুন বাসন কোসন সবই ত বেম্মা ঠেকিয়ে নেয়।'

'আচ্ছা সে না হয় হল, কুলুঙ্গিতে তো ভাতের ছোঁয়া পড়ে না, সেটা কেন এঁটো হবে?' ঠাকুমা বল্লেন–'বাসন মাজুনীরা এঁটো কাপড়ে লম্প নিয়ে যায় আসে। ধোয়াধুয়িতে লম্প থাকে কখনো ? বাইরেটা ধুলেও ভেতরে স্থতোর পলতে তো ধোওয়া যায় না, তাই এঁটো।' আমি বল্লুম–'লম্পর মাথায় দপ দপ ক'রে বেম্মা জ্বলতে থাকে আর তবু লম্প কেন শুদ্ধ হয় না ?' ঠাকুমা বল্লেন–'নাতবৌয়ের আমার নবীন বয়েস কিনা–খালি জিগ্যেসা খালি তক্কো। মানবার কথা মেনে যাবি, না তক্কোর ঝুড়ি খুলে বসলি। যেমন ময়লা হলেও শুদ্ধ কাপড় শুদ্ধই থাকে তেমনি মাজা হলেও এঁটো লম্প এঁটোই থাকে।' এই গেল এক পর্ব।

আচার বিচার নিয়ে কত কাণ্ড যে করতেন, শাশুড়ি কেমন মেনে নিয়েছিলেন, তার একটি গল্পই বলি।

আমাদের ভেতর বাড়িতে একটা বড় পুকুরে আমরা মেয়ে বৌরা গল্পগুজব ক'রে গা ধুতুম শাশুড়ি বলে দিয়েছিলেন- ঠাকরুণ জলে থাকলে তোমরা যেও না, ওঁর ছোঁয়া পড়বে। একদিন মাথা বাঁধতে দেরি হয়েচে, পড়ন্ত বেলায় গিয়ে দেখি ঠাকুমা জলে। চট্ ক'রে পালিয়ে এলুম। ওমা ঠাকুমা হেঁকে বল্লেন–'শোন্. এদিকে আয়। মাথা ভিজিয়ে ডুব দে। আমি পষ্ট দেখলুম–কালীদাসী চলে গেল আর তুই তার পায়ের ছাপে ছাপে পা দিয়ে উঠে গেলি। কালীর ছোঁওয়া পড়ল না ?'

কত যত্ন ক'রে মা মস্ত বড় খোঁপা ক'রে দিয়েচেন, কি ক'রে মাথা ভেজাই ? আমি ছুটে শাশুড়ির কাছে গেলুম। সব কথা শুনে আমার ওপর রাগ না করেও বল্লেন এখন আমাকেই ভুগতে হবে, দেখি কী হয়। ঘাটে যেতেই দিদি-শাশুড়ি হায় হায় করতে লাগলেন–'আদুরে বৌকে তুমি মাথায় তুলেচ, বিছানা পত্তর ছিষ্টি এঁটো করবে।' শাশুড়ি বল্লেন 'মা, শীতের বেলায় ডুব দিলে যদি জ্বর জাড়ি হয়, পরের মেয়ে তায় ঠাণ্ডার ধাত, ওকে বিছানায় শুতে দোব না, কম্বল পেতে মাটিতে শোবে, গায়ে লেপ দোব না–কম্বলই দোব। আলগা আলগা থাকবে, হেঁসেলে যাবে না। কাল সকালে কম্বল রোদে দিলেই তোমাদের 'বেম্মা ঠেকানো' হয়ে যাবে।

ঠাকুমা ঐ কথার ওপর আর কিছু বলতে পারেন নি। বাবার ঠাকুমার নাম ছিল ভুবনমোহিনী। তাঁর এই বেম্মা ঠেকানোর মোহন পন্থাটি সমাজপতিরা পরীক্ষা করলে কত সমস্যার সমাধানই না হয়ে যেত।

১৪০০ সাল

সুখময় মুখোপাধ্যায়

১৪০০ সাল (বঙ্গাব্দ)-কে এতদিন আমরা জানতাম রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতার মধ্য দিয়ে। এই কবিতার প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সেদিনকার "নববসন্তের প্রভাতের আনন্দের লেশমাত্র ভাগ" তিনি "অনুরাগে সিক্ত করি" আমাদের হাতে পাঠাতে পারবেন না। তাঁর কথা অবশ্য ফলে নি। তাঁর কবিতায় অভিব্যক্ত বসন্তের আনন্দ ও তাঁর অনুরাগের ভাগ আমরা এখনো পুরোপুরিই পাচ্ছি। ঐ কবিতার শেষ দিকে কবি ১৪০০ সালের পাঠক-পাঠিকাদের প্রশ্ন করেছেন, "এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি তোমাদের ঘরে ?" এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে এবং কোন্ কবি রবীন্দ্রনাথের "বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন" গ্রহণ করবেন, তা আমার জানা নেই।

সেই ১৪০০ সাল এখন এসেছে। আসার সঙ্গে সঙ্গে সে এক বিরাট বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। এক দল বাঙালি ১৪০০ সালকে বঙ্গাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বর্ষ মনে ক'রে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, হঠাৎ এক দল পণ্ডিতের নিষেধাজ্ঞা শুনে তাঁদের থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। শেষোক্ত পণ্ডিতেরা নানা অভিধান ও বিশ্বকোষ ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে খ্রীস্টাব্দের শতাব্দী শুরু হয় জোড়া শূন্যের বছরে নয়, তার পরের বছরে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শুরু ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে হয় নি, হয়েছিল ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে। সেই রকম, ১৪০০ সালও বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বছর, পঞ্চাদশ শতাব্দীর প্রথম বছর নয়।

এই সব পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে। তবুও, আমার মনে হয়, একটা জিনিস এঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি। সেটা এই যে, খ্রীস্টাব্দের বছরের গণনা-পদ্ধতি আর ভারতীয় সংবৎ সমূহের (বিক্রম সংবৎ, শকাব্দ, বঙ্গাব্দ প্রভৃতি) বছরগুলির গণনা-পদ্ধতি ঠিক এক রকম নয়। খ্রীস্টাব্দের বছর হচ্ছে চল্‌তি সাল বা current year ; এখন খ্রীস্টাব্দের ১৯৯৩ সাল চলছে—তার মানে ১৯৯২ সাল শেষ হয়ে ১৯৯৩ তম বছর শুরু হয়েছে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় সংবৎ বা era-গুলির বছর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অতিক্রান্ত সাল বা expired year ; অর্থাৎ এখন যে ১৯১৫ শকাব্দ চলছে, তার মানে শকাব্দের ১৯১৫ বছরই অতিক্রান্ত হয়েছে ; খ্রীস্টাব্দের রীতি অর্থাৎ চল্‌তি সালের রীতি অনুসরণ করলে এখন হতো ১৯১৬ শকাব্দ। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ এল ভি

স্বামী কান্নু পিল্লাই লিখেছেন, "Śaka era (expired year = A. D. year minus 78). Extensively used in India both in the past, and at present."

অবশ্য, কখনো কখনো শকাব্দের বছর অতিক্রান্ত বছর হিসাবে উল্লিখিত না হয়ে চলতি বছর হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে, এ রকম নিদর্শনও পাওয়া যায়। তবে এই জাতীয় নিদর্শনের সংখ্যা খুবই কম। গত কয়েক শত বছর ধরে শকাব্দের বছর অতিক্রান্ত বছর হিসাবেই উল্লিখিত হচ্ছে, যার সঙ্গে খ্রীস্টাব্দের ব্যবধান আটাত্তর বছর। শকাব্দের চল্‌তি বছরের সঙ্গে খ্রীস্টাব্দের পার্থক্য সাতাত্তর বছর।

এ-ব্যাপারে বঙ্গাব্দ শকাব্দেরই পথ অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ, তার সালগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিক্রান্ত বছর, এবং খ্রীস্টাব্দের সঙ্গে তার পার্থক্য ৫৯৩ বছর। চলতি বছর হলে খ্রীস্টাব্দের সঙ্গে তার ব্যবধান হতো ৫৯৪ বছর।

বঙ্গাব্দের সালকে চল্‌তি বছর অর্থাৎ current year হিসাবে উল্লেখ করার নিদর্শনও যে দু'একটি পাওয়া যায় নি—এমন নয়। যেমন, গদাধর দাস (ইনি কাশীরাম দাসের ছোট ভাই) তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল'-এর রচনাকাল এইভাবে জানিয়েছেন,

চতুঃষষ্টি শকাব্দ সহস্র পঞ্চশত।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত ॥
রাজচক্রবর্তী শাহজাঁহা দিল্লিপতি।
ধর্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী ॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ।
মহান্ প্রতাপী হয় বৈরিজয়যশ ॥

অর্থাৎ, ১৫৬৪ শকাব্দে, ১০৫০ সনে বা বঙ্গাব্দে এবং দিল্লীশ্বর শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে 'জগন্নাথমঙ্গল' রচিত হয়। ১৫৬৪ শকাব্দ ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয় এবং শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষ ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আরম্ভ হয়। সুতরাং এই দু'টি তারিখের মধ্যে ঐক্য আছে। কিন্তু গদাধর দাস বঙ্গাব্দেও কাল নির্দেশ করেছেন। এক্ষেত্রে বঙ্গাব্দের (১০৫০) সঙ্গে খ্রীস্টাব্দের (১৬৪২) পার্থক্য ৫৯২ বছর। সুতরাং এখানে বঙ্গাব্দের যে বছর পাচ্ছি, তা চল্‌তি বছর বা current year ; আর এখনকার বঙ্গাব্দের বছর অতিক্রান্ত বছর বা expired year, যেহেতু খ্রীস্টাব্দের সঙ্গে তার ব্যবধান ৫৯৩ বছর।

বাংলা সনের বছরের চল্‌তি বছর হিসাবে উল্লেখের আরো কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। পরশুরামের 'শ্রীবৎসচিন্তা' উপাখ্যানের রচনাকাল ১৫৮৪ শকাব্দ ও ১০৭০ সন বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন ; 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'র একটি পুথির (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮৬ নং পুথি) লিপিকাল ১৬৩৮ শকাব্দ ও ১১২৪

সন এবং রামেশ্বরের শিবায়নের একটি পুথির (সুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য,১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫ দ্রষ্টব্য) লিপিকাল ১৬৭১ শকাব্দ ও ১১৫৭ সন বলে এই দুই পুথির পুষ্পিকায় উল্লিখিত হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রেই শকাব্দের সঙ্গে বাংলা সনের ব্যবধান ৫১৪ বছর আর এখনকার বাংলা সনের (১৪০০) সঙ্গে শকাব্দের (১৫১৫) পার্থক্য ৫১৫ বছর। অতএব পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির বাংলা সনের বছরগুলি চল্‌তি বছর এবং এখনকার বাংলা সনের বছর অতিক্রান্ত বছর বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

সুতরাং পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বঙ্গাব্দের ১৪০০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এখন বঙ্গাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে। অতএব আমাদের পঞ্চদশ শতাব্দী শুরু হওয়ার উৎসব বন্ধ রাখার কোনো কারণ নেই।

বঙ্গাব্দের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল, সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক কালে এ বিষয়ে একটা মত চালু হয়েছে। সেটি এই—আগে এদেশে সবাই হিজরী সন ব্যবহার করত; হিজরী সনের বছর চান্দ্র বছর এবং তা ৩৫৪ দিনে হয়; ফলে ফসল কাটার খুব অসুবিধা হতো, কারণ চাষীরা আগের বছর যে তারিখে ফসল কেটেছিল, পরের বছর সে তারিখ ১১ দিন এগিয়ে গেছে। তাই আকবর হিজরীর যে সাল তখন ছিল সেই সময় থেকেই এক সৌর সংবৎ বা era-র প্রবর্তন করেন। এটিই আমাদের বঙ্গাব্দ। এই মতটি এখন বহুল প্রচার লাভ করেছে এবং অনেকে একে ঐতিহাসিক সত্য বলেও মনে করছেন। কিন্তু এই মত একেবারে কাল্পনিক। কারণ—

১) আকবরের সময়কার প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' বা 'আকবর-নামা'-তে অথবা অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লেখা বইগুলিতে কোথাও আকবর কর্তৃক হিজরীকে সৌর বৎসরে পরিবর্তিত করার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(২) আকবরের আমলে শুধু যে হিজরীই ব্যবহৃত হতো তাই নয়, হিন্দুরা শকাব্দ, বিক্রম সংবৎ প্রভৃতি ব্যবহার করতেন; মুসলমানদের অনেকেই ফার্সী পঞ্জিকা ব্যবহার করতেন; এ সমস্তরই বছর ৩৬৫ দিনের সৌর বছর।

(৩) চাষীরা তারিখ অনুসারে ফসল কাটে না, তারা নির্দিষ্ট ঋতুতে ফসল কাটে। সুতরাং তাদের জন্য হিজরীকে সৌর সংবতে পরিবর্তিত করার কোনো কারণ নেই।

হিজরী থেকে বঙ্গাব্দ হয়েছে—এই মত এসেছিল, কয়েকজন আধুনিক ঐতিহাসিকের মাথা থেকে; এঁদের মধ্যে যাঁর কণ্ঠস্বর সবচেয়ে জোরালো ছিল, তাঁর নাম কে. পি. জয়সোয়াল। প্রধানত তাঁরই প্রচারের ফলে একটি কাল্পনিক মত আজ ঐতিহাসিক সত্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

কিন্তু এই কাল্পনিক মতের ভিত্তি কী? ভিত্তি একটি তুচ্ছ বিষয়। সেটি হল এই—আকবরের সিংহাসনে আরোহণের বছর ছিল ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দ, বা ৯৬৩

হিজরী এবং ৯৬৩ বঙ্গাব্দের সমান। এর থেকেই এরা স্থির করলেন যে হিজরী থেকেই বঙ্গাব্দ চালু হয়েছে এবং তা চালু করেছিলেন আকবর।

সব ঐতিহাসিক এই মত মানেন নি। সিলভান লেভি ফরাসি ভাষায় নেপাল সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে লিখেছেন স্রং সন নামে একজন তিব্বতী রাজা (যিনি ৬০০ খ্রীস্টাব্দের অল্প আগে রাজা হন এবং মধ্যভারত ও পূর্বভারত জয় করেন) এই বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেন এবং তাঁর নাম অনুসারেই নাম হয় "সন"।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এই অঞ্চলের সাল-তারিখ সম্বন্ধে একজন বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বঙ্গাব্দ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "সুলতান হোসেন শাহের সময় এই সন প্রচলিত হয়।" (বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮)।

কোন বিষয় থেকে যতীন্দ্রবাবু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা তিনি উল্লেখ করেন নি। সেইজন্য, একে গ্রহণ করতে আমাদের অসুবিধা আছে। এটা ঠিক যে, কোনো কোনো পুথিতে বঙ্গাব্দকে "যবন নৃপতে শকাব্দ" বলা হয়েছে, রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'র পুথিতেও বঙ্গাব্দকে "যাবনী বৎসর" বলা হয়েছে। কিন্তু এর থেকেই মনে করা চলে না যে জনৈক মুসলমান রাজা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেছিলেন এবং তিনি হোসেন শাহ।

হোসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন, এই মতের বিপক্ষে একটি যুক্তি দেখানো যায়। হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ একটি সংবৎ প্রবর্তন করেছিলেন; তা "নছরৎশাহী সন" নামে পরিচিত। বঙ্গাব্দের সঙ্গে তার দু' বছরের তফাত। ১০৮৩ নছরৎশাহী সন ও ১০৮১ বঙ্গাব্দে লেখা একটি পুথি পাওয়া গেছে (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাংলা পুথির তালিকা-সমন্বয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭)। বঙ্গাব্দ যদি হোসেন শাহের দ্বারা প্রবর্তিত হতো, তা হলে তাঁর পুত্র নতুন একটি সংবৎ প্রবর্তন করতেন কি?

যা হোক, বঙ্গাব্দের প্রবর্তক কে—তা যখন জানা যাচ্ছে না, তখন তাকে বাংলার প্রবল প্রতাপশালী রাজা শশাঙ্কের নামে চিহ্নিত করলে ক্ষতি কি? আমাদের মনে রাখতে হবে "শকাব্দ" নামে যা এখন পরিচিত, তা কুষাণ রাজা কনিষ্ক প্রবর্তন করেছিলেন, পরে তাকে বিক্রমাদিত্যের শক-বিজয়ের বছর থেকে প্রবর্তিত বলে ঘোষণা করা হয়। মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণসেন সংবৎ (ল. সং) যে বছর থেকে প্রবর্তিত হয়েছে বলে ধরা হয়—তখনো বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করেন নি, অথচ এই সংবৎকে (চালু হবার দেড়শো দু'শো বছর পরে) তাঁরই নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই, কারো নামের সঙ্গে চিহ্নিত করার একান্ত প্রয়োজন ঘটে থাকলে ১৪০০ বছর আগে যিনি জীবিত ও সিংহাসনে আসীন ছিলেন, সেই শশাঙ্কের নামের সঙ্গে বঙ্গাব্দকে যুক্ত করার কথা ভাবা যেতে পারে।

জিবরাইলের ডানা

শাহেদ আলী

যে-কাহিনী অবলম্বনে ছবি করতে চেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়

আজিমপুর হয়ে যে-রাস্তাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চলে গেছে তারি বাঁ-পাশে, গাছপালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট্ট কুটির। ঘরের মেটে দেওয়ালগুলির উপরিভাগ গলে গেছে অনেক দিন—রোদ-বৃষ্টি আর হাওয়ার অবারিত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরানো টিনের সুরাখ দিয়ে দেখা যায় নীল আসমানের ছিটে-ফোঁটা।

মা ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিয়ে।

সন্ধ্যেবেলা হালিমা খুবই মেরেছিলো নবীকে। আট বছর গিয়ে ন'বছরে পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে। কাজ না শিখলে দিন-গুজরানের উপায় থাকবে না। নবীকে দুধের বাচ্চা রেখেই বাপ তার ইন্তেকাল করেছে। একা হালিমা কীই-বা করতে পারে তার জন্যে? নিজের পেট পালতেই সাত বাড়ী ঘুরতে হয় তার; কাজ না পেলে ভিক্ষা করতে হয় এবং সন্ধ্যা বেলা গিয়ে বসে থাকতে হয় গোরস্তানের গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান-খয়রাত করে, তাদের কাছ থেকে দু'চার পয়সা হালিমার বরাতেও জুটে যায় কখনো কখনো। নবী অবশ্যি বিনে মাইনেতেই বিড়ির দোকানে কাজ করে, দোকানী শুধু দুপুরবেলা একবার খেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা হয়ে উঠে নি বিড়ি বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে মাস-মাস পাঁচ টাকা পাবে দোকানীর কাছ থেকে।

কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু করেছে আজকাল—কোন আছিলায় দোকান থেকে বেরিয়েই সে যে কোথায় চলে যায়, কেউ বলতে পারে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর দেখাই মিলে না তার। এ নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে—আজ তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, সে কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর,—অমন দুষ্টু ছেলেকে দিয়ে দরকার নেই তার।

সারাটা বিকেল গোস্বায় আগুন হয়ে ছিলো হালিমা—ছেলে যদি কোনো কাজ না শিখে, তার কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে আজকের দুনিয়ায়? অথচ,

ছেলে এমনি মগড়া যে, এদিকে মনই বসে না তার। মন বসবেই বা কেন? মা তো রয়েছে তার জন্যে ভিক্ষা করতে, বাঁদিগিরি করতে! সন্ধ্যায় নবী বাড়ী ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই হালিমা ধুমধুম করে কতকগুলি কিল বসিয়ে দেয় নবীর পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী?—জানতে পীড়াপীড়ি করেছিলো হালিমা, কিন্তু নবীর কাছ থেকে জবাব পাওয়া কঠিন, সে শুধু ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে নবী।

হালিমা খেতে বসেছিলো, কিন্তু দু' এক লোকমা গিলেই সে উঠে পড়ে—তার পেটেও ভাত গেল না আজ। কতো অনুনয়-বিনয় করেছে হালিমা, কিন্তু তাতে মন গললো না অভিমানী শিশুর, শুধু দু'একবার চোখ মেলে হালিমার দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর মুখ গম্ভীর করে সে নিজেকে ঘুমের কোলে সঁপে দেয়।

গলে-যাওয়া দেয়ালের উপর দিয়ে হালিমা তাকিয়ে আছে আসমানের দিকে। একটা হাত তার নবীর ওপর রাখা। নবীর পিঠে কঞ্চি ভেঙেও কোনোদিনই খুব ব্যথা পায় না হালিমা,—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়া ছেলের ওপর হাত রেখে তার মনটা হু-হু করে ওঠে। সত্যি এতোটুকু ছেলে, কী-ই বা বুঝে? বাপ তো মরে গিয়ে রেহাই পেয়েছে চিরদিনের জন্য, বাপ-মার যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হতভাগিনী হালিমা। এভাবে যখন-তখন ওকে মারপিট করা খুবই অন্যায়।—কিন্তু আজ যদি কিছুই না শিখে, ও বাঁচবে কি করে সংসারে? - হালিমা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না যে নিজের দিন গুজ্‌রানের কথা নবীর না ভাবলেও চলবে।

হালিমার চোখ আঁসুতে ভরে আসে, আসমান থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে সে চুমা খায় নবীর কপালে!

নবী আস্তে আস্তে চোখ মেলে চায় আর হঠাৎ একবার দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে মা, এইডা কে?

- কই রে? বিস্মিত হালিমা প্রশ্ন করে।

—উই যে গেলো, ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপরিচিতের যাওয়ার পথটি।

—কেউ না, নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দেয় হালিমা।

-- তুমি লুকাইবার চাও?-নবীর অভিমান যেন ফুলে ওঠে খুব ছুন্দর একটা মানুছ গেছে না? রাঙা ধব্‌ধবা—আর পিন্দনে ছুন্দর কাপড়?

- ছুন্দর মানুছ? হালিমার বিস্ময় এবার আরো বেড়ে যায়।

- হ, চোখ দুটো বড়ো করে নবী বলে—মিঠাই লিয়া আইছিল—তোমার কাছে দিয়া গেছে না মা?

—হ, দিয়া গেছে, একটা করুণ হাসিতে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে হালিমা—

তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী এখন তুই ঘুমা, — বিহান বেলা খাবিনে মিঠাই।

— লোকটা কোন্‌খান থে আইছিল মা? নবী আবার প্রশ্ন করে। — দুইটা পাখ্‌না দেখছো পিঠে?

— পাখ না? — হালিমার আক্কেল সত্যি হার মানে এবার; আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারে না হালিমা।

নবী আবার বলে – হ, পাখ্‌না। মউরের পেখমের মতো ছুন্দর!

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে ফিরিছতা আইছিল্‌ রে – ফিরিছতা! আজ ছবে-বরাত না! ঘরে ঘরে আইয়া খোঁজ-খবর নিছে মানুষের! ফিরিছ্‌তাগো আজ ছুটি!

ফেরেশতা এসেছিলো! নবীর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে, উঠে। এক দারুণ উত্তেজনায় সে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে।

রাতটা কী চমৎকার! রূপা-গলা জোছনায় ধুয়ে ঢলঢল করছে সারা পৃথিবীর গা! সন্ধ্যায় ঘরে ফেরবার সময় নবী দেখেছে মসজিদে মসজিদে কোরআন-তেলাওয়াত ছেলেমেয়েদের। এখন রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ্‌-বাড়ীর মসজিদ থেকে কোরআন তেলাওয়াতের শিরীন আওয়াজ ভেসে আসছে এখনো – গোরস্তান গমগম্‌ করছে মানুষে! আজ ঘুমিয়ে নেই কেউই, ফেরেশতার সঙ্গে, মৃতদের রুহের সাথে আজ মোলাকাত করবে সবাই, নিজেদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ফেরেশতা মারফত জানাবে আল্লাহর কাছে। শুধু নবী আর হালিমাই ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে সুযোগটা। তাদেরই দুয়ারের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা, অথচ তাদের চাওয়ার কথা – জীবন-পিপাসার কথা কিছুই জেনে যায়নি – কিছুই জানানো হলো না তাকে।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলের হাবভাব। একবার বলে – কিরে, তোর খিদে লাগছে খুব? ভাত খাবি এখন?

নবী কোনো জবাব দেয় না তার, ক্ষিদার কথা সে ভুলেই গেছে একদম। মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক মধুর কঠিন ভাবনায়। ফেরেশতারা খবর নিয়ে যায় আল্লাহর কাছে! তাদের খবরও কি নিয়ে গেছে ফেরেশতা? সে কি গিয়ে বলবে না শবে বরাতের রাতেও সে ঘুমে দেখে গেছে নবী আর হালিমাকে।

— ফিরিশ্‌তারে কিছু কইয়া দিছো মা? আবার জিজ্ঞাসু হয় নবী!

কিছু বুঝতে না পেরে হালিমা চুপ করে থাকে।

— দুয়ারের কাছ দে' গেলো, আর কিছু কইয়া দিলা না? অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে নবী, আমারে ডাকলা না ক্যান তুমি!

— আরে পাগলা, হালিমা তার জ্বালা ছেপে রাখতে পারে না, ফিরিছতা

আমাগো কতা হুনবো ক্যান? বড় লোকগো খোঁজ-খবর করবার লাই না আইছে! আমাগো দুয়ারের কাছ দে তা'গো বাড়ীই হে গেছে।

নবী চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—তুমি নামাজ পড়ো না ক্যান মা? অসহ্য মুরুব্বিয়ানার সুর বেজে ওঠে তার প্রশ্নে।

—কী অইবো নামাজ পইড়া? একটা পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় হালিমার কণ্ঠে।

—কী, অইবো কি? এতোটুকু নবী জলে ওঠে বিরক্তিতে, যারা নামাজ পড়ে, তাগো বাড়ীতেই না ফিরিছতারা আহে; আল্লা তো তাগো কতাই ছোনে।

—না রে, না, হালিমা একরকম চীৎকার করে ওঠে এবার আল্লা তো ঘুমাইয়া রইছে কেঁতা গায় দিয়া। ছুনা-রূপা দিয়া ছেজদা করলেই হে চায়। গরীবের সোদা নামাজে হের মন ভিজে না।

আল্লাহ্‌র এই মহৎ গুণের কথা ভেবে নবী একান্তভাবেই ঘাবড়ে যায়। কাঙাল যারা, মিসকিন যারা, তাদের আর কোন ভরসাই নেই তাহলে। এতো সোনা-রূপাও তারা পাবে না, তাদের আরজুও গিয়ে পৌঁছাবে না আল্লাহ্‌র কাছে। আর তাই তো, গরীবদের যারা নামাজ পড়ে তাদের তো মালদার হতে দেখা যায় না। দুঃখ তাদের ঘুচছে কই? সোনা-রূপার শিরীন আওয়াজেই তাহলে ঘুম ভাঙে আল্লাহ্‌র! সেই জন্যই বুঝি মালদাররা আরো মালদার হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্তর গুণ!

কিন্তু তিনি তো পয়দা করেছেন সবাইকে। তিনি কেন তার রহমত একতরফা বিলিয়ে দেবেন মালদারদের মধ্যে? কোনোদিন কি ঘুমের ঘোরেও দরিদ্র বান্দার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না তাঁর চোখ? সত্যি কি গরীবেরা তাঁর ঘুম ভাঙাতে পারে না?

হতাশার আঁধারে হাতড়ে ফিরতে থাকে নবীর মন। দুয়ারের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে ফেরেশতা দবদবে আগুনের মতো রঙ, ময়ূরের পেখমের মতো বিচিত্র বর্ণের দুটি ডানা তার পিঠে, আর গায়ে সে কী খোশবু! সাদা ধব্‌ধবে তাজী ঘোড়া কোমর নাচিয়ে চলেছে ফেরেশতাকে নিয়ে। নবী জেগে থাকলে আজ শুয়ে পড়তো ফেরেশতার পথে, আর মিনতি করে বলতো তার রক্তের ঢেউ-ওঠা অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী। কথা না শুনলে সে ঝুলে পড়তো ডানায় ধরে—ফেরেশতার সাথে সাথে উড়ে উড়ে সেও চলে যেতো একেবারে আল্লার কাছে। অমনি চোখ না মেলে নবী চীৎকার করতো গলা ফাটিয়ে খামচিয়ে রক্তাক্ত করে ঘুম ভাঙাতো আল্লাহ্‌র।

কিন্তু তা-তো আর হলো না। অথচ সবকিছুরই চাবি রয়েছে আল্লাহ্‌র হাতে। তার ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেই-বা আর খুলে দেবে ভাগ্যের মণি-কোঠা?

বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে নবী। রাজ্যের যতো চিন্তা এসে জটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিবিয়ে গা এলিয়ে দেয় নবীর কাছে। ছেলে দুচোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হালিমা তা দেখছে না, শুধু বুক দিয়ে অনুভব করছে নবীর বুকভরা অস্বস্তি। একবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে : নবী, অনেক রাত অইছে—তুই ঘুমা।

নবী আসমানের দিকে চেয়ে থাকে চুপ করে, আর একটা পথের খোঁজে কল্পনা তার হয়রান হয়ে যায়। আকাশ ভরে, পৃথিবী ভরে এতো জোছনা—তবু যেন কতো অন্ধকার, চোখের সঙ্গে মনও হারিয়ে যায় সে অন্ধকারে।

হঠাৎ একবার বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায় তার চোখে, অকূল দরিয়ায় যেন নারিকেলকুঞ্জ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। খুশীতে, আবেগে রোমাঞ্চিত হয় তার সারা দেহ। হয়েছে, আর ভাবতে হবে না! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে টান দেবে সে। রশি তো তার হাতেই রয়েছে! এবার থেকে নির্বিকার ভাব ঘুচে যাবে আল্লাহ্‌র।

পরদিন। আগের দিনকার পানিভাত দুটা খেয়ে দোকানে কাজ করতে যায় নবী। যাবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না, হালিমাই পাঠিয়েছে অনেক শাসিয়ে।

হালিমা বলে, নিজের হাতেই আজ গড়তে হবে কপাল, আল্লার কাছে আরজি পেশ করলেই চলবে না!

কয়েকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে পিলখানার ওপাশে, ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। দোকান পালিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে ঐখানে সে রোজই ঘুড়ি ওড়ায় আপন মনে। এ খবর নবী ছাড়া আর কেউ জানে না সংসারে। পৃথিবীকে লুকিয়ে শিশু তার কচি হাত দুটি বাড়িয়ে দেয় আসমানের দিকে। কিন্তু হাত আর কদ্দূর-ই-বা ওঠে? নবীকে তাই নিতে হয়েছে ঘুড়ি—ঘুড়ি উড়িয়ে সে তার আর্তি এতোদিন অজান্তে উপর হতে আরো উপরে আরশের দিকেই পাঠিয়েছে।

পেট-ব্যথার অজুহাত তুলে নবী বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। মুহূর্তের জন্যেও সে থির হতে পারছে না আজ। অতি সন্তর্পণে বাড়ী পৌঁছে নবী। মা বাড়ী নেই। নবীর আনন্দের সীমা থাকে না। তিনটা পাতিল তচ্‌নচ করে সে বার করে দু'আনা পয়সা—ওহ্‌! দুই আনার পয়সা তো নয়, সাত রাজার ধন! পয়সাগুলি মুঠায় পুরে নবী ছুটে যায় নবাবগঞ্জে। সুতা কিনে সে আবার দৌড়তে শুরু করে দেয়। এক নতুন অভিযানের নেশায় তার বুক কাঁপছে।

জঙ্গলের ভেতরকার এক পরিত্যক্ত ভাঙা মসজিদের অন্ধকার গুহা থেকে নবী বার করে একটা ঘুড়ি আর লাটাই। এই ঘুড়িই তাকে রোজ দোকান থেকে বের করে আনে কাজ ভুলিয়ে, এই ঘুড়িই তাকে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে

আসমানের পথে নিয়ে যায়। আর সব ব্যাপারেই খই ফোটে নবীর মুখে, কিন্তু এই ঘুড়ির কথা কারো কাছে সে বলে না। এ যেন তার নেহাতই পুশিদা খেলা, একান্তভাবেই নিজস্ব।

এক সময়ে নবী চলে যায় পিলখানার পাশেই সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। পুরানো সুতাটার সঙ্গে নতুন সুতাটা গেরো দিয়ে সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে। ঘুড়ি যতোই উপরে উঠতে থাকে, উল্লাসে অধীরতায় ততোই বিচলিত হয়ে ওঠে নবী। একটা স্মিতহাস্যে তার মুখ থেকে চোখ পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বার বার। আরশের পায়ে রশি লাগিয়ে আজ সে সজোরে টান দেবে।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসে ঘুড়িটা। এক সময়ে যখন হাতের সুতা শেষ হয়ে গেলো, নবীর দুঃখের সীমা রইলো না। সুতা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঘুড়ি যে দেখা যাচ্ছে এখনো। আল্লাহ্, কি এতো কাছে? তাতো নয়, মানুষের দৃষ্টি-সীমার বাইরে অনেক—অনেক দূরে আরশের উপর ঘুমিয়ে তিনি। এতো কাছে হলে তো খালি চোখেই দেখা যেতো আল্লাকে। সুতা চাই তার আরো, অনেক সুতা—যে তার ঘুড়িকে নিয়ে যাবে মেঘের ওপারে, আরশের একেবারে কাছটিতে। কিন্তু ওখানেও দরকার পয়সার। সে যে সুতা কিনবে, সে পয়সাই-বা কই নবীর? তাদের দুর্দশা তাহলে আর ঘুচবে না। নবী আসমানের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতায় আর্তনাদ করে ওঠে।

কিছুক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়েই বাড়ি চলে আসে নবী। এই সুতায় হবে না, আরো অনেক সুতা চাই। বামনের হাত বাড়িয়ে আরশের পায়া ধরা অসম্ভব। পরম যত্নে সে ঘুড়িটা লুকিয়ে রাখে ভাঙা মসজিদের নির্জন অন্ধকারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘরেও পয়সা নেই। মার কাছে পয়সা চাইতে গেলে হালিমা কঞ্চি দিয়ে তার পিঠের ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে দু'আনা পয়সা আজ সে চুরি করেছে, তার জন্যেই তার বরাতে কী আছে, কে জানে?

তবু লোভ সামলাতে পারে না নবী। আজলের লিখা পালটাতে হলে কিছু খরচ কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বৈ কি! মার অবর্তমানে নবী উল্টা-পাল্টা করে দেখে ঘরের সব কটা হাঁড়ি-পাতিল—ছেঁড়া কাপড়ের বোঁচকাগুলি খোঁজে তন্নতন্ন করে। একটা পয়সা নেই কোথাও। থাকবেই বা কী করে? ভিক্ষা করে, পরের বাড়িতে কাজ করে যা দু'চার পয়সা পায়, তাতে করে মা-ছেলের আধপেটা খাবারই হয় না কোনদিন, তারা আবার জমাবে পয়সা!

হঠাৎ নবীর মনে পড়ে গেল: ইস্টিশনে গেলে দু চার পয়সা পাওয়া যেতে পারে। তার বয়সী ছেলেদের সে কুলিগিরি করতে দেখছে অনেকদিন। নবী আর ভাবতে পারে না, এক পেট খিদে নিয়েই সে ছুটে যায় ইস্টিশনের দিকে।

অনেকক্ষণ বসে থাকতে হলো তাকে। তারপর গাড়ি যখন এলো, তাজ্জব

বনে যায় নবী—কতো বিচিত্র রকমের মানুষ, আর কতো রঙ-বেরঙের পোশাক! বাক্স, বিছানা, পেটেরা প্রভৃতিতে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে লাইনের কাছটুকু। 'মুটে চাই', 'কুলি চাই' চীৎকারে হারিয়ে যায় আর সব আওয়াজ।

সবার বরাতেই একটা-না-একটা কিছু জুটে যায়; কিন্তু নবীর কপাল বড়ো খারাপ; 'মুটে চাই' বলে চীৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ এলো না তার গলায়—হাত দুটি চাওয়ার ভঙ্গীতে উপর দিকে উঁচিয়ে সে ছুটে যায় এক কামরার সুমুখ থেকে আরেক কামরার সুমুখে—চোখ তার করুণ, আঁসুতে টলোমলো।

কিন্তু ভিক্ষুক মনে করে কেউ কেউ তাকে নসিহত করলে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে, আর অতি আধুনিক কেউ-কেউ দেয় গলাধাক্কা। কারো কাছ থেকেই নবী কিছু পেলো না।

ট্রেন চলে গেছে। ইস্টিশনে বসে বসে নিজের বদ্-নসীবের জন্যে বেদনায় নবীর মন ভরে আসে। দুঃখটা এবার আরো বড়ো হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। মায় বেটায় কোনোদিন একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। কোনোদিন একেবারেই উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারতো! সেই যে তার বাপ ছেঁড়া শততালি দেওয়া কাপড়গুলি রেখে গিয়েছিলো, সেইগুলিই আরো তালি দিয়ে এবং গেরোর ওপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দুজনে। ঘরের মেটে দেয়াল তো প্রায় সবটাই গলে গেছে; বৃষ্টি হলেই টিনের সুরাখ দিয়ে 'উসসিলা' পড়ে ঘর ভেসে যায়। দুর্দশার আর সীম-পরিসীমা নেই। আল্লাহ্‌র কাছে তাদের দিলের আরজু পৌছাতে পারলেই অবসান হতো দুঃখ-রাত্রির।

কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবীও আরবী সূরা এবং রাকাতগুলো শিখবার সুযোগ পায়নি। আল্লাহ্ কেনই বা শুনবেন ওদের কথা।

ঘণ্টাখানেক পরে আর একটা ট্রেন যখন এলো, নবীর আনন্দ দেখে কে! ট্রেন থামবার আগেই 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' বলে হাত তুলে সে চীৎকার শুরু করে দেয় প্রাণপণে।

ট্রেন থামলে একটা ঘড়ি-পরা বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঁড়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কামরার সুমুখে। ভদ্রলোক একটা এটাচি ও হোল্ডঅল্ দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওয়েটিং রুমে নিতে পারবি?

—ক্যান পারুম না? তাচ্ছিল্যের সাথে নবী জবাব দেয়,—দেন আমার ঘাড়ে তুইল্যা।

—কতো নিবি?—ভদ্রলোকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

—আমার বহুত পইছার দরকার, চোখ দুটি বড়োবড়ো করে উচ্চারণ করে নবী—আপনে কতো দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক এবার দৃষ্টি প্রখরতর করে নবীর মুখের দিকে তাকান; অদ্ভুত ছেলে

তো ! বলেন—এতো পয়সা দিয়ে কী করবি ?

—বা রে, পইছার বুঝি কাজ নাই ! নবী বিস্ময় প্রকাশ করে, ঘুড়ির রছি কিনুম যে—অনেক রছি !

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হেসে ফেললেন এবং হোল্ডঅলটা নবীর মাথায় দিয়ে এটাচিটা হাতে ক'রে তিনি নেমে পড়েন গাড়ি থেকে। ওয়েটিং রুমে এসে চার পয়সার জায়গায় চার আনা দিয়ে বলেন—এই নে, অনেক সূতা হবে।

নবী সিকিটা ছুঁড়ে মারে ওয়েটিং রুমের মেঝেয়—না, আমি নিমু না। চার আনায় আমি কী করুম ? আমার অনেক রছি লাগবো। আমার ঘুড়ি আসমান ছুঁইবো গিয়া !

নবীর মেজাজ দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। ভদ্রলোক সিকিটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন ঘুড়ি আসমান ছুঁলে তোর কি হবে ?

—ক্যান, আরছের পায়ায় বাজাইয়া টান দিমু,—এক স্বপ্নিল নেশা আর শক্তির স্ফূর্তিতে নবী মুহূর্তে যেন বিরাট কিছু হয়ে ওঠে—আল্লা খালি আপনাগো কতাই ছুনবো,—আমাগো কতা বুজি হের ছুনোন লাগবো না ?

এবার সকলে এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। পরিবেশটা মুহূর্তে যেন কেমন থমথমে হয়ে ওঠে। কারো মুখে 'টু' শব্দটি নেই। রাজভক্তদের সামনে যেন রাজদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ভদ্রলোক পকেট হতে একটা আধুলি বের করে বলেন—এই নে, এখন হবে তো ?

আধুলিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আঁখি ছলছল করে ওঠে নবীর। আন্ত-রিকতা মিশিয়ে বলে,—আমাগো যখন অনেক পইছা অইবো, আমাগো বাড়ী তখন আইয়েন—জেব ভইরা দিয়া টাকা-পইছা দিমু আপ্‌নেরে।

নবীর কথায় সবাই হেসে ফেলে। যিনি আধুলিটা দিয়েছেন তিনি তো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁর আজকের এই মেহেরবানীর কথা কখনো ভুলতে পারবে না নবী—দিন যখন ফিরবে, নবী দুই জেব ভর্তি করে পয়সা দিয়ে শোধ করবে তাঁর ঋণ। হাসতে হাসতেই বলেন, হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই আসবো, আমরা সবাই আসবো সেদিন—আল্লাহ্ তোকে অনেক টাকা পয়সা দিক।

নবী এসব শুনবার জন্য অপেক্ষা করে না। সে সোজা চলে যায় চকের দিকে। অনেকটা সূতা কিনে যখন বাড়ি ফিরলো তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সে সূতাটা লুকিয়ে রেখে আসে মসজিদে—তার ঘুড়ির পাশে।

হালিমা ভিক্ষা করে-আনা চাল জাল দিচ্ছে আর সুরবুর্ হচ্ছে ধুঁয়ায়। গাছতলা থেকে ভেজা বন কুড়িয়ে এনেছে আগুন ধরাবার জন্যে। নবীকে দেখেই চোখ কচলাতে কচলাতে বলে, কিরে, অতোক্ষণে কোত্থে আইলি ?

মা'র দরদ-ভরা প্রশ্নে ভারি খুশী হয় নবী ; তার মেজাজ তাহলে বিগড়ে

যায়নি আজ। হয়তো পাতিল তচনচ করে পয়সা নেবার খবরটি মা এখনো জানতেই পারেনি। মনে মনে আল্লাহ্‌কে সে শুকরিয়া জানায়।

—দোকান থে বার অইয়া একটু ঘুইরা আইলাম মা,—মার দিকে চেয়ে সে বলে সহজ গলায়।

চুলায় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমার কণ্ঠে দরদ ভেঙে পড়ে - দোকান থে পালাস নে যেন! - কাজটা ছিখে ফেললে ঘরে টাকা পইছা আইবো, কাজ না জানলে কি ভাতকাপড় জোটে রে বাপ? আমাগো মা-পুতের কি উপায় আছে এছাড়া—এবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হালিমা প্রশ্ন করে—হারে নবী, তোর খিদা লাগছে, না?

মা-এর আন্তরিকতায় নবী একরকম ভুলেই যায় তার খিদার কথা। তাছাড়া, একদিকে রশি কেনার আনন্দ, অন্যদিকে মার স্নেহ দুটায় মিলে আজকের দিনটিই অপূর্ব হয়ে উঠেছে। নবী হেসে বলে না মা,—আমার খিদা লাগছে না। দোকানে আমাগোরে খাওয়ায় কিনা দুপুর বেলা!

—তাই ভালা,—হালিমা সায় দেয়—ভিক্ষার ভাত পেটে যতো কম দেয়া যায় ততোই ভালো। এ ভাতে ছেলে মাইয়াগো 'বাইড়' থাকে না।

রান্না হলে নবী ও হালিমা, দু'জনেই কিন্তু ভিক্ষার ভাত পেটে ঢেলে কিছুটা স্বস্তিবোধ করে।

পরদিন দোকানের কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আজ আবহাওয়া খুবই অনুকূল এবং নবীর হাতে অনেক সুতা! পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আজ সে অনায়াসে তার হাত পৌঁছিয়ে দিতে পারবে আসমানে।

নবী ঘুড়িটাকে পয়লা বুকের কাছে চেপে ধরে,—বুক তার ঢিপ ঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘুড়ি উড়লো আসমানে,—হাওয়ার ভরে নেচে নেচে, দুঃসাহসের দোলায় কেঁপে কেঁপে ঘুড়ি উঠে যায় উপর হতে উপরে—আরো উপরে! সুতা আজকে ফুরাতে চায় না,—ঘুড়ি ক্রমেই ছোটো হয়ে আসছে—অই বুঝি ঘুড়ি হারিয়ে যায় দৃষ্টির ওপারে, অসীম শূন্যতায়! আবেগে, ঔৎসুক্যে বড়ো হয়ে আসে নবীর চোখ দুটি। তার বুকের শ্বাস দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে আসে, ঠোঁটের বাঁধন খুলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসির আমেজ লাগে তার সারা মুখে। ঘুড়ির নাচের সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব চঞ্চলতায় নবীর বড়ো-হয়ে-আসা চোখের চকচকে তারা দুটি নাচতে থাকে।

এক সময়ে নবী টের পায়—লাটাই আর ঘুরছে না—সুতা শেষ হয়ে গেছে। সেই নির্জন ফণি-মনসায় ঘেরা জায়গাটুকুতে নবীর চোখ পানিতে ভরে আসে। ঘুড়ি এখনো দৃষ্টি-সীমার ভেতরেই উড়ছে!

নবী ঘুড়ি নামিয়ে আনলো। আরো রশি চাই তার—অনে—ক রশি!

আল্লাহ্ তার আসন এতো দূরে পেতেছেন কেন, বুঝতে পারে না নবী। কিন্তু আসন পাতলেই কি আরশে বসে ঘুমানো এতো নিরাপদ? সংসারে কি রশি নেই যে তাঁর আরশ ছোঁওয়া যাবে না, টলিয়ে দেয়া যাবে না পায়ায় রশি লগিয়ে? বাধা পেয়ে নবীর আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হয়ে ওঠে।

চিরদিনকার মতো মসজিদে ঘুড়ি আর লাটাই লুকিয়ে রেখে আজো নবী ছোটে ইস্টিশনের পথে। পয়সা চাই তার, রশি কেনার পয়সা যে রশি সে আরশের পায়ায় বেঁধে আল্লাহ্কে নামিয়ে আনবে মাটির মানুষের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত দু'আনার বেশী আর জোটে না। কতোটুকু সুতাই আর কেনা যায় এ দিয়ে!

এমনি করে রোজ কিছু কিছু পয়সা আয় করে নবী আর তাই দিয়ে সুতা কিনে পুরনো সুতাটায় জুড়ে দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে!

পিলখানার ওপাশে ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন করে নিয়েছে অনেকদিন। অমন নির্জন নীরব পরিবেশ আসমান ছাপিয়ে ওঠে নবীর দুর্জয় সাহস। কিন্তু হাতের সুতা যখন শেষ হয়ে যায় এবং ছোট হতে হতেও ঘুড়ি যখন থেকে যায় দৃষ্টির ভেতরেই, নবীর তখনকার দুঃখ আর আক্রোশ দেখে কে? তবু মন তার ভেঙে পড়ে না সাফল্যের নিকট-সম্ভাবনা তাকে করে তুলে আরো সাহসী, আরো জেদী।

রোজ নবী দোকানের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কোথায়-বা দোকান, আর কোথায়-বা নবী? ইস্টিশনে, বাজারে মুটেগিরি করে যা দু'চার পয়সা পায়, সবই খরচ করে সুতা কিনে। দিনে দিনে সুতা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে।

একদিন সত্যই ঘুড়িটা ছোটো হতে হতে একটা কালো বিন্দুর মত হয়ে আসমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেলো।

ডোর ধরে রেখে আসমানের দিকে চেয়ে আছে নবী, আর প্রচণ্ড কাঁপুনিতে থর্ থর্ করে উঠছে তার শরীর। উত্তেজনায় কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এলো তার,বিস্ময়ে আশঙ্কায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে—একটা করুণ হাসিতে মধুর হয়ে উঠলো শিশুর মুখ। আজ যেন টানাটানি পড়ে গেছে আসমান আর পৃথিবীর মধ্যে—কে হারে, কে জেতে—এবং তারি আকর্ষণ সে অনুভব করছে হাতের রশিতে! শুধু একটা রশি টন্টন্ করছে আসমানের আকর্ষণে। হয়তো দৃষ্টির আড়ালে থেকে কেউ টানছে রশি ধরে—আর সেই টানে ফুলে ফুলে উঠছে নবীর হাতের শিরা-উপশিরা।

রশি বেয়ে বেয়ে নবীর বিস্মিত দৃষ্টিও হারিয়ে যায় আসমানে। আজকে আর নবী ঘুড়ির রশি গুটাবে না, লোকচক্ষুর ওপারে ঘুড়ি উড়ে বেড়াক আপন ইচ্ছায়—আপন ধর্মে! এক সময় হয়তো আটকে যাবে আরশের পায়ায় আরো

শক্ত টান পড়বে হাতে, রশিতে টান দিয়ে নবী টলিয়ে দিবে আল্লাহ্‌র আরশ। চকিত আঁখি মেলে আজ আল্লাহ্‌ মাটির মানুষের দিকে তাকাবেন – অনিচ্ছায়ও শুনতে হবে দুঃখী বান্দার কাহিনী – তাদের ইতিহাস!

নবী চেয়ে আছে উপর দিকে – শুধু একটা সুতা সিরাতের পুলের মতো সূক্ষ্ম একটা সিঁড়ি বেহেশ্‌ত আর দুনিয়ার মাঝখানে। মাঝে মাঝে সাদা, কালো, নানা রঙের মেঘ আনাগোনা করছে এবং আঁৎকা টান পড়ে পড়ে ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠছে সুতাটুকু – মেঘ টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে সে সুতার ধারে।

নবীর চোখ দুটো পানিতে ভরে এলো। আল্লার আরশ ঠিক কোন্‌খানটিতে তা সে জানে না, কিন্তু আজ তার মনে হলো – সে যেন তার বিদ্রোহের নিশান আরশের কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে – আর যেন দূর নয় বেশী!

পেটের ক্ষিধা মা ও সমস্ত সংসার – সব কিছুই ভুলে যায় নবী। সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ 'ডোর' ধরে ও দাঁড়িয়ে থাকে। কই, কোথাও তো আটকে গেলো না ঘুড়ি! এক সময় সে সুতা গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে আনে নীচে এবং জমিন ছুঁবার আগেই ঘুড়িটাকে চেপে ধরে তার বুকের মাঝে; ঘাড় নীচু করে সে পরশ নেয় ঘুড়ির – কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় নাকে আর ঘুড়িটাকে মনে হয় ভেজা ভেজা।

আহ্‌! নবীর বুকে খুশী আর সামাই পায় না যেন। বহুদিন পর আল্লাহ্‌ আজ তাঁর গরীব বান্দার দুঃখে কেঁদেছেন, আর তাঁরই আঁসুর ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে নবীর ঘুড়ি।

আরশের পায়া ধরে টান দিতে হলো না আর; এর আগেই আল্লাহ্‌ কেঁদে ফেলেছেন তাঁর বান্দার দুঃখে। নবী আজ সত্যি বিজয়ী – সে সার্থক হয়েছে তার অভিযানে; আজ থেকে আর কোন দুঃখই থাকবে না তাদের।

বাড়ি ফিরে দেখে – হালিমা বিছানায় পড়ে কোঁকাচ্ছে – জ্বর এসেছে! জোহরের সময়েই ঘরে চলে এসেছিলো – আজ আর কিছুই জোটেনি কপালে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো নবীর – আল্লাহ্‌ যদি তাঁর বান্দার দুঃখে কাঁদবেন তো তার মা-এর জ্বর হবে কেন আজ? তাদের ঘরে আজ ভাত জুটবে না কেন? এ তাহলে আল্লাহ্‌র আঁসু নয় – শয়তানের পেশাব! শয়তান চায় না যে মানুষের দিলের আরজু পৌঁছুক গিয়ে আসমানে।

নবী বুঝতে পারে – তার আরো অনেক সুতার দরকার হবে। সাত তবক আসমান পেরিয়ে গিয়ে তবেই-না আল্লাহ্‌র আরশ! সকাল বেলা জ্বর নিয়েই হালিমা উঠে পড়ে। কয়েক বাড়ি ঘুরে কিছুটা ফেন যোগার করে নিয়ে আসে নবীর জন্যে।

নবী বলে তুমি খাইবা না, মা?

– না. হালিমা ধীরে ধীরে বলে, – তুই খাইয়া দোকানে যা।

নবী পিয়ে পিয়ে ফেনটা গিলে নেয়। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তুমি চিন্তা কইরো না মা—আল্লা আমাগো উপ্রে মুখ তুইলা চাইবো। এ-হাল আমগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা ছেলের দিকে চেয়ে একটু করুণ হাসি হাসে—কিছু বলে না। টলতে টলতে এক সময় বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে জানে না যে নবী দোকানে যায় না এক দিনও—বাজারে, ইস্টিশনে মুটেগিরি করে, আর পিলখানার ওপাশে ঘুড়ি উড়ায়!

নবী মুটেগিরি ক'রে ক'রে রোজ কিছুটা সুতো কেনে। ঊর্ধ্ব হতে আরো ঊর্ধ্বলোকে পাঠিয়ে দেয় তার বিদ্রোহের নিশান! কিছুতেই থামতে পারে না নবী; যার নূরের তজল্লিতে সিনাই পাহাড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো, তারি দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় দুঃসাহসী শিশু।

কিন্তু যতোই সুতা জুড়ে দিচ্ছে—ঘুড়ি ততোই উপর হতে আরো উপরে উঠছে—কোনো কুলকিনারাই পায় না নবী। এতোদূরে—মানুষের নাগালের বাইরে এভাবে আত্মগোপন করার কী মানে থাকতে পারে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন নবী সন্ধ্যার সময় ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে এসে দেখে—মা আজ বড়ো খুশী! পরনে তার নতুন শাড়ি—সানকি আর বাটিতে ভাত-সালুন বেড়ে বসে আছে নবীর অপেক্ষায়!

বহুদিন পর সান্‌কি-ভরা ভাত দেখে পেট জ্বালা করে ওঠে নবীর। সে সোজা গিয়ে বসে পড়ে হালিমার কাছে। খেতে খেতে বলে—মা, এই ছব্ পাইলা কই আইজ?

আজো জ্বর ছিলো হালিমার। কিন্তু এই মুহূর্তে নবীর খাওয়া আর খুশী দেখে সে যেন হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে—কাহারটুলির জমিদার বাড়ীর বউ মরছিল না!—তারি ফাতিহা আইছে আইজ,—বহুত্ কাপড়-চোপড় আর টাকা-পইছা দান-খয়রাত করছে। দেখ্না তোর লাইগা একটা লুংগিও আনছি চাইয়া—হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট্ট নতুন লুংগি এনে নবীর হাতে দেয়। নবী বিস্ময়ে অবাক হয়। আজ বুঝি সত্যিই মুখ তুলে চেয়েছেন আল্লাহ্, ঘুম তাহলে ভেঙেছে তাঁর! শুক্‌রিয়ার বান ডেকে যায় তার বুকে। ছলোছলো চোখে মার দিকে চেয়ে বলে—কইছিলাম না মা—এ হাল আমগো বেছি দিন থাকবো না!

হালিমা নবীর এ-কথায় সায় দিতে পারতো না কোনদিনই! কিন্তু এই মুহূর্তে সে সায় না দিয়ে পারে না। নবীর চোখে যেন সে পরিচয় পেয়েছে—তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের!

জমিদার-বাড়ির দেয়া পয়সা আর চালে দু'দিন ভালোই গেলো ওদের।

আবার শুরু হয় আধ-পেটা খাওয়া আর উপোসের পালা। নবীর মন ভেঙে যায় – রাগে জ্বালা ধরে তার সমস্ত সত্তায়। একি ছলনা – একি ছিনিমিনি খেলা বান্দার জীবন নিয়ে ? তাদের আরজু তাহলে এখনো গিয়ে পৌঁছায়নি আল্লাহ্‌র কাছে !

নবী রোজ ঘুড়ি উড়ায় আর মনে মনে বলে – আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে এতো সুতো যদি সে কিনতে না-ই পারে, এতো ফেরেশতা রয়েছে কি জন্যে ? তারাই তো মানুষের দিলের আরজু পৌঁছায় নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছ ! আল্লাহ্‌র কাছ হতে তারাই তো পয়গাম নিয়ে আসে মানুষের কাছে ! আজ-কাল এতো নিষ্ক্রিয় কেন ফেরেশতারা ? কেন তারা নবীর ঘুড়ি নিয়ে যায় না আল্লাহ্‌র কাছে !

সেদিন সোমবার। নবী না খেয়েই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে চুপি চুপি। সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকু।

নবী দুর্বার উপর বসে নতুন সুতাটা জুড়ে দেয় পুরোনো সুতাটার সঙ্গে। আসমান কেন যেন আজ মেঘলা মেঘলা। সূর্যের আলো পড়ে মেঘগুলি সাদা হয়ে গেছে আর ফাঁকে ফাঁকে চকচক করছে গাঢ় নীল আসমান।

এক সময় নবী ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আসমানে, – হাতে তার লাটাই ঘুরছে আর ঘুড়ি শনশন করে ধাওয়া করছে উপর দিকে। নবী অপলক চেয়ে আছে ঘুড়ির পানে, – আর রশিতে টান পড়ে ঘুড়ি ঝিন্‌ঝিন করে উঠছে তার সারা শরীর। অকারণ উল্লাসে ভরে উঠছে নবীর মন। নবী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না ! মন তার আবেগে উৎসাহে থর থর করে কেঁপে উঠছে, কল্পনা স্বর্ণ-ঈগলের মতো ডানা মেলেছে আসমানে।

ঘুড়ি ক্রমেই ছোটো হয়ে এলো ! এক সময়ে নবী বিস্মিত হয়ে দেখতে পায়, তার ক্ষুদ্র ঘুড়িটার চার পাশে একটা মস্তবড়ো পাখী উড়ছে আর ঘুরছে। মাঝে মাঝে পাখীটা হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে -- আবার দেখা যাচ্ছে। বৃহৎ ডানা মেলে ঘুরছে ঘুড়িটাকে কেন্দ্র করে। আশ্চর্য, একবার ঘুড়ির রশি আটকে যায় পাখীর গায়, নবীর হাতে টান পড়ে, আর তাতেই তার সারা শরীর অজানা আশঙ্কায় দুলে ওঠে – পাখীটা ঘুড়ি নিয়েই ঘুরতে থাকে আরো দ্রুত। রশি আরো প্যাঁচ খেয়ে লাগে পাখীর ডানায় আর গায়ে। হঠাৎ একসময় নবী টের পেলো সুতা ঢিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে আর ঘুড়ি ঘুরছে পাখীর পিছে পিছে। নবীর এতোদিনের অহংকার মাটি হয়ে গেলো। আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে আরশকে টলিয়ে দেয়া বুঝি জীবনে আর সম্ভব হলো না।

একাকী শূন্য মাঠে ডুকরে কেঁদে ওঠে নবী। দু'চোখ-ভরা আঁসু নিয়েই একবার সে তাকায় ঘুড়ির দিকে। একটা কালো বিন্দুর মতো পাখীর পিছে পিছে ঘুরছে ঘুড়ি, আর পাখীটা শুধু ঘুরে ঘুরে উপরের দিকেই উঠছে !

আচমকা নবীর মনে হলো–এ তো পাখী নয়–এ যে ফেরেশতা–জিবরাইল, এসেছে পাখীর সুরত ধরে,তার ঘুড়ি আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে ! দু'চোখ ফেটে এবার কৃতজ্ঞতার আঁসু গড়িয়ে পড়লো নবীর গাল বেয়ে ; তার আঁসু-ধোয়া মুখে ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব হাসি–বেদনা আর আনন্দে ঝলোমলো।

নিজের বোকামির কথা ভেবে নবীর শরম হয়। এতোদিন পর ফেরেশতা এসেছে তার দিলের আরজু আল্লার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে ! আর সে কি না কাঁদছে, পাখী তার ঘুড়ি নিয়ে গেলো বলে !

চোখ মুছে নবী তাকায় আসমানের দিকে–দেখলো, পাখীও নেই–ঘুড়িও নেই,–শুধু সাদা সাদা মেঘ, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে চক্‌চক্‌-করা গাঢ় নীল আসমান ! অনেকক্ষণ সে চেয়ে রইলো আসমানের দিকে,–আবার তার চোখ ফেটে দরদর করে নেমে এলো কৃতজ্ঞতার আঁসু। আজ সে সার্থক–আজ সে ধন্য ! আর কোনো ভাবনা নেই তার,–জিবরাইল এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি–নতুন পাতা খুলবে এবার তার জীবনের !

আবার আসমানের দিকে চেয়ে, এক ঝলক হেসে নবী বাড়ী ফিরে আসে। খুশীতে তার সারা শরীর নেচে উঠছে।

হালিমা উঠানে বসে শাক বাছছিলো–"মা–মা–হুন্‌ছো"–বলে নবী ঝাঁপিয়ে পড়লো তার কোলে।

হালিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে–তারপর রাগে ঠোঁট কামড়ে, টিপে ধরে নবীর ঘাড়,–গরগর করতে করতে বলে–কোথে আইলিরে হারামজাদা ? আইজ তোর রঙ আমি না বাইর কইরা ছাড়ুম না !

নবী মা'র রাগের কারণ বুঝতে পারে না–তবু, তার খুশির খবরটুকু সে না দিয়ে পারছে না মাকে,–মা, আইজ জিবরাইলরে দেখছি–আমগো খবর···

নবী কথা শেষ করতে পারলো না–ধুম ধুম করে হালিমার শক্ত হাতের কিল পড়তে থাকে তার পিঠে।–কিলাতে কিলাতেই বলে–ওরা দিবো আর আমরা খামু বইয়া বইয়া ? ঝাঁটা মার জিবরাইলের মুখে শতবার !

–মা–মা, তুমি গাল দিয়ো না–নবী চিৎকার করে ওঠে–গুনা অইব মা, আল্লা রাগ করবো।

হালিমার রাগ আরো বেড়ে যায়–তার গালির ফোয়ারা কিছুতেই থামতে চায় না।

নিরুপায় নবী কামড়ে ধরলো মা'র হাত।

এবার যেন আগুন লেগে গেলো হালিমার গায়। বিড়ির দোকানের মালিক আজ বলে গেছে–নবী দোকানে যায় না কোনদিনই ; সুতরাং কাজ তার ছাড়িয়ে দেয়া হলো আজ থেকে। দোকানীর কাছেই হালিমা শুনেছে–নবী নাকি কোথায় ঘুড়ি উড়ায় সারাদিন, আর সময় সময় ছুটাছুটি করে বাজারে,

৯

স্টিশনে। খবরটা পেয়ে অবধি গোস্বায় আগুন হয়েছিলো হালিমা। এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কী? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায়। — হারামজাদা, তোর গলার লাইগাই না আমার মাথা-বিষ, আর তুই কিনা ফাঁকি দেছ আমারে! আমি মরলে জিবরাইল থাঞ্চা থাঞ্চা ভাত লইয়া আইবো না তোর লাগি!

আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় নবীর পিঠ — চিৎকার করে সে কাঁদে এবং কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দেয় হালিমাকে। এক সময় প্রায় বেহুঁশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

রাতের বেলা হালিমার গায়ে জ্বর এলো।

নবী তার মার দিকে একবার চায়, — এবং কিছু না বলে ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়ে মাটির উপর। পেটে কিছুই পড়লো না আজ তার। শুয়ে শুয়ে, কপাল কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে সে কটমট করে তাকিয়ে রইলো হালিমার দিকে।

তারপর, কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়লো, সে নিজেই জানে না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নবী স্বপ্ন দেখলো : জিবরাইল তার ঘুড়ি নিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আসমানের দিকে ধাওয়া করেছে। এক সময় নীল আসমান দু'দিকে সরে গিয়ে পথ করে দিলো জিবরাইলের জন্যে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আবার যাত্রা শুরু হলো — আবার একটা আসমান ফাঁক হয়ে গেলো, আবার আরেকটা, — ষষ্ঠ আসমান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেলো জিবরাইলের ডানায়, — জিবরাইল তবু এগোচ্ছে নবীর ঘুড়ি নিয়ে! তারপর এক সময় খুলে গেলো সপ্তম আসমানের দরজা আর তার ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র আলোকচ্ছটা এসে ঝলসে দিলো নবীর চোখ দু'টি। আর চাইতে পারলো না নবী — দু'চোখে হাত দিয়ে সে চিৎকার করে উঠলো, — মাগো, আমার চোখ দুইটা পুইড়া গেলো!

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসলো নবী — গলে যাওয়া দেওয়ালের উপর দিয়ে সূর্যের প্রখর আলো তার নাকে-মুখে এসে লাগছে।

১৯৪৯

—

রচনা-পরিচয়

'জিবরাইলের ডানা' ঢাকার 'সাপ্তাহিক সৈনিক' পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯-এ। বইয়ের মধ্যে সংকলিত হয় ১৯৫৩-য় (তমুদ্দুন প্রেস, ঢাকা)। কলকাতায় ১৩৬২ (১৯৫৫)-তে রুহুল আমিন নিজামী-প্রকাশিত 'পূর্ববাংলার সমকালীন সেরা গল্প' নামক সংকলনে প্রকাশিত হয়।

সম্ভবত ১৯৫৯ নাগাদ গল্পটি পড়ার পর এর মধ্যে একটি চলচ্চিত্র-সম্ভাবনা

সত্যজিৎ রায়ের চোখে পড়ে। গল্পটি সম্পর্কে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করায় কোনো ব্যক্তি ঢাকায় লেখক শাহেদ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং গল্পটির চিত্রস্বত্ব নামমাত্র দামে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যাপারটা সত্যজিতের জানা ছিল না এবং শাহেদ আলীও জানতে পারেন নি গল্পটি সম্পর্কে সত্যজিতের আগ্রহের খবর। অবশ্য গল্পের স্বত্ব লেখক হাতছাড়া করেন নি।

'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি সম্পর্কে সত্যজিতের যে বিশেষ দুর্বলতা ছিল, তা সে সময়ে তাঁর সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ ছিল সকলেই জানতেন। 'তিন কন্যা' (১৯৬১) ছবিখানির সাফল্যের পর ভবিষ্যতে ছোটগল্পের চিত্র-সংকলন হলে যে 'জিবরাইলের ডানা' তাতে স্থান পাবে এ-কথা তখন তিনি কাউকে কাউকে বলেছিলেন।

১৯৬১-র শেষ বা ১৯৬২-র গোড়ায় ঢাকার 'মাসিক পূবালী'-তে খবর বেরোয় যে সত্যজিৎ রায় 'জিবরাইলের ডানা' ছবি করতে চলেছেন। লেখক শাহেদ আলী ঐ পত্রিকার খবরের কাটিং-সহ সত্যজিৎকে স্বয়ং একটি চিঠি দিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে চান। মাসখানেক পরে তিনি সত্যজিৎ রায়ের একটি চিঠি (২২. ২. ৬২) পান। তাতে গল্পটি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহের কথা স্বীকার ক'রে তিনি জানান: 'তিন কন্যা'র মতো আরেকটি ছোটগল্পের চিত্রসংকলন যদি ভবিষ্যতে করি—তাহলে জিবরাইলের ডানা-র কথা প্রথমেই চিন্তা করব এ-প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে পারি।'

শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি আর চলচ্চিত্রে রূপ পায় নি। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৯৭২-এ সত্যজিৎ ঢাকায় যান এবং ১০ বছর আগে লেখা চিঠির সূত্র ধরেই শাহেদ আলীর খবর নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয় না।

'জিবরাইলের ডানা' ১৯৫০ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কলেজ-পাঠ্য সংকলনে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু পরে ১৯৮৪-তে এটি পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত হওয়ার ব্যাপারে নাকি নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অথচ বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হয়ে গল্পটি আজ পর্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। 'জিবরাইলের ডানা' রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

শাহেদ আলী জীবিকায় অধ্যাপক। লেখক হিসেবে প্রধানত ছোট-গল্পকার। তাঁর অন্তত ৬টি গল্প-সংকলন আছে।

সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রে 'জিবরাইলের ডানা' ও লেখক শাহেদ আলী নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের চোখে পড়েছে—(ক) 'সাপ্তাহিক তারকালোক' (১৯৯২) এবং (খ) 'রূপম' (গল্প-পত্রিকা), মার্চ ১৯৯৩। দ্বিতীয়োক্ত পত্রে শাহেদ আলীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে—যেখানে শাহেদ আলীর নিজের বক্তব্য থেকেই নতুন ক'রে

সত্যজিৎ- প্রসঙ্গটি জানা যায়।

প্রথমোক্ত পত্রিকার সূত্রেও সেটি জানা যায় এবং আরো জানা যায় যে, পরবর্তী নানা সময়ে 'জিবরাইলের ডানা' নিয়ে ছবি করতে আগ্রহী হয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক, জ্যোতির্ময় রায়, মৃণাল সেন, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের ইবনে মিজান।

প্রধানত গল্পটির নিজস্ব সাহিত্যমূল্য বিবেচনায় এবং পরোক্ষে সত্যজিৎ-বিষয়ে গবেষণায় সহায়ক হবে, এই আশায়, লেখকের অনুমতি নিয়ে আমরা গল্পটি বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণ করেছি। 'পূর্ববাংলার সমকালীন সেরা গল্প' (কলকাতা, ১৯৫৫) এবং 'জিবরাইলের ডানা' (সংকলন), (ঢাকা, ১৯৮০) — উভয় পাঠ মিলিয়ে বর্তমান পুনর্মুদ্রণ।

—

স্বীকৃতি

অধ্যাপক শাহেদ আলীর কাছে কৃতজ্ঞ — গল্পটি পুনর্মুদ্রণে তাঁর সহৃদয় অনুমতির জন্য।

বিশেষ সহায়তা : আনোয়ার হোসেন পিণ্টু (চট্টগ্রাম)

অতিথি

সত্যজিৎ রায়

যে গল্প অবলম্বনে গড়ে উঠেছে 'আগন্তুক' ছবির চিত্রনাট্য

মন্টু ক'দিন থেকেই শুনেছে তার মা-বাবার মধ্যে কথা হচ্ছে দাদুকে নিয়ে। মন্টুর ছোটদাদু, মা-র ছোটমামা।

দাদুর চিঠিটা যখন আসে তখন মন্টু বাড়ি ছিল। মা চিঠি পড়ে প্রথমে আপন মনে বললেন 'বোঝো ব্যাপার।' তারপর বাবাকে ডেকে বললেন, 'ওগো শুনছো?'

বাবা বারান্দায় বসে মুচির জুতো মেরামত করা দেখছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, 'বলো।'

মা চিঠি হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মামা আসছেন।'

'মামা?'

'আমার ছোটমামা গো।'

বাবার ঘাড় ঘুরে ভুরু কপালে উঠে গেল।

'বল কি! তিনি বেঁচে আছেন?'

'এই ত চিঠি। মামার যে চিঠি লেখার মত বিদ্যে আছে সেটাই ত জানতাম না।'

বাবা আরাম কেদারার হাতল থেকে চশমাটা তুলে পরে নিয়ে মা-র দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'কই, দেখি।'

এক পাতার চিঠিটা পড়ে বাবাও বললেন, 'বোঝো।'

মা ততক্ষণে মোড়ায় বসে পড়েছেন।

একটা খটকা লেগেছে দুজনেরই সেটা বেশ বুঝতে পারছে মন্টু। বাবাই প্রশ্নটা করলেন।

'আমাদের ঠিকানা পেলেন কোথায় বল ত? আর ওঁর ভাগনীর সঙ্গে যে সুরেশ বোস বলে একজনের বিয়ে হয়েছে, আর তারা যে এই মামুদপুরে থাকে সেটাই বা জানলেন কি করে?'

মা একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বললেন, 'শেতলমামা আছেন ত। তাঁর কাছেই জেনেছেন হয়ত।'

'শেতলমামা ?'

'আঃ, তোমার আবার কিচ্ছু মনে থাকে না। মামাদের পড়শী ছিলেন নীলকণ্ঠ-পুরে। কত যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়িতে। তুমিও ত দেখেছ। রাজি ফেলে ছাপ্পান্নটা রাজভোগ খেলেন আমাদের বিয়েতে, সেই নিয়ে কত হাসা-হাসি।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'ছোটমামার সঙ্গে ত খুব মিতালি ছিল। গোড়ার দিকে মামা যে চিঠি দিতেন সে ত শুনেছি শেতলমামাকেই।'

'এ বাড়িতেও ত এসেছেন না শীতলবাবু ?'

'বাঃ, আসেন নি ? রাণুর বিয়েতেই ত এলেন।'

'ঠিক ঠিক। কিন্তু তোমার ছোটমামা ত শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।'

'তাই ত জানতাম। তিনি আবার হঠাৎ আমার এখানে আসছেন কেন সেটা ত বুঝলাম না।'

বাবা একটু ভেবে বললেন, 'অবিশ্যি আসতেই যদি হয় ত তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে আসবেন বল। তোমার বাপ মা বড় মামা বড় মামী সব পরলোকে। বড় মামার ছেলে ক্যানাডা, মেয়ে সিঙ্গাপুর। তুমি ছাড়া তার আর আছে কে ?'

'তা ত বুঝলাম, কিন্তু যে লোকটাকে প্রায় চোখেই দেখিনি তাকে মামা বলে চিনব কি করে ? মামা যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখন আমার বয়স দু' বছর, আর ওনার ষোল কি সতেরো।'

'ওঁর ছবি একখানা আছে না তোমার সেই পুরোন অ্যালবামে ?'

'তোমার যা কথা! সে চেহারা আর এখনকার চেহারা! তখন আমার বয়স পনের আর এখন ষাট।'

'সত্যি, খুব মুশকিলে পড়া গেল।'

'ঘর ত একখানা বাড়তি আছেই, বিলুর ঘর। কিন্তু কি খায় না খায় কিচ্ছু জানা নেই…'

'খাবে আবার কী ? আমরা যা খাবো তাই খাবে!'

'আমরা যা খাবো মানে কী ? যদি সাধু হয়ে থাকে তাহলে ত নিরামিষ খাবে। সে ত আরো ঝক্কি। পাঁচ রকম পদের কমে হবে না তার।'

'চিঠির ভাষা দেখে ত সাধু বলে মনে হয় না। দিব্যি আমাদেরই মত লেখা। ইংরিজিতে তারিখ লিখেছে, ইংরিজি কথা ব্যবহার করেছে। এই ত আন্-নেসেসারি।'

'নিজের ঠিকানা ত দেয় নি।'

'তা দেয় নি।'

'আর সোমবারই আসছেন বলে লিখেছেন।'

মা-বাবা দুজনেই খুব ভাবনায় পড়েছেন বলে মনে হল মণ্টুর। সত্যি যে মামাকে কেউ কোনদিন চোখেই দেখে নি তাকে ত মামা বলে মনে করাই মুশকিল।

মণ্টু এই দাদুর কথা বড় জোর একবার কি দুবার শুনেছে। ইস্কুলে পড়া শেষ হবার আগেই দাদু বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপর এই পঁয়তাল্লিশ বছরের গোড়ার কয়েকটা বছরের পর তার আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। মা বলতেন তিনি নিশ্চয়ই মরে গেছেন। মণ্টুর দু-একবার মনে হয়েছে দাদু যদি হঠাৎ একদিন ফিরে আসেন তাহলে বেশ হয়। কিন্তু তারপরেই মনে হয়েছে—সেরকম কেবল গল্পেই শোনা যায়। তাও গল্পে ঘর-পালানো লোক অনেকদিন পরে ফিরে এলে তাকে চেনবার লোক থাকে। এখানে তাও নেই। দাদু এল কি দাদু সেজে অন্য লোক এল তাও বলার জো নেই।

দাদু অবিশ্যি লিখেছেন বেশিদিন থাকবেন না—দিন দশেক। বাংলাদেশের ছোট মফঃস্বল শহরেই দাদুর ছেলেবেলা কেটেছে। সেই বাংলাদেশ দেখার ইচ্ছে হয়েছে দাদুর। নিজের দেশ নীলকণ্ঠপুরে ত যাওয়া যায় না, কারণ এখন আর সেখানে কেউ নেই। তাই মামুদপুরেই আসতে চান। তাও এখানে একজন ভাগনি আছে ত। মণ্টুর বাবা এখানে ওকালতি করেন। মণ্টুর দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে রিশড়ায়। দাদা কানপুরে হস্টেলে থেকে পড়ে আই আই টিতে।

রবিবারের মধ্যে মা সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। দোতলার পশ্চিমের ঘরের খাটে নতুন বিছানার চাদর, বালিশের নতুন ওয়াড়, দাদুর জন্য সাবান তোয়ালে গামছা, সবই এসে গেল। ট্রেন আসবে সকালে, দাদু নিজেই সুরেশ বোসের বাড়ি কোথায় জিগ্যেস করে সাইকেল রিকসা নিয়ে চলে আসবেন। তারপর যা থাকে কপালে। বাবা আজই সকালে বলেছেন, 'মামা হোক আর না হোক, লোকটা যদি সভ্যভব্য মিশুকে হয় তাহলে একরকম চলে যাবে। না হলে এই দশটা দিন হুজ্জতের একশেষ।'

'ভাল্লাগেনা বাপু' বললেন মা, সাপ না ব্যাঙ না বিচ্ছু—কিচ্ছু জানা নেই, এখন সামলাও ঝক্কি। ঠিকানাও দিল না লোকটা; তাহলে না হয় কোনো একটা ছুতোয় না করে দেওয়া যেত। এ যেন একেবারে পণ করে ঘাড়ে এসে চাপা।'

মণ্টুর মনের ভাব কিন্তু অন্যরকম। তাদের বাড়িতে অনেকদিন কেউ এসে থাকে নি। এখন তার গ্রীষ্মের ছুটি; সারাটা দিন সে বাড়িতেই থাকে। খেলার

সাথীর অভাব নেই--সিধু, অনীশ, রথিন, ছোট্‌কা—কিন্তু বাড়িতে একজন বাড়তি লোকের মজাটা আলাদা। সারাক্ষণ শুধু মা আর বাবাকে দেখতে কি ভালো লাগে? আর দাদু-কি-দাদু-নয় মজাটাও কি কম? এ যেন একটা রহস্য অ্যাডভেঞ্চার। যদি দাদু না হয় যদি কোনো বদ মতলবে দুষ্টু লোক আসে, আর সেটা যদি মণ্টু ধরে দিতে পারে, তাহলে দারুণ ব্যাপার হবে।

সোমবার সকালে সাড়ে দশটা থেকে সদর দরজার বাইরে ঘোরাঘুরি করার পর সোয়া এগারোটার সময় মণ্টু দেখল একটা সাইকেল রিকশা আসছে তাদের বাড়ির দিকে। গাড়িতে একজন লোক, তার হাতে একটা মিষ্টির হাঁড়ি, আর পায়ের কাছে একটা চামড়ার সুটকেস। লোকটা সুটকেসের উপর একটা পা তুলে দিয়েছে।

ইনি সাধু নন। অন্তত সাধুর মত পোষাক পরেন না। ধুতি-পাঞ্জাবীও নয়, প্যাণ্ট-সার্ট। মা বলেছিলেন বয়স ষাটের উপর, কিন্তু বেশি বুড়িয়ে যান নি। মাথার চুলও বেশি পাকে নি। চোখে চশমা আছে, তবে পাওয়ার খুব বেশি নয়।

রিকশাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাক্স মাটিতে নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক মণ্টুর দিকে ফিরে দেখে বললেন, 'তুমি কে?'

দাড়িগোঁফ নেই, নাকটা চোখা, চোখ দুটো ছোট হলেও উজ্জ্বল।

মণ্টু সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'আমার নাম সাত্যকি বোস।'

'অর্জুনের সারথি, না সুরেশ বোসের পুত্র? এই ভারী সুটকেস বইতে পারবে তুমি? ওতে বই আছে কিন্তু।'

'পারব।'

'তবে চলো।'

ভিতরের বারান্দায় উঠতে মা এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক মিষ্টির হাঁড়িটা মা-র হাতে দিয়ে বললেন—

'তোমার নাম সুহাসিনী ত?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী ত উকীল। সে বোধহয় কাজে বেরিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এইভাবে এসে পড়লাম ···খুব কিন্তু-কিন্তু বোধ করছিলাম, জান, কিন্তু শেষে মনে হল দিন দশেক হয়ত এই বুড়োকে বরদাস্ত করতে তোমাদের খুব অসুবিধে হবে না। তাছাড়া শীতলদা তোমাদের এত প্রশংসা করলেন। কিন্তু বুঝতে ত পারি, আমি যে সত্যি তোমার মামা তার ত কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই সেদিক দিয়ে আমি কিছু দাবীও করব না। একজন বুড়ো মানুষকে আশ্রয় দিলে ক'টা দিনের জন্য—এইটেই ভেবে নিতে হবে তোমাদের।'

মণ্টু লক্ষ করছিল যে মা মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছেন ভদ্রলোকের দিকে। এবার বললেন, 'আপনি চানটান করবেন ত?'

'খুব বেশি যদি অসুবিধে না হয়—'

'না না, অসুবিধে কেন? মণ্টু, এঁকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও চানের ঘরটা। আর, ইয়ে, আপনি কী খানটান সে ত জানা নেই, তাই…'

আমি সর্বভুক্‌। যা দেবে তাই খুশি মনে খাব। কথাটা বাড়িয়ে বলছি না।'

'তুমি ইস্কুলে পড়?' দোতলায় উঠতে উঠতে ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন মণ্টুকে।

'হ্যাঁ। সত্যভামা স্কুল। ক্লাস সেভেন।'

মণ্টু একটা কথা না জিগ্যেস করে পারল না।

'আপনি বুঝি সাধু নন?'

'সাধু?'

'মা বলছিলেন আপনি সাধু হয়ে গেছেন।'

'ও হো হো! সাধু-টাধু ত অনেককালের কথা ভাই। যখন প্রথম বাড়ি থেকে বেরোই তখন গেলাম হরিদ্বার। বাড়িতে ভালো লাগত না, তাই বেরিয়ে পড়লাম। একজন সাধুর কাছে গিয়েছিলাম বটে কিছুদিন। হৃষীকেশে। তারপর সেখানেও আর ভালো লাগল না, তাই বেরিয়ে পড়লাম। তারপর সাধু-টাধুর কাছে আর যাই নি।'

দুপুরের খাবার যা ছিল সেটা ভদ্রলোক সত্যিই বেশ খুশি মনে চেঁছেপুঁছে খেলেন। আমিষে কোনো আপত্তি নেই; মাছ ডিম দুই-ই খেলেন। মণ্টুর মনে হল মা একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন। মণ্টুর যদিও ভদ্রলোককে দাদু বলতে ইচ্ছে করছিল, সে লক্ষ করল মা একবারও মামা বললেন না।

যখন দই-এর প্লেটটা পাতে তুলছেন ভদ্রলোক, তখন যেন কতকটা কথা বলার জন্যই মা বললেন, 'বাঙলা রান্না অনেকদিন খাওয়া হয় নি বোধহয়?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'গত দুদিনে কলকাতায় খেয়েছি; তার আগে কতদিন খাই নি বললে বিশ্বাস করবে না।'

মা আর কিছু বললেন না। মণ্টুর ইচ্ছে হচ্ছিল যে জিগ্যেস করে—'বাংলা রান্না খান নি কেন? কোথায় ছিলেন আপনি এতদিন?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর জিগ্যেস করল না। ভদ্রলোক যদি ধাপ্পাবাজ হয়ে থাকেন তাহলে তাকে গুল মারার সুযোগ দেওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। উনি নিজে যদি বলতে চান ত বলুন।

কিন্তু উনি নিজেও কিছু বললেন না। চল্লিশ বছরের উপর যে লোক নিরুদ্দেশ ছিল তার ত অনেক কিছুই বলার থাকা উচিত, তাহলে এ লোক এত চুপচাপ কেন?

বাবার গাড়ির আওয়াজ যখন পেল মণ্টু তখন সে দোতলায়। সে দেখেছে ভদ্রলোক তখন হাতে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন। তার আগে মণ্টু আধ ঘণ্টা কাটিয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। সে ঘরের বাইরে ঘুরঘুর করছে দেখে ভদ্রলোক নিজেই তাকে ডাকেন।

'ওহে অর্জুনের সারথি।'

মণ্টু গিয়ে ঢোকে ভদ্রলোকের ঘরে।

'এসো আমার কাছে,' বললেন ভদ্রলোক, 'তোমাকে কিছু জিনিস দেখাই।'

মণ্টু খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'এটা কী ?' জিগ্যেস করলেন ভদ্রলোক।

'একটা তামার পয়সা।'

'কোথাকার ?'

মণ্টু পয়সার গায়ে লেখাটা পড়তে চেষ্টা করে পারল না।

'এটাকে বলে লেপ্‌টা। গ্রীস দেশের পয়সা। আর এটা ?'

এটাও মণ্টু বলতে পারল না।

'এটা তুর্কীর পয়সা। এক কুরু। আর এটা রুমানিয়ার পয়সা। একে বলে বানি। এটা ইরাকের—ফিল।'

এছাড়া আরো দশ দেশের দশ রকম পয়সা মণ্টুকে দেখালেন ভদ্রলোক। তার একটাও মণ্টু আগে কখনো দেখেও নি, তার নামও শোনে নি।

'এগুলো সব তোমার জন্য।'

মণ্টু অবাক। ভদ্রলোক বলেন কি! অনীশের কাকাও পয়সা জমান। উনি মণ্টুকে বুঝিয়েছেন যারা এ কাজটা করে তাদের বলে নিউমিস্‌ম্যাটিস্ট্‌স। কিন্তু অনীশের কাকার মোটেই এতরকম পয়সা নেই সেটা মণ্টু জানে।

'আমি ত জানতাম যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমার একজন নাতি আছে : তার জন্য এনেছি এসব পয়সা।'

মণ্টু মহা ফূর্তিতে পয়সাগুলো নিয়ে নিচে নেমে এল মা-কে দেখাতে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাবার গলা পেয়ে সে থেমে গেল। এই লোকটার বিষয় কথা বলছেন বাবা।

'...দশ দিনটা বাড়াবাড়ি। ওকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমাদের মনে সন্দেহ আছে। অতিরিক্ত খাতির না করলে ভদ্রলোক আপনিই মানে মানে বিদায় নেবেন। আর কোনোরকম রিস্ক নেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আজ সুধীরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেও অ্যাডভাইস দিল। আলমারি-টালমারি সব ভালো করে বন্ধ করে রাখবে। মণ্টু ত সব সময় পাহারা দেবে না, তার বন্ধু-বান্ধব আছে, খেলাধুলো আছে। আমি কাজে বেরিয়ে যাব। বাড়িতে তুমি আর সদাশিব। সদাশিব কাজ না থাকলেই ঘুমোয়। তুমিও যে

দুপুরে ঘুমোও না তা ত নয়।'

'একটা কথা তোমায় বলি,' বললেন মণ্টুর মা।

'কী ?'

'এনার সঙ্গে কিন্তু মায়ের আদল আছে।'

'তোমার তাই মনে হল ?'

'সেই রকম টিকোলো নাক, চোখের চাহনিও যেন সেইরকম।'

'আহা, আমি ত বলছি না ইনি তোমার মামা নন। কিন্তু মামা লোকটি কেমন তা ত কিছুই জানি না আমরা। লেখাপড়া করেন নি, কোনো ডিসিপ্লিন নেই, ছন্নছাড়া জীবন…। আমার মোটেই ভালো লাগছে না ব্যাপারটা।'

বাবার কথা থামলে পর মণ্টু ঘরে ঢুকল। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই মণ্টুর ভদ্রলোককে বেশ ভালো লেগে গেছে। বাবার কথাগুলো সে পছন্দ করে নি। হয়ত পয়সাগুলো দেখলে বাবার মনটা ভদ্রলোকের প্রতি একটু নরম হবে।

'এই কয়েন উনি দিলেন ?'

মণ্টু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'উনি কি এসব জায়গায় গেছেন বলে বললেন নাকি ?'

'না, তা বলেন নি।'

'তাও ভালো। এ জিনিস কলকাতায় কিনতে পাওয়া যায়। চৌরঙ্গীতে দোকান আছে।'

সাড়ে চারটে নাগাদ দোতলা থেকে নেমে এলেন ভদ্রলোক। তারপরেই বাবার সঙ্গে আলাপ হল।

'আপনার ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে,' বললেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ, ও তাই বলছিল।'

মায়ের মত বাবাও ঘন ঘন দৃষ্টি দিচ্ছেন ভদ্রলোকের দিকে।

'আমি দেখেছি কম বয়সী ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব চট করে ভাব হয়ে যায়। ভবঘুরেদের বোধহয় ওরাই সবচেয়ে ভালো বোঝে।'

'আপনি বুঝি সারাজীবনই ঘুরেছেন ?'

'তা ঘুরেছি। এক জায়গায় বসে থাকা ধাতে ছিল না আমার।'

'আমরা আবার গুছোন জীবনটাই বুঝি। উদ্দেশ্যহারা ভাবে ঘোরাঘুরি আমাদের পোষায় না। রোজগার আছে, সংসারের দায়িত্ব আছে, সন্তানপালন আছে। আপনি ত বিয়ে করেন নি ?'

'না।'

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সুহাসিনীর বোধহয় মনে নেই, ওর এক প্রমাতামহ—আমার এক দাদু—তাঁরও ঠিক এই প্রবৃত্তি ছিল। উনি তেরো বছর বয়সে ঘরছাড়া হন। আমি ত তাও অল্পদিনের জন্য হলেও

ফিরেছি। উনি আর একেবারেই ফেরেন নি।'

মণ্টু দেখল বাবা মা-র দিকে ফিরলেন।

'এটা জানতে তুমি?'

'জানলেও এখন আর মনে নেই' বললেন মা।

বিকেলে চা খাবার পর এক ব্যাপার হল। মণ্টুর বন্ধুরা ক'দিন থেকেই শুনছে যে সোমবার তার এক দাদু আসবে যাকে দাদু বলে চেনার কোনো উপায় নেই। তারা ভারী কৌতূহলী হয়ে এল সেই দাদুকে দেখতে। চার-পাঁচটি দশ-বারো বছরের ছেলেকে একসঙ্গে দেখে দাদুও খুব খুশি। সবাইকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন লাঠি হাতে নিয়ে। মিত্তিরদের বাড়ি পেরিয়ে মাঠটার একধারে কদম গাছটার তলায় বসে দাদু বললেন, 'তুয়ারেগ কাদের বলে জান?' সকলেই মাথা নেড়ে না বলল। দাদু বললেন, 'সাহারা মরুভূমি জান ত?—সেই সাহারায় তুয়ারেগ বলে একরকম যাযাবর জাতি বাস করে। দরকার হলে তারা দস্যুবৃত্তি করে। সেই তুয়ারেগের কবলে পড়ে একজন লোক কী ভাবে রক্ষা পেয়েছিল বুদ্ধির জোরে সে গল্প বলি তোমাদের।'

দাদুর গল্প ছেলের দল মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলে। মণ্টু পরে মা-কে বলেছিল, 'এমন গল্প, ঠিক মনে হয় সব কিছু চোখের সামনে দেখছি।'

বাবা কাছেই ছিলেন বললেন, 'গল্পের বই পড়ার বাতিক আছে বুঝি ভদ্রলোকের? কোনো এক ইংরিজি পত্রিকায় এ ধরনের একটা গল্প পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।'

মণ্টু বলেছিল ভদ্রলোকের সুটকেসে বই আছে সেটা সে জানে, তবে গল্পের বই কিনা জানে না।

তিনদিন তিন রাত চলে গেল এই ভাবে। বাড়ির কোনো কিছু চুরি হল না, ভদ্রলোক কোনো উৎপাত করলেন না, যা দেওয়া হল তাই তৃপ্তি করে খেলেন, কোনো বাড়তি আবদার করলেন না, কোনো বিষয়ে অভিযোগ করলেন না। এ ক'দিনে বাবার বেশ কয়েকজন উকীল বন্ধু এসেছে মণ্টুদের বাড়িতে। এমনিতে বেশি আসে-টাসে না; মণ্টু জানে তারা এই দাদু-কি-দাদু-নয় বুড়োকেই দেখতে এসেছে। মা-বাবাকে দেখে মনে হয় তারা মোটামুটি বুড়োকে মেনেই নিয়েছেন। বাবাকে ত একদিন বলতেই শুনেছে মণ্টু—'লোকটা সাদা-সিধে এটা বলতেই হবে। বেশি গায়ে পড়ার চেয়ে এই ভালো। তবে এরকম মানুষের বেঁচে থেকে কী লাভ জানি না। আসলে বাড়ি ছেড়ে পালানোর মানে বোঝো ত?—দায়িত্ব এড়ানো। এঁরা পরাশ্রয়ী জীব। সারা জীবনটাই হয়ত এর-ওর ঘাড়ে ভর করে কাটিয়েছে।'

মণ্টু একবার ছোটদাদু বলে ডেকে ফেলেছিল ভদ্রলোককে, তাতে তিনি শুধু

মৃদু হেসে তার দিকে চেয়েছিলেন, কিছু বলেন নি। মা কিন্তু মামা বলে ডাকেন নি একবারও। মণ্টু সে কথা বলাতে মা বলেছেন, 'তাতে ভদ্রলোক খুব একটা দুঃখ পাচ্ছেন বলে ত মনে হয় না। আর মামা যে ডাকব, তারপর যদি বেরোয় মামা নন, তাহলে কী অপ্রস্তুতের ব্যাপার বল ত।'

চারদিনের দিন ভদ্রলোক বললেন আজ একটু বেরোবেন।—'নীলকণ্ঠপুর বাস যায় না?'

বাবা বললেন তা যায়। বাজার থেকে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাস ছাড়ে।

'তাহলে ভাবছি জন্মস্থানটা একবার দেখে আসব। ফিরতে অবিশ্যি বিকেল হয়ে যাবে।'

'খেয়ে যাবেন ত?' প্রশ্ন করলেন মণ্টুর মা।

'নাঃ। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়াই ভালো। ওখানেই হোটেলে কোথাও খেয়ে নেব। ওর জন্য চিন্তা কোর না।'

ন'টার মধ্যেই ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লেন।

দুপুরে মণ্টু আর লোভ সামলাতে পারল না। ভদ্রলোকের ঘর খালি। ওঁর স্যুটকেসটায় কী বই আছে সেটা দেখার শখ ওর অনেকদিন থেকেই। বাবা নেই, মা একতলায় বিশ্রাম করছেন; মণ্টু গিয়ে ঢুকল ভদ্রলোকের ঘরে।

স্যুটকেসে তালা নেই। চুরির ভয়টা নেই ভদ্রলোকের সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

মণ্টু স্যুটকেসের ডালাটা তুলল।

কিন্তু কোথায় বই? বই ত নেই, খাতা। খান ত্রিশেক নানারকমের খাতা, তার মধ্যে দশবারোটা বাঁধিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু খাতা খুলল মণ্টু। পরিষ্কার ঝকঝকে বাংলা হাতের লেখা, পড়তে কোনো অসুবিধা নেই।

মণ্টু খাটের উপর উঠল খাতাটা নিয়ে।

আর পরমুহূর্তেই নেমে আসতে হল।

তার অজান্তে মা উপরে উঠে এসেছেন।

'ও ঘরে কী হচ্ছে মণ্টু? ওনার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছ বুঝি?'

মণ্টু সুবোধ বালকের মত খাট থেকে নেমে এসে স্যুটকেসে খাতাটা রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'যাও, নিজের ঘরে যাও। পরের জিনিস ঘাঁটতে নেই। নিজের বই পড় গিয়ে যাও।'

ছ'টার একটু পরেই ফিরে এলেন ভদ্রলোক।

রাত্তিরে খাবার সময় মণ্টুর মা-বাবাকে বেশ খানিকটা অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন তিনি কালই ফিরে যাচ্ছেন।

'তোমাদের আতিথেয়তার তুলনা নেই, কিন্তু আমার পক্ষে এক জায়গায়

বেশিদিন থাকা পোষায় না।'

বাবা-মা যে খবরটা শুনে অখুশি নন এটা মণ্টু জানে, যদিও তার নিজের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। বাবা বললেন, 'আপনি কি কলকাতায় যাবেন এখান থেকে?'

'হ্যাঁ, তবে সেও বেশিদিনের জন্য নয়। সেখান থেকে অন্য কোথাও পাড়ি দেব। কারুর গলগ্রহ হয়ে থেকে অভ্যেস নেই। আমি সেই বাড়ি ছাড়ার পর থেকেই স্বাধীন।'

মা বললেন, 'গলগ্রহ বলছেন কেন, আমাদের ত কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।'

খানিকটা যে হচ্ছিল সেটা মণ্টু জানে. কারণ সে এর মধ্যে একদিন বাবাকে বলতে শুনেছে যে এই মাগ্যির বাজারে একজন বাড়তি লোকের পিছনে খরচ অনেক।

এবার মণ্টু আর বাবা দুজনেই গেল ভদ্রলোককে স্টেশনে পৌঁছাতে, বাড়ির গাড়িতে করে। মণ্টু জানে যে ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন অবধি বাবার মনে সন্দেহ আছে যিনি এসে রইলেন এতদিন, তিনি সত্যি বরেই মণ্টুর দাদু কিনা।

সাতদিন পর আরেক বৃদ্ধ এসে হাজির হলেন মণ্টুদের বাড়িতে। ইনি মণ্টুর মায়ের শেতলমামা। এঁকে এর আগে একবারই দেখেছে মণ্টু, দিদির বিয়েতে।

'সে কি, শেতলমামা, হঠাৎ কী মনে করে?'

'একটা কর্তব্য সারতে এসেছি রে। একটা নয়, দুটো। নইলে এই বুড়ো বয়সে আজকের দিনে এমনি এমনি কেউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পাড়ি দেয়? দুপুরে খাব কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই খাবেন। কী খেতে মন চায় বলুন। এখানে সব পাওয়া যায়, কলকাতার মত নয়।'

'দাঁড়া দাঁড়া, আগে কাজগুলো সারি।'

কাঁধে ঝোলানো থলি থেকে ভদ্রলোক একটা বই বার করলেন।

'এ বইয়ের নাম শুনিস নি ত?'

মা বইটা হাতে নিয়ে বললেন, 'কই, না ত।'

'পুলিন তোদের বলে নি সেটা জানি।'

'পুলিন?'

'তোর ছোটমামা! যে লোক কাটিয়ে গেল এখানে পাঁচটা দিন তার নামটাও জানিস নি? এ তারই লেখা বই।'

'তাঁর বই?'

'তোরা কোন্ রাজ্যে থাকিস? সেদিন কাগজেও ত নাম বেরিয়েছে। এমন

আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্য ক'টা আছে ?'

'কিন্তু এই নাম ত—'

'নাম ত ছদ্মনাম। সারা পৃথিবী ঘুরেছে চল্লিশ বছর ধরে, অথচ এতটুকু দম্ভ নেই।'

'সারা পৃথিবী—?'

'পুলিন রায়ের মত অত বড় ভূপর্যটক ভারতবর্ষে আর হয় নি। আর সব নিজের রোজগারে ঘোরা। খালাসীগিরি থেকে শুরু করে কুলিগিরি, কাঠের মজুরী, খবরের কাগজ বিক্রী, দোকানদারী, লরির ড্রাইভারি—কোনো কাজ সে বাদ দেয় নি। তার অভিজ্ঞতার কাছে গল্প হার মেনে যায়। সে বাঘের কবলে পড়েছে, সাপের ছোবল খেয়েছে, সাহারায় যাযাবর দস্যুদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এসেছে, জাহাজডুবি থেকে সাঁতরে উঠেছে ম্যাডাগাস্কারের ডাঙায়। থার্টি নাইনে সে ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে বলে বাপের বাড়ির মায়া একবার কাটাতে পারলে সারা পৃথিবীটাই হয়ে যায় নিজের ঘর। সাদা কালো ছোট বড় জংলী সভ্য সব এক হয়ে যায়।'

'কিন্তু—এসব আমাদের বললেন না কেন ?'

'তোদের মত ঘরকুনো কূপমণ্ডুক কি এসব কথা বিশ্বাস করত ? সে আসল কি নকল তাই তোরা ঠিক করতে পারিস নি, তাকে মামা বলে ডাকতে পারিস নি, আর এত কথা সে বলতে যাবে তোদের ?'

'ইস্—আবার ডেকে আনা যায় না মামাকে ?'

'উঁহু। পাখি উড়ে গেছে। বললে বলিদ্বীপটা দেখা হয় নি, সেখানে যাবার চেষ্টা করবে। এই বইটা তোদের দিয়ে গেছে। তোদের ঠিক দেয় নি, দিয়েছে দাদুকে। বললে ওর মনটা এখনো কাঁচা, ওতেই ছাপটা পড়বে ভালো। তবে ওর আসল পাগলামোর কথাটা বলি নি এখনো। ওকে পই পই করে বললাম যে আর ক'টা দিন থেকে যাও, এ বই নির্ঘাৎ পুরস্কার পাবে, অ্যাকাডেমি দশ হাজার টাকা দিচ্ছে আজকাল। সে কিছুতেই শুনলে না। বললে টাকা যদি আসে ত মামুদপুরে আমার ভাগনীকে দিয়ে দিও, সে খুব যত্ন নিয়েছে আমার। শুধু মুখে বলা না, কাগজে লিখে দিলে।—এই নে সেই টাকা।'

মা শেতলমামার হাত থেকে খামটা নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ধরা গলায় বললেন, 'বোঝো ব্যাপার !'

—

—'আরো বারো', আনন্দ পাবলিশার্স (১৯৮১) গ্রন্থে সংকলিত।

সত্যজিৎ রায়, ১৯৬৪ ছবি : সুনীল জানা

নিজস্ব কাহিনী অবলম্বনে

সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য

আগন্তুক

সত্যজিৎ রায়

ন্যাশনাল ফিল্ম ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর নিবেদন (১৯৯২)
কাহিনী চিত্রনাট্য সংগীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়

ক্যামেরা : বরুণ রাহা
শিল্প-নির্দেশক : অশোক বোস
সম্পাদক : দুলাল দত্ত
শব্দ-গ্রাহক : সুজিত সরকার
প্রধান কর্মসচিব : অনিল চৌধুরী

ভূ মি কা লি পি

সুধীন্দ্রনাথ বোস : মার্কেন্টাইল ফার্মের বড় চাকুরে (দীপঙ্কর দে)
অনিলা : সুধীন্দ্রর স্ত্রী : সুগায়িকা ও নাচিয়ে (মমতাশঙ্কর)
সাত্যকি / বাবলু : সুধীন্দ্র-অনিলার ছেলে (বিক্রম ভট্টাচার্য)
মনোমোহন মিত্র : অনিলার ঘর-পালানো ছোট মামা (উৎপল দত্ত)
পৃথ্বীশ সেনগুপ্ত : সুধীন্দ্রর ব্যারিস্টার বন্ধু (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়)
রঞ্জন রক্ষিত : সুধীন্দ্রর বন্ধু ; চলচ্চিত্র, মঞ্চ ও টি. ভি অভিনেতা (রবি ঘোষ)
ছন্দা : রঞ্জনের স্ত্রী (সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়)
ত্রিদিব মুখোপাধ্যায় : অবসরপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি (প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়)
শীতলাকান্ত সরকার : শান্তিনিকেতনবাসী অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরে,
অনিলার পারিবারিক বন্ধু (অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়)
মধু ও দশরথ : সুধীন্দ্রর বাড়ির কাজের লোক

—

রবীন্দ্রসংগীত : 'বাজিল কাহার বীণা' (শ্রমণা গুহঠাকুরতা)

ছবির দৈর্ঘ্য : ১০৮০৫ ফুট / ৩২৯৩·৩৭ মিটার

১

PRE-CREDIT

সকাল।
এক মহিলার হাতে ধরা একটা ইনল্যাণ্ড লেটার, তার উপর ঠিকানা লেখা—
Mrs. Sudhindranath Bose, 24 Rowland Road, Calcutta 20।
নেপথ্যে পুরুষের কণ্ঠস্বর।

সুধীন্দ্র কার চিঠি ?

এবার সুধীন্দ্রর স্ত্রী অনিলাকে দেখা যায়। সে ইনল্যাণ্ড লেটারের পেছনটা দেখে।

অনিলা হাতের লেখা চিনি না। M. Mitra—

জায়গাটা হচ্ছে একটা বেশ ছিমছাম বাড়ির একতলার বারান্দা। এক প্রান্তে সুধীন্দ্র পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে।

সুধীন্দ্র তোমার মা-র তরফের কেউ হবে।

অনিলা নিজে বারান্দার মাঝামাঝি অংশে দাঁড়িয়ে। সে চিঠিটা খোলে।

অনিলা M. Mitra বলে কেউ নেই।

অনিলা মনোযোগসহকারে চিঠিটা পড়তে শুরু করে। বাড়ির কাজের লোক মধু চা নিয়ে এসে সুধীন্দ্রর পাশের টেবিলে রেখে চলে যায়। সুধীন্দ্রর দৃষ্টি কাগজের দিকে।

সুধীন্দ্র পুজোয় লোড শেডিং হচ্ছে না। (অনিলার দিকে তাকায়) কী ? কার চিঠি ?

চিঠিটা পড়তে পড়তে অনিলার চোখে ক্রমে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

বারান্দার সামনের বাগান।
গাছের ছায়ায় বসে একটি বছর দশেকের ছেলে একটা টিনটিনের বই পড়ছে। ইনি হলেন সুধীন্দ্র ও অনিলার একমাত্র ছেলে সাত্যকি – ডাক নাম বাবলু। সে বই বন্ধ ক'রে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

বারান্দা।
বাবলু আসে। অনিলা এখনো চিঠি পড়ছে। সুধীন্দ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে।

বাবলু কার চিঠি মা?
অনিলা (পড়তে পড়তে) দাঁড়াও বাবা –
সুধীন্দ্র বা-বা! এ যে দেখছি – massive missive! কে লিখেছে?

অনিলার চিঠি পড়া শেষ। সে একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়ে।

সুধীন্দ্র কী ব্যাপার? কোনো দুঃসংবাদ নাকি?
অনিলা জানি না।
সুধীন্দ্র জানো না!
বাবলু কার চিঠি?
অনিলা তোমার ছোটদাদুর –
সুধীন্দ্র (চোখ কপালে তুলে) What ?!
বাবলু যিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন?
সুধীন্দ্র তিনি তো এক যুগ হল বেপাত্তা!
অনিলা পঁয়ত্রিশ বছর। নাইন্টিন ফিফ্‌টি ফাইভে গেছেন, আমার তখন দু-বছর বয়েস।
সুধীন্দ্র আর তোমার মামার?
অনিলা উনি তো বি. এ পাশ করেই উধাও – আমার কোনো স্মৃতিই নেই। যা শুনেছি পরে সব মা-র কাছে – সিক্সটি এইটে শেষ খবর পাওয়া যায়। মা, বড়মামা, অন্য কোনো আত্মীয়স্বজন কাউকে কিছুই লিখতেন না। একমাত্র শীতলবাবুকেই ছয়-সাত বছর অন্তর অন্তর একটা ক'রে কার্ড, পশ্চিমের নানান শহর থেকে। উত্তর দেওয়ার উপায় ছিল না, ঠিকানাও থাকত না –
সুধীন্দ্র শীতলবাবু মানে তোমাদের সেই ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড?
অনিলা হ্যাঁ, দাদুর পড়শি ছিলেন। আমাদের বাড়িতেও তো এসেছেন –

সুধীন্দ্র Oh, Yes—হ্যাঁ, সেই এ-জি বেঙ্গল-এ চাকরি করতেন, রিটায়ার ক'রে শান্তিনিকেতনে, তাই তো ?

অনিলা ওঁর কাছ থেকেই আমাদের খবর পেয়েছেন।

সুধীন্দ্র কোত্থেকে লিখেছেন ?

অনিলা দিল্লি—কুতুব হোটেল—

সুধীন্দ্র চিন্তিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সুধীন্দ্র কুতুব হোটেল ! Never heard of it ! Any way, কী লিখেছেন ? জোরে জোরে পড় শুনি

অনিলা I must say, ভদ্রলোকের বাংলাটা এখনো রীতিমতো সড়গড় ! (চিঠি পড়তে শুরু করে) কল্যাণীয়াসু খুকি—

সুধীন্দ্র খুকি ? খুকি আবার কে ?

অনিলা পড়তে তো দাও !—

সুধীন্দ্র Sorry, carry on—

অনিলা (আবার শুরু করে) কল্যাণীয়াসু খুকি, তোমার পোশাকি নামটা জানা নাই, তাই এই নামেই সম্বোধন করিলাম, অপরাধ লইও না—

সুধীন্দ্র (বাধা দিয়ে) ও বাবা, এ যে দেখছি সাধুভাষা !—

অনিলা বিরক্ত হয়ে এক ঝলক স্বামীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আবার পড়া শুরু করে।

অনিলা ···আমি যখন গৃহত্যাগ করি তখন তুমি সত্যই খুকি। যাহা হউক, আমি পশ্চিমে সফর শেষ করিয়া সবে মাত্র এখানে আসিয়াছি। শীতলাকান্ত কাকার নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আমার নিকট-আত্মীয় বলিতে একমাত্র তুমিই আছ এবং স্বামীপুত্র লইয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার করিতেছ। আমি অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় ভ্রাম্যমাণ জীবনে ফিরিয়া যাইব। আমার একান্ত ইচ্ছা, ইত্যবসরে তোমাদের অতিথিরূপে এক সপ্তাহকাল আমার জন্মস্থান কলিকাতায় অতিবাহন করি। তোমার এই মাতুলকে তুমি চাক্ষুষ চিনিবে না, আমিও তোমাকে চিনিব না। এই অবস্থায় আমার প্রস্তাব যে এক প্রকার imposition তাহা আমি বুঝি।—আমাদের দেশে অতীতে যে সামাজিক প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিও গৃহস্থের আতিথেয়তা হইতে বঞ্চিত হইত না। সেই আদর্শের কথা স্মরণ করিয়াই আমি আমার অনুরোধ পেশ করিতে সাহসী হইলাম।

—আমি স্থির করিয়াছি আগামী ১৬ই রাজধানী এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ১৭ই সকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়া ট্যাক্সি-সহযোগে তোমাদের গৃহে উপস্থিত হইব। আমাকে অতিথিরূপে গ্রহণ করা বা না-করা সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত আমার শিরোধার্য। মনে রাখিও অম্ল-মধুর-তিক্ত-কষায় সব রকম অভিজ্ঞতায় আমি সমান অভ্যস্ত। ইতি, আশীর্বাদক—তোমার ছোটমামা শ্রী মনোমোহন মিত্র।

চিঠি পড়া শেষ হয়। সুধীন্দ্র ও বাবলু খুব মন দিয়ে অনিলার পড়া এতক্ষণ শুনছিল।

সুধীন্দ্র তুমি বলছিলে তোমার কোনো স্মৃতি নেই—বেঁটে মোটা কালো ফরসা রোগা লম্বা, কিচ্ছু মনে নেই?

অনিলা না—

সুধীন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে আসে অনিলার দিকে।
তার হাবভাবে অস্বস্তি প্রকাশ পায়।

সুধীন্দ্র তাহলে একটাই রাস্তা—এর একটা immediate reply—চিঠি নয়, Telegram—Regret,—না, deeply regret—leaving Calcutta on 16th for a fortnight's holiday—Sender's name—Mrs. Sudhindra Bose!

অনিলা ডাহা মিথ্যে বলে দেবে? Fortnight's holiday?

সুধীন্দ্র মিথ্যে মানে? লোকে ছুটিতে বাইরে যায় না? ও তো জানে না যে আমি আপিসে চাকরি করি—ধরো যদি আমি একটা কলেজের প্রোফেসার হই, তাহলেও তো পুজোতে অঢেল ছুটি—

অনিলা তুমি তো আর প্রোফেসার নও!

সুধীন্দ্র এ লোক যে মিথ্যে বলছে না, তার কী বিশ্বাস? আজকাল কতরকম ধাপ্পাবাজি হয় তুমি জানো? বাবার আর্টের collection—priceless collection—এই বসবার ঘরেই কম ক'রে পাঁচ-সাত লাখ টাকার জিনিস রয়েছে। বেশি দরকার নেই, ঐ বুক শেল্ফ-এর ওপরে রাখা দু খানা ব্রোঞ্জের মূর্তির একখানা হাতিয়ে নিয়ে একজন foreign tourist-কে বেচলে one can make a fortune!

অনিলা তুমি বলতে চাও এ লোক চুরির মতলব নিয়ে আসছে?

সুধীন্দ্র Who knows?

অনিলা ছোটমামা মা-র অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। দাদুও ছোট মামাকে খুব ভালোবাসতেন। আর সেটা অকারণে নয়—অনেক গুণ

ছিল ছোটমামার — জীবনে কোনোদিন সেকেণ্ড হন নি।

সুধীন্দ্র পঁয়ত্রিশ বছরে একটা লোকের খোল নল্‌চে পাল্‌টে যেতে পারে। সেটা জানো ?

অনিলা এ চিঠি পড়ে তা মনে হয় না।

বোঝাই যায় অনিলা তার স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারছে না। তার ভ্রূকুটি যাচ্ছে না।

সুধীন্দ্র All right, আমি ধরেই নিচ্ছি উনি তোমার ছোটমামা — অত্যন্ত ভদ্রলোক — A model of virtue — কিন্তু তুমি তোমার স্বামীর দিকটা একটুও ভাববে না ?

অনিলা সুধীন্দ্রর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেয়।

অনিলা কী বলতে চাইছো তুমি ?

সুধীন্দ্র Look — ভদ্রলোক আসছেন ১৭ই শুক্রবার — থাকবেন সাত দিন। অর্থাৎ গোটা weekend-টাই মাটি! ২১শে সপ্তমী — পুজোর সময় ভাবছিলাম কোথায় একটু relax করব — তা না — উড়ে এসে জুড়ে বসবেন এই বুড়ো — claiming to be your মামা — expecting — expecting কেন — extorting traditional Indian hospitality — "এসো ভাই, বসো ভাই — খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই ?"

অনিলা আমার একটুও ভালো লাগছে না।

সুধীন্দ্র কী ?

অনিলা তোমার attitude — আবার কী ? এই চিঠির উত্তরে ঐ Telegram হয় না। রীতিমতো ভালো চিঠি।

সুধীন্দ্র আহা সেটা তো আমি অস্বীকার করছি না। — শুধু ভালো নয়, একটু বেশি ভালো! সেইখানেই খট্‌কা! যে লোকটা এতদিন দেশের বাইরে রয়েছে সে এত ভালো বাংলা লেখে কী ক'রে ?

অনিলা সে হয়ত উনি অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। ভাষাটা অন্যের, কিন্তু ভাবটা তো ওঁর!

সুধীন্দ্র না-না-না — এর মধ্যে কোথায় যেন সামান্য গোলমাল রয়েছে — there is something fishy here —

অনিলা ঠিক আছে —

অনিলা রেগে সেখান থেকে চলে যায়। বাবলু তার পিছু নেয়।

খাওয়ার ঘর।
বাবলু খাওয়ার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।
অনিলা বিস্কুট তৈরিতে ব্যস্ত।

বাবলু মা, দাদু আসবেন না?
অনিলা (বিরক্ত) তোমার বাবাকেই জিগ্যেস কর—

বাবলু তার বাবার দিকে তাকায়। সুধীন্দ্র দূরে বেতের চেয়ারে বসে। অনিলাকে উদ্দেশ্য ক'রে সে গলা তোলে—

সুধীন্দ্র কী হল? তুমি আবার রাগ করলে নাকি?

কোনো উত্তর না পেয়ে সুধীন্দ্র উঠে এসে খাওয়ার ঘরের দরজায় বাবলুর পাশে এসে দাঁড়ায়।
অনিলা নিজের কাজ ক'রে চলেছে।

সুধীন্দ্র নেই মামার চেয়ে জাল মামা ভালো—এই বলতে চাও তুমি?
অনিলা আমি একটা কথাই বলতে চাই। চিঠি, টেলিগ্রাম কোনো-টারই কি খুব একটা দরকার আছে? উনি এমনিতেই লিখেছেন যে উনি ১৭ তারিখে আসছেন। তা আসুন।—যদি দেখি জাল লোক বা মামা হয়েও কোনো কু-মতলবে আসছেন তাহলে আমিই ওকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করব—তোমার কিছু করতে হবে না—তাহলেই হবে তো?
সুধীন্দ্র Bravo!

সুধীন্দ্র মুচকি হেসে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।
বাবলুর চোখ চক্‌চক্ ক'রে ওঠে

বাবলু আব্বেব্বাস্—জাল দাদু!

দিন।
রাজধানী এক্সপ্রেস ছুটে বেরিয়ে গেল।
কামরার ভিতর সীটের তলায় একটা বহু ব্যবহৃত লেবেল মারা দড়ি দিয়ে বাঁধা সুটকেস।

সীটের উপর পায়ে বিলিতি কেড্‌স পরে বসে এক ভদ্রলোক, তার মুখ একটা খোলা খবরের কাগজে ঢাকা। ইনিই মনোমোহন মিত্র।
এরই উপর ছবির টাইট্‌ল শুরু হয়। টাইট্‌ল-এর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় --

রাত।
রাজধানী এক্সপ্রেস দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায়।

ট্রেনের ভিতর।
কামরার দরজা খুলে বেয়ারা থালি নিয়ে ঢুকে মনোমোহনের সামনে রেখে চলে যায়।
মনোমোহনের মুখ এখনো দেখা যাচ্ছে না – তার ডান হাত এসে থালির ঢাকনাটা সরায়।

সকাল।
হাওড়া স্টেশনে পাশাপাশি অজস্র লাইনের মধ্যে একটা দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস এগিয়ে আসছে।

একটা কুলির মাথায় দেখা গেল সেই লেবেলমারা পুরনো সুটকেসটা এগিয়ে চলেছে।
এবার দেখা যায় মনোমোহনের কেড্‌স-পরা পা প্ল্যাটফর্মের ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে।

ট্যাক্সির ডিকিতে দু'টো সুটকেস রাখা হয়। ড্রাইভার এসে ডিকি বন্ধ করে – মিটার নামিয়ে দেয়।
শেষ টাইট্‌ল কার্ড পড়ে।

২

সকাল।
সুধীন্দ্রর বাড়ির দোতলার একটা ঘর।
এই ঘরটাই মামার জন্য বাসযোগ্য ক'রে নেওয়া হচ্ছে।
দুই চাকরের একজন ঝাড়ু দিচ্ছে, একজন বিছানার চাদর পাতছে।
অনিলা আলমারিতে চাবি লাগিয়ে দেখে নেয় সেটা ঠিক আছে কিনা।

অনিলা (চাকরদের) আলমারির তলাটা ভালো ক'রে পরিষ্কার কর —ভীষণ ধুলো জমেছে। আর মধু—তোমার কাজ হয়ে গেলে এখানে ফ্লাস্কে ঠাণ্ডা জল আর একটা গেলাস রেখে দিও।

অনিলা টেবিলের উপরে চাবিটা রেখে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে।
সদর দরজা খোলা। সেখানে টিনটিন হাতে বাবলু দাঁড়িয়ে আছে।

অনিলা (বাবলুকে) তুমি ওখানে থেকো কিন্তু—আর উনি এলে আমাকে ডেকো—

বাবলু মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানিয়ে দেয়।

বসবার ঘর।
সুসজ্জিত ঘর—আভিজাত্য, রুচি এবং স্বচ্ছলতার পরিচয় আছে।
দেয়ালে টাঙানো এক বিশাল কালামকারী, আরেক দেয়ালে তিনটে রাজপুত মিনিয়েচার।
মাটিতে দেওয়ালের সামনে দাঁড় করানো রয়েছে দু'টি পাল যুগের পাথরের মূর্তি।
অনিলার চোখ যায় একটা bookshelf-এর উপর দুই প্রান্তে রাখা দু'টো bronze figurines-এর দিকে।
সে দু'টোকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।
তারপর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে নিজের শোবার ঘরে যায়।

অনিলা ঘরে ঢুকে আলমারি খোলে।
তারপর মূর্তি দু'টো তার মধ্যে রেখে আলমারি বন্ধ ক'রে দেয়।
এমন সময় নিচে থেকে বাবলুর গলা শোনা যায়।

বাবলু মা, এসে গেছে!

অনিলা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চাকরদের উদ্দেশ্য ক'রে হাঁক দেয়।

অনিলা শোনো, তোমরা নিচে এসো, মাল তুলতে হবে।

বাড়ির সামনে রাস্তা।
একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।
মনোমোহন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পার্স থেকে টাকা বার ক'রে ড্রাইভারকে দেয়।
দু'জন চাকর ইতিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে সুটকেস এবং মনোমোহনের পাশে দাঁড় করানো একটা মাঝারি ব্যাগ তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে আসে।
সদর দরজায় বাবলু ও তার কিছু দূরে অনিলা দাঁড়িয়ে। মনোমোহন হাসি মুখে তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

মনোমোহন (বাবলুকে) কী নাম তোমার?

বাবলু প্রণাম করতে করতে উত্তর দেয়।

বাবলু সাত্যকি।
মনোমোহন সাত্যকি? কৃষ্ণের শিষ্য—না সুধীন্দ্র বোসের পুত্র?

অনিলাও এগিয়ে এসে প্রণাম করে।

মনোমোহন থাক থাক মা, তোমার নামটা?
অনিলা অনিলা।
মনোমোহন অনিলা—
অনিলা আসুন।

তিনজন এগিয়ে যায় ল্যাণ্ডিং-এর পরে বারান্দার দরজার দিকে।

মনোমোহন তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে তো?
অনিলা হ্যাঁ, পেয়েছিলাম—
মনোমোহন আমি কিন্তু কোনো জবাব পাই নি। তুমি আবার বারণ ক'রে লেখো নি তো?

অনিলা না না।

বারান্দা।
সামনের বেতের চেয়ার দেখিয়ে দেয় অনিলা।

অনিলা বসুন—
মনোমোহন এখানে বসবো ?
অনিলা হ্যাঁ।

মনোমোহন চেয়ারে বসে।

মনোমোহন আমি কি জানি না তোমাকে ফাঁপড়ে ফেলেছি ! যাকে প্রায় চোখেই দেখ নি, মুখের কথায় তাকে মামা বলে মেনে নিয়ে—
অনিলা এ আপনি কী বলছেন ? হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া তো আনন্দের কথা—

অনিলাও কাছেই একটা বেতের চেয়ারে বসেছে, বাবলু তার পাশেই একটা মোড়ায়।

মনোমোহন তোমার স্বামী বোধ হয়—
অনিলা অফিসে। কাল-পরশু ছুটি, আর একুশ তারিখ থেকে তো পুজো—
মনোমোহন বুঝলাম।
অনিলা আপনাকে ঠাণ্ডা একটু কিছু দিই ? একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর না হয় চান-টান করবেন—
মনোমোহন তাই দাও। কিন্তু বরফ দিও না, মা—
অনিলা আচ্ছা।

অনিলা উঠে গিয়ে বারান্দার অপর প্রান্তে রাখা ফ্রিজ-এর দিকে চলে যায়।
বাবলু ছুটে খাবার ঘর থেকে গেলাস আর ট্রে নিয়ে আসে।
অনিলা ফ্রিজ থেকে Thums Up-এর বোতল খুলে গেলাসে ঢালে।
এদিকে মনোমোহন কথা বলে চলেছে।

মনোমোহন একবার ভাবলাম—আসার পথে তোমাদের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসি—তারপর মনে হল কোথায় কী পাওয়া যায় কিছুই তো জানি না। শেষকালে একটা অখাদ্য কিছু নিয়ে এলে—

অনিলা Thums Up-এর বোতল সমেত গেলাস ভর্তি পানীয় এনে মনোমোহনের পাশের টেবিলে রাখে।

মনোমোহন Thank you—আচ্ছা, ভীম নাগ, গাঙ্গুরাম এসব দোকান আছে এখনো?

অনিলা হ্যাঁ, আরো অনেক নতুন দোকান হয়েছে।

মনোমোহন গেলাসে চুমুক দেয়।

মনোমোহন এ তো দেখছি কোকাকোলার দোসর!—এখানেই তৈরি?

অনিলা হ্যাঁ—

মনোমোহন এবার বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে Thums Up নামটা দেখে।

মনোমোহন সর্বনাশ! (বাবলুকে) বুড়ো আঙুলের এই বানান শিখেছ নাকি সাত্যকি বাবু?

বাবলু (হেসে মাথা নেড়ে) ধ্যাৎ! T-H-U-M-B—

মনোমোহন তবু ভালো। ইস্কুলে পড় তো?

বাবলু এখন এক মাসের ছুটি—পুজোর।

মনোমোহন এখানে আসার পথে অনেক জায়গায় দেখলাম মেরাপ বাঁধা রয়েছে—দেখে বুঝলাম যে পুজোর মধ্যে এসে পড়েছি।

অনিলা আপনি দেশ ছাড়ার পর আর পুজো দেখেছেন কি?

মনোমোহন আমি পুজো দেখি নি, মা। তবে রথযাত্রা দেখেছি—কোথায় জানো? নিউ ইয়র্কে—Madison Avenue—

অনিলা এখানেও তো তাই। সাহেব মেমসাহেব বোষ্টম বোষ্টমীর ছড়াছড়ি! রথ বলতে তো ওদেরই—আমাদের আর কোথায়?

মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জানো, সাত্যকি বাবু?—একশো আটটা নাম? জানো?

বাবলু না—

মনোমোহন (সুর ক'রে) 'হরি হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম—
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম!

অনিলা বেশ অবাক হয় মনোমোহনের গান শোনে; ভদ্রলোকের গলায় রীতিমতো সুর।

মনোমোহন 'গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন–'
আমার দিদিমা গাইতেন, তোমায় শিখিয়ে দেব – কেমন?

বাবলু হ্যাঁ।

অনিলা আপনি চান করবেন তো?

মনোমোহন যদি অসুবিধে না হয়।

অনিলা না না। আপনার ঘর দোতালায়। বাবলু দেখিয়ে দেবে।

মনোমোহন Thums Up-এ শেষ চমুক দিয়ে উঠে পড়ে।

মনোমোহন সুন্দর বাড়ি তোমার–

অনিলা আমার শ্বশুরমশাইয়ের তৈরি।

মনোমোহন তোমার স্বামী inherit করেছে?

অনিলা হ্যাঁ।

মনোমোহন চলো, সাত্যকিবাবু।

বাবলু তাকে নিয়ে দোতলায় রওনা দেয়।
অনিলা খাবার ঘরে যেতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে এবং ঘুরে ল্যাণ্ডিং-এর দিকে যায়।
সিঁড়ি দিয়ে মনোমোহন ও বাবলু উপরে উঠছে, অনিলা এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ায়।

অনিলা ওহো – আপনি কী খান না-খান আমার জানা হয় নি, তাই –

মনোমোহন সিঁড়ি থেকে অনিলার দিকে চেয়ে হাসে।

মনোমোহন আমি সর্বভুক্ এবং স্বল্লাহারী – কাজেই কোনো চিন্তা নেই –

দু'জনে ওপরে উঠে যায়। ইতিমধ্যে টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে, অনিলা দ্রুত বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

বসবার ঘর। অনিলা এসে ফোন তোলে।

অনিলা হ্যালো –

এবার সুধীন্দ্রকে দেখা যায় ওর ছিমছাম আপিস ঘর থেকে ফোন করছে স্ত্রীকে।

সুধীন্দ্র এসেছে ?

অনিলা হ্যাঁ—এই মিনিট পনেরো হল।

সুধীন্দ্র কী রকম ?

অনিলা কী বলব বলো ? কথাবার্তা তো ভালোই, আর 'মা-মা' ক'রে কথা বলছেন—শুনতে খারাপ লাগছে না।

সুধীন্দ্র উনি তো 'মা-মা' বলছেন, তুমিও 'মামা' বলতে শুরু করলে নাকি ?

অনিলা ভবী অত সহজে ভোলে না—

সুধীন্দ্র তাও ভালো—তোমার মা-র চেহারার সঙ্গে মিল আছে ?

অনিলা তা নেই, তবে একটা ব্যাপারে মিল আছে।

সুধীন্দ্র কী ?

অনিলা গলায় সুর আছে—

সুধীন্দ্র ও বাবা, এর মধ্যে আবার গান শোনালো নাকি ?

অনিলা আরে বাবা, না—শুধু দু-লাইন—এলে বলব !

সুধীন্দ্র বাংলা বলে কেমন ?

অনিলা তোমার আমার চেয়ে ভালো বৈ মন্দ নয়।

সুধীন্দ্র এ সব কী বলছ ? এগুলো আমার সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। শোনো—

অনিলা আবার কী ?

সুধীন্দ্র পাসপোর্ট দেখতে চাও, পাসপোর্ট ! আসল-নকল ধরার এর চেয়ে ভালো উপায় নেই।

অনিলা তোমার কি মাথা খারাপ নাকি ? কোনো মেয়ে এসব পারে ? ওসব করতে হলে তুমি এসে কর। আমি ছাড়ছি, আমার অনেক কাজ।

সুধীন্দ্র হাল ছেড়ে ফোন রেখে দেয়।

৩

খাবার ঘর।

অনিলা খাওয়ার টেবিলে রাখা গেলাসগুলোয় জল ঢেলে দেয়। পাশে খাওয়ার প্লেট ও খাবার-দাবার সুন্দর ক'রে সাজানো রয়েছে।

এক পাশে কাজের লোক তাকে সাহায্য করছে।

মনোমোহন আর বাবলু প্রবেশ করে।

মনোমোহন নতুন কেনা কুর্তা-পায়জামা পরেছে।

মনোমোহন আমরা এসে গেছি, মা—

অনিলা আসুন।

মনোমোহন কুর্তা-পায়জামা—চলবে তো?

অনিলা নিশ্চয়ই।

মনোমোহন এখানে পরার মতো তো কিছুই ছিল না—তাই দিল্লিতে ঐসব কিনতে হল।

অনিলা আসুন—

মনোমোহন এগিয়ে এসে একটা খাবারের পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখে।

অনিলা ওটা মাছ। বসুন—সর্বভুক যখন তখন সব খেতে হবে কিন্তু!

মনোমোহন সেটা মনে রেখেছ, আর স্বল্পাহারীটা ভুলে গেলে!

মনোমোহন তার স্থান গ্রহণ করে, বাবলু তার বিপরীত দিকের চেয়ারে বসে। অনিলা দু'জনকে ভাত দেয়।

মনোমোহন মাংসটা বরঞ্চ তুমি রাত্রের জন্য রেখে দিও, এ বেলা মাছটাই খাই—

অনিলা (পালংশাকের ঘণ্ট দেখিয়ে) এটা কী জানেন?

মনোমোহন বাংলা রান্না যে কতকাল চোখে দেখি নি সে বললে বিশ্বাস করবে না!

অনিলা এটা পালংশাকের ঘণ্ট।

মনোমোহন ও, Spinach? Popeye the sailor, জানো তো, বাবলুবাবু?

বাবলু হ্যাঁ, spinach খেয়েই তো Popeye-এর গায়ে জোর হয়—

চাকর একটা বড় প্লেটে বড়িভাজা নিয়ে এসে অনিলার সামনে ধরে।

অনিলা আপনাকে একটা নতুন জিনিস দেখাই—

অনিলা প্লেটটা নেয়। তারপর মনোমোহকে বড়িভাজা দেখায়।

মনোমোহন সর্বনাশ, এ আবার কী?

অনিলা গয়না বড়ি! মেদিনীপুরের বৌ-ঝিয়েরা নিজের বাড়িতে তৈরি করে।

মনোমোহন বাঃ, আহারের এত বাহার, এ শুধু বাংলা দেশেই সম্ভব।

বাবলু আমাকে একটা দাও, মা!

অনিলা একটা বড়িভাজা বাবলুকে দেয়।

মনোমোহন তুমি খাবে না, মা?

অনিলা আগে আপনার হোক্—

মনোমোহন তার মানে তুমি এখনো মেমসাহেব হও নি!

অনিলা মৃদু হাস্য ক'রে মনোমোহনের পাশে বসে।

অনিলা আপনি বললেন বাঙালি রান্না অনেকদিন খান নি। তা বিদেশে তো অজস্র বাঙালি—নিউ ইয়র্কেই তো আমাদের চেনা কত বাঙালি রয়েছে! তাদের সঙ্গে আপনি মেশেন নি?

মনোমোহন একবার যখন শিকড় তুলে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছি—তখন আর বাঙালির সঙ্গ কেন?

অনিলা কিন্তু বাংলা ভাষাটা তো ভোলেন নি—দিব্যি বলেন, দিব্যি লেখেন!

অনিলা মনোমোহনকে খাবার দিতে উঠে পড়ে।

মনোমোহন আগে ডাল, পরে মাছ—

অনিলা আমরাও তাই—

অনিলা তাকে ডাল দেয়।

মনোমোহন ব্যাপারটা কী জানো, মা? মায়ের ভাষা ভুলতে না চাইলে কেউ ভোলে না। আর যারা ভুলতে চায় তারা তিনমাসের মধ্যে ভোলে। তার জন্যে বিদেশে যাবারও কোনো দরকার হয় না! দিল্লিতে শুনলাম, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাকে বলে Mummy, বাবাকে বলে Daddy! তুমিও তাই বলো নাকি, বাবলুবাবু?

বাবলু (লজ্জা পেয়ে) ধ্যাৎ!

অনিলা বড়ি কিন্তু ডাল দিয়ে খায়। দিই একটা?

মনোমোহন দাও—অলংকার বটিকা!

অনিলা পাত্র থেকে একটা গয়না বড়ি তুলে মনোমোহনকে দেয়। মনোমোহন সেটা নিয়ে তাতে কামড় দেয়। বাবলুও তার বড়িতে কামড় দেয়। দু'জনের চোখাচোখি হয়—দু'জনেরই মুখে হাসি।

অনিলা আপনি ঘর ছাড়লেন কেন?

মনোমোহন খাবারে মনোযোগ দিতে গিয়ে থেমে যায়।

মনোমোহন অ্যাঁ?

অনিলা মানে…মা-র কাছে শুনেছি আপনাকে সবাই খুব ভালোবাসত—আপনি ভালো ছাত্র ছিলেন, আপনার ভবিষ্যৎও ভালো ছিল—

মনোমোহন তবুও ঘর ছাড়লাম কেন?

অনিলা হ্যাঁ?

মনোমোহন জার্মান ভাষায় একটা খুব সুন্দর কথা আছে—Wanderlust! মানে হচ্ছে ভ্রমণের নেশা—

অনিলা শুধু সেই কারণেই ঘর ছাড়লেন?

মনোমোহন সে নেশাটা আমার মধ্যে ছিলই। তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল—

অনিলা আপনাকে একটু মাছ দিই?

মনোমোহন মাছটা থাক, আমি বরং মাংসটাই খাই—মাছের কাঁটা বাছতে গেলে কথা বলা হবে না—

অনিলা মাংস দেয় মনোমোহনের পাতে।

মনোমোহন (বাধা দিয়ে) বেশি দিও না, বেশি দিও না—ব্যস্—

অনিলা বাবলুকে মাংস দেয়, তারপর মনোমোহনের পাশে গিয়ে বসে।

বাবলু আরেকটা কী কারণ বললে না তো?

মনোমোহন ও বাবা, তোমার কান এই দিকে, অ্যাঁ, বাবলুবাবু? বলছি শোনো—তুমি খুব মজা পাবে। ছেলেবেলায় আমি খুব ভালো ছবি আঁকতাম—

অনিলা হ্যাঁ, সেটা মা-র কাছে শুনেছি—

মনোমোহন তো—আমি ঠিক করেছিলাম কলেজের পড়া শেষ ক'রে আর্ট স্কুলে ভর্তি হব। তা একদিন হল কি, আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি—হাতে একটা বিদেশী পত্রিকা এলো। খুলে দেখি পাতাজোড়া বাইসনের ছবি! ফোটো নয়, হাতে আঁকা! বাইসন কাকে বলে জানো তো দাদু?

বাবলু হ্যাঁ, মাথায় শিং আছে।

মনোমোহন হ্যাঁ, সেই শিং বাগিয়ে চার্জ করছে, জানো মা—সে এক আশ্চর্য ছবি—(উত্তেজিত হয়ে) এমন তেজ, এমন দৃপ্ত ভঙ্গি—যেন দাভিঞ্চিকেও হার মানিয়ে দেয়! কে এঁকেছে এই ছবি—কে সে অসামান্য শিল্পী! ছবির নিচে দেখি লেখা আছে—আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে, প্রস্তর যুগে স্পেনের আলতামিরা অঞ্চলে একজন আদিম গুহাবাসী এঁকেছিল এই ছবি! ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে মনে মনে বললাম, তোমার ক্ষুরে দণ্ডবৎ বাইসন ভায়া, আমি জীবনে আর যাই হই না কেন, কিছুতেই আর্টিস্ট হব না! সারা দুনিয়ায় এমন কোনো আর্ট স্কুল নেই যা আমাকে এই রকম বাইসন আঁকা শেখাতে পারে। সেই থেকে সভ্য ব্যাপারটা কি, আর অসভ্য ব্যাপারটাই বা কি—এই নিয়ে একটা কৌতূহল আমার মনে জেগে উঠেছিল, আর তার সঙ্গে যোগ হল Wanderlust—এই দুইয়ে মিলে আমাকে দেশ ছাড়া করল।

অনিলা আপনি আবার বেরোবার কথা লিখেছেন—

মনোমোহন হ্যাঁ, এবার যাব অস্ট্রেলিয়া—ওদিকটা দেখা হয় নি—

দুপুর। মনোমোহনের ঘর।

মনোমোহন তার খাটে বসা, তার পাশেই মোড়াতে বসা বাবলু।

মনোমোহনের হাতে কয়েকটা বিদেশী coins, সেগুলোর সঙ্গে সে বাবলুর পরিচয় করিয়ে দেয়।

মনোমোহন এটা গ্রিসের coin – দ্রাখ্‌মা – এটা পোলাণ্ডের Zloty – Z-L-O-T-Y – এটা মেক্সিকোর Peseta –

শেষ কয়েনটি দেখায় সে বাবলুকে।

মনোমোহন আর এটা পেরুর Sol –
বাবলু অনীশের কাকাও পয়সা জমায় – আমি জানি তাকে কী বলে!
মনোমোহন কী বলে?
বাবলু নিউ-মিস্‌-ম্যাটিস্ট!
মনোমোহন (হেসে) Very good, very good! আমি অবশ্য পয়সা জমাই না – আমার মুদ্রাদোষ নেই!

মনোমোহন উঠে গিয়ে খাটের পাশের টেবিলে ব্যাগটা রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

মনোমোহন এগুলো আমার কাছে থেকে গিয়েছিল, তার থেকে কয়েকটা তোমাকে দিয়ে দিলাম!
বাবলু আবিব্বাস্‌, আমাকে!
মনোমোহন তুমি তোমার বন্ধুদের দেখিও –
বাবলু আমি কিন্তু আমার বন্ধুদের বলে দিয়েছি, সবাইকে নয় – কয়েকজনকে –
মনোমোহন কী বলেছ?
বাবলু আমাদের বাড়িতে একজন লোক এসেছেন – সে আমার দাদু হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে!

মনোমোহন হেসে ওঠে।

বাবলু তারা কিন্তু তোমায় দেখতে আসবে –

অনিলা এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ায়।

অনিলা বাবলু – এবার চলে এসো – উনি বিশ্রাম করবেন না বুঝি?
বাবলু (মনোমোহনকে) আমি যাচ্ছি –
মনোমোহন Auf Wiedersehen –

বাবলু যেতে গিয়ে থেমে যায়, দাদুর দিকে অবাক হয়ে তাকায়।

বাবলু কী বললে?

মনোমোহন Auf Wiedersehen! জার্মান কথা—মানে আবার দেখা হবে!

বাবলু (এক গাল হেসে) আবিব্বাস্!

কলকাতার গড়ের মাঠ। বিকেল।
আকাশে রঙিন প্যারাসুটবাহী এক শিক্ষানবিশ জওয়ান। শহরের স্কাইলাইনের পটভূমিতে তার অবতরণমুখী উড়ান দেখা যায়।
এরই উপর মনোমোহনের কথা ভেসে আসে।

মনোমোহন ভেবে দেখ, দক্ষিণ আমেরিকার সব চেয়ে উঁচু পাহাড়, আন্দেস্—তার গায়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে এই পাথরের শহর!

এবার বাবলু ও তার বন্ধুদের দেখা যায় গড়ের মাঠে একটা গাছতলায় বসে মনোমোহনে গল্প শুনছে।

মনোমোহন —চারশো বছর ধরে কেউ তো জানতই না এখানে একটা শহর আছে। তারপর ১৯১১ সালে—সেই যে বছর মোহন-বাগান সাহেবদের হারিয়ে আই-এফ-এ শিল্ড নিল—সেই বছর হিরাম বিংহ্যাম নামে এক পর্যটক হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেললেন এই শহর!—কী নাম বলেছিলাম শহরের?

ছেলেরা মাচ্চু পিচ্চু!

মনোমোহন মাচ্চু-পিচ্চু-র!

মনোমোহন সামনে রাখা একটা প্যাকেট থেকে মাচ্চু পিচ্চুর একটা ফটো বার ক'রে দু'হাত দিয়ে সামনে তুলে ধরে।

মনোমোহন এই দেখ—

ছেলেরা আবিব্বাস্!—আপনি গেছেন এই শহরে?—আপনি গেছেন?

মনোমোহন গেছি বৈকি! এই ছবি তো আমারই তোলা! আমি গেছি বিশ বছর আগে—খচ্চরের পিঠে চড়ে! তাক লেগে গিয়েছিল শহর দেখে—সেখানে সব পাথরের তৈরি। কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে কোথাও পাথর নেই! ওরা কোথায় পাথর পেল, কী ক'রে সে পাথর পাহাড়ের গা বেয়ে অত উঁচুতে তুলল, কেউ জানে না! বড় আজব সভ্যতা ছিল এই ইন্‌কা সভ্যতা!

ছেলেরা আরেকটা গল্প বলুন!—আরেকটা গল্প বলুন!

মনোমোহন না, না—গপ্পো-টপ্পো নয়—এবারে একটা ম্যাজিক!

মনোমোহন এবার তার থলি থেকে কতকগুলো নানা সাইজের বিদেশী কয়েন বার ক'রে সামনে একটা শাদা খামের উপর রাখে।

ছেলেরা এগুলো আবার কী?

মনোমোহন তোমাদের কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব—দেখি ঠিক ঠিক বলতে পার কিনা। Ready?—

ছেলেরা রেডি!

মনোমোহন আচ্ছা বলতো, চাঁদ বড়—না সূর্য?

ছেলেরা সূর্য!

মনোমোহন কেমন ক'রে জানলে?—দাঁড়াও—(মনোমোহন দু'টো একই সাইজের coin পাশাপাশি রাখে) এ হল চাঁদ, এই হল সূর্য। আকাশে তো দু'টোকে দেখে একই সাইজ মনে হয়।

ছেলেরা সূর্য যে অনেক দূরে!

মনোমোহন কত দূরে?—আমি বলছি—সূর্য সাড়ে নয় কোটি মাইল দূরে, আর চাঁদ মোটে পাঁচ লক্ষ মাইল দূরে—

ছেলেরা তাই তো দু'টোকে এক মনে হয়—

মনোমোহন আচ্ছা ধর চাঁদ যদি পাঁচ লক্ষ মাইল দূরে না হয়ে দু'লক্ষ মাইল দূরে হতো?

ছেলেরা তাহলে চাঁদকে বড় দেখাতো—

মনোমোহন আগের চাঁদের জায়গায় একটা নতুন বড় coin রাখে।

মনোমোহন এই—এই রকম—এই তো?

ছেলেরা হ্যাঁ।

মনোমোহন আর ধর যদি চাঁদ আট লক্ষ মাইল দূরে হতো?

ছেলেরা অনেক ছোট দেখাতো, অনেক ছোট—

মনোমোহন এবার একটা ছোট্ট coin রাখে বড়টার জায়গায়।

মনোমোহন অনেকটা এই রকম—

ছেলেরা হ্যাঁ।

মনোমোহন কিন্তু এটা তো হল না—চাঁদ ঠিক এমনই দূরে হল, যাতে এই রকম হয়—

মনোমোহন আবার মাঝারি coin-টা চাঁদের জায়গায় রাখে। তারপর সে চাঁদ-coinটা সরিয়ে এনে সূর্য-coinটার উপর রেখে সেটাকে ঢেকে ফেলে।

মনোমোহন তাই চাঁদ যখন সূর্যের উপর এসে পড়ে — আস্তে আস্তে তাকে ঢেকে ফেলে — একদম চাকৃতি চাকৃতি মিলে যায় —

ছেলেরা সূর্যগ্রহণ!

মনোমোহন সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ। আবার পৃথিবীর ছায়া যখন চাঁদকে ঢেকে ফেলে তখন একেবারে চাকৃতি চাকৃতি মিলে যায় —

ছেলেরা চন্দ্রগ্রহণ — চন্দ্রগ্রহণ!

মনোমোহন পূর্ণ গ্রহণ — চাঁদের পূর্ণ গ্রহণ। কী ক'রে হয়, বল তো?

ছেলেরা সবাই নিরুত্তর।

মনোমোহন বলতে পারলে না! পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পণ্ডিতকে জিগ্যেস কর — সেও বলতে পারবে না! কেউ জানে না। এ এক বিস্ময় — আমি বলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব চেয়ে বড় বিস্ময়। সূর্য আর চাঁদ — দিনের রাজা আর রাতের রানী — আর চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া সব এক সাইজের চাকৃতি! ম্যাজিক!

৪

সন্ধে। সুধীন্দ্রর বাড়ি। কলিং বেল বেজে ওঠে।
চাকর সদর দরজা খুলতে সুধীন্দ্র অ্যাটাচি কেস হাতে ভিতরে ঢোকে।
সিঁড়ির নিচেই তার দেখা অনিলার সঙ্গে।

অনিলা এই শোনো —

সুধীন্দ্র কী ব্যাপার?

অনিলা শোনো না!

বসার ঘর।
অনিলার পিছন পিছন সুধীন্দ্র ঢোকে।

অনিলা আমি কিন্তু confirmed—
সুধীন্দ্র যে উনি তোমার মামা—এবং অত্যন্ত ভালো লোক! ভবী দেখছি সহজেই ভোলে! এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা গোটা মানুষকে তুমি চিনে ফেললে?

অনিমা সোফায় বসে।

অনিলা মেয়েরা পারে। পুরুষদের সন্দেহ বাতিক—মেয়েদের নেই। তা ছাড়া একটা মানুষের হাবভাব, কথাবার্তা, তার চোখের চাউনি—এসব দেখলে বোঝা যায় না? উনি যে বিদেশ ঘুরেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জার্মান-টার্মান ভালো জানেন—আর বাবলুকে কয়েকটা বিদেশী কয়েন্‌সও দিয়েছেন—
সুধীন্দ্র বিদেশী কয়েন্‌স!—বিদেশী ডাক-টিকিট কিনতে পাওয়া যায় জানো? সেরকম বিদেশী কয়েন্‌স এরও dealers আছে (সোফাতে বসে)—কোথাকার কয়েন্‌স চাই বলো না! আমি কালই এনে দেব।
অনিলা Any way, আমার যা মনে হল তাই বললাম।
সুধীন্দ্র বাড়ি ছাড়ার কারণ কিছু বলল?
অনিলা তখনই তো জার্মান কথাটা ব্যবহার করলেন যার মানে ভ্রমণের নেশা—

সুধীন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করে।

সুধীন্দ্র Wanderlust?
অনিলা হ্যাঁ, কিন্তু তোমার মতো উচ্চারণ করেন নি—
সুধীন্দ্র (জার্মান উচ্চারণে ভাণ্ডেরলুস্ট—এই তো?
অনিলা হ্যাঁ—
সুধীন্দ্র কথাটা ইংরেজিতেও ব্যবহার হয়—আর যখন হয় তখন ইংরেজি উচ্চারণেই হয়। আমি আড়াই মাস ধরে ম্যাক্স মুলার ভবনে জার্মান শিখেছিলাম—ধৈর্যের অভাবে এগোতে পারি নি। এখনো গোটা পঞ্চাশেক জার্মান কথা আমার মনে আছে।—আর কী কারণ বললেন?

অনিলা কীসের ?

সুধীন্দ্র বাড়ি ছাড়ার—আর কীসের ?

অনিলা সে অনেক কথা, বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে—বাইসন—বুঝলে কিছু ?

সুধীন্দ্র (অবাক) বাইসন ?

অনিলা উঠে পড়ে সুধীন্দ্রর দিকে এগিয়ে আসে।

অনিলা বাড়িতে guest এসেছে, তুমি বাড়ির কর্তা, host—একবার দেখাটা সেরে নাও !

সুধীন্দ্র ভদ্রলোক কোথায় ?

অনিলা নিজের ঘরেই হবেন। বাবলুর বন্ধুদের সঙ্গে গড়ের মাঠে গিয়েছিলেন। একটু আগেই ফিরেছেন।—ওঠো, ওঠো না—

সুধীন্দ্র উঠে পড়ে।

সুধীন্দ্র বাড়িতে ফুলো না থাকলে এনে রেখো—

অনিলা এই শোনো—

সুধীন্দ্র চলে যাচ্ছিল, অনিলার ডাকে ঘুরে দাঁড়ায়।

সুধীন্দ্র আবার কী ?

অনিলা আমার একটা অনুরোধ রেখো, please !

সুধীন্দ্র কী ?

অনিলা অন্তত প্রণামটা কোরো।

মনোমোহনের ঘর।

মনোমোহন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কুর্তার বোতাম লাগাচ্ছে। দরজায় টোকা শুনে সাড়া দেয়।

মনোমোহন Come in—

সুধীন্দ্র ইতস্ততভাবে প্রবেশ করে।

সুধীন্দ্র Good Evening—

মনোমোহন তাকে ঘুরে দেখে।

মনোমোহন সুধীন্দ্র বোস?

সুধীন্দ্র ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে, কিন্তু মনোমোহন দু'হাত দিয়ে মাঝপথে তার প্রণাম রোধ করে।

মনোমোহন না না না - কক্ষনো না!

সুধীন্দ্র থতমত খেয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মনোমোহন যখন মন থেকে সন্দেহ দূর হবে—যদি হয়—তখন প্রণাম করার প্রশ্ন উঠবে। তার আগে নয়। আমি চিঠিতে লিখেছি, এখন মুখে বলছি—I know this is an imposition—তোমরা কে জানি, কিন্তু আমি কে তোমরা জান না। Unfortunately আমি আমি আসল না নকল, সৎ মামা না অসৎ মামা—এসব জানার জন্য তোমাদের কিছুটা সময় দিতে হবে। সে সময়টুকু দিতে তোমরা রাজি আছ কিনা ভেবে দেখ—

সুধীন্দ্র কিন্তু সহজ রাস্তা যে নেই একথা আপনি কেন বলছেন আমি বুঝতে পারছি না—আমার তো মনে হয়—

সুধীন্দ্রর কথা শেষ করার আগেই মনোমোহন তার shoulder bag থেকে একটা পাসপোর্ট বার ক'রে সুধীন্দ্রের দিকে ছুঁড়ে দেয়।
সুধীন্দ্র সেটা লুফে নেয়।

সুধীন্দ্র Thanks—এই তো, আপনারই নাম—মনোমোহন মিত্র—এই তো আপনার ছবি—Distinguishing mark—Mole on right cheek!

সুধীন্দ্র মনোমোহনের দিকে দেখে।
মনোমোহন তার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে তার ডান গালের তিলটা নির্দেশ করে।

সুধীন্দ্র তাহলে ঠিকই আছে—আপনি কেন—

মনোমোহন এতে কী প্রমাণ হল সুধীন্দ্র বোস? তুমি বলবে Identity, আমি বলব তাও নয়—এই বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির যুগে পাসপোর্ট জাল করার কতরকম ফিকির আছে তুমি জান?

মনোমোহন সুধীন্দ্রর হাত থেকে পাসপোর্টটা ছিনিয়ে নেয়।

মনোমোহন This passport proves nothing! সুতরাং আমাকে অবিশ্বাস করবার পূর্ণ অধিকার তোমার আছে। কিন্তু এসব কথা তো তোমার স্ত্রীকে বলা যায় না! সে সুষ্ঠুভাবে তার কর্তব্য পালন ক'রে চলেছে—কোথাও কোনো ত্রুটি রাখছে না! রক্তের সম্পর্ক যদি থেকেই থাকে সে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে, তোমার সঙ্গে তো নয়—so you have every right to kick me out! এই দেখ। (খাটের তলায় রাখা সুটকেসটা দেখিয়ে আমার সুটকেস আমি এখনো খুলি নি—ইচ্ছা করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে যেতে পারি।

সুধীন্দ্র এ কথা আপনি বলছেন কেন? আমার স্ত্রীর আপনাকে ভালো লেগেছে—কাজেই there is no question of my—my—

মনোমোহন I am at your mercy!

সুধীন্দ্র আপনি ও কথা ভুলে যান—আমার শুধু একটাই প্রশ্ন—

মনোমোহন বল—

সুধীন্দ্র হঠাৎ অ্যাদ্দিন বাদে আপনি—মানে, আপনার দেশে ফেরার ইচ্ছাটা হল কেন?

মনোমোহন এটাও সত্যি বলে মানবে কিনা ভেবে দেখ! নাঃ—দেশে ফেরার ইচ্ছা হয় নি। পশ্চিমের পালা সাঙ্গ ক'রে এবার পুবের দিকে যাব মনস্থির করেছিলাম। দিল্লি তো আসতেই হয়—কিন্তু এতদিন কারো প্রতি রক্তের টান অনুভব করি নি।—এবার হয়ত বয়সের জন্যে—

মনোমোহনের গলা ধরে আসে।

সুধীন্দ্র (বাধা দিয়ে) আপনি বিশ্রাম করুন—আমি চান সেরে আসছি।

সুধীন্দ্র চলে যায়। মনোমোহনকে কিছুটা ক্লান্ত দেখায়।

শোবার ঘর। অনিলা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় খাটে বসে আছে। সুধীন্দ্র ঢুকতেই সে মুখ তুলে চায়।

সুধীন্দ্র You win—আপাতত—

অনিলা পাসপোর্ট?

সুধীন্দ্র ঠিক হ্যায়—

অনিলা দেখিয়েছেন?

সুধীন্দ্র হ্যাঁ, almost নিজে থেকেই !

সুধীন্দ্র খাটে অ্যাটাচি রেখে, কোট সার্ট আলনায় রেখে চেয়ারে বসে জুতো মোজা খোলে। তার মধ্যে কথা চলে।

অনিলা তাহলে আর 'আপাতত' বলছ কেন ? আসল মামাই তো এসে গেছেন।

সুধীন্দ্র আমার মতো পঞ্চাশজনকে চড়িয়ে খেতে পারেন ভদ্রলোক। কী বলছেন জান ?

অনিলা কি ?

সুধীন্দ্র বলছেন the passport proves nothing—আজকাল নাকি আকছার পাসপোর্ট জাল হচ্ছে !

অনিলা (হেসে, ঠাট্টার স্বরে) পাসপোর্ট দেখতে চাও—পাসপোর্ট দেখতে চাও ! এবার হল তো ?

সুধীন্দ্র হ্যাঙ্গারে অন্য একটা জামা নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোয়।

সুধীন্দ্র তোমার so-called মামা যে গভীর জলের মাছ সে আমি জানব কী ক'রে বল। He's playing some sort of a game। সেটা যে কী, ঠিক করতে পারছি না। মনে হয় কাল সন্ধেবেলা এর একটা ফয়সালা হয়ে যাবে—

অনিলা মানে ?

সুধীন্দ্র কাল পৃথ্বীশকে আসতে বলেছি।

অনিলা কেন ? ও আবার কেন ?

সুধীন্দ্র এ ব্যাপারে একজন ঠোঁটকাটা লোকের দরকার—আর সেই লোক যে তোমার স্বামী নয়, সেটা তুমি ভালো ক'রে জান। আমার যদি কোনো chronic ব্যারাম থেকে থাকে, সেটা হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। পৃথ্বীশের সেটা নেই। ওকে আমি ব্যাপারটা বলেছি, and he is most intrigued। ও বলেছে ওরকম জালিয়াতির কেস ও আগে অনেক handle করেছে—

অনিলা ও কি আবার ওনাকে জেরা করবে নাকি ? যা চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে তোমার ঐ বন্ধু !

সুধীন্দ্র অনিলার পাশে এসে বসে, তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

সুধীন্দ্র জেরা মানে কি ? সেই লোকটা বলছে সে তোমার মামা।

তার জোরে সে আমাদের অন্ন ধ্বংস করছে, চারবেলা ভালোমন্দ খাইয়ে তার পেছনে per day অন্তত পঞ্চাশটা টাকা তো খরচা হবেই! অথচ we know next to nothing about the man! কাজেই তাকে কিছু essential প্রশ্ন তো করতেই হয় – পৃথ্বীশ সেটা করবে এবং যথাসম্ভব ভদ্রভাবেই করবে।

সুধীন্দ্র উঠে পরে।

অনিলা আমি জানি না। যে লোকটা ভাগনিকে আড়াই বছরের খুকি দেখে গেছে – পঁয়ত্রিশ বছর পর দেশে ফিরে এসে তাকে দেখার ইচ্ছেটা অন্তত আমার কাছে এতটুকুও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

সুধীন্দ্র ঠিক আছে। লোকটা যদি স্রেফ sentimental কারণে এসে থাকে, then I have nothing to say – কিন্তু যদি বুঝি যে মামা হয়েও লোকটার মতলব ভালো নয়, তাহলে I'll at once show him the door – চক্ষুলজ্জা or no চক্ষুলজ্জা!

অনিলা আর যদি মামা না হয়?

সুধীন্দ্র তাহলে আর কি – আপনি তো আছেন – কুলো (দন্ত বিকশিত হয়ে ভঙ্গি ক'রে) – বাতাস –!

সুধীন্দ্র বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।
এদিকে টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। অনিলা সেটাকে কিছুক্ষণ বাজতে দিয়ে বিছানার পাশের টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিয়ে কানে দেয়।

অনিলা হ্যালো –

এবার অনিলার বান্ধবী ছন্দাকে দেখা যায় তার বাড়ির শোবার ঘর থেকে ফোন করছে। ছন্দার পিছনে তার স্বামী রঞ্জনকে দেখা যায় কাঁধে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রীর কথা শুনছে।

ছন্দা আমি ছন্দা বলছি – ছন্দা – চিনতে পারছিস না?

অনিলা ও – তোর গলাটা একদম অন্যরকম শোনাচ্ছে –

ছন্দা ও আর কিছু নয় – excitement! এসেছে?

অনিলা হ্যাঁ, এসেছেন – সত্যি নয় তো কী?

ছন্দা তা, কী বুঝছিস একটু বল্!

অনিলা একদিনে আর কী বুঝব বল?

ছন্দা আমরা না – আমি আর আমার কর্তা। উঃ – আমরা একদম

কৌতূহলে ফেটে পড়ছি, হ্যাঁ—সেইদিন তোর মুখ থেকে শোনা অবধি! আর কিছু ভাবতে পারছি না!

অনিলা কিন্তু তোরা আর কাউকে বলিস নি তো?

ছন্দা তুই বিশ্বাস কর, বলবার জন্য প্রাণটা একেবারে ছটফট করছে—কিন্তু টুঁ শব্দটি করি নি!

অনিলা এখন তো খবর পেলি—এখন ছাড়ি?

ছন্দা এই না না না—ও তোর সঙ্গে কথা বলবে, ওকে দিচ্ছি—

রঞ্জন ছন্দার কাছে এসে তার হাত থেকে টেলিফোনটা নেয়।

রঞ্জন হ্যালো—

অনিলা হ্যাঁ, বলুন—

রঞ্জন আমার একটা request আপনাকে রাখতে হবে।

অনিলা কী request?

রঞ্জন Just half an hour-এর জন্যে একটিবার ঢুঁ মারব আমরা দু-জনে—

অনিলা হ্যাঁ, কিন্তু উনি যদি কোনোরকমে বুঝতে পারেন—

রঞ্জন শুনুন—শুনুন—শুনুন—আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, উনি ঘুনাক্ষরেও টের পাবেন না—আমরা যেমন মাঝে মধ্যে যাই, সে রকম casually যাব, casually কথাবার্তা বলব—আধঘণ্টার মধ্যে casually চলে আসব। আপনি শুধু সুধীনকে বলবেন—ও যেন আমাকে অভিনেতা বলে introduce না করে। গোড়ার দিকে আমার profession-টা গোপন রাখাই ভালো।

অনিলা কিন্তু আপনারা আজই আসতে চান?

রঞ্জন কাল-পরশু double show তো! শনি-রবি যে!

অনিলা ঠিক আছে, তাই আসুন—

রঞ্জন Thanks—ঐ কথাই রইল—okay!

অনিলা ফোন রেখে উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা মারে। ভিতর থেকে স্নান করতে করতে সুধীন্দ্রর গান শোনা যায়।

সুধীন্দ্র (গান) সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো—

অনিলা শুনছো?

সুধীন্দ্র (গান সকালবেলার মল্লিকা—

অনিলা এই!

দরজা ফাঁক ক'রে সুধীন্দ্র ভেজা মুখ বার করে।

সুধীন্দ্র কী ব্যাপার ?

অনিলা ছন্দা আর রঞ্জন আসছে—বলছে জানতে দেবে না ওরা ওঁকে দেখতে এসেছে—

সুধীন্দ্র বেশ তো, ওদেরও খবর দিয়ে দাও—চামেলি, শেফালি, যূথিকা, মল্লিকা—

অনিলা হ্যাৎ !

সুধীন্দ্র কেন ? তাহলে বুড়োকে entertain করার দায়িত্বটা একা আমাদের ঘাড়ে পড়ে না !

সুধীন্দ্র দরজা বন্ধ করতে যাবে, অনিলা হাত দিয়ে রোধ করে—

অনিলা এই শোনো না—তুমি please ওঁকে আমার মামা বলে introduce কোরো—

সুধীন্দ্র Okay !—Okay !—

সুধীন্দ্র দরজা বন্ধ ক রে দেয়।

৫

রাত। সুধীন্দ্রর বসবার ঘর।

রঞ্জন সোফায় বসে সিগারেট ধরায়। আরেকটা সোফায় ছন্দা আর সুধীন্দ্র, আর ডিভানে অনিলা। নেপথ্যে মনোমোহনের গলা শোনা যায়।

মনোমোহন আসতে পারি ?

গলার শব্দে রঞ্জন চট্ ক'রে অ্যাশট্রে-তে সিগারেট গুঁজে দেয়।

মনোমোহন ঘরে ঢুকলে সবাই দাঁড়ায়।

মনোমোহন রসভঙ্গ করলাম না তো ?

সুধীন্দ্র না না — আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমাদের বন্ধু মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রক্ষিত — মনোমোহন মিত্র।

নমস্কার বিনিময়ের পর মনোমোহন রঞ্জনের বিপরীত দিকের সোফায় বসে। রঞ্জন মনোমোহনের দিকে দেখে —

রঞ্জন আপনাকে তো ঠিক — ?

সুধীন্দ্র উনি নিলির ছোট মামা।

রঞ্জন ওর ছোট মামা — ছো —

রঞ্জন সেই অবাক চোখেই একবার অনিলার দিকে একবার সুধীন্দ্রর দিকে দেখে। তারপর সে-দৃষ্টি চলে গিয়ে স্বাভাবিক হয়। রঞ্জন মাথা নাড়ে।

রঞ্জন ও, না না — আমি ভুল ক'রে ফেলেছি ! আমার আর এক বন্ধুর স্ত্রী — কী যেন নাম — মন্ (ছন্দার দিকে দেখে) — মঞ্জুরই তো ছোটমামা —

ছন্দা মঞ্জুর আবার মামা কৈ ?

রঞ্জন Sorry — মঞ্জুর তো মামা — আচ্ছা (অনিলাকে) — আপনার তো তিন মামা, না দুই ?

অনিলা দুই। বড় মামা মারা গেছেন — আর ছোটমামা পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যান —

রঞ্জন আবার মনোমোহনের দিকে দেখে — অবাক দৃষ্টি। মনোমোহন সেই-ভাবেই স্মিত হাস্য নিয়ে বসে আছে।

রঞ্জন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে অনিলার দিকে চায় — ভাবটা যেন, ইনিই সেই ব্যক্তি কি ?

অনিলা অল্প হেসে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে।

রঞ্জন মাথাটা কি রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে !

সুধীন্দ্র তোর মাথা কোনোদিনই ঠিক ছিল না — the whole thing is very simple — নিলির ছোট মামা পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যান — আজ সকালে ফিরেছেন !

রঞ্জন কোত্থেকে ?

সুধীন্দ্র পশ্চিম — Occident —

রঞ্জন উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়ে।

রঞ্জন Sensational ব্যাপার! – এ যে another ভাওয়াল সন্ন্যাসী – আপনি ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেস্‌টা জানেন?

মনোমোহন (মৃদু হেসে) জানি –

রঞ্জন World famous case! কতদিন চলেছিল বলুন তো? দশবছর –

মনোমোহন এখানে কোনো মামলা-টামলার ব্যাপার নেই।

রঞ্জন (নিশ্চিন্তভাবে) নেই তো?

মনোমোহন না।

রঞ্জন (সুধীন্দ্রর দিকে) মানে, উনি যে এর মামা, সে বিষয়ে –

সুধীন্দ্র কোনো dispute নেই।

রঞ্জন যাক্ – (মনোমোহনকে) কি বাঁচান যে বেঁচেছেন আপনি জানেন না! (বসে পড়ে) – আজকালকার উকিলদের পাল্লায় পড়লে আপনাকে pauper ক'রে ছেড়ে দিত! আবার আপনাকে বেরিয়ে পড়তে হতো ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে –

চাকর এসে চা-সমেত ট্রে টেবিলে রেখে চলে যায়। অনিলা উঠে মোড়া নিয়ে টেবিলের সামনে বসে চা তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
রঞ্জন ট্রে থেকে একটা বিস্কুট তুলে নেয়।

রঞ্জন বাঃ (অনিলাকে) – এ তো আপনার তৈরি সেই বিখ্যাত বিস্কুট।

অনিলা ও বাবা! বিখ্যাত –

রঞ্জন (বিস্কুট খায়) দারুণ! (সুধীন্দ্রকে) আচ্ছা, এই যে উনি এলেন। এই খবরটা তুই কাগজে দিবি না?

সুধীন্দ্র না, দেব না আর যদি দেখি কোনো সাংবাদিক ঘুনাক্ষরেও টের পেয়েছে তাহলে বুঝব তুইই ফাঁস করেছিস –

রঞ্জন ধ্যুৎ! আমার পেটে বোমা মারলেও একটি কথা বেরোবে না! তবে চোখের সামনে একটা হেডলাইন দেখছিলাম – Return of the prodigal uncle!

মনোমোহন এই Prodigal কথাটার দু'টো অর্থ আছে, জানেন তো মিস্টার রক্ষিত?

রঞ্জন দু-রকম – Prodigal?

মনোমোহন একটা হল wasteful, আর একটা হল repentant – অনুতপ্ত – আমি কিন্তু দু'টোর একটাও নই!

রঞ্জন যাক্ – শুনেও বেশ ভালো লাগল –

এবার ছন্দা মুখ খোলে, তার দৃষ্টি মনোমোহনের দিকে।

ছন্দা আচ্ছা, আমি কি একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি ?

মনোমোহন নিশ্চয়ই –

ছন্দা ইয়ে – মানে, আমরা তো কিছুই জানতাম না – এখানে এসে শুনলাম। আপনি যে এতদিন পরে ফিরলেন, সে কি একা ফিরলেন ?

মনোমোহন আমার তো আর কেউ নেই –

ছন্দা ও, আপনি বুঝি সংসার করেন নি ?

মনোমোহন সংসারের একটা মানে হচ্ছে ঘর – তো ঘরই যখন ছাড়লাম তখন সংসারের কথা আসছে কী ক'রে ?

ছন্দা (অপ্রস্তুত) ও – বুঝলাম – তা তো বটেই !

রঞ্জন আচ্ছা, আপনি প্রায় এক যুগ পর কলকাতায় এলেন – কলকাতা থেকেই তো গেছিলেন ?

মনোমোহন হ্যাঁ।

রঞ্জন অ্যাদ্দিন বাদে এসে শহরটা কিরকম দেখছেন ? আমি কিন্তু পাক্কা ক্যালকেশিয়ান – তবে শহরের নিন্দে শুনে অভ্যস্ত !

মনোমোহন নিন্দে কেন ? নিঃসন্দেহে সভ্য শহর !

রঞ্জন (অবাক) বলছেন ?

মনোমোহন সভ্য নয় ? রাস্তায় এত লোকজন, যানবাহন -- আর চতুর্দিকে মূর্তিমান দম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে highrise-গুলো – আর পঁয়ত্রিশ বছর পরে এখানে ফিরে এসে দেখি, মানুষ টানছে রিক্সা এই contradiction না হলে আর সভ্যতা !

সবাই হাসে।

রঞ্জন আপনি সভ্যতা সম্বন্ধে বেশ bitter মনে হচ্ছে।

মনোমোহন আপনি নিউ ইয়র্ককে কী বলবেন ?

রঞ্জন উরে বাবা ! ও তো জাঁদরেল শহর, অবশ্য বায়োস্কোপে দেখেছি আর কি !

মনোমোহন Main thoroughfare pavement এ ফ্যামিলির পর ফ্যামিলি বসে আছে বেজার মুখ নিয়ে সামনে প্ল্যাকার্ড 'We are homeless' !

রঞ্জন বোঝো ! আপনি কি নিউইয়র্ক থেকেই আসছেন ?

মনোমোহন দক্ষিণ আমেরিকা – ব্রেজিল –

রঞ্জন (বিস্ময় বিমূঢ়) আরেব্বাস্ ! ব্রেজিল ! বলেন কি ?

মনোমোহন (একটু অবাক) কী ব্যাপার ?

সুধীন্দ্র ও বোধহয় পেলের কথা ভাবছে !

মনোমোহন পেলে ?

রঞ্জন পেলে ! – ব্রেজিলে গেছেন, পেলেকে জানেন না ?

মনোমোহন ও হ্যাঁ, ফুটবলার – তাই তো ?

রঞ্জন হ্যাঁ, all time great ! Back kick ক'রে গোল করত !

মনোমোহন দেখুন, মিস্টার রক্ষিত, এই ফুটবলের ব্যাপারে আমার বিদ্যা ভয়ংকরী – মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল, the limit of my knowledge !

সকলে হাসে।

রঞ্জন আপনি জেনে রাখুন, ফুটবল হচ্ছে বাঙালির life blood ! ফুটবল, আর আরেকটা জিনিস – এটা আপনি নিশ্চয়ই বিদেশে miss করেছেন !

মনোমোহন কী জিনিস ?

রঞ্জন সেটা বাঙালির monopoly – বলতে পারেন বাঙালির invention –

মনোমোহন (খানিক ভেবে) রসগোল্লা ?

রঞ্জন আড্ডা ! পার্কে বসে আড্ডা, লেকের ধারে আড্ডা, কফি হাউসে আড্ডা – যেটা না হলে বাঙালির ভাত হজম হয় না ! আড্ডা – Made in Bengal ! –

মনোমোহন Allow me to contradict you, Mr Rakshit – (সোফা থেকে উঠে) আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিস দেশে আখড়া ছিল জানেন ? Gymnasium ?

রঞ্জন ওখানে বুঝি শরীর চর্চার খুব ?

মনোমোহন শুধু শরীর নয় – Juvenal-এর উক্তি তো জানেন – আমরা এখানে স্কুলে থাকতেই পড়েছিলাম – Mens sana incorpore sano –

সুধীন্দ্র A sound mind in a sound body !

মনোমোহন Right – ওখানে শরীর এবং মন দু'টোরই চর্চা হতো। এমন একটা সময় ছিল যখন এ সবটাই হতো Gymnasium-এর মধ্যে – Athens-এর আখড়ায় সে যুগের যারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী – সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যালকিবাইডিস তারা জমায়েত হতো এবং আলোচনাচক্র বসত এবং দর্শন, পলিটিকস্‌, ম্যাথেমেটিক্‌স – এসব

ছিল আলোচনার বিষয় – Dialogue – যা আপনি আজও পড়তে পারেন। একে আপনি কী বলবেন ?

রঞ্জন এ তো একরকম আড্ডাই –

মনোমোহন But at the highest level – পরনিন্দা নয়, পরচর্চা নয় – মুখেন মারিতং জগৎ নয় ! (সোফাতে বসে) অবিশ্যি বাঙালির আড্ডাকে আমি বাতিল করছি না – Productive আড্ডার উদাহরণ এখানেও আছে – কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয় – মানে আমাদের সময় যা হতো এখন তো সবই নিম্নগামী একটা অন্তঃসারশূন্য twaddle ছাড়া কিছু বলা যায় না। বাঙালির আড্ডা যদি তেমন তেমন হতো তো রবীন্দ্রনাথও আড্ডা দিতেন –

রঞ্জন হ্যাঁ, ঠিক কথা ! রবীন্দ্রনাথ তো আড্ডা দেন নি – সুধীন্দ্রর দিকে দেখে) দিয়েছেন কি, সুধীন ? রবিঠাকুর আড্ডা দিয়েছেন ?

সুধীন্দ্র এ প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে মনোমোহনের দিকে দেখে।

সুধীন্দ্র আপনাকে এর আসল পরিচয়টা দেওয়া হয় নি। রঞ্জন রক্ষিত – এবং নাম করা অভিনেতা –

অনিলা Stage – TV Film সব কিছু –

সুধীন্দ্র হুঁ – কমেডিয়ান –

মনোমোহন কমেডিয়ান ?

রঞ্জন কী বলবেন সভ্য না অসভ্য ?

মনোমোহন এখানে হাসির খোরাক পান আপনারা ? আমি আজকের কাগজে শোক সংবাদ ছাড়া কিছুই পেলাম না –

রঞ্জন হাসি মানে ঐ স্যাটায়ার-এর সুযোগটা আছেই। মানে যতদিন আমাদের পলিটিক্সটা আছে আর কি ! ধরুন স্যাটায়ার বলতে আপনি আবার ঐ Aris ··

সুধীন্দ্র Aristotle ?

রঞ্জন না, totle না – totle না –

মনোমোহন Tophanes ?

রঞ্জন আজ্ঞে ?

মনোমোহন Aristophanes ?

রঞ্জন হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ – মানে, ঐ সব ভাববেন না আবার, বুঝলেন ? এখানে ঐ চুটকির মতো আর কি !

মনোমোহন Skit ?

রঞ্জন হ্যাঁ – হ্যাঁ, মানে ধরুন এক ভদ্রলোক – আমি আপনাকে নমুনা

দিচ্ছি এক বাঙালি ভদ্রলোক – অবিশ্যি শেষের 'ই'-টা বাদ দিতে পারেন –

মনোমোহন আমারো কিন্তু শেষের 'ই' বাদ –

রঞ্জন তাই বুঝি ? তা সে তো – এই ধরুন আমি ফরিদপুর (ছন্দাকে দেখিয়ে) এ নেত্রকোণা – (অনিলাকে) আপনি ?

অনিলা যশোর !

রঞ্জন (সুধীন্দ্রকে) আর সুধীন, তুই ?

সুধীন্দ্র বর্ধমান ! –

রঞ্জন ধ্যাৎ, ঘটি ! Any way – এই ভদ্রলোক –

মনোমোহন দাঁড়িয়ে বলুন – দাঁড়িয়ে বলুন !

রঞ্জন উঠে দাঁড়ায়।

রঞ্জন আচ্ছা – এক ভদ্রলোক – তিনি রাইটার্স বিল্ডিং-এ গেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ! তা ঐ ভদ্রলোকের ধারণা কোনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেভেনটি ফাইভ পার্সেন্ট ইংরিজি বলতে পারলে কাজ দেয় বেশি। তো উনি তো ঢুকেছেন – সামনে লিফ্‌ট – পুলিশ দাঁড়িয়ে – পুলিশ বলল, কোথায় যাবেন ?

– I have come to see C.M. –

– C.C.M ? You mean C.P.M ?

– না, না – how can I see P. M. ? P. M. is in Delhi, না ? I want to see C. M.

– Appointment আছে ?

– হ্যাঁ, আলবৎ ! Right now – 4 C. M. – ধ্যাৎ ! কী কয় ! 4 P.M.

– Sorry, C. M.'s left.

– Sorry ? Sorry ক্যান ? I am also left ! এতে Sorry-র কী আছে ?

– C. M. has left for home, বাড়ি গেচেন !

– এইর মইদ্দেই left ?

– Rrright !

মনোমোহন গলা তুলে তারিফ জানিয়ে হাসে।

মনোমোহন Very very good – very good !

মনোমোহন চায়ের কাপটা সামনে টেবিলের উপর রাখে।

মনোমোহন আচ্ছা মিস্টার রক্ষিত, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

রঞ্জন হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—

মনোমোহন আপনারা আমাকে কেমন দেখলেন?

সকলে চুপ। প্রশ্নটা একেবারে অপ্রত্যাশিত।
রঞ্জন হতবাক্, কী বলবে বুঝতে পারে না।
অনিলার মাথা হেঁট।

মনোমোহন আমাকে দেখতেই তো এসেছিলেন আপনারা, তাই না? খবরের কাগজে কী দরকার, টেলিফোনই তো আছে—(অনিলার দিকে চেয়ে) এ জিনিস চেপে রাখাটা খুবই শক্ত, তাই না, মা? নাটকের এত উপাদান—suspense, suspicion, দ্বন্দ্ব—To be or not to be uncle! (রঞ্জনকে) কিছু মনে করলেন না তো, মিস্টার রক্ষিত?

রঞ্জন না, না—বরং অভিনয়টা করতে বেশ একটু ইয়েই লাগছিল··· এখন এই প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গিয়ে···

রঞ্জন সুধীন্দ্রর দিকে দেখে।

সুধীন্দ্র অনেকটা ইয়ে লাগছে!

রাত।
বাবলুর শোবার ঘর।
বাবলু ঘুমোচ্ছে।

মনোমোহনের ঘর।
মনোমোহন ঘুমোচ্ছে।

অনিলার শোবার ঘর।
বাথরুমের ভিতরে সুধীন্দ্র মুখ ধুচ্ছে। সে হঠাৎ হেসে ওঠে। অনিলা খাটে শুয়ে Agatha Christie-র বই পড়ছে।
নেপথ্যে সুধীন্দ্রর হাসি শুনে অবাক হয়ে বাথরুমের দিকে দেখে।

অনিলা কী হল ?

সুধীন্দ্র কোনোরকমে হাসি সংবরণ ক'রে বাথরুম থেকে বেরোয়।

সুধীন্দ্র আমি ভুলতে পারছি না –
অনিলা কী ?
সুধীন্দ্র রঞ্জনের মুখ ! ওকে ওরকম চুপসে যেতে দেখি নি কখনো –

সুধীন্দ্র খাটের উল্টোপাশে নিজের জায়গায় গিয়ে শোয়।
তারপর পিছনের তাক থেকে একটা পত্রিকা নেয়।

সুধীন্দ্র I must say that I'm beginning to like your মামা ! বিদ্যে-বুদ্ধি তো আছেই – ভালো ছাত্র ছিলেন, সেটাও বোঝা যায়। সব চেয়ে যেটা ভালো লাগছে, ভদ্রলোকের রসবোধ। হাসতে জানেন, হাসাতেও জানেন ! (স্বগত) অথচ when you come to think of it – এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমরা এখনো কিছুই জানি না – এই পঁয়ত্রিশ বছর কোথায় কোথায় ছিলেন – কী করেছেন – কেন করেছেন – কিছু না – A big question mark – আশ্চর্য ! (অনিলাকে) – শোনো, your Mama may be an early riser, আমাকে কিন্তু কাল ৯ টার আগে তুলবে না, বুঝেছ ?

অনিলার দিক থেকে কোনো উত্তর নেই। সে হাতের বইটা বুকের উপর রেখে একদৃষ্টে সীলিং-এর দিকে চেয়ে আছে। তার মধ্যে একটা চাপা উদ্বেগের ভাব। সুধীন্দ্র উঠে বসে।

সুধীন্দ্র কী ব্যাপার ? কী ভাবছ ? মিসেস বোস ?

এবারও কোনো উত্তর নেই দেখে সুধীন্দ্র হাতের পত্রিকাটা বালিশের পাশে রেখে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে অনিলার পাশে এসে বসে।

সুধীন্দ্র কী হয়েছে সেটা বলবেন কি ? মাঝ রাত্তিরে স্বামীর কাছে কিছু লুকোতে নেই, সেটা জানেন ? এটা শাস্ত্রের injunction নয়, সুধীন্দ্র বোসের ! Now come on – কী ব্যাপার বল তো ? বল –

অনিলা এবার মুখ তোলে। তার কণ্ঠস্বরে গভীর অনুতাপ।

অনিলা কথাটা কেন মাথায় এল ! কেন কেন কেন ?
সুধীন্দ্র কী কথা ?

অনিলা উঠে বসে।

সে আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। সে যে বেশ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে সেটা বোঝা যায়।

কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর অনিলা তার হেঁট মাথাটা তোলে।

অনিলা একজন নিরুদ্দেশ হলে ক'দ্দিন পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোনো খবর না পেলে ধরে নেওয়া হয় যে সে মারা গেছে?

সুধীন্দ্র সাত বছর –

অনিলা ফিফ্‌টি ফাইভ-এ মামা চলে যান। সিক্সটি এইট পর্যন্ত শীতল-বাবুকে কার্ড পাঠিয়েছেন –

সুধীন্দ্র Carry on –

অনিলা সেভেনটি-তে দাদু মারা যান। মারা যাবার আগে উনি উইল ক'রে গিয়েছিলেন – মা টাকা পান, বড় মামা টাকা পান। ছোট মামাকে দাদু ভীষণ ভালোবাসতেন –

সুধীন্দ্রর চাউনির মধ্যে এবার একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, একটা অবিশ্বাস, admiration, alertness-এর সংমিশ্রণ।

সুধীন্দ্র ও বাবা, এ যে দেখছি মহীয়সী মহিলা! (উঠে পড়ে) তোমার দাদু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য উইল-এ নিশ্চয়ই provide ক'রে গিয়েছিলেন। এই ভাবছ তো তুমি?

অনিলা যদি সেটা করেও থাকে সেটা উনি জানলেন কী ক'রে?

সুধীন্দ্র মামা জানেন কি না-জানেন সেটা পরের কথা – আগে জানতে হবে, তোমার মামার শেয়ার ছিল কিনা!

অনিলা কী ক'রে জানবে?

সুধীন্দ্র কোনো source নেই?

অনিলা জানি না, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না –

সুধীন্দ্র Listen – তোমার দাদুর সেই উকিল বন্ধু, যিনি আমাদের বিয়েতে এসেছিলেন। কানে খাটো – stinking rich – অথচ এক কপি 'সঞ্চয়িতা' দিয়ে খালাস – আরে মনে নেই, আমরা কত হাসা-হাসি করলাম!

অনিলা ত্রিদিব মুখার্জি।

সুধীন্দ্র Right!

অনিলা তার তখনই বয়েস ছিল সত্তরের উপর – এখন তিনি বেঁচে আছেন কিনা তার কি ঠিক –

সুধীন্দ্র থাকতেও তো পারেন—এবং বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি জানেন—

অনিলা কেন কথাটা আমার মাথায় এল—কেন, কেন—!

সুধীন্দ্র তুমি কি আফশোষ করছ?

অনিলা হ্যাঁ, করছি—একশোবার করছি! আমার এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে উনি আমার মামা, আর তিনি আমাকেই দেখতে এসেছেন। এর আর কোনো কারণ হতে পারে না!

সুধীন্দ্র মামা মামা তো বলছ, কিন্তু তুমি কি তাঁকে একবারও মামা বলে ডেকেছ? আমি তো শুনি নি—

অনিলা কেন ডাকি নি জান? এই তুমি! তুমি আমার মনের মধ্যে এমন সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছ এত ইচ্ছা করে 'মামা' বলে ডাকতে—এত চেষ্টা করি—ঠোঁটের গোড়ায় এসেও—

সুধীন্দ্র ভাগ্যিস বেরোয় না!

সুধীন্দ্র আবার খাটে অনিলার সামনে বসে। তার হাতটা ধরে।

সুধীন্দ্র শোনো নিলি, মনটাকে শক্ত কর। বড়ি তেতো হতে পারে এবং সে বড়ি গিলতেও হতে পারে। তার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। তুমি বলছ রক্তের টান—আমি যদি বলি ট্যাঁকে টান পড়েছে? আজকের দিনে অত লম্বা লম্বা পাড়ি কি চাট্টিখানি কথা? আমার মনে হয় উনি ওনার শেয়ার নিতে এসেছেন এবং ওনার আসার আসল কারণ হল সেটাই—

অনিলা ছিঃ!—এত নীচ তুমি, এত ছোট মন তোমার!

সুধীন্দ্র মিসেস বোস, কার মাথায় প্রথম এসেছিল কথাটা?

অনিলা নিজের কোলে রাখা Agatha Christie-র বইটা তুলে দেখায়, তার উপর আঙুল দিয়ে খোঁচা মারে।

অনিলা এই যে যত রাজ্যের crime fiction! (বইটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়)—নইলে একথা আমার মাথাতেও আসত না!

সুধীন্দ্র (হেসে) I've not heard anything funnier or sadder—

সুধীন্দ্র টেলিফোনের সামনে গিয়ে বসে। নিচের তাক থেকে ডিরেকটরিটা বার করতে করতে—

সুধীন্দ্র তোমার মামার শেয়ার না থাকলেই তো নিশ্চিন্ত হও তুমি?

আমাদের কর্তব্য হল সেটাকে verify করা। তেতো হলেও we must find out the truth—(ডিরেকটরি ওলটাতে ওলটাতে) T. C তো? ত্রিদিব চন্দ্র?

অনিলা তোমার কি মাথা খারাপ নাকি? এত রাত্রে তুমি ফোন করবে?

সুধীন্দ্র বল না, TC, না TR—

অনিলা TR—

সুধীন্দ্র ঠিকানাটা?

অনিলা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, নম্বর জানি না।

সুধীন্দ্র (গাইডে খুঁজছে) TR—TR—

সুধীন্দ্র নাম্বারটা পেয়ে ডায়রিটা পাশে রেখে ডায়াল শুরু করে। অনিলা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না—

অনিলা উনি টাকার জন্য আসেন নি—এ বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই। আর শেয়ার থাকলেও উনি তা জানেন না—উনি এসেছেন শুধু মাত্র—

অনিলার কথা শেষ হয় না, কারণ সুধীন্দ্র লাইন পেয়েছে—

সুধীন্দ্র (টেলিফোনে) হ্যালো—ইয়ে মুখার্জি সাহাব কা কোঠি হায়? উকিল মুখার্জি সাহেব?—আচ্ছ, হাঁ—লেকিন জিন্দা হায় না? হাঁ, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক হ্যায়—(ফোন রেখে দেয়,) Alive but not kicking!—

৬

সকাল। ত্রিদিব মুখার্জির বাড়ির বারান্দা।
একটা ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ করা পা মোড়ার উপর তোলা রয়েছে।
ক্যামেরা পিছিয়ে এলে ত্রিদিব মুখার্জি, আর তার পাশের সোফায় বসা সুধীন্দ্রকে দেখা যায়।
বৃদ্ধ উকিলের কোলে একটা কুকুর, আর কানে একটা আদ্যিকালের hearing aid এবং সেটা থাকা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রকে তারস্বরে প্রশ্ন করতে হচ্ছে।

সুধীন্দ্র আমি জানতে চাইছিলাম, মোহিনীবাবুর ওয়ারিশান কে কে ছিলেন?

ত্রিদিব ওয়াশিংটন? কে গিয়েছিল?

সুধীন্দ্র ওয়ারিশান, মানে heirs—

ত্রিদিব ও AIR?

সুধীন্দ্র H-E-I-R-S—

ত্রিদিব Heirs, ওয়ারিশান—

সুধীন্দ্র হ্যাঁ, মোহিনীবাবুর ওয়ারিশান।

ত্রিদিব মোহিনীর ওয়ারিশান ওর তিন সন্তান!

সুধীন্দ্র তিন জনেরই জন্য উনি provide ক'রে গিয়েছিলেন?

ত্রিদিব Bromide?

সুধীন্দ্র Provide—Provision—মোহিনীবাবুর উইলে—

ত্রিদিব হ্যাঁ, হ্যাঁ—ক্ষিতিমোহন পেল, নীলা পেল—তা বেশ ভালোই পেল! ENT বল্‌তে তখন তো একমাত্র মোহিনীমোহনই leading—আমার সঙ্গে আলাপ হয় ওর ঐ চেম্বারে। সেবার দিল্লি গেলাম প্লেনে—jet হয় নি তখনো—তা landing-এর সময় কানটা blocked হয়ে গেল! আরে বাবা সে কিছুতেই খোলে না! কলকাতায় ফিরে এসে মোহিনীর ওখানেই গেলাম। ও তখন খুব rising। নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দিয়ে, তাইতে ফুঁ দিয়ে হাওয়া ঢুকিয়ে—ওঃ—

সুধীন্দ্র অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছে, এবার মওকা পেয়ে আবার প্রশ্ন করে।

সুধীন্দ্র তাঁর ছোট ছেলে—মোহিনীমোহনের—

ত্রিদিব মনু—হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনোমোহন—মনোমোহন—

সুধীন্দ্র তাঁর শেয়ার ছিল কি ?

ত্রিদিব হ্যাঁ, ছিল বৈকি।

সুধীন্দ্র তিনি তো তখন নিরুদ্দেশ !

ত্রিদিব কোন দেশ জানি না বাবা ! তবে হ্যাঁ—বেঁচে আছে এইটুকু জানা ছিল—

সুধীন্দ্র তিনি যে ফিরে এসেছেন, সে খবর জানেন ?

ত্রিদিব না জানি না—

সুধীন্দ্র তিনি এখন শেয়ার পাবেন ?

ত্রিদিব অ্যাঁ, কী ?

সুধীন্দ্র এবার নতুন কায়দা করে। গলায় শব্দ না ক'রে শুধু ফিসফিস ক'রে ঠোঁট নাড়ে।

সুধীন্দ্র তিনি এখন টাকা পাবেন ?

ত্রিদিব হ্যাঁ, পাবে—পাবে না কেন ? টাকা তো আর কর্পূর নয় যে উবে যাবে ! claim করলেই পাবে- তবে হ্যাঁ, তার identity prove করতে হবে—

সুধীন্দ্র পাসপোর্ট চলবে ?

ত্রিদিব চলবে চলবে—

সুধীন্দ্র সে টাকা এখন কোথায় আছে—কার কাছে ?

ত্রিদিব মোহিনী যাকে উইলের executor ক'রে গেছে, তার কাছেই আছে—তার account-এ ব্যাংকে জমা আছে।

সুধীন্দ্র সে কি মোহিনীবাবুর বন্ধুস্থানীয় কেউ ?

ত্রিদিব তা হিন্দুস্থানী হতে পারে। মোহিনীমোহন যখন মারা যায়, তখন আমি সিঙ্গাপুরে আমার মেয়ের কাছে—

দুপুর।

মনোমোহনের শোবার ঘর।

মনোমোহন খাটে বসা। তার সামনে একটা ক্যাসেট রেকর্ডার থেকে অদ্ভুত

সব আওয়াজ বেরোচ্ছে।
বাবলু পাশে মোড়ায় বসে শুনছে।

বাবলু এটা কী?
মনোমোহন জংলীদের বাজনা!
বাবলু তুমি কী ক'রে পেলে এটা?
মনোমোহন ম্যাজিক!

মনোমোহন রেকর্ডারটা off ক'রে দেয়।

বাবলু আমি কিন্তু জেনে গেছি—
মনোমোহন কী?
বাবলু তুমি কে—
মনোমোহন কে বলতো?
বাবলু দাদু।
মনোমোহন আসল, না নকল?
বাবলু আসল—
মনোমোহন কী ক'রে জানলে? আর তো কেউ জানে না!
বাবলু (একটু ভেবে) ম্যাজিক!
মনোমোহন (হাসে) very good ⋯ !
বাবলু এবার থেকে দাদু বলে ডাকব তো?
মনোমোহন আরো ভালো কী হয় জানো?
বাবলু কী?
মনোমোহন ছোট্ দাদু—
বাবলু ছোট্ দাদু?
মনোমোহন হ্যাঁ—মানে আমি তো ছোটার জন্যেই ready! জীবন-টাই তো ছোটাছুটি—এখানে কয়দিন বিশ্রাম ক'রে আবার ছুট!
বাবলু এখানে তোমার ভালো লাগছে না বুঝি?
মনোমোহন যদ্দিন লাগে ভালো, তদ্দিন তো আছিই—
বাবলু (হতাশ) তারপরেই চলে যাবে?
মনোমোহন শোনো, আমি তোমায় একটা কথা শিখিয়ে দিই—খুব মজার কথা—'কূপমণ্ডুক'—কী বললাম?
বাবলু কূপমণ্ডুক—
মনোমোহন হ্যাঁ, 'কূপ' মানে হচ্ছে কুয়ো—আর 'মণ্ডুক' হচ্ছে ব্যাঙ্।

বাবলু কুয়োর মধ্যে ব্যাঙ ?

মনোমোহন হ্যাঁ, ভাবো তো – কী বিশ্রী ব্যাপার ! আলো নেই, বাতাস নেই, দুর্গন্ধ, স্যাঁৎসেতে – তার মধ্যে পড়ে থাকতে হয় সারাটা জীবন। মানুষের মধ্যেও কূপমণ্ডুক আছে – তাদের বলে কুনো। আমি ও রকম নই। তাই তো আমি বারবার বেরিয়ে পড়ি !

বাবলু আমিও যদি বেরোই ?

মনোমোহন বেরোবে বৈকি ! নইলে তুমি আর্মাডিলোর মাংস খাবে কী ক'রে ?

বাবলু কীসের মাংস ?

মনোমোহন আর্মাডিলো, পিঁপড়ে খাওয়া জানোয়ার –

বাবলু কারা খায় ঐ মাংস ?

মনোমোহন হুঁ হুঁ ! সব একেবারে বলে ফেললে দাদুর থলি যে ফুরিয়ে যাবে – সবুর কর, তবে তো মেওয়া ফলবে !

দুপুর। সুধীন্দ্রের শোবার ঘর।
অনিলা বিছানায় বসে জামার বোতাম সেলাই করছে।
সুধীন্দ্র আসে।
অনিলা ঘুরে দেখে স্বামীর দিকে।
সুধীন্দ্র খাটে এলিয়ে পড়ে।

সুধীন্দ্র উফ্, – আমার ফারিংস্-ল্যারিংস্ দুইই গ্যাছে ! একটা মান্ধাতার আমলের hearing aid – তাতে কিছু কাজ হয় না !

অনিলা শেয়ার ?

সুধীন্দ্র ভদ্রলোকের ধারণা শেয়ার আছে তোমার মামার। তবে উনি বললেন তোমার দাদুর মৃত্যুর সময় উনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন। অর্থাৎ তোমার দাদু যদি ছেলের ফেরার কোনো লক্ষণ না দেখে উইল change করেন, তাহলে সেটা ত্রিদিববাবুর জানার কথা নয় –

অনিলা তাহলে তাই হয়েছে এটা আমার আগে strike করে নি। মামার শেয়ার থাকলে আর কেউ না হোক শীতলবাবু নিশ্চয়ই জানতেন, আর তিনি মামাকে জানাতেন। আর মামা এমন একটা ভালো খবর আমাদের কাছ থেকে চেপে রাখতেন ? কক্ষনো না –

সুধীন্দ্র বিছানা থেকে উঠে সিগারেট ধরিয়ে রকিং চেয়ারে বসে ও খাটের উপর পা তুলে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

সুধীন্দ্র Don't be too sure, নিলি –

অনিলা কেন ?

সুধীন্দ্র যে লোকের হাত খোলা নয়, সেই লোক মনের দিক দিয়ে চাপা হলেও আশ্চর্য হব না !

অনিলা হাত খোলা নয় মানে ?

সুধীন্দ্র পঁয়ত্রিশ বছর পরে আপন ভাগনিকে দেখতে যে লোক খালি হাতে আসতে পারে সে আর যাই হোক, মুক্তহস্ত নয় –

অনিলা হঠাৎ আলমারির দিকে যায়। কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে উপরের তাকের পিছন দিক থেকে ব্রোঞ্জ মূর্তি দু'টো বার করে।

সুধীন্দ্র কী ব্যাপার ?

অনিলা উনি আর যাই হোন – চোর নয় –

আলমারি বন্ধ ক'রে অনিলা মূর্তি দু'টো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
সুধীন্দ্র মুচকি হেসে মাথা নাড়ে।

৭

রাত। বসার ঘর।
মনোমোহন বুক শেল্‌ফ-এর উপরে রাখা ব্রোঞ্জের দু'টো মূর্তির মধ্যে একটা তুলে নিয়ে দেখে।

মনোমোহন বাঃ ! –

এবারে মনোমোহন দ্বিতীয় ব্রোঞ্জের মূর্তিটাও হাতে নেয়।

মনোমোহন এটা কি কালকে ছিল এখানে ?

অনিলা ও সুধীন্দ্রতে দৃষ্টি বিনিময় হয়।

অনিলা (অপ্রস্তুত) না – মানে ওটা অন্য জায়গায় ··

মনোমোহন পাল ব্রোঞ্জ – (পাশে রাখা অন্য জিনিসগুলো দেখতে দেখতে) আইভরি ···এসব তোমার collection বুঝি, সুধীন ?

সুধীন্দ্র আজ্ঞে না – বাবার –

ডিভানের উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো কাপড়ে ঢাকা একটা বাদ্যযন্ত্র। সেটাকে মনোমোহন লক্ষ করে।

মনোমোহন ঐ যন্ত্রটা কালকে দেখেছিলাম। ওটা কি সেতার, না তানপুরা ?

অনিলা তানপুরা –

মনোমোহন তুমি গান গাও বুঝি ?

অনিলা ঐ আর কি –

এবার সুধীন্দ্রের বন্ধু পৃথ্বীশকে অন্য একটি সোফায় বসে থাকতে দেখা যায়।

পৃথ্বীশ উনি শুধু গান করেন না, নাচেনও –

মনোমোহন একটা সোফায় বসে। চা পান চলছে।

মনোমোহন নাচটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে – তবে গানটা মন্দ হতো না. গাইবে নাকি মা ? সেই দেশ ছাড়ার পর বাংলা গান শুনি নি –

অনিলা আপনাদের চা খাওয়া হোক। তারপর গাইব –

পৃথ্বীশ বাবলুকে দেখছি না ?

সুধীন্দ্র ওর বন্ধুর বাড়িতে পুজো – কাছেই – সন্ধেবেলাটা সেখানেই কাটায়।

মনোমোহন ভালো কথা – তোমরা যদি সিগারেট খেতে চাও দ্বিধা কোরো না। আমি গুরু-টুরু মানি না। তোমরা যদি আমাকে গুরুজন বলে না মানো তা সেটা কোনো গুরুতর অপরাধ হবে না –

সুধীন্দ্র পৃথ্বীশ পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদুহাস্য করে, কেউই সিগারেট বার করে না।

পৃথ্বীশ (মনোমোহনকে) আপনি কি পুজোর কথা মনে করেই এ সময়ে এলেন ?

মনোমোহন পুজো যে এসে গেছে তাই জানতাম না—আচ্ছা, (সুধীন্দ্রকে) দুর্গা মহিষাসুরকে ক'বার বধ করেছিলেন জানো ?

সুধীন্দ্র ক'বার ? একবার বলেই তো জানি !

মনোমোহন তিনটে আঙুল তুলে দেখায় ।

মনোমোহন Three times ! আচ্ছা, গণেশের মুখ কেন হস্তীর হল নিশ্চয়ই জানো ?

সুধীন্দ্র (হেসে) জানতাম—ভুলে গেছি—

মনোমোহন আমি দিদিমার দৌলতে ছেলেবেলাতেই এত পৌরাণিক কাহিনী জেনে গেছি যে এখনো ভুলি নি—

পৃথ্বীশ দেশের হালচাল কেমন বুঝছেন ? কাগজ পড়ছেন ?

মনোমোহন Caste, Religion—দু'টোই খুব গোলমেলে জিনিস। কাগজ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে !

পৃথ্বীশ আপনি ধর্ম মানেন না ?

মনোমোহন ধর্ম means religion· হিন্দু শাস্ত্রে কিন্তু ধর্ম অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মানে—

পৃথ্বীশ (একটু অসহিষ্ণু) আমি religion mean করছি—

মনোমোহন আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দিচ্ছি—আপনাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে ?

পৃথ্বীশ হ্যাঁ, হ্যাঁ—

মনোমোহন Ready, মা ?

অনিলা হ্যাঁ।

মনোমোহন Silence ! Sil vous plait !

অনিলা এতক্ষণ তানপুরা tune করছিল, এবার সে গান ধরে।

অনিলা

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন-'পরে।
প্রভাতকমলসম ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে।
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পুরি।
কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ,

পরাণের আবরণ মোচন করে।
লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে।

গান শেষ হয়। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর—

মনোমোহন আঃ, অপূর্ব!—দিদির কথা মনে পড়ে যায়।

কাজের লোক এসে টেবিল থেকে চায়ের সরঞ্জাম তুলে নিয়ে যায়। মনোমোহনের ঘোর যেন হঠাৎ কেটে যায়। পৃথ্বীশের দিকে দেখে।

মনোমোহন হ্যাঁ, কী যেন প্রশ্ন ছিল?

পৃথ্বীশ আপনি religion মানেন কিনা—

মনোমোহন Oh, yes…religion—religion—আমি—লোকটা জানেন মিঃ সেনগুপ্ত, একটু orthodox!

পৃথ্বীশ সে তো ভালো কথা—

মনোমোহন যে জিনিস মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে—আমি তাকে মানি না। Religion এটা করে, আর organised religion তো বটেই। সে একই কারণে আমি জাতও মানি না—

পৃথ্বীশ ঈশ্বর?

মনোমোহন একবার পৃথ্বীশের দিকে তাকায় ও তারপর কপালে হাত রেখে গান ধরে—

মনোমোহন 'অন্ধজনে দেহ আলো
মৃতজনে দেহ প্রাণ—'

সকলে কিছুক্ষণ চুপ। তারপর—

মনোমোহন কে দেবে আলো, কে দেবে প্রাণ? মুশকিলটা কী জানেন মিঃ সেনগুপ্ত—আজকালকার দিনে সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরে বিশ্বাস রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে! দৈনিক পত্রিকা—দৈনিক—প্রতিদিন সে বিশ্বাসে আঘাত হানে! কী করবেন বলুন—

পৃথ্বীশ হুঁ—true enough—এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু What about science? Voyager Neptune-এর

ছবি পাঠিয়েছে, একে আপনি কী বলবেন ?

মনোমোহন আমার মত শুনে কী হবে ? For a change আপনার মতটা কী শুনি না !

পৃথ্বীশ নতুন কিছু না—ঐ আর পাঁচটা শিক্ষিত লোকে যা বলে তাই—

মনোমোহন And what is that ?

পৃথ্বীশ Technology-র অভাবনীয় progress—কিছুদিন আগে পর্যন্ত যা স্বপ্নেও ভাবা যেত না—A big feather in the cap of NASA—

মনোমোহন NASA—

পৃথ্বীশ হ্যাঁ, NASA—

মনোমোহন আর তার পাশেই নেশা ! Hypodermic syringe দিয়ে নিজের দেহে ভয়ংকর মাদক রস চালান দিয়ে শমনকে সমন জারি করছে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ, আর অধিকাংশই তরুণ ! একে রোধ করবে কোন Technology মিঃ সেনগুপ্ত ?

পৃথ্বীশ হুঁ, তা আপনি তো এতদিন পশ্চিমেই কাটিয়েছেন ?

মনোমোহন কাটিয়েছি।

পৃথ্বীশ কেন ? সেখানে তো Technology-র রাজত্ব—সেটা যদি আপনাকে এতই পীড়া দেয় তা জঙ্গলে গিয়ে জংলীদের মধ্যে বাস করতে পারতেন—

মনোমোহন সশব্দে হাততালি দিয়ে উঠে পড়ে—তার দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

মনোমোহন ছাখো, ছাখো—clairvoyance ! এ জিনিস তো বিজ্ঞানের আওতায় আসে না !

পৃথ্বীশ আপনি বলতে চান আপনি জংলীদের মধ্যে বাস করেছেন ?

মনোমোহন Nothing but the truth, so help me God !—গৃহত্যাগের পর প্রথম পাঁচ বছর আমি দেশেই কাটাই এবং বন্য পরিবেশে কাটাই। সাঁওতালদের নিয়ে শুরু করার পর ক্রমশ কোল ভীল নাগা মুণ্ডা মুরিয়া মারিয়া ওঁরাও টোডা—কত নাম করব ?

পৃথ্বীশ এই সব উপজাতিদের সঙ্গে আপনি সময় কাটিয়েছেন ?

মনোমোহন আপনি কখনো ইঁদুরের মাংস খেয়েছেন ? Field rat ? সাপের মাংস ? বাদুরের মাস ? (অনিলাকে) মা, আমি বলেছিলাম না আমি সর্বভুক। সেটা কিন্তু কোনো figure of speech নয়—সর্বৈব সত্য—

পৃথ্বীশ তা এই পাঁচ বছরে আপনি বিশেষ উপার্জন করেছিলেন বলে তো মনে হয় না –

মনোমোহন On the contrary – আমার শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

পৃথ্বীশ একদৃষ্টে মনোমোহনের দিকে চেয়ে থাকে।

মনোমোহন আপনি ভাবছেন যে সম্বলটা কোত্থেকে এল – তাই তো ?

পৃথ্বীশ আপনার বাবা নিশ্চয়ই এই গৃহত্যাগের ব্যাপারটা sponsor করেন নি।

মনোমোহন Strange notion। (সোফায় বসে) অসল কথাটা বলি, শুনুন – আমার দিদিমা – the late গিরিবালা দাসী, যাঁর কথা একটু আগেই বলেছিলাম – তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন – এমন কি spoil করতেন বললেও ভুল হবে না – তা আমি ম্যাট্রিকে প্রথম হই, ইণ্টারমিডিয়েটেও প্রথম হই – তারপর যখন বি.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাই তখন সেই দিদিমা আমার হাতে একটা lump sum তুলে দিয়ে বলেন : 'বাছা, তুমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ – ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।' – Three thousand rupees – সে যুগে চাট্টিখানেক কথা ছিল না। সুতরাং আমার নিজের পুঁজি নিয়েই গৃহত্যাগ করি – প্রয়োজনে আমাকে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয় নি !

পৃথ্বীশ বুঝলাম। তা সেই সম্বল তো বললেন ফুরিয়ে গেল। এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে – Who paid for your trips abroad ?

মনোমোহন I earned my way – ধর্মাবতার। As a cabin boy – P and O কোম্পানির S. S. Olympia জাহাজের cabin boy – !

পৃথ্বীশ তারপর ? লণ্ডনে পৌছে ?

মনোমোহন বছর পাঁচেক – শুধু লণ্ডনে নয়, ইয়োরোপের বিভিন্ন শহরে --

পৃথ্বীশ কী ? কী করেন ?

মনোমোহন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে struggle ! – বাঙালির অতি প্রিয় শব্দ। আমি অবশ্য ওটাকে struggle বলি না – আমি বলি মগজের

পুষ্টি – মাংসপেশীর পুষ্টি ! আর মানুষ চেনার প্রথম পদক্ষেপ –

পৃথ্বীশ তারপর আবার জঙ্গলে ফিরলেন কবে ? এ সবই তো মনে হচ্ছে শহরের ঘটনা – সভ্য শহর –

মনোমোহনের মুখে দুষ্ট হাসি দেখা দেয়। সে হঠাৎ আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে উঠে পড়ে পাকা গায়কের গলায় দু-লাইন কীর্তন গেয়ে দেয় –

মনোমোহন 'রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং,
রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং,
মম গচ্ছং মথুরায় –'

পৃথ্বীশের ধৈর্যচ্যুতি হয়, সে বিরক্তভাবে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার ক'রে সশব্দে সামনের টেবিলের উপর রাখে।
মনোমোহন পৃথ্বীশের দিকে এগিয়ে আসে।

মনোমোহন My আত্মজীবনী won't get you much nearer the truth, my friend ! আপনি তো পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আদত মানুষটার নাগাল পেতে চাইছেন ? সেটা অত সহজ হবে না ! তবু for the sake of record আমি জানিয়ে রাখি, তখন আমি পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছি – ফলে কিঞ্চিৎ bank balance – ফলে ছাত্রাবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় – a degree in Anthropology – তৎপর যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা –

পৃথ্বীশ যুক্তরাষ্ট্র ?

মনোমোহন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র –

পৃথ্বীশ কারণ ?

মনোমোহন Indians –

পৃথ্বীশ কী ? Oh, I see – American Indians ! তা এবারেও কি cabin boy ?

মনোমোহন হেসে ওঠে।

মনোমোহন No, Sir ! কিছু মনে করবেন না – আত্মপ্রচারের মতো হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেখানকার পরীক্ষাতেও আমি যথারীতি প্রথম স্থান অধিকার করি – ফলে struggle করতে হয় নি – একটি বিশিষ্ট Anthropological সংস্থা আমার আমেরিকা ভ্রমণের খরচপত্র বহন করেন। শর্ত ছিল যে আমি আমার অভিজ্ঞতা নিয়মিত

তাদের কাছে লিখে পাঠাব along with photographs। সেই শর্ত আমি পালন ক'রে এসেছি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মিলে তেতাল্লিশটি উপজাতির সান্নিধ্যে বেশ কয়েকটা বছর কাটাই। সেই অভিজ্ঞতাই আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় উন্মেষের প্রধান কারণ।

পৃথ্বীশ এবার অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়ায়।

পৃথ্বীশ ঠিক আছে, let me take over from here–আপনি বসুন, আপনার গলা শুকিয়ে গেছে। আপনি বসুন–

মনোমোহন (বসে পড়ে) জো হুজুর!

পৃথ্বীশ আমি বলছি, আপনি শুনুন–ভুল হলে শুধরে দেবেন–

মনোমোহন As your honour pleases!

পৃথ্বীশ মোদ্দা কথা যেটা দাঁড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এই সব অভিজ্ঞতা থেকে আপনার উপলব্ধি হয়েছে যে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা হচ্ছে একটা বিরাট ভাঁওতা, বন্য সভ্যতা হচ্ছে আসল সভ্যতা। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমি নিজে শহুরে মানুষ হলেও tribal life সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নই–এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পড়াশোনা আমারো আছে–আমি জানি যে ওদের ধর্ম আছে, শিল্প ও সংস্কৃতি, সংগীত ইত্যাদি আছে। কিন্তু–

মনোমোহন Uno momento Signor Sen Gupta! (ওঠে পড়ে এগিয়ে আসে) What is 'ইত্যাদি'? ইত্যাদি বলে কী উহ্য রাখছেন সেটা বলুন এঁদের! নইলে এঁরা আমায় চিনবেন কি ক'রে? বন্য সভ্যতা সম্বন্ধেই বা জানবেন কী ক'রে?

পৃথ্বীশ কী বাদ গেছে সেটা আপনিই বলুন!

মনোমোহন আরে বাপরে! আসল জিনিসটিই তো বাদ! Science! Technology! আপনি শুধু ভাবছেন Neptune-এর কথা, Voyager-এর কথা! আচ্ছা এটা ভাবুন তো–মানুষ নিরালম্ব বর্বর বাঁদুরে অবস্থা থেকে hunting, fishing, agriculture, weaving, pottery–জীবন ধারণের যাবতীয় উপাদান উদ্ভব করতে কী ক'রে শিখল? আরো আছে–architecture! একটা পর্ণকুটিরও স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করে। আপনি Igloo জানেন? এস্কিমোদের বাড়ি? তাতে দু'রকম বরফ ব্যবহার হয় জানেন? এক opaque–অস্বচ্ছ–যা দিয়ে বাড়ির ছাউনি তৈরি হয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে স্বচ্ছ–transparent–যা দিয়ে বাড়ির চতুষ্কোণ জানলা তৈরি হয়।

একে কি বলবেন ? Science নয় ? Technology নয় ?

পৃথ্বীশ থামুন মশাই ! Totem, Taboo, Voodooism, Witch-craft, Mumbo-Jumbo ! আপনি···আপনার ব্যারাম হলে কি ওঝাকে call দেন ?

মনোমোহন তাও দিয়েছি মিঃ সেনগুপ্ত – অনন্যোপায় হয়ে দিয়েছি। ঐ জঙ্গলে আর ডাক্তার কোথায় পাবো বলুন ! (বসে পড়ে) আর সে কী রকম ওঝা জানেন ? পাঁচশো medicinal plants-এর গুণাগুণ তার নখদর্পণে ! সে আমায় সারিয়ে তুলেছিল – এমনিতে call দিই না বটে, যে কারণে এই ঘরের সোফায় বসে আপনাদের সঙ্গে চা বিস্কুট খাচ্ছি, সেই কারণেই দিই না ! (উঠে পড়ে) আপনি একটা সহজ ব্যাপারকে (উত্তেজিত হয়ে) কেন এত জটিল ক'রে ফেলছেন বলুন তো ? আপনি কেন বুঝতে পারছেন না আমি নিজে জংলী নই ! এটা আমার পরম আক্ষেপের বিষয় যে আমি জংলী নই – আমি আলতামিরা গুহাবাসীদের মতন বাইসন আঁকতে পারি না ! কিন্তু উপায় কী বলুন ? ঘর ছাড়ার অনেক আগে আমার মজ্জার মধ্যে ঢুকে গেছে Shakespeare, বঙ্কিম, মাইকেল, Marx, Freud, রবীন্দ্রনাথ ! সেই জন্যেই তো আমার Field note-এর দরকার – আমি নিজে জংলী হলে কি দরকার হতো ? হতো না···

মনোমোহন আবার সোফাতে বসে।

পৃথ্বীশ আপনি তো মুরিয়াদের study করেছেন বললেন, তাই না ?

মনোমোহন হ্যাঁ, করেছি।

পৃথ্বীশ তা তাদের 'ঘটুলে' যা ঘটে – তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যে অবাধ যৌন সম্পর্ক – (অনিলাকে) sorry বৌদি – (মনোমোহনকে) – সে সম্বন্ধে আপনার Field notes কী বলে ? – সেটা চূড়ান্ত promis-cuity ? নয় ? সেটা কি আপনি সভ্য বলবেন ?

মনোমোহন না – 'যদেতদ্ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম –
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব –'

Holy Wedlock – এটাই হচ্ছে সভ্য !

পৃথ্বীশ একটু আগে তো আপনি নিজেকে সর্বভুক বল্লেন। তা আপনি

মানুষের মাংস খেয়েছেন ?

মনোমোহন সে সৌভাগ্য আমার হয় নি --

পৃথ্বীশ সৌভাগ্য !

মনোমোহন শুনেছি নরমাংস খুব সুস্বাদু - কিন্তু আমি খাই নি (অনিলাকে) সর্বভুক বলাটা মিথ্যে বলা হয়ে গেছে মা, অপরাধ নিও না

পৃথ্বীশ এই cannibalism-কে আপনি সভ্যতার কোন স্তরে ফেলবেন ?

মনোমোহন সভ্য ? সভ্য কোথায় ? বর্বর - Barbaric ! -- সভ্য কে জানেন ? সভ্য হচ্ছে সেই মানুষ, আঙুলের একটি চাপে, একটি বোতাম টিপে, একটি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে, সমস্ত অধিবাসী সমেত একটা গোটা শহর নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে ! আর সভ্য কারা জানেন ? যারা এই অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে -- without turning a hair !

পৃথ্বীশ Any way, Mr Mr···

মনোমোহন কী ? Mr Sen Gupta ? পদবীতে এসে হোঁচট খেলেন তো ? আরে তা তো হবেই ! মিত্র বলবেন কী ক'রে ? সত্য না মিথ্যা তাই তো জানা হল না -- তা এক কাজ করুন - আমার একটা ছদ্মনাম আছে, যে নামে আমি লিখতাম - আমার ছেলেবেলার অতি প্রিয় নাম - Nemo - আপনি সেইটে ব্যবহার করতে পারেন ।

সুধীন্দ্র Jules Verne ? Captain Nemo ?

মনোমোহন হ্যাঁ, Latin word - Nemo - মানে, No one - আমার উপযুক্ত নাম, কী বলেন ?

পৃথ্বীশের মুখ গম্ভীর, থমথমে ।

পৃথ্বীশ আপনি No one, না Some one, সেটাই তো প্রশ্ন। আপনি আমার এই বন্ধু এবং তার স্ত্রীকে কী সমস্যায় ফেলেছেন তা জানেন ? আপনি এদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন - সেটা জানেন আপনি ? নেহাৎ এঁরা অত্যন্ত ভদ্র, তাই এদের আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি রাখছে না। কিন্তু আপনি guest হিসেবে welcome, না unwelcome, সেটাই তো বুঝতে দিচ্ছেন না ! আপনি বলছেন আপনার passport proves nothing - কিন্তু সেটা যে জাল কি না-জাল সেটা তো আপনি নিজেই জানেন ! তাহলে আপনি

সেটা খোলাখুলি ওদের বলছেন না কেন – Why ? Look, either come clean, or just clear out –

পৃথ্বীশ তার জায়গায় ফিরে এসে সামনে থেকে সিগারেট আর দেশলাই তুলে নিয়ে একটা সিগারেট মুখে পুরে তাতে সশব্দে অগ্নিসংযোগ ক'রে একটা ভালোরকম টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে।
মনোমোহন তার সামনে সোফায় স্থির হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে, দৃষ্টি নিচে।
পৃথ্বীশ হঠাৎ উঠে পড়ে।

পৃথ্বীশ ঠিক আছে, আমি আসি –

পৃথ্বীশ দরজার দিকে এগোয়। সুধীন্দ্র দ্রুত তার পশ্চাদ্ধাবন করে।
অনিলা বিপন্নভাবে সেদিকে চেয়ে থাকে।

বারান্দা।
পৃথ্বীশের পিছন পিছন সুধীন্দ্র বেরিয়ে আসে।

সুধীন্দ্র শোন শোন শোন –

পৃথ্বীশ থামে।

সুধীন্দ্র এই শেষ হুমকিটার কী প্রয়োজন ছিল ?

পৃথ্বীশ লোকটা ভদ্রসমাজে থাকার উপযুক্ত নয় – তোর বাড়িতে ওর জায়গা হতেই পারে না !

সুধীন্দ্র এর মধ্যে জায়গার প্রশ্ন কোত্থেকে…লোকটা তো আর কয়েকদিন বাদে চলেই যেত – আর তুই তো কথা দিয়েছিলি যে ব্যাপারটা তুই সাবধানে handle করবি।

পৃথ্বীশ ওর জানা উচিত where he stands ! তোর বউকে তো আমি চিনি, আর দু'বেলা কী খাওয়াচ্ছে তাও আমি জানি ! Not field rats – ইঁদুরের মাংস নয় নিশ্চয়ই ! ধমকে না দিলে ও এখানে আঠার মতো লেপ্‌টে থাকত – eating you out of house and home ! এসব পরাশ্রয়ী জীবকে তুই চিনিস না, আমি চিনি ! Good night !

পৃথ্বীশ গটগটিয়ে চলে যায়।

বসার ঘর।
সুধীন্দ্র ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢোকে, তার মাথা হেঁট। অনিলাও কারো দিকে চাইতে পারছে না।
মনোমোহন নীরব, গম্ভীর।
সুধীন্দ্র তার দিকে দেখে।

সুধীন্দ্র আমি যে কী বলে আপনাকে–

সুধীন্দ্র আর বলতে পারে না, কারণ মনোমোহন বাঁ হাত তুলে তার কথা থামিয়ে দিয়েছে।

৮

সুধীন্দ্রর শোবার ঘর। অনেক রাত।
সুধীন্দ্র ও অনিলা দু'জনেই খাটে বসে আছে।
দু'জনের গলার স্বরেই অনুতাপের সুর।

অনিলা আমার ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মিশে যাই। খাবার টেবিলে পর্যন্ত উনি একটি কথাও বললেন না–

সুধীন্দ্র I'm really sorry, নিলি– পৃথ্বীশ যে এরকম একটা কাণ্ড ক'রে বসবে জানলে ওকে আমি কখনোই আসতে বলতাম না–

অনিলা উনি চিঠিতে আমাদের আতিথেয়তার Tradition-এর কথা লিখেছিলেন। আর এই কি তার নমুনা? এখন আমাদের যা করা উচিত সেটা হচ্ছে এই অপমানের ফলে উনি যে দুঃখটা পেলেন সেটা ওঁর মন থেকে দূর ক'রে দেওয়া।

সুধীন্দ্র একটা কথা বলব তোমায়?

অনিলা কী?

সুধীন্দ্র তুমি কি ভাবতে পেরেছিলে উনি ওঁর জীবনের অর্ধেকটা এই ভাবেই কাটিয়েছেন ?

অনিলা একেবারেই না। অদ্ভুত জীবন, অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—অনেক কিছু নতুন শিখলাম ঠিকই—কিন্তু তার ফলে মানুষটা যেন কেমন দূরে সরে গেল ! মামা হবেন, যাঁকে আপন ক'রে নেওয়া যায়—যার সঙ্গে •আদর চলে, আবদার চলে। কিন্তু ওঁর প্রতি যেটা হয়, সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধা—

সুধীন্দ্র মুশকিল কী জানো. পণ্ডিত হয়ে ভদ্রলোকের মাথাটা খুলেছে ঠিকই—মনটা হয়ত সে পরিমাণে খোলে নি। তুমি তো আর চেষ্টা ক'রে জংলী হতে পারবে না ! তাহলে মামা আপনিই কাছে চলে আসতেন !

অনিলা তা আর হবে না · তবে বাকি ক'টা দিন ওঁর অভিমান আমাদের ভাঙতেই হবে। ওঁর প্রথম পরিচয় উনি আমাদের অতিথি—ওঁর মনে ব্যথা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়—

সুধীন্দ্র তুমি কিন্তু ওঁকে মামা বলে ডাকতে পারো। আমার আপত্তি নেই—

অনিলা সেটা যদি অন্তর থেকে হয় নিশ্চয়ই ডাকব, তবে জোর ক'রে hypocrite হতে পারব না।

মনোমোহনের ঘর। সকাল।
অনিলা ঘরে ঢুকেই হতবাক।

অনিলা (স্বগত) এ কী ?

ঘর খালি, আলমারি খোলা, খাটের তলায় সুটকেসটাও নেই।
অনিলা টেবিল থেকে চাবিটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

সুধীন্দ্রর শোবার ঘর।
সুধীন্দ্র এখোনো ঘুমোচ্ছে। অনিলা এসে তাকে ঝাঁকানি দেয়।

অনিলা এই শুনছ ?

সুধীন্দ্রর ঘুম ভাঙে।

সুধীন্দ্র উঁ ? কী ?

অনিলা উনি নেই, ঘর খালি !

বাবলু নামে। শীতলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বাগান পেরিয়ে দলটার দিকে এগিয়ে যান।

শীতল এসো মা, এসো – (প্রণাম-পর্ব শেষ হয়) থাক থাক – (বাবলুকে) দাদু ভালো আছো তো ?

বাবলু হ্যাঁ –

সুধীন্দ্র উনি আসেন নি ?

শীতল এসেছে তো – ট্রেন তো প্রায় এক ঘণ্টা হল এসে গেছে –

সুধীন্দ্র তা ওঁকে তো দেখছি না ?

শীতল এসো এসো, বলছি – (অনিলাকে) তুমি তো মা ফোনে বললে ও একটু খামখেয়ালি – আমার তো মনে হয় তার চেয়ে বেশ একটু বেশি। এসো এসো –

সবাই এসে বারান্দায় চেয়ারে বসে।

শীতল ওকে তো সেই পঞ্চান্নয় দেখেছি। ওকে কোলে ক'রে নিয়ে চিড়িয়াখানা ঘুরিয়ে দেখিয়েছি –

সুধীন্দ্র তা উনি গেলেন কোথায় ?

শীতল আরে বাবা, সে লোক তো সকাল থেকে কিছু খায় নি ! বললুম, অন্তত দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও – 'না খাবো না' – এক পেয়ালা চা ? 'না খাবো না' ! তবে আসা কেন বাপু ! অ্যাদ্দিন বাদে দেখা, কেবল একটা cold monetary transaction ? নাকি সেটারও দরকার নেই ?

সুধীন্দ্র তাতে কী বললেন উনি ?

শীতল বললে, না তা দরকার আছে – আমি তো এখানে ক'টা দিন আছি, এখান থেকে কলকাতা ফিরেই প্লেন ধরব – তাই তাড়া নেই। আর এমনিতেও আজ রোববার, ব্যাংক বন্ধ। কাল সকালের আগে কিছু হতোও না –

সুধীন্দ্র উনি তাহলে এখন…

শীতল এর আগে শান্তিনিকেতনে এসেছ ?

অনিলা আমি এসেছি – বিয়ের আগে – তিনবার –

শীতল কাছেই একটা সাঁওতাল গ্রাম – নাম বনের পুকুর – সেখানেই গেছে। বললে দেশ ছাড়ার আগে সেখানে নাকি কিছুদিন ছিল। সেখানে যে কী special attraction আছে, আমি তো মা কিছুই বুঝলাম না ! তা অ্যাদ্দিন বাদে এলে, এত দেশ দেখলে, দু'দণ্ড বসে

যে আমার সঙ্গে কথা কইবে তা···আর সব চেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো? পেন্নাম করার আগে—বুঝে গ্যাখো, পেন্নাম করার আগে পকেট থেকে পাসপোর্ট বার ক'রে আমাকে দেখালো যে সেই-ই মনোমোহন মিত্তির!

তিনি হেসে ওঠেন।

সুধীন্দ্র তা ওঁর সন্ধানেই যখন এসেছি—একবার খোঁজ ক'রে দেখি ওঁকে পাই কিনা···

চারজনে উঠে পরে।

শীতল তাই যাও—পেলে বগলদাবা ক'রে নিয়ে এসো একেবারে—

সুধীন্দ্র তাই করব—

সুধীন্দ্ররা এগোতে যাবে, এমন সময় শীতলাকান্ত সুধীন্দ্রর কাঁধে হাত রাখেন।

শীতল ভালো কথা, ওর মাথার কোনো ব্যামো ট্যামো—

সুধীন্দ্র না—না—

শীতল আমি এতগুলো টাকা যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছি বিশ বছর—পাঁচ লাখ! এখন কত এসে দাঁড়িয়েছে বুঝে গ্যাখো—তাই—

সুধীন্দ্র না, না—আপনি চিন্তা করবেন না—ওঁর মাথা একদম পরিষ্কার (অনিলা-বাবলুকে) চলো—

বনের পুকুর গ্রাম। দুপুর।

শান্ত গ্রামের পরিবেশ। বটগাছের ঝুরি ধরে ছোট ছোট সাঁওতাল বালকরা দোল খাচ্ছে।

একটা খড়ের গাদার নিচে দেখা যায় মনোমোহন হেলান দিয়ে বসে হাড়িয়া খাচ্ছে।

দূরে মোটরের আওয়াজ পেয়ে মনোমোহন মুখ তোলে।

তারপর সে উল্টোদিকে তাকায়—কিছু দূরে একটি সাঁওতাল মেয়ে টিউবওয়েল পাম্প ক'রে জল তুলছিল। মনোমোহন তাকে ডাকে—

মনোমোহন (সাঁওতালি ভাষায়) এ হো—(মেয়েটি তাকায়) হানে হানা পারকম নস্তে এগুইমে বিলমে তেরা হুড়কো দড়ুপ আঃ—

মনোমোহন খাটিয়া আনতে বলেছে, তাই মেয়েটি তা আনতে যায়।

শালবন।
বাবলু, সুধীন্দ্র ও অনিলা হেঁটে আসে।
বাবলুই প্রথম দাদুকে দেখতে পায়।

বাবলু ঐ যে—! ঐ যে দাদু!—

তিনজনই তার দিকে এগিয়ে যায়।
সাঁওতাল মেয়েটি খাটিয়া এনে মনোমোহনের সামনে পেতে দিয়ে যায়।
সুধীন্দ্র, অনিলা ও বাবলু এসে মনোমোহনের সামনে দাঁড়ায়।

মনোমোহন এসো—বসো—
অনিলা এ আপনি কী করলেন? বলা নেই—কওয়া নেই···
মনোমোহন মনটা বড় অস্থির হয়েছিল।
সুধীন্দ্র আমি—কাল রাত্রের ঘটনায়—অত্যন্ত অনুতপ্ত—
মনোমোহন আসলে কী জানো? আমি তো সহজ সরল মানুষদের সঙ্গে মিশে অভ্যস্ত—কেউ মাতব্বরি করছে দেখলে নিজেকে সামলাতে পারি না—
অনিলা আপনার তো কিছু খাওয়াও হয় নি সেই সকাল থেকে—আমরা কিন্তু আপনাকে নিতে এসেছি! চলুন—
মনোমোহন এখন যাবো না—একবেলা উপোসে কোনো ক্ষতি হয় না। আজ বিকেলে এখানে নাচ আছে—আমি ব্যবস্থা করেছি। সেই নাচ দেখে তবে যাবো। তোমরাও দেখবে—ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী হচ্ছে কোল উপজাতি। সাঁওতালরা ওদেরই সমগোত্রীয়। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ওরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল—
অনিলা আপনি এখান থেকে কলকাতায় ফিরবেন তো? আমাদের বাড়ি?
মনোমোহন তোমরা যখন এসেছ, নিশ্চয়ই ফিরবো। তবে আজ নয়—কাল বিকেলে, ট্রেনে—কাল সকালে এখানে একটা কাজ আছে—
সুধীন্দ্র আপনার তো একটা প্রাপ্তি আছে, তাই না?
মনোমোহন আছে—
অনিলা আপনি এরকম একটা সুখবর আমাদের দেন নি?
মনোমোহন (দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে) তার কারণ ছিল—আমার মনে

হয়েছিল, বাপের প্রতি কোনো কর্তব্যই যখন করি নি তখন তাঁর সম্পত্তির অংশে আমার কোনো অধিকার নেই। পরে মনে হল অত-গুলো টাকা — আর বাবা যখন স্নেহবশত সেটা আমাকেই দিয়ে গেছেন — তখন ··

মনোমোহন তাদের দিকে তাকায়। তিনজন এখনো দাঁড়িয়ে —

মনোমোহন দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো, বোসো —

বাবলু, অনিলা, সুধীন্দ্র সামনে পাতা খাটিয়ায় বসে —

মনোমোহন ব্যস্, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নাও ! আর কথা নয় ···

বিকেল। পড়ন্ত রোদ।
নদীর ধারে একটা খোলা জায়গায় সাঁওতালী নাচগান আর মাদলের বাদ্য হচ্ছে।
অন্তত পনের বিশটি মেয়ে পরস্পরের হাত ধরে অর্ধবৃত্তাকারে দুলে দুলে নাচছে আর গাইছে।
মনোমোহন আর বাবলু কাছেই একটা চাটাইয়ের উপর বসে, পাশে অনিলা সুধীন্দ্র দাঁড়িয়ে।
নাচিয়ে মেয়ের দল আর মাদল বাদকদের আমরা বার বার দেখি নানান দৃষ্টি-কোণ থেকে।
আর সেই সঙ্গে দেখি অনিলাকে।
এই নৃত্যগীতের ছন্দ ক্রমে ক্রমে তার দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে, তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠছে।
নাচিয়েদের পা আর দেহের আন্দোলনের সঙ্গে মিলিয়ে অনিলার অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও ছন্দের আবির্ভাব হয়।
মনোমোহনের হাতও তালে তালে উঠছে পড়ছে। সে বাবলুর দিকে তাকায়। বাবলুও অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছে।

মনোমোহন কেমন লাগছে, দাদু ?
বাবলু ভালো —

এবার অনিলার দেহ মৃদু মৃদু দুলতে থাকে — সাঁওতাল মেয়েদের আগুপিছু দোলার সঙ্গে সঙ্গে।
মনোমোহনের ঠোঁটের কোণেও প্রসন্ন হাসি।

অনিলার সমস্ত দেহে নৃত্যের ছন্দ।
সুধীন্দ্র তার স্ত্রীর দিকে দেখে।

সুধীন্দ্র দেখছ কী ? Go and join them !
অনিলা (উদ্ভাসিত) যাই ?–
সুধীন্দ্র যাও–যাও !

অনিলা আর নিজেকে সামলাতে পারে না।
সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে অর্ধবৃত্তের এক প্রান্তে নৃত্যরতা মেয়েটির মুক্ত হাত নিজের হাতে ধরে নিজেকে সম্পূর্ণ নাচের মধ্যে ঢেলে দেয়।
বাবলু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে।
সুধীন্দ্র মনোমোহনের দিকে এগিয়ে যায়। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে গলা তুলে বলে–

সুধীন্দ্র দেখছেন আপনার ভাগনির কাণ্ড ?

মনোমোহন হাত দিয়ে সুধীন্দ্রকে আরো ঝুঁকতে বলে। সুধীন্দ্র তার মুখ মনোমোহনের মুখের কাছে আনে।

মনোমোহন ও আমার ভাগনি কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল –এখন আর নেই–

দু'জনেই হেসে ওঠে।
অনিলা ও সাঁওতাল রমণীদের উত্তাল ভঙ্গির উপর–

FADE OUT

১০

সকাল। মনোমোহনের ঘর।

মনোমোহনের লেবেল-মারা চামড়ার স্যুটকেসটা পরিত্যক্ত অবস্থায় খাটের পাশে মেঝেতে পড়ে আছে। খাটের উপর রাখা একটা নতুন VIP suitcase, অনিলা সেটা গুছিয়ে দিচ্ছে। মনোমোহন, সুধীন্দ্র, বাবলু পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

মনোমোহন স্যুটকেসটা তাহলে memento হিসেবে রেখে দিও— বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল স্যুটকেসটার উপর! তোমরা কেন যে আবার—

অনিলা কোনো কোনো ব্যাপারে সভ্য না হলে চলে না—

মনোমোহন ঠিক আছে, তোমার কথার ওপর তো কথা নেই—

অনিলা কতকগুলো খাতার গুচ্ছ তুলে ধরে।

অনিলা এই এতগুলো খাতা—এগুলো সব লাগবে?

মনোমোহন ওগুলো আমার Field notes মা, যেগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সেগুলো আমি আগেই ফেলে দিয়েছি—

অনিলা (স্যুটকেসে খাতাগুলো রেখে) বেশ—রইল তাহলে—দেবেন excess luggage—আপনার তো এখন লাখ লাখ টাকা—

সুধীন্দ্র আমরা সবাই কিন্তু আপনার সঙ্গে Airport যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম—

মনোমোহন তোমরা প্রস্তুত থাকবে—তারপর গিয়ে শুনবে প্লেন আট ঘণ্টা লেট্, তখন আমি অপ্রস্তুত! I can't allow that—চন্দ্রসূর্য ঘড়ির কাঁটায় ওঠা নামা করে, কিন্তু Airline করে না!—

সকলে হাসে।

অনিলার স্যুটকেস গোছানো হয়ে গেছে। সে দরজার বাইরে দাঁড়ানো চাকরকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে –

অনিলা মধু, স্যুটকেসগুলো নিয়ে যাও –

মধু ও অন্য একজন এসে স্যুটকেস দু'টো নিয়ে যায়। অনিলা এগিয়ে গিয়ে মনোমোহনকে স্যুটকেসের চাবিটা দেয়।

অনিলা স্যুটকেসের চাবিটা –

মনোমোহন সেটা নিয়ে বাবলুর দিকে দেখে।

মনোমোহন সাত্যকিবাবু! – সবুরে মেওয়া ফলে – এই যে মেওয়া! – এই নাও –

মনোমোহন পকেট থেকে একটা ছোট্ট পোড়ামাটির রঙিন পুতুল বার ক'রে বাবলুকে দেয়।
বাবলু হাসিমুখে সেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।

মনোমোহন যারা আর্মাডিলোর মাংস খায় তাদের তৈরি – দেড় হাজার বছর আগে! –
সুধীন্দ্র Thank you বলে দাও –
মনোমোহন No! – ঐ হাসির চেয়ে ভালো Thank you আর হয় না – (অনিলাকে) চলো মা –

চারজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

মনোমোহন ও, একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি। আমি একটা বই লিখেছি – ভ্রমণ কাহিনী বলতে পারো – An Indian Amongst Indians। আমেরিকার একজন প্রকাশক বইটা ছাপছে – তার জন্যে আমাকে, যাকে বলে, handsome advance দিয়েছে –

চারজন সিঁড়ি দিয়ে নামে।

সুধীন্দ্র তার মানে আপনি এখন rich man বলুন!
মনোমোহন হ্যাঁ, তা তো বটেই –
অনিলা চিঠি লিখবেন তো?
মনোমোহন আমার নিজের element-এ গিয়ে পড়লে কী যে করি

বলা যায় না তো, মা –

অনিলা অন্তত একটা পৌঁছ সংবাদ –

মনোমোহন হ্যাঁ, তা দেব।

নিচে এসে মনোমোহন দাঁড়িয়ে পড়ে।

মনোমোহন এখন একটা final কর্তব্য –

মনোমোহন পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার ক'রে সুধীন্দ্রকে দেয়।

সুধীন্দ্র কী ব্যাপার ?

মনোমোহন ইংরেজিতে একটা কথা আছে জানো ? – Floccinaucinihilipilification –

সুধীন্দ্র ও হ্যাঁ, সেই স্কুলে পড়েছিলাম – The longest word in the English dictionary !

মনোমোহন মানে কী জানো ?

সুধীন্দ্র না, সেটা তো ঠিক –

মনোমোহন Setting little or no value – এই বোঝাতেই ২৯টি অক্ষর ! এই না হলে সভ্যতা ?

সুধীন্দ্র খামটা খুলতে যাবে, মনোমোহন বাধা দেয় –

মনোমোহন আমি যাই তারপরে। আমার সামনে কেউ আমার রচনা পড়লে আমার কেমন embarrassed মনে হয়। এটা তোমাদের আতিথেয়তার উদ্দেশ্যে একটি সামান্য message – of little or no value ! (বাবলুর দিকে ঘুরে বাবলুবাবু – এইবার ছোট দাদু দেবে ছুট – !

বাবলু একদৃষ্টে দাদুর দিকে তাকিয়ে, চোখ ছলছল।

বাবলু আর কোনোদিনও আসবে না ?

মনোমোহন – এবার তুমি আসবে আমার কাছে ! আর কোন জিনিসটা কখনো হবে না কথা দিয়েছ ?

বাবলু কূপমণ্ডুক !

মনোমোহন কূপমণ্ডুক ! মনে থাকে যেন ! – (অনিলাকে) মা –

অনিলা আর কান্না চেপে রাখতে পারে না।

অনিলা অনেক অন্যায় করেছি, মামা – ক্ষমা করবেন –

অনিলা মনোমোহনকে প্রণাম ক'রে চোখের জল মোছে।

মনোমোহন তুমি করলে অন্যায়? আমি কি জানি না কী কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম তোমায়? কিন্তু তার কারণ ছিল, মা – এসব পাসপোর্ট থেকে কী জানা যায়? নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নাও, ছবির সঙ্গে মুখ মিলিয়ে নাও – কিন্তু মানুষটাকে তো চেনা যায় না! তার জন্য সময় লাগে – সে সময়টা দরকার ছিল – (সুধীন্দ্রর দিকে দেখে) Well, Mr Bose –

সুধীন্দ্র জংলীদের মধ্যে কি প্রণামের প্রথা আছে?

মনোমোহন তেমন তো শুনি নি –

সুধীন্দ্র তাহলে যদি প্রণাম না ক'রে –

সুধীন্দ্র তার কথা শেষ করার আগেই মনোমোহন তাকে বুকে জাপটে ধরে। কোলাকুলির পর –

মনোমোহন তাহলে আসি –

মনোমোহন সদর দরজার দিকে এগিয়ে যায়।
তিনজনে অনুসরণ করে। মনোমোহন বাইরে দাঁড়ানো সুধীন্দ্রর মারুতি গাড়িতে গিয়ে ওঠে। গাড়ি start দেয়। মনোমোহন হাত নেড়ে বিদায় জানায়।
অনিলা, সুধীন্দ্র ও বাবলুও হাত নাড়ে। গাড়ি চলে যায়।
অনিলা চোখের জল মুছতে মুছতে সিঁড়ির দিকে এগোয়। সুধীন্দ্র হাতে খামটার দিকে দেখে –

সুধীন্দ্র (অনিলাকে) দাঁড়াও – মামা কী লিখেছেন দেখে যাও –

অনিলা সিঁড়ির মুখটায় থেমে স্বামীর দিকে ঘোরে।
সুধীন্দ্র খামটা খুলে ভিতর থেকে পরস্পরের সঙ্গে ক্লিপ করা দু'টো কাগজ বার করে।
প্রথমে উপরের কাগজটা দেখে সুধীন্দ্র।

সুধীন্দ্র কবিতা –

'বুঝে দেখ রক্তের টান
সুভাগিনী ভাগিনিরে
মামা তাঁর ভাগ দিয়ে যান –'

সুধীন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উপরের পাতা উলটিয়ে দ্বিতীয় কাগজটার দিকে চাইতেই তার দৃষ্টি বিস্ফারিত হয় –

সুধীন্দ্র এ কী !

অনিলা এখন সুধীন্দ্রর পাশে। সুধীন্দ্র হতভম্ব ভাব ক'রে কাগজটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয় কাগজটা একটা চেক, যা দেখে অনিলারও দৃষ্টি বিস্ফারিত !

অনিলা আমার নাম, শীতলবাবুর সই ! –

সুধীন্দ্র বুঝতে পারছ না ? উনি ওঁর নিজের শেয়ারটা পুরোটাই তোমার নামে লিখে দিয়ে গেছেন – মিস্টার No one !

দু'জনে পরস্পরের দিকে বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে চায়, তার উপরে –

FREEZE

– চিত্রনাট্যের পাঠ নির্ধারণ ও
উপস্থাপনা : সন্দীপ রায়

আগন্তুক প্রসঙ্গে

১

গণশত্রু (১৯৮৯) ও শাখা-প্রশাখা (১৯৯০) ছবি দু'টির পর চূড়ান্ত শারীরিক অনিশ্চয়তার মধ্যে সত্যজিৎ রায় 'আগন্তুক' ছবির পরিকল্পনা খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রহণ করেন। 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ও পরে 'আরো বারো' গল্প-গ্রন্থে সংকলিত (১৯৮১) নিজের 'অতিথি' গল্পটিকে ভিত্তি করেই এর চিত্রনাট্য গড়ে ওঠে।

চিত্রনাট্যের প্রাথমিক রূপ 'রেকর্ড' সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়—২২.৯.৯০ থেকে ৬.১০.৯০-এর মধ্যে। আপাত হাল্‌কা চালে বলা কাহিনীর মধ্যে অনেক গভীর ও গম্ভীর কথা বলতে চেয়েছিলেন সত্যজিৎ যা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক ভাবনার আংশিক প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে নৃতত্ত্ব বিষয়ে পৃথিবীর কয়েকজন দিক্‌পাল লেখকের বই পড়ছিলেন। এইসব অধ্যয়নের প্রভাব যেমন পরোক্ষভাবে চিত্রনাট্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি কিছুটা আত্মজীবনী ও নিজস্ব উপলব্ধির সংকেতও চিত্রনাট্যে অনেকখানি ছায়া ফেলেছে।

সত্যজিৎ রায়ের সব ছবির মতোই 'আগন্তুক'কে একটি সরল কাহিনী-কথন হিসেবে যেমন দেখা যায়, তেমনি মনস্তত্ত্ব ও সভ্যতার ধারায় মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থান বিশ্লেষণের প্রয়াস হিসেবেও ছবিটিকে বিচার করা চলে। গণশত্রু ও শাখা-প্রশাখা চিত্রদ্বয়ের পরে 'আগন্তুক' তৈরি হওয়ার পর কেউ কেউ মনে করেছেন এখানে সত্যজিৎ রায়ের আর এক 'ত্রয়ী' চিত্রমালা (Trilogy) প্রস্তুত হয়ে গেছে—যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ, সমাজ ও মনুষ্যত্ব এবং সভ্যতা ও মানুষ—এই পর্যায়ক্রমে কাহিনী ও বক্তব্য ক্রমপ্রসারিত হয়েছে। আলাদা ক'রে ভাবলেও 'আগন্তুক'-এর বিষয়বস্তু নিয়ে কাহিনী-চিত্র তৈরির কোনো নজির সিনেমার ইতিহাসে নেই।

২

'আগন্তুক' ছবির শুটিং শুরু হয় ২২ নভেম্বর ১৯৯০-এ—কলকাতা ময়দানে আউটডোর শুটিং দিয়ে। ২৬ নভেম্বর ইন্দ্রপুরী স্টুডিও-য় প্রথম ইনডোর শুটিং আরম্ভ হয়। মাঝে মাঝে বাদ থাকলেও ১৬ জানুয়ারি ১৯৯১ পর্যন্ত মোটামুটি ধারাবাহিক শুটিং হওয়ার পর কলকাতার বাইরে শান্তিনিকেতনে আউটডোর শুটিং করতে সত্যজিৎ সদলে যান ১৯ জানুয়ারি এবং ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত সেখানে শুটিং করেন।

এর মধ্যে সম্পাদনার কাজ কিছুটা এগিয়েছিল এবং আরো কিছু আউটডোর কলকাতার মধ্যে হয়েছিল। ২৭ মার্চ ১৯৯১-তে এইচ-এম-ভি স্টুডিওতে ছবির আবহ সংগীত রেকর্ডিং হয়। তার আগে—নভেম্বরের শেষ দিকে—সত্যজিৎ নিজের গলায় কয়েক লাইন গান রেকর্ড করেন, যা উৎপল দত্ত-র কণ্ঠে শোনা গেছে। রবীন্দ্র-সংগীতটি শ্রমণা গুহঠাকুরতার কণ্ঠে গৃহীত হয়েছিল। এবারে রি-রেকর্ডিং-এর কাজের জন্য তিনি সদলে বম্বে রওনা হন ১৩ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখে এবং ১৫ তারিখে বম্বের রাজকমল স্টুডিও-তে ছবির রি-রেকর্ডিং শেষ হয়।

অতঃপর মাদ্রাজ থেকে ছবির প্রিণ্ট এসে পৌঁছালে 'আগন্তুক'-এর প্রথম প্রদর্শনী নন্দন প্রেক্ষাগৃহে ২৬ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখ শুধু আমন্ত্রিত দর্শকদের জন্য করা হয় এবং পরবর্তী প্রদর্শনী হয় ৬ মে।

৩

ইতিমধ্যে 'আগন্তুক' নিয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-জগতে - যথারীতি সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির মতোই – বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। বার্লিনে 'ভারত-উৎসব' অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী হিসাবে ১৯৯১-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ছবিটি প্রদর্শিত হয়।

Venice Film Festival-এ প্রতিযোগিতার বাইরে প্রদর্শিত হয়ে 'আগন্তুক' সমালোচক ও দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করে। এই উৎসবে ছবিটি সমালোচকদের বিশেষ পুরস্কার (FIPRESCI) লাভ করে। এ-বিষয়ে ভারতের সংবাদপত্রে ১৮. ৯. ৯১ তারিখে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

Tokyo Film Festival-এ 'আগন্তুক' দেখানো হয় ৩০. ৯. ৯১ তারিখে। এখানে সত্যজিৎ রায় লাভ করেন Life Achievement Award।

London Film Festival-এ 'আগন্তুক' দেখানো হয় ১১ নভেম্বর ১৯৯১ তারিখে—National Film Theatre-এ—একই দিনে দু'বার। এই সব প্রদর্শনীতে দর্শকদের প্রভূত অভিনন্দন লাভ করে ছবিটি।

শাখা-প্রশাখা ছবিটির ফরাসি প্রযোজকরা 'আগন্তুক' ছবির প্রদর্শন স্বত্ব লাভ করায় অক্টোবর ১৯৯২-তে ফ্রান্সে ছবিটি মুক্তিলাভ করে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এ-ছবির ভারতীয় প্রযোজক এন. এফ. ডি. সি ৬০ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ অর্জন করে বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। এই সাফল্যের তথ্যচিত্র ভারতীয় দূরদর্শনে একটি প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হয় (World This Week, Friday, 6. 11. 92)।

ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯২) লাভ করে 'আগন্তুক' বছরের

শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনার কৃতিত্বের জন্য। খবরটি প্রকাশিত হয় ৭ ও ৮ এপ্রিল ১৯৯২-এ।

৪

এসব সত্ত্বেও কলকাতায় 'আগন্তুক' বাণিজ্যিক মুক্তিলাভ করে প্রায় বিনা প্রচারে, কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই, ঘোর বর্ষায় বিপর্যস্ত শহরে ১০ জুলাই ১৯৯২ তারিখে। একান্ত অবহেলার সঙ্গে গোপ মুভিজ-এর পরিবেশনায় কেবল মিনার-বিজলী-ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ছবিটি চালানো হয়। 'সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি', 'জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত' বা 'অন্ধজনে দেহ আলো··গানটি নিজেই গেয়েছেন সত্যজিৎ রায়'–এই জাতীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে ছবিটিকে চালাবার চেষ্টা হয়। বহু দর্শক কিছু জানার আগেই ছবিটি তার আকস্মিক মুক্তির মতোই অকস্মাৎ বিদায় নেয়। এর পরে চ্যাপলিন প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি ২ সপ্তাহ (২. ১০. ৯২ – ১৫. ১০. ৯২ দেখানো হয়।

'আগন্তুক'-এর মুখ্য অভিনেতা উৎপল দত্তের প্রয়াণে দূরদর্শন ছবিটি দেখায় রবিবার ২২. ৮. ৯৩ তারিখে সন্ধ্যায়।

বর্তমানে ছবিটির একটি ভিডিও ক্যাসেট বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

—

আগন্তুক
প্রান্তিকতা ও সংহতি

ছন্দক সেনগুপ্ত

'আগন্তুক' ছবির প্রেরণা হিসেবে সত্যজিৎ রায় অনেক বারই নৃতত্ত্ববিদ ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের নাম করেছেন। তথাকথিত 'আদিম' মানুষের মানস ও মনন পশ্চিমী ধাঁচের না হলেও তার চাইতে নিচুমানের যে নয় এ কথা লেভি-স্ত্রোস অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন বহুবার, বিশেষত তাঁর সুবিখ্যাত দু'টি বই Tristes Tropiques এবং The Savage Mind-এ। এটা, অতি অবশ্যই, 'আগন্তুক' ছবিরও বাণী। লেভি-স্ত্রোসের মতে পৃথিবীর সব মানুষই কয়েকটি 'আইন' মেনে চিন্তা করে, যদিও সেই 'আইন'-এর প্রয়োগপন্থা এক-এক সমাজে এক-এক রকম হতে পারে। এবং প্রয়োগের বৈচিত্র্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভব হয় চিন্তার ফলাফলের প্রভেদ।[১]

'আগন্তুক'-এর চরিত্র ও বক্তব্য বুঝতে গেলে লেভি-স্ত্রোস অথবা তাঁর তত্ত্ব সম্বন্ধে এর চাইতে বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই। অথচ অন্য এক নৃতত্ত্ব-বিদের তত্ত্বের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় থাকলে 'আগন্তুক' ছবি এবং সত্যজিৎ রায়ের শিল্পমানসের বৈশিষ্ট্য অন্য একদিক থেকে বোঝা সহজ হতে পারে।

ভিক্টর টার্নার (১৯২০-৮৩)-এর নাম অনেকেই শুনেছেন। টার্নারের জন্ম ও শিক্ষা ইংল্যাণ্ডে। কর্মজীবন কাটে অবশ্য আমেরিকায়। কর্নেল, শিকাগো ও ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব পড়ান বহু বছর। টার্নারের গবেষণা শুরু হয় কয়েকটি আফ্রিকান উপজাতির আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ দিয়ে। তাঁর যে-সব তত্ত্বের কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব সেগুলি উত্থাপিত হয় এই প্রাথমিক গবেষণাতেই, যদিও শেষ অবধি তারা ছড়িয়ে পরে বিভিন্ন, বিচিত্র ক্ষেত্রে।[২]

বহু উপজাতিক সমাজেই এক বিশেষ ধরনের লোকাচার খুব গুরুত্বপূর্ণ। নৃতত্ত্ববিদ আর্নল্ড ভ্যান গেনেপ (Arnold Van Gennep) এ শতাব্দীর গোড়ায় এ জাতীয় লোকাচারের নাম দিয়েছিলেন rites of passage এবং দেখিয়েছিলেন যে কোনো rite of passage-এর সাধারণত তিনটি স্তর থাকে। প্রথম হল গতানুগতিক জীবন অথবা সামাজিক অবস্থান থেকে অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণকারী ব্যক্তিদের পৃথক্‌করণ। এই পৃথক্‌করণের সঙ্গে-সঙ্গেই অংশগ্রহণকারীরা প্রবেশ করে দ্বিতীয় স্তরে। এই দ্বিতীয় স্তর প্রকৃত অর্থেই মধ্যবর্তী। এক অবস্থা অথবা অবস্থান (ধরা যাক কৈশোর) থেকে অন্যতে (ধরা যাক যৌবনে) প্রবেশ করার আগে এই দ্বিতীয়, মধ্যবর্তী স্তরে কিছুকাল কাটানো এই সব লোকাচারে

আবশ্যক। এই পর্ব সার্থকরূপে সমাপন করবার পরই আসে rite af passage-এর তৃতীয় এবং অন্তিম ধাপ। অংশগ্রহণকারীরা এবার সমাজে পুনঃপ্রবেশ করে, তবে নতুন রূপে, নতুন অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে।

টার্নারের গবেষণায় ভ্যান গেনেপ বর্ণিত দ্বিতীয় স্তরটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরটির সঠিক বাংলা পরিভাষা পাওয়া মুশকিল। ভ্যান গেনেপ এটির নামকরণ করেছিলেন limen—এই লাতিন শব্দটির ইংরেজি করা যায় threshold—কিন্তু বাংলা? 'কিনারা' অথবা 'প্রান্ত' বললে মূল অর্থের অনেকটাই বজায় থাকে, কিন্তু পুরোটা নয়। টার্নারের রচনায় limen অথবা liminal stage অথবা কেবল liminality কথাগুলি ফিরে-ফিরে আসে নানান অনুষঙ্গে। সব সময়ই কিন্তু টার্নার জোর দেন liminality-র পরিবর্তনশীল ও গতিময় প্রকৃতির উপর। এই অর্থটি বাংলায় ধরে রাখা শক্ত। আমি এই প্রবন্ধে liminality-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রান্তিকতা' এবং liminal-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রান্তিক' ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক পরিভাষা তারা কখনোই নয়।

যাই হোক, এই 'প্রান্তিক' স্তরে দৈনন্দিন নিয়ম ও রীতিনীতি সবই মুলতুবি থাকে। প্রান্তিক ব্যক্তির সামাজিক অধিকার অথবা কর্তব্য তার পূর্বের এবং ভবিষ্যতের চাইতে ভিন্ন। এর আগে rite of passage-এর উদাহরণ রূপে কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশের সময়কার অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছি। সেই সব অনুষ্ঠান—যা বহু সমাজেই প্রচলিত—চলাকালীন কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা কিশোর বা যুবক কোনোটাই নয়। একজন কিশোর অথবা একজন যুবকের সমাজে যা অধিকার এবং যা কর্তব্য সেগুলি প্রান্তিক স্তরে অপ্রযোজ্য। কিন্তু এটা ভাবলে ভুল হবে যে প্রান্তিক ব্যক্তিদের কোনো প্রকার নিয়ম মেনে চলবারই প্রয়োজন নেই। তবে সে নিয়ম কেবল প্রান্তিক পর্বেই প্রযোজ্য, তার আগে বা পরে নয়।

তাঁর বিশ্লেষণে ভিক্টর টার্নার প্রান্তিকতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে প্রান্তিক ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো প্রকার শ্রেণীভেদ থাকে না। তাদের মধ্যে বিরাজ করে বিশুদ্ধ সাম্যবাদ ও নিবিড় মৈত্রী। দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ, যেমন সম্পত্তি বা ধনদৌলত, তার কোনো মূল্যই নেই এই পর্বে। অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় থাকা বাধ্যতামূলক। দৈনিক জীবনের আত্মীয়-পরিজন এ সময়ে পর। প্রান্তিকতার সঙ্গে তুলনা করা হয় মৃত্যুর বা জন্মের পূর্বেকার অবস্থার। অদৃশ্যতা অথবা অন্ধকারের অনুষঙ্গও প্রচলিত বহু সমাজে। প্রান্তিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে টার্নার বলেছেন: 'তাদের যেন সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে ফেলে নতুন ক'রে গড়া হয়।'

প্রান্তিক অবস্থায় দৈনন্দিন সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে উদ্ভব হয় এক নতুন চেতনার যার টার্নারের-দেওয়া-নাম হল communitas এবং যার নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ 'সংহতি'। প্রান্তিক ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে যে গভীর মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব বিরাজ করে তা আগেই বলেছি। সামাজিক শ্রেণী-ভেদের অভাব থেকে জন্ম হয় মানুষে-মানুষে নৈকট্য ও সমতার। এরই নাম communitas বা সংহতি।[৩]

টার্নার যদি এখানেই থেমে যেতেন তাহলে তিনি ভ্যান গেনেপের টীকাকার রূপে নৃতত্ত্বের ইতিহাসে স্থান পেতেন। কিন্তু টার্নার ভ্যান গেনেপ বর্ণিত rite of passage-থেকে প্রান্তিকতার মূল ধারণাটি নিয়ে তার প্রয়োগ করেছেন এত রকমের প্রসঙ্গে যে সেটি আজ এক নতুন গুরুত্ব পেয়েছে নৃতত্ত্বের বাইরে সমাজ ও শিল্প-সমালোচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। টার্নারের নিজস্ব রচনা তো বটেই, তাঁর অনুগামীদের প্রয়াসও সমালোচনা-সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই প্রভাবের মূলে টার্নারের বিশ্বাস যে প্রান্তিকতা কেবলমাত্র কতিপয় লোকাচারের অঙ্গ নয়। সব সমাজেই এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই কিছু মানুষ থাকতে বাধ্য যাঁরা প্রায় স্বেচ্ছায়ই অবস্থান করেন সেই সমাজ অথবা সেই ক্ষেত্রের কিনারায়। এই প্রান্তিকতা বহুভাবে প্রকাশ পেতে পারে। দারিদ্র্য ভবঘুরে স্বভাব, স্বেচ্ছাচারী আচরণ, অনৈতিকতা, এমনকি সমাজবিরোধিতা—এ সবই প্রান্তিকতার বিভিন্ন রূপ। কিন্তু এই সব কেন্দ্রচ্যুত ব্যক্তিরা সবাই 'অসফল' বা 'বিপজ্জনক' নয়। সামাজিক প্রথা বিবর্জিত সংহতির স্বপ্ন, সর্বমানবের ভ্রাতৃ-বন্ধনের কামনাও তাঁদের মধ্যে জন্ম নেয় প্রায়শই। এঁরা প্রথাসিদ্ধ নৈতিকতা মেনে চলতে নারাজ ঠিকই, কিন্তু এঁদের অনেকেই মেনে চলেন এক ভিন্ন (এবং হয়তো ঊর্ধ্বতর) নীতি। লোককথা বা সাহিত্যে এ ধরনের চরিত্র প্রায়ই দেখা যায়। বাইবেল-এর 'গুড সামারিটান' ও ডসটয়ভস্কির ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশ-মেণ্টে'র সোনিয়ার উদাহরণ টার্নার নিজেই দিয়েছেন। বাঙালি পাঠক নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের কল্যাণে বহু দেশজ উদাহরণের কথা মনে করতে পারবেন।

সংহতির চিন্তা শুধু ব্যক্তির মধ্যে নয়, দলগত ভাবেও আসতে পারে। এখনো বহু ধর্মগোষ্ঠীর উল্লেখ করা যায়। টার্নার এ ধরনের একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বাংলার বৈষ্ণবরাও আছেন। তা ছাড়াও বাউল গানে টার্নার খুঁজে পেয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত সংহতির বিশুদ্ধ প্রকাশ।[৪]

প্রান্তিকতা ও সংহতির টার্নার বর্ণিত এই বৃহত্তর অর্থ মনে রাখলে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম বিচারে সুবিধা হতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রচিত সত্যজিৎ-শিল্প কোনো একটি তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস নেহাৎই হাস্যকর। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে সত্যজিতের শিল্প-সাহিত্যে প্রান্তিক চরিত্রের আগমন ঘটেছে বারে-বারে। জনৈক সমালোচক একবার

শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনার কৃতিত্বের জন্য। খবরটি প্রকাশিত হয় ৭ ও ৮ এপ্রিল ১৯৯২-এ।

৪

এসব সত্ত্বেও কলকাতায় 'আগন্তুক' বাণিজ্যিক মুক্তিলাভ করে প্রায় বিনা প্রচারে, কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই, ঘোর বর্ষায় বিপর্যস্ত শহরে ১০ জুলাই ১৯৯২ তারিখে। একান্ত অবহেলার সঙ্গে গোপ মুভিজ-এর পরিবেশনায় কেবল মিনার-বিজলী-ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ছবিটি চালানো হয়। 'সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি', 'জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত' বা 'অন্ধজনে দেহ আলো · গানটি নিজেই গেয়েছেন সত্যজিৎ রায়' – এই জাতীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে ছবিটিকে চালাবার চেষ্টা হয়। বহু দর্শক কিছু জানার আগেই ছবিটি তার আকস্মিক মুক্তির মতোই অকস্মাৎ বিদায় নেয়। এর পরে চ্যাপলিন প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি ২ সপ্তাহ (২. ১০. ৯২ – ১৫. ১০. ৯২ দেখানো হয়।

'আগন্তুক'-এর মুখ্য অভিনেতা উৎপল দত্তের প্রয়াণে দূরদর্শন ছবিটি দেখায় রবিবার ২২. ৮. ৯৩ তারিখে সন্ধ্যায়।

বর্তমানে ছবিটির একটি ভিডিও ক্যাসেট বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

—

আগন্তুক

প্রান্তিকতা ও সংহতি

ছন্দক সেনগুপ্ত

'আগন্তুক' ছবির প্রেরণা হিসেবে সত্যজিৎ রায় অনেক বারই নৃতত্ত্ববিদ ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের নাম করেছেন। তথাকথিত 'আদিম' মানুষের মানস ও মনন পশ্চিমী ধাঁচের না হলেও তার চাইতে নিচুমানের যে নয় এ কথা লেভি-স্ত্রোস অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন বহুবার, বিশেষত তাঁর সুবিখ্যাত দু'টি বই Tristes Tropiques এবং The Savage Mind-এ। এটা, অতি অবশ্যই, 'আগন্তুক' ছবিরও বাণী। লেভি-স্ত্রোসের মতে পৃথিবীর সব মানুষই কয়েকটি 'আইন' মেনে চিন্তা করে, যদিও সেই 'আইন'-এর প্রয়োগপন্থা এক-এক সমাজে এক-এক রকম হতে পারে। এবং প্রয়োগের বৈচিত্র্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভব হয় চিন্তার ফলাফলের প্রভেদ।[১]

'আগন্তুক'-এর চরিত্র ও বক্তব্য বুঝতে গেলে লেভি-স্ত্রোস অথবা তাঁর তত্ত্ব সম্বন্ধে এর চাইতে বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই। অথচ অন্য এক নৃতত্ত্ব-বিদের তত্ত্বের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় থাকলে 'আগন্তুক' ছবি এবং সত্যজিৎ রায়ের শিল্পমানসের বৈশিষ্ট্য অন্য একদিক থেকে বোঝা সহজ হতে পারে।

ভিক্টর টার্নার (১৯২০-৮৩)-এর নাম অনেকেই শুনেছেন। টার্নারের জন্ম ও শিক্ষা ইংল্যাণ্ডে। কর্মজীবন কাটে অবশ্য আমেরিকায়। কর্নেল, শিকাগো ও ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব পড়ান বহু বছর। টার্নারের গবেষণা শুরু হয় কয়েকটি আফ্রিকান উপজাতির আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ দিয়ে। তাঁর যে-সব তত্ত্বের কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব সেগুলি উত্থাপিত হয় এই প্রাথমিক গবেষণাতেই, যদিও শেষ অবধি তারা ছড়িয়ে পরে বিভিন্ন, বিচিত্র ক্ষেত্রে।[২]

বহু উপজাতিক সমাজেই এক বিশেষ ধরনের লোকাচার খুব গুরুত্বপূর্ণ। নৃতত্ত্ববিদ আর্নল্ড ভ্যান গেনেপ (Arnold Van Gennep) এ শতাব্দীর গোড়ায় এ জাতীয় লোকাচারের নাম দিয়েছিলেন rites of passage এবং দেখিয়েছিলেন যে কোনো rite of passage-এর সাধারণত তিনটি স্তর থাকে। প্রথম হল গতানুগতিক জীবন অথবা সামাজিক অবস্থান থেকে অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণকারী ব্যক্তিদের পৃথক্‌করণ। এই পৃথক্‌করণের সঙ্গে-সঙ্গেই অংশগ্রহণকারীরা প্রবেশ করে দ্বিতীয় স্তরে। এই দ্বিতীয় স্তর প্রকৃত অর্থেই মধ্যবর্তী। এক অবস্থা অথবা অবস্থান (ধরা যাক কৈশোর) থেকে অন্যতে (ধরা যাক যৌবনে) প্রবেশ করার আগে এই দ্বিতীয়, মধ্যবর্তী স্তরে কিছুকাল কাটানো এই সব লোকাচারে

আবশ্যক। এই পর্ব সার্থকরূপে সমাপন করবার পরই আসে rite af passage-এর তৃতীয় এবং অন্তিম ধাপ। অংশগ্রহণকারীরা এবার সমাজে পুনঃপ্রবেশ করে, তবে নতুন রূপে, নতুন অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে।

টার্নারের গবেষণায় ভ্যান গেনেপ বর্ণিত দ্বিতীয় স্তরটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরটির সঠিক বাংলা পরিভাষা পাওয়া মুশকিল। ভ্যান গেনেপ এটির নামকরণ করেছিলেন limen—এই লাতিন শব্দটির ইংরেজি করা যায় threshold—কিন্তু বাংলা? 'কিনারা' অথবা 'প্রান্ত' বললে মূল অর্থের অনেকটাই বজায় থাকে, কিন্তু পুরোটা নয়। টার্নারের রচনায় limen অথবা liminal stage অথবা কেবল liminality কথাগুলি ফিরে-ফিরে আসে নানান অনুষঙ্গে। সব সময়ই কিন্তু টার্নার জোর দেন liminality-র পরিবর্তনশীল ও গতিময় প্রকৃতির উপর। এই অর্থটি বাংলায় ধরে রাখা শক্ত। আমি এই প্রবন্ধে liminality-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রান্তিকতা' এবং liminal-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রান্তিক' ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক পরিভাষা তারা কখনোই নয়।

যাই হোক, এই 'প্রান্তিক' স্তরে দৈনন্দিন নিয়ম ও রীতিনীতি সবই মূলতুবি থাকে। প্রান্তিক ব্যক্তির সামাজিক অধিকার অথবা কর্তব্য তার পূর্বের এবং ভবিষ্যতের চাইতে ভিন্ন। এর আগে rite of passage-এর উদাহরণ রূপে কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশের সময়কার অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছি। সেই সব অনুষ্ঠান—যা বহু সমাজেই প্রচলিত—চলাকালীন কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা কিশোর বা যুবক কোনোটাই নয়। একজন কিশোর অথবা একজন যুবকের সমাজে যা অধিকার এবং যা কর্তব্য সেগুলি প্রান্তিক স্তরে অপ্রযোজ্য। কিন্তু এটা ভাবলে ভুল হবে যে প্রান্তিক ব্যক্তিদের কোনো প্রকার নিয়ম মেনে চলবারই প্রয়োজন নেই। তবে সে নিয়ম কেবল প্রান্তিক পর্বেই প্রযোজ্য, তার আগে বা পরে নয়।

তাঁর বিশ্লেষণে ভিক্টর টার্নার প্রান্তিকতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে প্রান্তিক ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো প্রকার শ্রেণীভেদ থাকে না। তাদের মধ্যে বিরাজ করে বিশুদ্ধ সাম্যবাদ ও নিবিড় মৈত্রী। দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ, যেমন সম্পত্তি বা ধনদৌলত, তার কোনো মূল্যই নেই এই পর্বে। অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় থাকা বাধ্যতামূলক। দৈনিক জীবনের আত্মীয়-পরিজন এ সময়ে পর। প্রান্তিকতার সঙ্গে তুলনা করা হয় মৃত্যুর বা জন্মের পূর্বেকার অবস্থার। অদৃশ্যতা অথবা অন্ধকারের অনুষঙ্গও প্রচলিত বহু সমাজে। প্রান্তিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে টার্নার বলেছেন: 'তাদের যেন সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে ফেলে নতুন ক'রে গড়া হয়।'

প্রান্তিক অবস্থায় দৈনন্দিন সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে উদ্ভব হয় এক নতুন চেতনার যার টার্নারের-দেওয়া-নাম হল communitas এবং যার নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ 'সংহতি'। প্রান্তিক ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে যে গভীর মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব বিরাজ করে তা আগেই বলেছি। সামাজিক শ্রেণী-ভেদের অভাব থেকে জন্ম হয় মানুষে-মানুষে নৈকট্য ও সমতার। এরই নাম communitas বা সংহতি।[৩]

টার্নার যদি এখানেই থেমে যেতেন তাহলে তিনি ভ্যান গেনেপের টীকাকার রূপে নৃতত্ত্বের ইতিহাসে স্থান পেতেন। কিন্তু টার্নার ভ্যান গেনেপ বর্ণিত rite of passage-থেকে প্রান্তিকতার মূল ধারণাটি নিয়ে তার প্রয়োগ করেছেন এত রকমের প্রসঙ্গে যে সেটি আজ এক নতুন গুরুত্ব পেয়েছে নৃতত্ত্বের বাইরে সমাজ ও শিল্প-সমালোচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। টার্নারের নিজস্ব রচনা তো বটেই, তাঁর অনুগামীদের প্রয়াসও সমালোচনা-সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই প্রভাবের মূলে টার্নারের বিশ্বাস যে প্রান্তিকতা কেবলমাত্র কতিপয় লোকা-চারের অঙ্গ নয়। সব সমাজেই এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই কিছু মানুষ থাকতে বাধ্য যাঁরা প্রায় স্বেচ্ছায়ই অবস্থান করেন সেই সমাজ অথবা সেই ক্ষেত্রের কিনারায়। এই প্রান্তিকতা বহুভাবে প্রকাশ পেতে পারে। দারিদ্র্য ভবঘুরে স্বভাব, স্বেচ্ছাচারী আচরণ, অনৈতিকতা, এমনকি সমাজবিরোধিতা—এ সবই প্রান্তিকতার বিভিন্ন রূপ। কিন্তু এই সব কেন্দ্রচ্যুত ব্যক্তিরা সবাই 'অসফল' বা 'বিপজ্জনক' নয়। সামাজিক প্রথা বিবর্জিত সংহতির স্বপ্ন, সর্বমানবের ভ্রাতৃ-বন্ধনের কামনাও তাঁদের মধ্যে জন্ম নেয় প্রায়শই। এঁরা প্রথাসিদ্ধ নৈতিকতা মেনে চলতে নারাজ ঠিকই, কিন্তু এঁদের অনেকেই মেনে চলেন এক ভিন্ন (এবং হয়তো ঊর্ধ্বতর) নীতি। লোককথা বা সাহিত্যে এ ধরনের চরিত্র প্রায়ই দেখা যায়। বাইবেল-এর 'গুড সামারিটান' ও ডসটয়ভস্কির ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশ-মেণ্টে'র সোনিয়ার উদাহরণ টার্নার নিজেই দিয়েছেন। বাঙালি পাঠক নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের কল্যাণে বহু দেশজ উদাহরণের কথা মনে করতে পারবেন।

সংহতির চিন্তা শুধু ব্যক্তির মধ্যে নয়, দলগত ভাবেও আসতে পারে। এখনো বহু ধর্মগোষ্ঠীর উল্লেখ করা যায়। টার্নার এ ধরনের একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বাংলার বৈষ্ণবরাও আছেন। তা ছাড়াও বাউল গানে টার্নার খুঁজে পেয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত সংহতির বিশুদ্ধ প্রকাশ।[৪]

প্রান্তিকতা ও সংহতির টার্নার বর্ণিত এই বৃহত্তর অর্থ মনে রাখলে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম বিচারে সুবিধা হতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রচিত সত্যজিৎ-শিল্প কোনো একটি তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস নেহাৎই হাস্যকর। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে সত্যজিতের শিল্প-সাহিত্যে প্রান্তিক চরিত্রের আগমন ঘটেছে বারে-বারে। জনৈক সমালোচক একবার

বলেছিলেন যে সময় চলে শ্রেণী-সংগ্রামের সংঘাতে আর সত্যজিৎ রায়ের চরিত্ররা কক্ষচ্যুত নক্ষত্র মাত্র। এ কথার মধ্যে একটা আংশিক সত্য লুকিয়ে আছে, যদিও ভুয়ো-মার্কসবাদ অবলম্বন ক'রে সে সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। সত্যজিৎ রায়ের 'কক্ষচ্যুত নক্ষত্র'রা শ্রেণীসংগ্রামে জ্ঞানত লিপ্ত হবেনটা কি কি ক'রে? প্রান্তিক মানুষেরা তো শ্রেণী বা কোনো প্রকার বিভাজনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা যে সংহতির কল্পনা করেন তা বিশ্বমানবতার নামান্তর। সেখানে শ্রেণী বা শ্রেণীসংগ্রামের কথাই ওঠে না। এ প্রকার ধ্যান-ধারণা সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকের চোখে যাই হোক না কেন, যথার্থ কোনো প্রান্তিক মানুষের জীবনদর্শনে শ্রেণীসংগ্রামের কোনো স্থানই নেই এবং সে ধরনের চরিত্রদের উপস্থিত করতে গেলে কি চলচ্চিত্রকার কলমের জোরে তাদের খুদে মার্কসবাদী বানিয়ে ফেলবেন?

সত্যজিৎ রায়ের প্রান্তিক চরিত্ররা কেউই নৈরাজ্যবাদী বা সমাজবিরোধী নন। সত্যজিতের ছবিতে সম্পূর্ণ নেতিবাচক চরিত্র তেমন নেই-ই। যাঁরা খানিকটা অনৈতিক তাঁরা কিন্তু সবাই সমাজের চোখে সফল। যেমন 'সীমা-বদ্ধ'র শ্যামলেন্দু অথবা 'জন-অরণ্য'র সোমনাথ। যে চরিত্ররা সত্যি-সত্যিই 'কক্ষচ্যুত নক্ষত্র' তাঁরা প্রায় সকলেই অপেক্ষাকৃত নির্লোভ, চিন্তাশীল, স্পর্শ-কাতর এবং সৃজনশীল। বর্তমান সমাজে তারা অসফল অথবা খ্যাপাটে অথবা অলস বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু সত্যজিতের চলচ্চিত্রায়নে সেটা সমাজেরই ব্যর্থতা রূপে চিহ্নিত হয়। 'পথের পাঁচালী'র হরিহর, 'অপুর সংসার'-এর অপু, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র সিদ্ধার্থ, অথবা 'শাখা-প্রশাখা'র প্রশান্ত — এঁরা সবাই বিভিন্নভাবে প্রান্তিক, কিন্তু তাঁরা সামাজিক প্রতিপত্তির বাসনা জলাঞ্জলি দিয়েও (বা জলাঞ্জলি দিয়েই) তাঁদের অন্তর্নিহিত মানবিকতা, সৃষ্টিশীলতা ও নৈতিকতাকে ধরে রাখেন এবং সাধ্যমতো বিকশিতও করেন। সত্যজিতের ছবিতে সাফল্য বা অর্থলাভ বা প্রতিপত্তির বিস্তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈতিক অধঃপতনের চিহ্ন এবং কারণ।

'সীমাবদ্ধ' ও 'জন-অরণ্য'র নায়কদের উল্লেখ আগেই করেছি। সেই সঙ্গে 'শাখা-প্রশাখা'র প্রবোধ ও প্রবীরের নামও মনে রাখতে হবে।

প্রান্তিকতা না হয় হল, কিন্তু কেবল নিজের ব্যতিক্রমী নৈতিকতা ও সৃজন-শীলতাকে বাঁচিয়ে রাখাই কি সংহতি? অবশ্যই নয়, যদিও বাস্তবে বহু প্রান্তিক ব্যক্তিই শুধুমাত্র এ-টুকুই ক'রে উঠতে সমর্থ হন। এখানে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে আমরা যে সংহতির আলোচনা করছি তা কেবল একজন ব্যক্তির চিন্তার জগতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। 'শাখা-প্রশাখা'র প্রশান্তর কথাই ধরা যাক আবার। সে অর্ধোন্মাদ, সুতরাং প্রান্তিকতার শেষতম বিন্দুতে তার অবস্থান। কিন্তু তার শিল্পবোধ সুগভীর এবং তার মনে যে সর্বক্ষণ এক নিজস্ব নৈতিকতার বোধ সজাগ সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না দর্শকের। সমাজ

তাকে গ্রহণ করে না, নাকি সেই সমাজকে বর্জন করেছে ? ছোট ভাই প্রতাপ তাকে বলে : 'এক হিসেবে তুমি ভালোই আছ মেজদা। আজকের মানুষ যে কোথায় নেমেছে সেটা তোমাকে দেখতে হচ্ছে না।' উত্তরে প্রশান্ত চিৎকার ক'রে ওঠে : 'জানি ! জানি ! – অমাবস্যা ! অন্ধকূপ ! কালো ! Black – Black – Black – Black – Black !' উত্তেজনা কমবার পরে সে ধীরভাবে বলে – 'একা, একা, একমেবাদ্বিতীয়ম্ !' এগুলি কি সমাজের সঙ্গে যুঝতে না পারা 'কক্ষচ্যুত নক্ষত্র'-র বিলাপ, না সমাজকে প্রত্যাখ্যান করেছে এমন একজনের স্বগতোক্তি ?[৫]

কিন্তু সমাজকে প্রত্যাখ্যান মানে মানুষকে প্রত্যাখ্যান নয়। এই একই দৃশ্যে মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে প্রশান্ত গুণ গুণ করেছে একটি সুবিখ্যাত সুর : সেটি বেঠোফেনের নবম সিম্ফনির 'ওড টু জয়'। এবং তারপর আপন মনে বলেছে – 'Brothers ! Brothers ! Brothers !' এটাকে যদি কেবলমাত্র তার নিজের ভাইদের প্রতি ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এই জটিল দৃশ্যের বহুমাত্রিকতা ধরা যাবে না। 'ওড টু জয়' তো কেবল সুর নয়, ফ্রিডারিশ শিলার-এর যে কবিতাকে বেঠোফেন তাঁর শেষ সিম্ফনিতে স্থান দিয়েছিলেন তাকে পশ্চিমী মানবতাবাদের manifesto বললে তেমন কিছু ভুল বলা হয় না। প্রশান্ত গুণ-গুণ করে যে অংশের সুর তার বাণী হল :

Freude, schoener Goetterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heligthum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt.
Alle Menschen werden Bruder
Wo dein sanfter Flugel weilt.

এ কবিতার বাংলা অনুবাদ আছে কিনা আমার জানা নেই। মানেটা মোটামুটি এই রকম :

আনন্দ, ঈশ্বরের দ্যুতি,
স্বর্গের সন্তান,
এসে তোমার অমর্ত্যভবনে
আমাদের চেতনা আনন্দবিহ্বল।
প্রতিদিনের হাজার বিভেদ
মুছে দেয় তোমার ইন্দ্রজাল।
তোমার ছত্রছায়ায়
মানুষ মানুষের আপন, দোসর।

ইংরেজি অনুবাদে, বলা বাহুল্য, 'Alle Menschen werden Bruder' ছত্রটি হয় 'All human beings become brothers'—এর পরেও কি প্রশান্তর 'Brothers ! Brothers ! Brothers !' বলাটা শুধুমাত্র তার নিজের ভাইদের প্রতি ইঙ্গিত বলে মনে হওয়া সম্ভব ? সে দ্যোতনা অবশ্যই আছে এবং সেটাই সত্যজিৎ রায়ের সংলাপ রচনার চিরাচরিত কায়দা। কিন্তু এ দৃশ্যে শিলার / বেঠোফেনের উপস্থাপনার উদ্দেশ্য প্রশান্তর মানবতাবাদের প্রমাণ দেওয়া। এবং ওই বিশ্বমানবতাবাদেরই আর এক নাম সংহতি।

'গণশত্রু'তে প্রান্তিকতা ও সংহতির উপস্থাপনা একটু অন্য রকম। এ ছবি (এবং হেনরিক ইবসেনের মূল নাটক) শুরু হয় যখন, তখন তার নায়ক একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। ইবসেনের নাটক শেষ হয় যখন, তখন নায়ক পুরোপুরি প্রান্তিক, বজায় আছে কেবল তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মবিশ্বাস। একাকিত্বের সেই বিশ্ববিখ্যাত গুণসংকীর্তন ('সেই সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ যে সবচেয়ে একা'), কিন্তু স্থান পায় না সত্যজিতের রূপান্তরে। তার বদলে বাইরে থেকে ভেসে আসে সমবেত ধ্বনি : 'ডাক্তার গুপ্ত জিন্দাবাদ !' সেই ধ্বনি শুনে বিস্মিত ও আনন্দিত অশোক বলে—'আমি তাহলে একা নই !' প্রান্তিকতা মিশে যায় সংহতিতে, যা ইবসেনের মূল কল্পনা বজায় রাখলে কখনোই সম্ভবপর হতো না !

প্রশান্তর সংহতি-চিন্তার সঙ্গে অশোক গুপ্তর অভিজ্ঞতার প্রভেদ হল যে ড: গুপ্তর সংহতিসাধন একটি সুনির্দিষ্ট, বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে। বিশ্বমানবতাবাদী সংহতির স্থান কি তাহলে শুধু চিন্তার জগতে ? তাঁর শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ এই প্রশ্নের বিচার করেন সত্যজিৎ। 'গণশত্রু', 'শাখা-প্রশাখা' এবং 'আগন্তুক' ছবি তিনটিকে ট্রিলজি আখ্যা দেওয়ার একাধিক যুক্তিসংগত কারণ আছে। তার একটি হল যে তিনটি ছবিরই মূল বিষয় প্রান্তিকতা ও সংহতি।

'আগন্তুক'-এ কিভাবে এ দু'টি ধারণার উপস্থাপনা করা হয় সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে একটা ভূমিকার প্রয়োজন আছে। ভিক্টর টার্নারের তত্ত্বের অনেক দিকই এ প্রবন্ধে আলোচিত রয়েছে—তাদের মধ্যে একটির আলোচনা এখানে না ক'রে নিলেই নয়।

তীর্থযাত্রার অসাধারণ বিশ্লেষণ করেছেন টার্নার যার প্রধান বক্তব্য হল যে তীর্থযাত্রা এক প্রান্তিক অভিজ্ঞতা। (আমার পরিভাষার দৈন্য এখানে প্রকট। 'liminality' শব্দে যাত্রা, রূপান্তর বা গতির যে ইঙ্গিত আছে 'প্রান্তিকতা'য় তা নেই।) তীর্থযাত্রা প্রান্তিক অভিজ্ঞতা শুধু নয়, যাত্রাকালে যাত্রীদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক বিশেষ ধরনের সংহতি যা দৈনন্দিন জীবনে প্রান্তিক ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায় না।[৬]

'আগন্তুক'-এর ক্ষেত্রে টার্নারের এই চিন্তা কতটা প্রাসঙ্গিক তা সকলেই

বুঝবেন। তীর্থযাত্রার ধর্মীয় দিকটা অবশ্যই বাদ দিয়ে ভাবতে হবে। অন্ততপক্ষে ধর্ম শব্দের প্রাত্যহিক অর্থটা মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। সত্যজিতের নায়ক মনোমোহন পঁয়ত্রিশ বছর গৃহহীন ও ভবঘুরে। বিশ্বময় তাঁর ভ্রমণ এবং তাঁর প্রিয়তম মানুষ যাঁরা তাঁরা কেউই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি নন। মনোমোহনের সন্ধান মানবতা ও নৈতিকতার সন্ধান। সেখানে জাতি, শ্রেণী বা সামাজিক প্রতিপত্তির কোনোরকম গুরুত্ব নেই। তথাকথিত 'অসভ্য' উপজাতির মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যত নিবিড় হয়েছে,, ততই তাঁর মনে জমে উঠেছে, 'সভ্য' সমাজের প্রতি অসন্তোষ। যে সমাজে তাঁর জন্ম সেখানে আজ তিনি সম্পূর্ণ প্রান্তিক ঠিকই কিন্তু তিনি খুঁজে পেয়েছেন সেই সংহতি যা প্রশান্তর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বপ্ন।

যাত্রা বা গতিময়তা, অতি অবশ্যই, কেবল মানসিক স্তরেই ঘটতে পারে। এবং তাতেও মানবিকতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটা সম্ভব। সেরকম উদাহরণও সত্যজিৎ শিল্পে পাওয়া যায়। 'সোনার কেল্লা'র সিধুজ্যাঠা শুধু বাড়ি বসে বই পড়েন ঠিকই, কিন্তু 'মনের জানলা' তাঁর সব সময়ই খোলা। প্রশান্ত বা সিধুজ্যাঠাকে কি মনোমোহন অপছন্দ করতেন? বোধ হয় না। কিন্তু মনোমোহনের জীবনে বিশ্বমানবের সংহতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে দেশ-কাল-ভাষা-বর্ণের ঊর্ধ্বে। এখানেই মনোমোহন প্রশান্ত, সিধুজ্যাঠা অথবা 'অপরাজিত'র হেডমাস্টারের থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। প্রান্তিকতার সঙ্গে সংহতির বাস্তবায়নের কোনো বাধ্যতামূলক সম্পর্ক নেই, কিন্তু দু'টি যখন একই সঙ্গে ঘটে যায় তখনই মানবতাবাদ তত্ত্ব থেকে সত্যে রূপান্তরিত হয় পরিপূর্ণভাবে। সেই অর্থে মনোমোহন সত্যজিৎ-শিল্পের সবচাইতে পরিণত ও সার্থক চরিত্রসৃষ্টি। তাঁর সারা জীবনের চিন্তা, এষণা ও শিক্ষা সত্যজিৎ মনোমোহনের চরিত্রে ঢেলে দিয়েছেন অকৃপণ হস্তে। এতই সার্থক, এতই পূর্ণাঙ্গ ও বহুমাত্রিক এই চরিত্র যে বলতে ইচ্ছা করে সত্যজিৎ 'পথের পাঁচালী' থেকে 'শাখা-প্রশাখা' অবধি যত স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন তারা সবাই যেন এই একজনের মধ্যে উপস্থিত। 'আগন্তুক' সত্যজিতের অন্তিম ছবি হয়ে দাঁড়ায় নেহাতই দৈবচক্রে, কিন্তু এই ছবি দিয়ে তাঁর শিল্পীজীবনের পরিসমাপ্তি একান্তই যথাযথ।

'আগন্তুক' কি আত্মজীবনীমূলক ছবি? যে সব দর্শক সত্যজিতের জীবনদর্শনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন তাঁরাও লক্ষ করবেন যে মনোমোহনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৫-এ এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় 'আগন্তুক' ছবিরই হুবহু সমসাময়িক। ছবির প্রথম দৃশ্যে তিনি নেই, কিন্তু আছে তাঁর চিঠি। বহু পরে আমরা দেখি তাঁর পাসপোর্টের সই। সবই সত্যজিতের সুপরিচিত হস্তাক্ষরে। মনোমোহন গান করেন তিনবার—কণ্ঠস্বর সত্যজিতের। এগুলির উপর ভিত্তি ক'রে সমালোচনা বেশি দূর কিন্তু এগোতে পারে না। (মনে পড়ে, কলকাতার

এক সমালোচক 'শাখা-প্রশাখা' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্যজিতের চেহারার আদল নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন !)

সঠিকতর পথের সন্ধান সত্যজিৎ রায় নিজেই দিয়েছেন। ১৯৯১-তে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন : 'আগন্তুক আমি আজ থেকে ৩৫ বছর আগে, সেই 'পথের পাঁচালী'র সময়ে করতে পারতাম না। গত তিনটে চারটে ছবিতে আমি নিজের বক্তব্য, নিজের বিশ্বাস, নিজের দর্শন, যাই বলুন না কেন তা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। যেমন এবার 'আগন্তুক'-এ আমি উৎপলকে বলে দিয়েছিলাম যে, উৎপল, তুমি কিন্তু আমার স্পোক্সম্যান এটা মনে রেখো ।'[৭]

সত্যজিতের 'বিশ্বাস' বা 'দর্শন' নিয়ে কোনো বিশদ আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে একটা কথা বলা জরুরি : ভবিষ্যতে ওই ধরনের আলোচনায় 'আগন্তুক' – এবং একটু অন্যভাবে – 'শাখা-প্রশাখা' ও 'গণশত্রু' গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে বাধ্য। 'আগন্তুক' মাত্র একবার দেখে খাপছাড়াভাবে কয়েকটি উপলব্ধি হয়েছিল আমার। সেগুলির উল্লেখ হয়ত খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

মনোমোহনের প্রত্যাবর্তনের পর তার identity নিয়ে সবাইয়ের যে প্রবল সন্দেহ দেখা দেয় সেটাই এই ছবির প্লট – অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। সেই সন্দেহের দরুণ যে শুধু মনোমোহন ক্ষুণ্ণ হন তা কিন্তু নয়। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যা শিখেছেন ও জেনেছেন তা ব্যক্ত করতে বিশেষ সুযোগ পান না ঠিকই, কিন্তু তাতে কার বেশি ক্ষতি হয় ? মনোমোহনের, না তাঁর মধ্যবিত্ত আত্মীয়-পরিজনের ?

মনোমোহনের উদার মানসিকতা শেষ অবধি একটা প্রভাব বিস্তার করে ঠিকই তাঁর ভাগনি স্বেচ্ছায় সাঁওতালদের নাচে যোগ দেয়, সাত্যকি কথা দেয় যে সে কখনও কূপমণ্ডুক হবে না। কিন্তু তাঁর নিজের চোখে এ প্রভাব তেমন সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। প্রান্তিকতার যা আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি (নতুন রূপে প্রাত্যহিক সমাজে পুনর্ভুক্তি) তা মনোমোহনের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটে না। ছবির শেষে তিনি ফিরে যান তাঁর প্রান্তিক অবস্থানে। শিল্পী এবং ব্যক্তিমানুষ হিসেবে বাঙালি সমাজে সত্যজিৎ রায়ের অবস্থান এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে মনোমোহনের কলকাতা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কোনো মিল আছে কিনা সেটা ভাবার বিষয়।

কিন্তু এ ছবি শুধুমাত্র এক প্রান্তিক ব্যক্তির চিত্রায়ণে আটকা পড়ে থাকে না। বিবরণ-এর সঙ্গে স্থান পায় বিচার ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা। হয়ত সেই জন্যেই ছবির কেন্দ্রস্থলে আসে সেই আশ্চর্য জেরার দৃশ্য। অনেকে এই দৃশ্যকে court scene-আখ্যা দিয়েছেন। সে ধারণা আমার মনে হয় সঠিক। কিন্তু ছবি ও তার স্রষ্টার জীবনকে এক ক'রে ভাবলে এ দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত জটিল। কে

এখানে আসামী আর কেই বা বিচারক ? জেরা করছেই বা কে ? যে মানুষ সমাজকে বিশেষ পরোয়াই করে না সে এত প্রশ্নের উত্তরই বা দিচ্ছে কেন ? চিত্র নাট্যকার যাতে নাটক জমাতে পারেন সেই জন্য ? ব্যাপারটা কি এতই সরল ?

একটা সম্ভাব্য উত্তর : 'আগন্তুক' প্রথাগত অর্থে আত্মজীবনীমূলক ছবি নয়। এ ছবি আত্মমূল্যায়নের ছবি। একজন 'স্পোক্‌সম্যান'-এর সাহায্যে সত্যজিৎ এখানে তাঁর নিজের প্রান্তিক জীবনের অর্থ ও মূল্য খুঁজে বার করতে প্রয়াসী। তাই তিনি একাই আসামী, প্রশ্নকর্তা এবং, শেষ অবধি, বিচারক। সেই বিচারকার্য ও অনুসন্ধান যত অগ্রসর হয় ততই পরিষ্কার হয় যে প্রান্তিকতার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। একমাত্র সংহতি-সাধনই পারে প্রান্তিকতাকে অর্থ ও মূল্য প্রদান করতে। এবং সেখানে মনোমোহন পরিপূর্ণভাবে সফল। শিলার / বেঠোকেন / প্রশান্ত-র যা স্বপ্ন, মনোমোহনের জীবনে তা বাস্তব। মধ্যবিত্ত কূপমণ্ডুকদের দৃষ্টিতে সে ভবঘুরে হলেও নিজের বিচারে তার জীবন অর্থময়, মূল্যবান ও প্রকৃত অর্থে মানবিক। পঁয়ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী যাত্রা মনোমোহনের বৃথা হয় নি। সেই বিশ্বাস থেকে কিন্তু সন্তুষ্টির উদয় হয় না মনোমোহনের প্রাণে সঞ্চার হয় নতুন উদ্যমের। যথার্থ প্রান্তিকতায় সংহতির সন্ধানের কোনো শেষ নেই। ছবির শেষে মনোমোহনের যাত্রা তাই শুরু হয় আবার। কোনো মানবতাবাদী শিল্পীই যেহেতু পুরো নৈরাশ্য-বাদী হতে পারেন না, তাই সত্যজিৎ ইঙ্গিত দেন যে সাত্যকি হয়ত ভবিষ্যতে মনোমোহনের জীবনযাত্রা না হলেও জীবনদর্শন গ্রহণ করবে।

'আগন্তুক' সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলি সঠিক এমন দাবি আমি কখনোই করছি না। আমার প্রধান উদ্দেশ্য 'আগন্তুক' ছবিকে উদাহরণস্বরূপ নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পের একটি স্বল্প-আলোচিত দিক তুলে ধরা ভিক্টর টার্নারের 'প্রান্তিকতা' ও 'সংহতি'র তত্ত্ব যদি যত্ন-সহকারে এই কাজে প্রয়োগ করা হয় তাতে সমালোচকদের ও পাঠকের বিশেষ সুবিধা হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

উল্লেখপঞ্জি

১ লেভি-স্ত্রোস সম্বন্ধে আলোচনার কোনো অভাব নেই ইংরাজি সমালোচনা-সাহিত্যে। ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছি যে সূত্রগুলি থেকে এখানে কেবল তাদেরই উল্লেখ করলাম :

Edmund Leach, *Claude Le'vi-Strauss* (New York : Viking, 1970).

E. Nelson Hayes & Tanya Hayes (eds), *Claude Le'vi-Strauss : The Anthropologist as Hero* (Cambridge, Mass : M. I. T. Press, 1970).

Christopher Tilley, 'Claude Le'vi-Strauss : Structuralism and Beyond', in C. Tilley (ed.),***Reading Material Culture : Structuralism, Hermeneutics and Post-Structuralism*** (Oxford : Basil Blackwell, 1990), pp. 3-81

Ahmed Gurnah and Alan Scott, ***The Uncertain Science : Criticism of Sociological Formalism*** (London / New York : Routledge, 1992), Chapter 3 : 'Claude Le'vi-Strauss : Universal Categories and the End of Racism', pp. 65-92.

২ টার্নারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জির জন্য দেখুন :
Frank E. Manning, 'Victor Turner's Career and Publications', in Kathleen M. Ashley (ed.), ***Victor Turner and the Construction of Cultural Criticism*** (Bloomington, Ind : Indiana University Press, 1990), pp. 170-77.

৩ Victor W. Turner, ***The Ritual Process : Structure and Anti-Structure*** (Chicago : Aldine, 1969), Chapter 3 : 'Liminality and Communitas', pp. 94-130 , and Chapter 4 : 'Communitas : Model and Process', pp. 131-65.

৪ Turner, ***The Ritual Process***, p. 165 ; and Victor Turner, 'Morality and Liminality', in his ***Blazing the Trail ; Way Mark in the Exploration of Symbols***, ed. Edith Turner (Tucson, Arizona : University of Arizona Press, 1992), pp. 132-62.

৫ সত্যজিৎ রায়, 'শাখা-প্রশাখা' (চিত্রনাট্য), 'এক্ষণ', শারদীয় ১৩৯৮, পৃ. ৫৬ ।

৬ Victor Turner, ***Dramas, Fields, and Metaphors : Symbolic Action in Human Society*** (Ithaca, NY : Cornell University Press, 1974), Chapter 5 : 'Pilgrimages as Social Processes', pp. 167-230.

৭ সত্যজিৎ রায়, 'আমার ছবিতে···আজকের দিনে' (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার), 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১ মে ১৯৯১ – এই সূত্রটি আমি নিজে দেখবার সুযোগ পাই নি । আমার উদ্ধৃতিটির উৎস : 'দেশ', ২ মে ১৯৯২, পৃ. ৪৬ ।

পরিবারবর্গের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী (বাঁদিকে) ও প্রমথ চৌধুরী।
শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে।

ক্রোড়পত্র

জীবনকথা

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

এ-যাবৎ অ-প্রকাশিত আত্মকথার প্রকাশ

দ্বিতীয় পর্ব

—

সম্পাদনা অনাথনাথ দাস

বিবাহিত জীবন

আগে বলেছি যে বি. এ. পাশ করবার পর ১নং রেনি পার্ক বালিগঞ্জে স্থির হয়ে বসে একটু ঘরসংসারের কাজের দিকে মন দিয়েছিলুম। এও বলেছি যে, সেই বাড়ী থেকে আমার বিয়ে হয়েছিল[১]। দুই ঘটনার মধ্যে যখন ৫।৭ বছরের ব্যবধান ছিল, তখন বলতে হয় যে ঐ এক বাড়ীতে আমরা অনেকদিন একটানা ছিলুম। দিনু[২] মাঝে ২ বল্‌ত 'বিবিপিসি, বিয়ে কর না কেন?' আমি উত্তরে বলতুম, 'ধাৎ, ভাইপো হয়ে আবার পিসির বিয়ে দিতে এসেছেন!'

আমার কেমন একটা সংকোচ বোধ হত যে, হয়ত স্বামীর সঙ্গে মিশ খাবে না। বা তাঁকে সুখী করতে পারব না, ইত্যাদি ২। যেমন বয়স পেরিয়ে গেলে মেয়েদের হয়ে থাকে। সকলের হয় কি না জানিনে; তবে আমার নিজের উপর বিশ্বাস তখনো ছিল না, এখনো বিশেষ নেই। সরলাদি (ওরফে সল্লি) বোধহয় এই হিসেবে প্রথমে ওঁর কথা আমার কাছে পাড়েন। এবং আমি (সম্ভবতঃ) আপত্তি না করায় আবার ওঁর কাছেও বলেন। ওঁর আত্মকথায় এ বিয়ের কিছু বিবরণ[৪] দেওয়া আছে।

বী কোম্পানির[৫] আমাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া তখনো সমানে চলেছে। ইতিমধ্যে শ্রী প্রমথনাথ চৌধুরী কোন শুভ অবকাশে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর কাছে এই প্রস্তাব পেশ করেন, এবং তিনি বলেন (লক্ষ্মী মেয়ের মত) যে মাকে জানিয়ে পরে মত জানাবেন। মাকে বলতে তিনিও রাজি হয়ে গেলেন। এই হচ্ছে আমার বিয়ের সম্বন্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কোন কারণে. যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অপ্রীতিকর বলেই অনাবশ্যক। আমার হবু-শ্বশুরবাড়ীর সকলে এ সম্বন্ধ তেমন নেক্‌নজরে দেখেন নি। সেই জন্য উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হতে বেশ কিছু বিলম্ব হতে লাগল—অন্ততঃ মাস ছয়েক। এমন কি, মা সে জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মনে আছে। এবং ভাবী বর মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য দিনকতক তাঁর প্রিয় বন্ধু দীপনারায়ণ সিংহের[৬] ওখানে ভাগলপুরে গিয়ে বসে রইলেন। সেখান থেকে আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার ২।১ খানা প্রকাশযোগ্য এবং প্রকাশ করাও হয়েছে।[৭] তবে প্রথম দিকে যখন কলকাতায় ছিলেন, রোজই আমাদের ওখানে আসতেন এবং অনেক রাত পর্য্যন্ত থাকতেন।

আমার দেওর সুহৃৎ[৮] মজা করে ইংরিজী courtship কথাটাকে বলতেন 'কুটিশ', এবং flirtationকে 'ফুলটিশ'। এখনো বউরা সেকথা শুনে হাসে। উল্লিখিত বিবাহপূর্ব্ব অবস্থাটা হয়ত প্রথমোক্তের ভিতর পড়তে পারে। কিন্তু শেষোক্তের ভিতরে কিছুতেই নয়, কারণ ইংরিজীতে 'ফুলটিশে'র একটি সংজ্ঞা

পড়েছিলুম 'attention without intention'। আর এ স্থলে intention যে ঠিকই ছিল, তা ফলেন পরিচীয়তে।

ওঁর কলকাতার বন্ধুদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন নাটোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। তিনি আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে—সম্ভবতঃ মাঘোৎসবে দেখে ওঁর কাছে আমাকে প্রশংসাসহ পাস ক'রে দিয়েছিলেন—'খুব ভদ্র' বলে। তার মানে ওরকম ক্ষেত্রে কবির গানের 'আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি?' প্রশ্ন করাই অনাবশ্যক, এবং ঘাড় নিচু ক'রে চুপচাপ বসে থাকাই স্বাভাবিক ছিল, কাজেই ঐ কথা বলে থাকবেন। সেদিন কি কাপড় পরেছিলুম তা পর্যন্ত মনে আছে। ধন্য স্ত্রীজাতির স্মৃতিমহিমা। এই অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক পরে!

কিন্তু দেশে ও কালে স্ত্রীজাতির যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, ঐ এক বেশ-ভূষা সম্বন্ধে চিরকালই তাঁদের ঔৎসুক্য আছে ও থাকবে ধরে নিয়ে আমার বিয়ের পাওনা-থোওনা সম্বন্ধে পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণার্থে কিছু২ বিবরণ দিচ্ছি। আমারই এক খুড়তুতো ভগ্নী (ও পরে জা) বলেছিলেন যে তাঁর নাকি বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় গয়না পাবার জন্য! আমার যদিও চিরদিনই গয়নার চেয়ে কাপড়ের প্রতিই বেশি ঝোঁক ছিল, তবু গয়না জিনিষটা ফেল্‌না নয়, বিশেষতঃ শুভবিবাহ ক্ষেত্রে। বরপক্ষের কোন দাবা না থাকলেও (আর এ স্থলে ছিল না বলা বাহুল্য, কারণ পক্ষই নেই ত দাবী করবে কে?) মা বাপ ইচ্ছে করেই আদরের মেয়েকে যথাসাধ্য দানসামগ্রী দিয়ে থাকেন। বস্তুত ঠিক বিয়ের জন্য আলাদা ক'রে আমাকে বিশেষ কোন গয়না তাঁরা করিয়ে দেন নি, কেননা কুমারী জীবনের অবশ্য কিছু২ ছিল। কেবল একটিমাত্র জিনিষ দিয়েছিলেন, তাতে একটু নতুনত্ব ছিল। সেটি ছিল প্ল্যাটিনমের উপর হীরে বসানো বেশ বড় একটি ফুলপাতা নক্সার ব্রোচ, তার বড় ফুলটা কাঁপত।

আর তার শেষে একটি সরু লেজুড় জোড়া ছিল, যেটা ইচ্ছেমত খুলে নেওয়া যেত। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতে যখন একটু টাকার সুবিধে হল, তখন সেই লেজুড়টা ব্রোচ থেকে খুলে নিয়ে তার ও-পাশে ঠিক সেইরকম আর এক লেজুড় জুড়ে বেশ একটি গলার চিক ক'রে নিলুম, যেটা পরে আবার আমার এক ভাইপো-বউকে যৌতুক করি। আর ব্রোচটার সদগতি করলেন জ্যোৎস্নাদাদা,[৯] তাঁর পুত্রবধূর জন্য কিনে নিয়ে। (অবশ্য অনেক পরে)। আর তারকবাবু ৫০০ টাকা যৌতুক করেছিলেন, তার থেকে আমি এক প্রস্ত সোনার গয়না নিজের পছন্দমত ক'রে নিয়েছিলুম।

এখন পিছিয়ে দেখে বুঝি যে বেশভূষার ক্ষেত্রে চিরকালই একটু নতুন পরি-কল্পনার প্রতি ঝোঁক ছিল; ঐখানেই যা-কিছু ভালোমন্দ মাঝারি মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছিল। তারকবাবু[১০] আগেও জন্মদিন ইত্যাদি উপলক্ষে অনেক

দামী ও সুন্দর জিনিষ আমাকে দিয়েছিলেন – যথা নীলা ও হীরের ব্রেসলেট, সোনার ট্র্যাক-ঘড়ি (watch), হীরেবসানো আংটী-ঘড়ি, – শেষটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয় সেটা তাঁকে মেরামত করতে দিয়ে কোথায় দিয়ে যে কি হয়ে গেল তা জানিনে, কিন্তু আর পেলুম না। অন্যগুল হয় দান নয় বিক্রিতে গেছে তবু জানি। যা সাংসারিক বুদ্ধি, তাতে হারানো বা ঠকাই ত স্বাভাবিক। যথা তারকবাবুর যৌতুক দরুণ যে বাজুবন্ধ করালুম, পরে প্রকাশ পেল যে স্যাকরা গিনি সোনা বলে নিকৃষ্ট সোনা ঠকিয়ে দিয়েছে। যাচিয়ে বা কসে নেবার বুদ্ধি তখন হয় নি। এখন (যখন গয়না গড়াবার দিন গেছে) হয়ত তার চেয়ে একটু হয়েছে। বিয়েতে নাটোরের মহারাজা দুটো দামী জড়োয়া ব্রেস্‌লেট যৌতুক দিয়েছিলেন, কিন্তু দুটো দু'রকমের; তখন ত সবতাতেই বিলিতী নকল করা হত। পরে উল্লিখিত টাকার সুবিধে হলে তার প্রত্যেকটির জুড়ি গড়িয়ে দু'জোড়া ব্রেস্‌লেট করিয়ে নিলুম। তার মধ্যে এক জোড়া ভবিষ্যতে মামুলী যৌতুকদত্ত হলেও, আর এক জোড়ার দানের ভিতর একটু নতুনত্ব ছিল – অর্থাৎ রবীন্দ্রস্মৃতি-ভাণ্ডারে দান করেছিলুম[১১]।

যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবার দরুণই এই সব পাওনা-থোওনা হল, তাঁর বিবাহপূর্ব্ব উপহারের উল্লেখ না করলে ফর্দ্দ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিলিতী মেমেদের হাতে (তখনকার ফ্যাশন) chain bracelet দেখে পছন্দ হয়েছিল বলে এক যোড়া সেইরকম সোনার ঢিলে শিকল হাতে পরিয়েছিলেন (সোনার হলেও শিকল ত বটে!)। আর নীলাতে মুক্তাতে গাঁথা বেশ সুন্দর একটি চীক তাঁর প্রিয় জহুরী ভগীরথমলের কাছ থেকে কিনে দিয়েছিলেন; সেটিও অবশেষে তাঁরই প্রিয় বন্ধুর প্রথম পুত্রবধূর যৌতুকস্বরূপ দিলুম, ভালই হল। আর একটি সুন্দর জিনিষ দিয়েছিলেন, তাঁর প্রিয় মুচি চিনিবাসের হাতের তৈরি এক জোড়া শাদা buck-skin-এর নাগ্‌রা, তার ধারে কালো মখমলের উপর জরির কাজ। আশা করি জুতোদান শুনে কেউ হাসবেন না, কিন্তু বাস্তবিকই নমুনাটির একটু নতুনত্ব ছিল। অন্ততঃ আমি ত আগে কখনো দেখি নি; সম্ভবতঃ রুহিদাসবংশজর স্বকপোল-কল্পিত। এখনো কেউ যদি চান করিয়ে দেখতে পারেন।

জুতোকে নতুনভাবে সজ্জিত করবার আর এক পরিকল্পনা দেখিয়েছিলেন আমার পিসতুতো ভাই সত্যদাদা,[১২] যিনি আমার বিয়ের যৌতুক স্বরূপ দিলেন এক চপ্পল বা sandal, তার উপর রূপোর চরণচক্র মত বসিয়ে দেওয়া। এই সাজটি আজকের আধুনিকাদেরও অনুকরণযোগ্য বলে মনে করি। এমন কি নৃত্যরতা পায়ের জন্য ইচ্ছে করলে ঐ রূপোর সাজের মধ্যে ছোট ২ ঘুঙুরও লাগিয়ে দেওয়া যায়।

বিয়ের কাপড়ের বিস্তারিত বর্ণনা ক'রে আর সময় বা কাগজ নষ্ট করব না। তবে কনের লাল বেনারসীর একটু নতুনত্ব ছিল – পাতলা ডুরে জমির উপর

এতখানি চওড়া কল্কাদার সুন্দর আঁচলা ও তিনটে পাড়। আমিও নিজের মাথা থেকে জামাটা একটু নতুন নমুনায় করিয়েছিলুম। সে কাপড় এখন আমার এক নাতনীর বিয়ের উপলক্ষে আগে থাকতেই দিয়ে দিয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি যেন তার আমার মত শিবতুল্য স্বামী হয়। যদিও শিব গড়াগড়ি যান না; এক দেবীর পদতলে ছাড়া!

ফুলশয্যার সাড়ীটাতেও একটু নতুনত্ব করেছিলুম, আমার পুরনো লোরেটো কন্ভেন্টের এক মেমবন্ধুকে দিয়ে ফুলের পাড় সেলাই করিয়ে। জমিটাও ছিল সুন্দর হলদে ফুলকাটা দামী ক্রেপের। সোনালী রংটা আমার বড় পছন্দ ছিল, আর শুনতে পাই সেকালে আমাকে মানাতও। শেষপর্য্যন্ত কাপড়ের সখটাই আমার বেশি ছিল আগেই বলেছি। আর মাও তাঁর নিজের ভাল ২ কাপড় বা যখন যে সুন্দর নতুন সাড়ী কি জামা দেখেছেন তাঁর একমাত্র মেয়েকে দিয়েছেন।

প্রথমে উনি বিদেশে ব্যারিস্টারী করতে যেতে চেয়েছিলেন কারণ অনেক ভাইয়ের একই জায়গায় পসার জমানো সহজ নয়। কিন্তু মা মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না বলে মত করলেন না; যেমন ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না বলে শিক্ষার জন্য বিলেত যেতে দিলেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল আমরা একসঙ্গেই থাকি, কিন্তু উনি তা কিছুতেই রাজি হলেন না। এই জন্য যখন মা কান্নাকাটি করছিলেন, তখন সুরেনই নাকি প্রস্তাব করলেন যে ওদের আলাদা বাড়ী করে দেওয়া যাক; সে কথা কখনো ভুলব না। যদিও তখনই ওদের অবস্থা-বিপর্য্যয় আরম্ভ হয়েছিল। শুধু বাড়ী নয়, বাড়ী সাজাবার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করবার সব সরঞ্জামই দিয়েছিলেন – মায় গাড়িঘোড়া পর্য্যন্ত। অন্য আত্মীয়রাও ঘরকন্নার বিবিধ সামগ্রী দান ক'রে সাহায্য করেছিলেন; এইরকম আত্মীয়দের মধ্যে পরামর্শপূর্ব্বক যৌতুক ভাগ ক'রে নেওয়া অন্যত্রও দেখেছি ও খুব ভাল লাগে।

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ আমার শুভ বিবাহ হয়, যোড়াসাঁকোর দালানে। এখন মনে করলে হাসি পায় যে আমি বালিগঞ্জ থেকে যোড়াসাঁকো যাবার পথে বাথগেট কোংয়ের ওখান থেকে মাথার তেল কিনে নিয়ে গেলুম – Vegetable Hair [oil] তখন মাখতুম। বর যখন এল সুরেনের মনে হল রোজ যেমন আসেন আসছেন, তাই বিশেষ সমাদর ক'রে নামাতে ভুলে গেল! আর বিয়ের প্রত্যেক মন্ত্র তিনবার ক'রে উচ্চারণ করতে বলায় বাবা বিরক্ত হয়ে দু'একবার বলার পরেই 'ঐ হয়েছে ২' বলে সেরে দিলেন। তাই উনি বলতেন আমাদের বিয়ে সিদ্ধ হয় নি। আমার আসন হয়ে বসে থাকতে ২ পাঁইজোড়ে পায়ে লাগছিল মনে আছে। উপরে গিয়ে বাসরঘরে (বাড়ীর ভিতর তেতলায় দ্বিপুদাদার[১৩] ঘরে) কিরকম যৌতুকখেলা বা ঠাট্টাতামাসা হল ভাল মনে নেই; তবে মামুলী ন্যাজ নিশ্চয় কেউ ক'রে থাকবে। আড়িপাতাও হয়েছিল।

পরের দিন পূর্ব্বোক্ত কারণে মূল শ্বশুরবাড়ী যাই নি, যদিও পরে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম বোধহয়। কিন্তু আমার ছোট ননদ আমাকে নিতে পাঠিয়েছিলেন, আর তাঁরই সাহায্যে উনি গায়ে-হলুদও পাঠিয়েছিলেন, সেকথা বলতেই ভুলে গেছি। বেশ ফিকে হল্‌দে রেশমী শাড়ীটি ছিল. সেটি অনেকদিন পর্য্যন্ত পরেছি। যাবার সময় যতদূর মনে আছে বেশি কাঁদি নি, হয় ত দু'এক ফোঁটা। সঙ্গে সেই মানী দাসী গিয়েছিল, তা আগেই বলেছি। সেখানে গিয়ে কি হল ভাল মনে নেই। প্রথমে মা ওঁরা ১৪ নং বালিগঞ্জ সর্ক্যুলর রোডের বাড়ী আমাদের জন্য ভাড়া করেছিলেন।

একতলাটা প্রায় মাটির সমান হলেও, খাবার ভাঁড়ার ঘরাদির উপযুক্ত ছিল; আর দু'টি প্রাণীর পক্ষে দোতলায় যথেষ্ট ঘর ছিল। পিছনে একটি ছোট বারান্দা ছিল, সেখানে আমরা সন্ধ্যাবেলায় বসতুম। আর সামনে একটি ছোট বাগানও ছিল। যদিও বাগানের দিকে নিজে কখনো বেশি মনোযোগ দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। ঘরের ভিতরটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল, এবং এখনো তাই আছে। তবে বাড়ী পরিষ্কার রাখতে গেলে বাগানটিও সাজিয়ে রাখা দরকার. কারণ চিঠির কাগজ ও লেফাফার মত এতদুভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

চাকরের মধ্যে মঙ্গল নামে এক [ওড়িয়া] বেয়ারা এবং মম্মদালি নামে এক বাবুর্চ্চি ছিল। এক আধজন দাসীও আসত যেত। প্রথমোক্তটির কাজ যেমনই হোক, বেশ একটু হাতটান ছিল বলে মনে হয়। কারণ কর্ত্তাদামশায়ের যৌতুক এক যোড়া ব্রেস্‌লেট কোন কারণে যোড়াসাঁকো থেকে পূর্ব্বোক্ত মনরাখন দরওয়ান ফেরৎ এনে এক সাবানের বাক্সমধ্যে আমার হাতে দিলে, আমি যে ডেস্কে বসে লিখছিলুম তারই উপর রাখলুম, পরে উঠে যাবার সময় তুলে নিয়ে যেতে ভুলে গেলুম। সে ব্রেস্‌লেট আর পাওয়া গেল না। মনরাখনকে যখন পরে জেরা করা গেল যে, সেই সাবানের বাক্সে কি ছিল, তখন সে বল্লে 'হজুর, বৌমা হমারা হাতমে দিয়া, হম্‌ লেকে আয়া, লেকেন উস্‌মে সাপ হ্যায়কি বীছ্‌, হ্যায়, সে ত হম্‌ নেহি জান্‌তা।' বছর খানেক পরে যখন নিজের কমলালয় বাড়ী ছেড়ে অনেকদিন মায়ের অসুখের সময় ১৯নং স্টোর রোডে তাঁর কাছে গিয়ে থাকি, ঐ মঙ্গলের হাতেই চাবি পাঠিয়ে ২ দরকারী কাপড়চোপড় আনাতুম (কুছ্‌ নেই ত থোড়া ২ বাপের বাত নিশ্চয়ই পেয়েছিলুম!)। পরে বাড়ী ফিরে এসে অনেক ভাল ২ জিনিষের খোঁজ পেলুম না; যথা ওঁর ফুলশয্যার লাল বেনারসী যোড় (আমি পরে পরব বলেই মা বেশ একরকম সুন্দর মেটে ২ লাল রংয়ের যোড় দিয়েছিলেন), আফিস ঘরের ছোট গালিচা, ইত্যাদি। সবচেয়ে আশ্চর্য্য পুকুর-চুরি হয়েছিল যখন আমার ছোট বাক্স-হারমোনিয়ম বসবার ঘর থেকেই লোপাট হয়ে গেল। এ-সব মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় ছাড়া কি বলব? তা ছাড়া আমরা বাড়ী

না থাকলে মঙ্গল যে আমাদের যন্ত্রে হাত লাগাতেন তার চাক্ষুষ না হোক শ্রোত্রীয় প্রমাণ আমরা নিজেই বাড়ী আসতে ২ পেয়েছি। যাক্ সে সব কথা। চুরির ফিরিস্তি দিতে গেলে অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে জায়গা জুড়ে বসবে।

মন্মদালিটা রাঁধত ভাল, সেইটেই আমার মত আনাড়ি গৃহিণীর পক্ষে ছিল সৌভাগ্যের বিষয়। সে মিঃ কে. জি. গুপ্তর[১৪] (পরে স্যর) বাড়ীতে চাকরী ক'রে তাঁর স্ত্রীর কাছে ভাল ২ বাঙলা রান্না শিখেছিল ; তার মধ্যে একটা মনে হচ্ছে চিঁড়ে দিয়ে মাগুর মাছ। মাঝে ২ লোক খেতে বলা হত ; কিন্তু আমি একটুতেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়তুম যে উনি বলতেন দুটো লোককেও নিমন্ত্রণ করতে ভয় হয়। তাই ত বলি মায়ের ভাল গুণগুলি না পাই, মন্দগুলি পেয়েছিলুম।

গানবাজনাও হত অবশ্য, পিয়ানোও ছিল। ২০৲ দিয়ে এক তানপুরা কিনে গায়ক সুরেন বাঁড়ুয্যের[১৫] কাছে কেঁচে গণ্ডূষও করা হয়েছিল। উনি গান খুব ভালবাসতেন, গাইতেও পারতেন ; কৃষ্ণনগরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিলেন না ; তবে কতকগুলি পছন্দ করতেন, যথা 'শুধু তোমার বাণী নয় গো'। আর বলতেন যে যথার্থ প্রেমসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র লিখেছেন—সে হচ্ছে 'এমন দিনে তারে বলা যায়'! সে সময়ে 'আজি যে রজনী যায়', 'মম যৌবননিকুঞ্জে' এই সব গানই লোকপ্রিয় ছিল। শ্বশুরবাড়ী ১৯ নংয়ে গেলেই ওঁর গান হত 'দেখো এক বালা যোগী' ইত্যাদি। সে-সব গান এখনো আমার কাছে লেখা রয়েছে।

শ্বশুরবাড়ী ত কাছেই ছিল—১৯ নংয়ের আগে বোধহয় ৯ নং স্টোর রোড। রোজ রাত্রেই আমাদের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ ছিল। বিয়ের আগে সত দাদা ওঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, 'মেজমামী'র[১৬] সঙ্গে হয়ত বনবে না, যেন সাবধানে চলেন, ইত্যাদি। কিন্তু ওঁর বিবেচনাগুণে বা যে কারণেই হোক সব সময়েই তাঁদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা ক'রে চলেছেন, তা জ্যোতিকামশায়ও পরে স্বীকার করেছেন। এমন কি, মা যখন নিজের হাতে পাগড়ী বেঁধে দিয়ে সেলাই ক'রে দিয়েছেন, তখনো কিছু বলেন নি ; যদিও ওঁর বাড়ীর লোকে হাসাহাসি করে-ছিলেন। তাঁরা সব হ্যাটকোটধারী সাহেব ছিলেন কি না! সেজঠাকুর ওঁরা যখন ধুতি পরতেন তখন সুন্দর লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে যোড়াসাঁকোর বাড়ীর চেয়ে ঢের বাবুয়ানা ভাবে পরতেন। ৬ নংয়ের ছেলেবাবুরা অধিকাংশই বাড়ীতে পাজামা কুর্তা এবং বেরবার সময় আচকান পরতেন বলেই মনে হয়, ধুতি হয়ত ক্রিয়া-কর্মে। ছোটবেলা মেয়েরাও ইজের জামা পরত। বোধহয় সেকালের মুসলমান-রাজরীতির জের।[১৭]

১৪ নংয়ের জীবনযাত্রা সহজ স্বাভাবিক ভাবেই চলেছিল ; বিশেষ কিছু উল্লেখ-যোগ্য এখন যে ঠিক মনে করতে পারছি তা নয়। উনি খেয়ে দেয়ে আফিস

চলে যেতেন ; আমি চিরকালই নিয়মভক্ত, পর ২ দৈনিক কাজ ক'রে যেতুম, -সামান্য ঘরসংসারের কাজ যা থাকত, লেখাপড়া, সেলাই এবং একটু দুফুরবেলা বিশ্রাম, যা চিরকালের অভ্যাস ; বা কোন আত্মীয়স্বজন এলে গল্প করা। উনি ফিরে এলে কোন ২ দিন বিকেলে সামনে বালিগঞ্জের মাঠে বেড়াতে যেতুম, সন্ধ্যায় হয়ত কেউ আসত।

অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। মনে আছে উনি একটি গ্ল্যাড্‌স্টন ব্যাগে কিছু কাপড় এবং নগদ ১০০০্ হাতে নিয়ে সংসার করতে আসেন। তাতে অত এলাহি চালে চাকর বাকর রেখে ক'দিন চলে ?—তবু ত বাড়ীভাড়া লাগত না। তখন রোজগার ওঁর কি হত মনে নেই—সামান্যই হবে। এটুকু মনে আছে যে ঐ মন্মদালিকে দিয়েই একটা মুক্তর চীক বাঁধা দিয়ে ধার করেছিলুম লুকিয়ে। কিছু বিক্রিও করেছিলুম। এই আমার হাতে-খড়ি। যদিও মা'কে সংসার খরচের জন্য গয়না বিক্রি করতে আগে দেখেছি, কাজেই আমার পক্ষে এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। কিন্তু উনি ওরকম ভাবে ঘরের জিনিষপত্র বেচে সংসার চালানোর মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। আত্মীয়স্বজনের কাছে ধারও করে-ছিলুম ; লিখেও রাখতুম ; কিন্তু নিকট আত্মীয়দের কতদূর দেনা শোধ করেছি সন্দেহ !

১৪ নংএ ক' বৎসর ছিলুম ঠিক মনে নেই। তবে অন্ততঃ ১৯০২ পর্য্যন্ত ছিলুম নিশ্চয়। কারণ সে বছর রাণী ভিক্টোরিয়া মারা যান, এবং আমার বড় ননদ (লেখিকা প্রসন্নময়ী দেবী) আমাকে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন—মনে আছে ঐ বাড়ীতেই, সম্ভবতঃ অপরের অনুরোধে। সে লেখাটা এখন হাতের কাছে নেই, কিন্তু না পড়েই বেশ বুঝছি যে সেটা নেহাৎ ছেলেমানুষী হয়েছিল, ইংরিজীতে যাকে বলে half-baked ও stilted, এবং বাঙ্গলায় যাকে বলে কাঁচা ও কারুলেশহীন, তাই ছিল, ভাবে ও ভাষায়। তার আগে কখনো ছাপাবার জন্য কিছু লিখেছি বলে মনে পড়ে না। যদিও দৈনিকলিপি জাতীয় কিছু লিখে থাকতে পারি, বংশগত হস্তকণ্ডুয়নবশতঃ। 'মারাঠী পানসুগারি' নামে সেকেলে 'ভারতী'-তে ঐ দেশে সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার ঐ জাতীয় এক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল. সেও সরলাদিদির অনুরোধে। চিরকাল অনুরোধের আসরই চালিয়ে যাচ্ছি, নিজে থেকে কখনো কিছু গড়ে তুলি নি। এখন পর্য্যন্ত অনুরোধে ঢেঁকি গিলছি. এই লেখাই তার প্রমাণ।

আর একটি অভ্যাসের আভাস ঐ একই সূত্রে ঐ বাড়ীতেই হয়েছিল। রাণী হরনাম সিংয়ের সঙ্গে সিমলা পাহাড়ে আলাপ হবার কথা আগেই বলেছি। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে আমাদের কাছে এক প্রস্তাব করলেন যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক নারীর কাছ থেকে ৫ [গণ্ডা] (এক পয়সা)

তুলে ভারতসাম্রাজ্ঞীর একটি স্মরণ চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা হোক। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ফলে দেখা গেল—বলিতে সহজ বটে করিতে তা নয়। যে সুষ্ঠু সংগঠন-প্রণালী ও বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এই প্রকাণ্ড মহাদেশের প্রত্যেক নারীর কাছে ভিক্ষাপাত্র ধরা সম্ভব হতে পারে সে কালে আমাদের পুরুষসমাজেরই ক'জন লোক সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন জানিনে, মেয়ে ত দূরের কথা। বহুকাল পরে অবশ্য অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্ততঃ বোম্বাই প্রদেশবাসীর সংগঠনক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল মাস ছয়েকের মধ্যে কস্তুরবা তহবিলে ক্রোড়াধিক (?) টাকা তুলে ফেলায়। কিন্তু সে কতকটা তদারকির (?) গুণে। রাণীসাহেবের কলিকাতাস্থ বাসাবাড়ীতে আমাদের তৎকালীন আধুনিক শিক্ষিতা অনেকেই যাতায়াত করলেন। মীটিং ও ইটিং করলেন, কা'কে কোন আসনে বসতে দেওয়া হবে তা নিয়ে মান-অভিমানও করলেন (যেমন আমাদের বাঙ্গালীর দস্তুর!) কিন্তু অবশেষে বোধ হয় ঐ পদ্ধতির পাষাণের ঘায়েই তরী ডুবল, এবং বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার কথা মত লক্ষ ২ [টাকার] স্থলে মোট ৫০০০৲ চাঁদা উঠল। সেই ৫০০০৲ আমার ভাগ্নী প্রিয়ম্বদা দেবীর[১৮] হাত দিয়ে বেলগাছিয়া হাঁসপাতালে পাঠানো হল। তখন বোধহয় তার নাম ছিল Albert Victor Hospital। ও হয়ত প্রিয়র সঙ্গে কোন সূত্রে কর্ত্তৃপক্ষের কিছু বিশেষ পরিচয় ছিল। সুবিধের মধ্যে এই দানের কল্যাণে তাঁর ওখানে রোগী পাঠাবার একটা অধিকার জন্মেছিল। আমার শাশুড়ীর অনুগত একটি ব্রাহ্মণের বিধবা ওখানে শিক্ষা লাভ ক'রে ভাল চাকরীও পেয়েছিল।

যদিও অনেক বৎসর পরেকার কথা, তবু এক ঘটনার এই সঙ্গে কতকটা যোগ আছে বলে এই প্রসঙ্গেই লিখছি। সকলেই জানেন ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের দরুণ বাঙ্গলা দেশময় কিরকম বিক্ষোভ ও আলোড়ন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং পরে ১৯১২ সালে রাজদম্পতি এসে সে ভাঙ্গাকে জোড়া লাগিয়ে কেমন স্থিরকে অস্থির ও অস্থিরকে স্থির ক'রে দিলেন। আমার সে সময় কেন জানিনে হঠাৎ কি এক খেয়াল মাথায় চাপল—বাতিকই বলতে হয়—যে এই বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে সানন্দ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার জন্য বাঙ্গালীর পক্ষ থেকে মহারাণীকে মূল্যবান সাড়ী ও সিঁদুর আলতাদি উপহার দিয়ে সধবা করা হোক। কখনো যা করি নি অর্থাৎ নিজে অগ্রণী হয়ে কোন সামাজিক কাজে নামা, তাই করলুল—পাঁচজনকে বলতে কইতে ও কওয়াতে লাগলুম; এমন কি রাজদরবারে এই মর্ম্মে আরজিও পেশ করলুম। কিন্তু উত্তর এল যে, মহারাণীর আর কোন সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করবার সময় নেই, বড় দুঃখিত ইত্যাদি।

পরে রাণীসাহেব বল্লেন যে, তোমাদের আরও অনেক আগে এ চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। যা হোক, বাড়ীর বাইরে একটা কোন সাধারণ সমবেত অনুষ্ঠান নিজের বুদ্ধি ও কল্পনাদ্বারা গড়ে তোলবার আমার এই প্রথম

ও শেষ ব্যর্থ চেষ্টা। পরে অবশ্য অনেক সভাসমিতিতে যোগ দিয়েছি. এবং এখনো দিয়ে থাকি ; কিন্তু জ্যাঠাইমা[১৯] যেমন তাঁর প্রথম জামাইষষ্ঠীর ব্যস্ততার সময় বলেছিলেন – 'এই আমার পেরথম !' এই জন্য বেথুন স্কুলে যে নারী-সভা ডেকেছিলুম, আবাল্য বন্ধু ও সুলেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণী[২০] তার বেশ মজার নকল ক'রে দেখাতেন, কেমন ক'রে কোন্ প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে কোন্ মহিলা অনভ্যস্ত কুণ্ঠিতভাবে চৌকি ছেড়ে অল্প উঠে 'আমি এই প্রস্তাব অনুমো—বলে অর্দ্ধোক্তিপূর্ব্বক অর্দ্ধপথে বসে পড়ছেন. ইত্যাদি হাস্যকর ব্যাপার। সে 'আধ-আধভাষিণী'[২১] বঙ্গমহিলা এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয়।

তখন সবুজপত্র বেরবার বহু দেরি থাকলেও উনি ডেস্কে বসে২ প্রবন্ধ লিখতেন মনে আছে, তার একটার বিষয় যেন ছিল 'চিনির শুল্ক'।[২২] এই নামে যদি কোন প্রবন্ধ ওঁর প্রকাশিত হয়ে থাকে ত তারিখ মিলিয়ে সময়ের তুলনা করা যেতে পারে।

অনতিবিলম্বেই আমরা নিজস্ব কমলালয়ের বাড়ীতে উঠে গিয়ে থাকব মনে হয় এই কারণে যে, ১৯১১ সালে সেখানে খাবার টেবিলে বসে আমাদের দুজনের দুই ভাইয়ের বিয়েতে কি দেওয়া হবে তার আলোচনা করছি যেন মনে পড়ে। আমার ত একটি মাত্র ভাই বা দাদা কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হন না আগেই বলেছি। অবশেষে মহর্ষির প্রিয় শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর মেজ মেয়ে সংজ্ঞা[২৩] সেজেগুজে তার ভাইয়ের পৈতের নিমন্ত্রণ করতে এলে, আমার দেবর সুহৃৎনাথের প্ররোচনায় তাঁর সঙ্গে সুরেনের বিয়ের কথাটা তোলা হয় এবং ক্রমে স্থির হয়। লোকে হয়ত 'যার সঙ্গে যাঁর হবার' সেই মামুলী কথা তুলবে ; যদিও আমার তাতে কেবল যা হয়েছে তা হয়েছে—এ ছাড়া আর কিছুই বিশেষ বলা হয় বলে মনে হয় না। আর ওঁর তখন যে ভাইয়ের বিয়ের কথা হচ্ছিল, তিনি আমার 'নতুন' ঠাকুরপো মন্মথ।[২৪] তিনি ছিলেন মাদ্রাজে পল্টনের ডাক্তার এবং আমার পিসতুতো বোন ইন্দুদিদির (বড়পিসিমা সৌদামিনী দেবীর ছোট মেয়ের) বড় মেয়ে লীলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সে দেখতে সুন্দরী ছিল।

শ্বশুরবাড়ী

এইখানে আমার শ্বশুরবাড়ীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া মন্দ নয়, যেমন বাপের বাড়ীর দিয়েছিলুম।

আমার শ্বশুরপরিবার ছিলেন পাবনা হরিপুরের চৌধুরী বংশ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বোধহয় কাপ শ্রেণী। শুনেছিলুম তাঁরা শ্রোত্রীয়ের মেয়ে বিয়ে করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের কুলীনে কন্যাদান করতে হয়। নাটোররাজ যখন খুব বাড়-বাড়ন্ত, যখন বাহান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা খাজনা দিতেন বলে শুনেছি,

তখন এ দের কোন পূর্ব্বপুরুষ তাঁদের দেওয়ানী করেছিলেন, এবং বিপদের সময় শ্যামরায় ঠাকুর বুকে ঝুলিয়ে সাঁতরে পার হয়ে হরিপুরে এসেছিলেন ; সেই অবধি ঐখানে শ্যামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়। বংশলতায় পরে দেখেছি কোন হরি কীর্ত্তনিয়ার নামে গ্রামের নাম হয় হরিপুর।

নাটোর রাজবংশের সঙ্গে ওঁদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আর আমার শ্বশুরের এক মাসির রাজবাড়ীতে বিয়ে হবার দরুণ একটু কুটুম্বিতাও হয়েছিল। যত দূরেরই হোক, ৺মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ নিজগুণে শেষ পর্যান্ত সে সম্পর্ক বজায় রেখে গেছেন। আমার পিসশাশুড়ীদের ধরে ২ সব কুলীনে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সে মূর্খ দরিদ্র যেমনই হোক না কেন। কুল রাখতে গিয়ে এই অকাজ করার দরুণ পিসিমাদের কাছে ভাইরা তটস্থ ও হাতযোড় হয়ে থাকতেন ; 'হরিপুরের ঠাকুরঝি'র আমরা বরাবরই প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিই কল্পনা ক'রে এসেছি ; তবে এদিকে ভাইপোদের খুব ভালবাসতেন শুনেছি। আমার নিজের বড় ননদ প্রসন্নময়ী দেবীর[২৫] মধ্যে হরিপুরের ঠাকুরঝির এই রুদ্র রূপের আভাস আমরাও কতকটা দেখতে পেয়েছি।

আমার পূজনীয় শ্বশুরমহাশয় দুর্গাদাস চৌধুরীর[২৬] রং খুব কালো কিন্তু মুখের কাট ভাল ছিল। খুব রাশভারি লোক ছিলেন শুনেছি, ও ছেলেরা ভয় ক'রে মেনে চলত। বড়দের নাকি বাবু বলে ডাকতেন, – যথা 'প্রমথবাবু'। শুনেছি senior scholar ছিলেন, পড়াশুনা ভালবাসতেন, ও বাড়ীতে ভাল লাইব্রেরি ছিল ; সে কথা ওঁর আত্মজীবনী থেকেও জানা যায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বলে ঘুরে ২ বেড়াতে হত। সেই কারণে, কৃষ্ণনগরে বাড়ী কিনে সেখানে স্ত্রী পরিবার রেখে দিয়েছিলেন। সে বাড়ীর গল্প ওঁদের কাছে অনেক শুনেছি। আর বহু পরে কৃষ্ণনগরের সাহিত্য সম্মেলনে[২৭] গিয়ে দেখেও এসেছি। বেশ বড় ২ ঘর ও ১১ বিঘা জমি আছে দেখলুম। কিন্তু তখন সব পোড়ো অবস্থা। এমন কি, ভাঙ্গা ছাদের ভিতর দিয়ে অশ্বত্থের ডাল চলে এসেছে ; দেখে খারাপ লাগল।

বড় মেয়ে প্রসন্নময়ী দেখতে সুন্দরী ছিলেন, এবং ভাইদের সঙ্গে থেকে তিনি বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ শিখেছিলেন। নিজে লিখতেও পারতেন। নবীন সেন প্রভৃতি তখনকার লেখকদের সঙ্গে তাঁদের বেশ মেলামেশা, আলাপ পরিচয় ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রামতনু লাহিড়ি রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন বঙ্গ ভদ্র-পরিবারের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

এ-হেন মেয়েকে জাতিরক্ষার খাতিরে পিসিমারা ১০ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকুমার বাগচী নামক এক পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ঠাকুরঝি সে গুণাইগাছা গ্রামে গিয়ে বেশিদিন ঘর করতেও পারলেন না, আর জামাইবাবুরও কিছুদিন পরে মস্তিষ্ক বিকার হল। তাঁদের একমাত্র সন্তান ও

কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীও সুন্দরী ছিলেন, এবং পরে বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পাস ক'রে সুকবি বলে খ্যাতি লাভ করেন।

আমার শাশুড়ী ছিলেন বাগের রায়দের ঘরের মেয়ে। সেই বারো ভূঁইঞাদের মধ্যে বাগের রায়রা ছিলেন একজন। তাঁর মুখশ্রী তত কাটা না হলেও রঙ ধবধবে ছিল। আর উনি ত বলতেন আমার বুদ্ধিসুদ্ধি রসবোধ প্রভৃতি যা-কিছু, সব মায়ের কাছে পাওয়া।

আমার মাস-শাশুড়ীর পদবী 'খাঁ' শুনে প্রথমে আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। পরে শুনলুম বারেন্দ্রদের নাকি ঐ পদবী হয়। দুই বোনের নাম ছিল মগ্নময়ী ও দ্রবময়ী। মাসিমা ১৪ বৎসর বয়সে বিধবা হয়ে বোনের সংসারে এসে সেই এক হিঁদু বিধবার আচারে চিরদিন থেকে শেষ পর্য্যন্ত বোনের ছেলেপিলে ঘরসংসার দেখাশোনা ক'রে গেলেন। মাসিমাকে ওঁরা খুব ভালবাসতেন, ও তাঁর কাছ থেকে খুব আদর আবদার পেয়েছেন। রাত ২৷৷০ টায় নাকি লুচি খেতে চাইলেও ক'রে দিয়েছেন। তখনকার দিনে বেশি চাকরবাকর রাখবার ত রেওয়াজ বা ক্ষমতা ছিল না। অথচ উনি বলতেন ওঁরা বরাবর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরেছেন ও ভাল খাবার খেয়েছেন। অমন সেবাপরায়ণ বোন ঘরে ছিলেন বলেই বোধহয় মা অতগুলি ছেলেকে ভালভাবে মানুষ করতে পেরেছিলেন।

আমরা মায়ের সাত ছেলে ও দুই মেয়ে দেখেছি। শুনতে পাই আগে তাঁর একটি মেয়ে ও ঠাকুরঝির একটি ছেলে মারা যায়। সব প্রথম ঠাকুরঝি প্রসন্নময়ী বোধহয় ১৮৫৪ খৃ-এ জন্মান; তারপরে ১৮৬০-এ বড় ভাসুর আশুতোষ চৌধুরী; ১৮৬৩তে মেজ ভাসুর যোগেশচন্দ্র; ১৮৬৬তে সেজ ভাসুর কুমুদনাথ; ১৮৬৮তে প্রমথনাথ; ১৮৭০-এ মন্মথনাথ; ১৮৭১-এ ছোট ননদ মৃণালিনী বা মেনা; ১৮৭৫-এ সুহৃৎনাথ এবং ১৮৭৮-এ ছোট দেবর অমিয়নাথ (একমাত্র বর্ত্তমান)।

বড়ঠাকুরকে ওরা ব্যারিস্টার হতে বিলেত পাঠান। সেই জাহাজেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়[২৮], এবং সেই আলাপের সূত্রেই বিলেত থেকে ফিরে এলে প্রতিভাদিদির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ করবার জন্য রবিকাকা কৃষ্ণনগরে যান। কত সামান্য ঘটনার উপর কত লোকের জীবনের গতি নির্ভর করে তাই ভাবি। বড়ঠাকুর লেখাপড়ায় পারদর্শী ছিলেন, এবং সৌজন্যগুণ খুব ছিল। তিনি আমার খুড়তুতো বোন প্রতিভাদিদিকে বিয়ে করেন তা ত আগেই বলেছি।

মেজঠাকুর যোগেশচন্দ্র চৌধুরীও বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হন, পরে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন, এবং সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের সেজ মেয়ে সরসীবালাকে বিবাহ করেন। সেজঠাকুর কুমুদনাথ চৌধুরী প্রথমে ওকালতী ক'রে টাকা জমিয়ে বোধহয় নিজের খরচে ব্যারিস্টার হতে বিলেত যান। মেজঠাকুর পরে Weekly Notes বলে একটি আইনের সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন ও ছাপাখানা স্থাপন ক'রে নিজে উপার্জ্জন করেন। সে ছাপাখানা এখনো চলছে।

সেজঠাকুর[২৯] স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথ ডাঃ প্রতাপ মজুমদারের চতুর্থ কন্যা রাধারাণী দেবীকে বিবাহ করেন। এবং ভাল শিকারী বলে খুব নাম করেন। এখনো তাঁর ২।১ নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ীতে তার বহু নিদর্শন আছে।

প্রমথনাথের কথা ত জানাই আছে। এঁরা চারজনই বিলেত যাবার আগে এম. এ. পাস করেন, এবং চারজনই বালিগঞ্জে কাছাকাছি বাড়ী করেন। আমাদের ১২ নং ব্রাইট স্ট্রীটটা ত মা ওঁরাই দিয়েছিলেন।

ছোট ঠাকুরপো মন্মথনাথ খেলাধূলায় ভাল ছিলেন, কিন্তু ভাইদের মত অত পাস করতে পারেন নি বলে বরাবর বিনয় ক'রে বলতেন যে আমার জীবনে যা-কিছু উন্নতি হয়েছে, সে আমার মায়ের পুণ্যের জোরে। এই কথাটি আবার আমার মায়ের শুনতে খুব ভাল লাগত। অথচ তিনি বোধহয় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম Surgeon Genl.-এর উচ্চ পদে অন্ততঃ কিছুদিন অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আমাদের খুব ভালবাসতেন, বলতেন 'ন'দা আমার গুরু' ; কারণ উনি বুঝি পৈতের সময় কানে মন্ত্র দিয়েছিলেন। ফী বছর মাদ্রাজ থেকে ছুটে ২ ভাইদের দেখতে আসতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মেসপোটেমিয়ায় গিয়ে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন ; যদিও যাবার কোন দরকার ছিল না, কারণ এখানে ত সরকারী চাকরীতে যথেষ্ট আয় ছিল। ভাল ডাক্তারও ছিলেন, আর ছোটবড় আপনপর ভেদজ্ঞান ছিল না। তিনি আমার পিসতুতো বোন ইন্দুদিদির মেয়ে লীলাকে বিয়ে করেছিলেন, সে ত আগেই বলেছি।

মেনার বিয়ে হয়েছিল দেবগ্রামের ডাঃ উমাদাস বাঁড়ুয্যের সঙ্গে। তিনিও ভাল ডাক্তার ছিলেন এবং পাথুরিয়াঘাটার মহারাজাদের বাড়ীর প্র্যাকটিস্ একচেটে ক'রে নিয়েছিলেন। কথায় বার্ত্তায়ও বেশ রসিক ছিলেন, তাই ত আমি বলি যে, বিয়ে হয়ে অবধি আর ফী দিয়ে ডাক্তার ডাকতে হয় নি ; আমার নন্দাই উমাদাস এবং দেবর সুহৃৎনাথের হাতেই সপরিবারে প্রাণ সমর্পণ করেছিলুম। এই উমাদাসেরই দাদা রাইপুরের বর্দ্ধিষ্ণু উকীল তারাদাস বাঁড়ুয্যের সঙ্গে ভাগ্নী প্রিয়ম্বদার বিয়ে হয়। প্রিয় তিন বৎসরের পর বিধবা হয়ে একমাত্র ছেলে নিয়ে কলকাতায় থাকতে এল। পরে সেও বালিগঞ্জে বাড়ী ক'রে থাকে।

সুহৃৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতনী নলিনী দেবীকে বিবাহ করেন, এবং মহর্ষিই তাঁকে বিলেত পাঠান। অমিয়নাথ ব্যারিস্টার হন এবং উমেশচন্দ্র বাঁড়ুয্যের সেজ মেয়ে প্রমীলাকে বিবাহ করেন ও ব্যারিস্টারীতে প্রচুর ধনমান অর্জ্জন করেন।

সুহৃৎ অমির জন্মের পর থেকেই আমার শ্বশুরপরিবার একরকম কলিকাতাবাসী হয়ে পড়েছিলেন, তাই ওরা সেণ্ট জেভিয়ারে একটু ইংরিজী ধরনে মানুষ হয়েছিল ; হরিপুর দেশের প্রভাব তেমন ওদের উপর পড়ে নি। তবে একটি দুটি ক'রে দেশের আত্মীয় সকলের বাড়ীতেই প্রতিপালন হয়েছিল। আমার শাশুড়ীর নিজের অত বড় পরিবার থাকা সত্ত্বেও ২।৪টি জ্ঞাতি সর্ব্বদাই কাছে রাখতেন।

ওঁদের পিসতুতো ভাই, জ্যেঠতুতো ভাইয়ের ছেলে ইত্যাদি; যেমন সেকালের রেওয়াজ ছিল।

তখনকার হরিপুরের ছোটতরফ বড়তরফের ভিতর আমার শ্বশুররা ছিলেন বড়তরফ। শুনতে পাই ওঁদের আগে ভাল অবস্থা ছিল, কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলে একটা বড় মামলা হেরে গিয়ে অনেক টাকা লোকসান হয়ে যায়। আমার শাশুড়ী সেজছেলের কাছে বেশির ভাগ থাকতেন বলে সেখানেই হরিপুরের লোক বেশি আসত; ২।৩ টি ছেলে তাঁদের কাছে মানুষও হয়েছিল।

আমি বিয়ে হয়ে ছোট তরফের অনেককে ওখানে আসতে ও থাকতে দেখেছি। সকলেই বেশ কইয়ে বলিয়ে এবং ভদ্র ছিল। সেজঠাকুরই শিকারের জন্য হরিপুরে বেশি যাতায়াত করতেন। মেজঠাকুরই সেখানে বাড়ী করেছেন। বড়ঠাকুর একটা বৈঠকখানা ঘর এবং পাবনায় বাপের নামে একটা টোল ক'রে দিয়েছেন শুনেছি।

আমি এক একবার ওঁদের বলতুম যে কত লোকে দেশে হাঁসপাতাল ইস্কুল প্রভৃতি কত কি ক'রে দিয়েছে, আর তোমরা সাত ২ ভাই কৃতী হয়ে দেশের জন্য কিছু করলে না। একেবারে যে কিছু করেন নি, তা নয়। একটা ডাক্তারখানা খুলে সেজঠাকুর হরিপুরে ডাক্তার বসিয়েছিলেন; কিন্তু লোকে তাকে শুধু ২ ডেকে ফী দিত না, তাই তার পোষাল না। স্কুলেও আমরা সকলে মাসে ২ চাঁদা দিয়েছি, কিন্তু ওখানকার লোকই ভাল ক'রে চালাতে পারলেন না, তাই বোধহয় উঠে গেছে। আর এখন ত সবই পাকিস্তানে চলে গেছে।

আমার আর জীবনে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হল না। একবার সব যাবার ঠিকঠাক হয়ে যায়, হাতী আনিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেও, দাঁতে ব্যথার দরুণ শেষকালে বাধা পড়ল। তবে আমাদের কলকাতার বাড়ীতেও ২।৩টি হরিপুরের ছেলে বছরের পর বছর থেকেছে, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত হরিপুরের সঙ্গে যাতায়াত ও চিঠিপত্রাদি দ্বারা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ যোগ রাখা হয়েছিল। আমি ত এক সময় বলতুম যে, পাঁচরকম সমাজের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা করতে হয়, বাপের বাড়ী, মামার বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, হরিপুর এবং বিলাতফেরৎ বন্ধু বা ব্রাহ্মসমাজ। সেজদি মেজদি হরিপুর গেছেন; কিন্তু আমরা আর কোন বউ যাই নি।

আমার স্বামী ওঁরা হিঁদু সমাজেই মানুষ হয়েছেন, —প্রথমে হরিপুরে ও পরে কৃষ্ণনগরে। কিন্তু বিলাত গিয়ে জাতিচ্যুত হওয়ায় এবং বিশেষ কোন ধর্ম্মমত না থাকায় পরে যিনি যেরকম ঘরে বিয়ে করেছেন, সেইরকম আচারই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ বড় ভাসুররা আমরা ও সুহৃৎরা ব্রাহ্মমতে এবং মেজঠাকুর সেজঠাকুর হিঁদুমতে ক্রিয়াকর্ম্ম করতেন। ছোটঠাকুরপো ত দূরে ২ থাকতেন। আর ছোট জা প্রমীলা ব্রাহ্মমতই পছন্দ করত, যদিও মেয়ের বিয়ে শেষে হিঁদু-মতেই দিল। নলিনীও বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে এক মেয়ের বিয়ে শেষে হিঁদুমতে

দিল, ঘরে ২ গগনদাদার ছেলের সঙ্গে[30], তার বাপের প্ররোচনায়, মেয়ে সুখে থাকবে বলে।

এখন পিছিয়ে ভেবে দেখতে গেলে মনে হয় যে, আমাদের নিজস্ব ১২ নং ব্রাইট স্ট্রীটের কমলালয় বাড়ীতেই জীবনের সব চেয়ে সুখের দিন কেটেছে — নির্ঝঞ্ঝাট, নিরাপদ এবং আত্মীয়বন্ধুপরিবৃত। আমাদের বাড়ী হবার আগেই··· নাম অনুসারে ছেলের বাড়ীর 'সুরপুরী' এবং মেয়ের বাড়ীর 'কমলালয়' নাম ঠিক ক'রে দেন। যদিও আমরা ১৯১৫-য় বাড়ী বিক্রি করা পর্য্যন্ত একটানা সেখানে ছিলুম না, অনেক সময় ভাড়া দিয়ে এখানে ওখানে থেকেছি। একবার আফগান কন্সল, একবার রাণাঘাটের পালচৌধুরীদের, একবার আর্ম্মানি ক্লাব, —এই সব কত লোককে ভাড়া দিয়েছি মনে পড়ে। তা ছাড়া জমি বিক্রি করেও কত টাকা পেয়েছি। নয় বিঘার মধ্যে আদ্ধেক সেজঠাকুরকে ১৮ হাজারে বেচা হয়; তারপরে রাস্তার দিকে একটা বাঁক ম্যুনিসিপ্যালিটি ১২ হাজারে নেয়। এই ত গেল ৩০০০০৲। তা ছাড়া ভাড়া দিয়েও কত পেয়েছি। কমলালয় আমাদের নামেও লক্ষ্মী, কাজেও লক্ষ্মী ছিল। War Boom-এর বেশি দাম পেয়ে লোভে পড়ে ও-বাড়ী হাতছাড়া করাতেই আমাদের যত দুরবস্থায় পড়তে হল।

উল্লিখিত দাদার বিয়ের পরেই আমরা তাঁদের সঙ্গে দিনকতক দার্জ্জিলিঙে Hermitage বাড়ীতে গিয়ে থাকি বোধহয় ১৯০৩ খৃঃ এ। সেটা লাটসাহেবের Shrubbery বাড়ীর একটু নীচের দিকে, কিন্তু বেশ বড় বাড়ী ছিল মনে আছে।

রস দাসী

রস বলে আমাদের এক পুরনো মামার বাড়ীর দাসী ছিল। সে একটু লেখাপড়া জানত ও শুদ্ধভাষী ছিল বলে আমরা তাকে 'পণ্ডিতা' আখ্যা দিয়েছিলুম। সে নতুন বউকে অনেক শিক্ষা দিত, তার মধ্যে দু'একটা মনে আছে: বিলিতী বেগুনকে বলতে হবে 'টমাটম্' আর অড়হর ডালকে 'রহরকি' ডাল। আর বলত বউমা 'পিতৃলয়ে' গেছেন। আর 'আমাদের যখন পরা ছিল, তখন গিরিন্ পাড়টা বড় ভালবাসতুম দিদিমণি'। কত আর তার গল্প করব।

সব চেয়ে মজার হচ্ছে একবার ১৯ নং স্টোর রোডের একতলার সিঁড়ির ঘরে পাথরের টেবিলের উপর রাখা লণ্ঠনটা দাউ ২ ক'রে জ্বলছে দেখে রস বল্লে, 'শিখাটা বড় প্রবল হয়েছে'; অমনি ইন্দুদিদি টপ ক'রে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, —'একটু দুর্ব্বল ক'রে দাওনা হে।' সেই নিয়ে কত হেসেছি, আর এখন পর্য্যন্ত ছেলেদের কাছে গল্প করি আর হাসি।

সেই রসকে রাঁচিতে ভাল্লুকে কামড়ালে; —সেই যে বলে বুনো জানোয়ার

যে হাত তাকে খাওয়ায় সেই হাতই কামড়ে দেয়—ঠিক তাই। মা বাবা এক-যোড়া বাচ্ছা ভাল্লুক কোত্থেকে এনে পুষেছিলেন। তাদের খাঁচিতে তারের জালঘেরা ঘরে রাখা হত, আর রস তাদের খেতে দিত। একদিন রস তাদের খাবার নিয়ে ঢুকেছে, আর কি জানি কেন,—তখন হয়ত একটা বয়সে তাদের স্বাভাবিক হিংসা-প্রবৃত্তি জেগেছে, হঠাৎ তার গায়ে লাফিয়ে উঠে একেবারে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলে। মা তাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে কত ক'রে তবে সারিয়ে তুল্লেন।

ভাল্লুকগুলোর কি হল তা মনে নেই। ঐ রস কতদিন আমাদের কাছে থেকে শেষে অসুখ ক'রে গায়ে পোকা পড়ে মারা গেল। তাদের বাড়ী ছিল তারকেশ্বরে। নিজের ছেলেপিলে হয় নি বলে ভাইপোকে পুষ্যি নিয়ে মানুষ করলে, বিয়ে দিলে। তার বউ অম্র এখনো পর্য্যন্ত আমাদের কাছে আসে।

Hermitage-এ অনেক লোক আসত, তার মধ্যে কুচবেহারের মহারাণীর বোন্ ও রাজেন মুখুয্যেদের মেয়েদেরই বেশি মনে পড়ে। আমাদের লম্বা চুল আগুনের কাছে বসে ২ শুকোতে দেরি হত, অথচ তারা বেশ বেলাবেলি চুল বেঁধে ফিটফাট হয়ে বেরত কি ক'রে তার হদিশের সন্ধান করতে গিয়ে বেরলো—তারা যে রোজ স্নান করে বলে, তার মানে মাথায় জল দেয় না। সে বুদ্ধিটা আমাদের হলে 'গোল ত মিটেই যেত'। মহারাণীও শুনেছি রাত্রে হপ্তায় দুতিন দিন মাথায় তেল দিয়ে মাথা বেঁধে শুতেন। কারণ তাঁদের পরিপাটি ক'রে চুল বেঁধে সারাদিন তৈরি থাকতে হত, আমাদের মত গয়ং গচ্ছ ত তাঁদের সাহেব-সুবোর মহলে চলবে না।

১৯ নং স্টোর রোড

মা ওঁরা ইতিমধ্যে কবে যে ১৯ নং স্টোর রোড কিনে সেখানে উঠে গিয়েছিলেন তা ঠিক মনে নেই। কিন্তু সেটা বাড়ীর মত বাড়ী ছিল বটে। বাইশ বিঘে জমি আর তিনটে পুকুর, তার মধ্যে পিছনের ফটকটা কড়ায়া রোডে গিয়ে পড়ত, তারই ৯৩ নংয়ে দিদিমাদের বাড়া ক'রে দিলেন। সেই যে বল্লুম নিজের হীরের গয়না বিক্রি ক'রে দিদিমার সাধ পূর্ণ করবার জন্য ঘুসুড়িতে গঙ্গার ধারে একটা ছোট একতলা বাড়ী বাগান কিনে দিলেন,—বাবার কাছে আর মা-বাপের জন্য টাকা চাইবেন না বলে। তারপর দিদিমার একটু অসুখ করলেই মায়ের সংসার ফেলে ঠিকা গাড়িতে অতদূর ছকড়্ ২ ক'রে যাওয়া অসুবিধে হত বলে সে বাগান আবার উত্তরপাড়ার বাবুদের কাছে ৫০০০্-য় বিক্রি ক'রে দিলেন ও সেই টাকা দিয়ে কড়ায়া রোডের উপর দিদিমাদের বাড়ী ক'রে দিলেন। সে বাড়ী তাঁরা বংশানুক্রমে বহুদিন ভোগ করেছেন। এমন কি দাদামশায় দেশের মত ক'রে পুকুরপাড়ে যে সুপুরি নারকোলের গাছ সারবন্দী লাগিয়েছিলেন,

তারও ফল ভোগ ক'রে গেছেন। তাঁরা দুজনেই ঐ বাড়ীতে মারা যান। তার অনেকদিন পরে সুরেনের দেনার দায়ে[৩১] ঐ বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলে মামীদের অন্য ভাড়াবাড়ীতে চলে যেতে হয়। বাড়ীটা মায়ের স্ত্রীধনের টাকা দিয়ে করা, কিন্তু মামাকে যে সেইটে লেখাপড়া ক'রে দেবেন, সে বুদ্ধি তাঁর মাথায় যোগায় নি; তাহলে আর বাড়ীটা যেত না। ওঁদের কাজই ঐরকম।

১৯ নংয়ের বাড়ীটা বহু পুরনো, শুনেছি ১০০ বছরের দলিল ছিল। কিন্তু ঘরবারান্দাগুলি খুব দরাজ মাপের—আমি যে বলি আজকালকার বাড়ীর মত greatest possible number in the least possible space-এর আদর্শে তৈরি নয়। একটা বকুলতলা ছিল; তিন চারটে বকুলগাছ এমন ভাবে পোঁতা যে মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড সবুজ গম্বুজ তৈরি হয়; তার তলায় মস্ত গোল বাঁধানো বেদি। ছেলেপিলে খেলবার বা দোলবার বা চড়ুইভাতি করবার আদর্শ স্থান। এমন বাড়ী বা ঘুস্‌ড়ির গঙ্গাধারের বাগানবাড়ী যে দাদার ছেলেদের ভোগে এল না তা মনে করলে দুঃখ রাখবার স্থান থাকে না।

ঐ ১৯ নং বাড়ীর সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িত তা বলে শেষ করা যায় না। বউয়ের প্রত্যেক ছেলেই ওখানে হয়; যখন ছাড়তে হল চোখের জল ফেলতে ২ চলে গেল। বাবা তেতলার ঘরে বসে খুট্‌খাট্ ক'রে কত typewrite করতেন, সে সব বড় ২ বাঁধানো বই এখনো আছে। ঐখানে থাকতে ২ বউয়ের ছেলের সঙ্গে অক্ষয় চৌধুরীর মেয়ে উমার মেয়ের সঙ্গে পুতুলের বিয়ে হল। বউ বুদ্ধি ক'রে ছেলে নিয়েছিল বলে কত সুন্দর ২ জিনিষ পেলে, যা বাস্তবিক কাজে লাগে।

ঐখানে থাকতে ২ কেশববাবুর নাতনী মট্‌রীর সঙ্গে পাঞ্জাবী চমনলাল ডিংরা নামক সুন্দর ছেলের বিয়ে হল; মা বরপক্ষের সব কাজ করলেন। সেই মট্‌রী বছর তিনেক পর বিধবা হয়ে সিমলায় নিজের বাড়ীতে বাস করছিল। এই অল্পকাল হল মারা গেছে শুনলুম। তার মেয়ে ঋতা কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে কে জানে। মেয়েটা দেখতে শুনতে ভাল, ক্ষমতাও ছিল; কিন্তু ওদের ত রাজা-রাজড়া নইলে মন ওঠে না, তাই শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে হল না।

ঐ ১৯ নংয়ে থাকতে ২ বসন্তরাও বলে একজন মারাঠী যুবক তার পার্শী স্ত্রী জাইবাইকে নিয়ে পালিয়ে এসে সুরেনের কাছে এক রাত্রের আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে কত বছর বাগানের একটা ছোট বাড়ীতে থেকে চলে গেল। সেইখানেই ছেলেপিলে হল ও ক্রমশঃ মা-বাপের সঙ্গে জাইবাইয়ের মিটমাট হয়ে গেল। জাইবাই একেবারে 'বাবু' ২ ক'রে অস্থির—অমন লোক সে জীবনে কখনো দেখে নি। তা না হলে বাপ মা দেশ জাত জ্ঞাত সব ছেড়েছুড়ে তার পিছনে ২ চলে আসবেই বা কেন? আর বাস্তবিক বসন্ত রাও বেশ চটপটে করিতকর্ম্মা ও দেখতে সুশ্রী ছেলে ছিল। তবে যুদ্ধের সময় রাঁচিতে কুলি সরবরাহ করতে গিয়ে কি সব তহবিল তছরূপ ক'রে বিপদে পড়ে গিয়েছিল। অবশেষে পাহাড়ে থেকে

গর্তে লাফিয়ে পড়ে ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে কতদিন হাঁসপাতালে পড়ে থাকে। তখন জাইবাইয়ের সে কি ছুটোছুটি দৌড়দৌড়ি। কত কাণ্ডই হল। তারপর বহুকাল তাদের আর কোন খবর নেই।

টিণ্ডারিয়া

হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে 'হারমিটেজে' যাবার আগে বোধহয় ১৯০২ খৃঃএ আমরা দুজন এবং ঠাকুরঝি ও সুহৃৎ নলিনী দুই বাচ্ছাসহ টিণ্ডারিয়ায়[৩২] বেড়াতে যাই। উনি কাজের জন্য সব সময় থাকতে পারতেন না। সেখানে বড়ঠাকুর[৩৩] ৭০০০৲ দিয়ে এক সাহেবের কাছে একটি চা-বাগান এবং একতলা বাঙ্গলো কিনেছিলেন। তারপর ২৮ হাজার খরচ ক'রে সেই বাড়ী বাড়িয়ে, দোতলা ক'রে, প্রত্যক ঘরে যেন মেয়ের বিয়ের দানসামগ্রীর মত আসবাব দিয়ে একেবারে কলকাতার বাড়ির মত সাজিয়ে ফেল্লেন। সাধে কি মাসিমা তাঁর সম্বন্ধে আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন যে 'বাছার আমার সব টাকা শুধু ইঁট আর কাঠেই গেল!' কিন্তু সে পরের কথা।

আমাদের প্রথম যাবার তারিখটা সঠিক মনে আছে এই জন্য যে, সুহৃৎ এর বড় মেয়ে সুরমা তখন বছর দেড়েকের, আর বড় ছেলে সঞ্জীব মাস ছয়েকের। আর তাদের জন্মের সাল আমি জানি ১৯০১ এবং ১৯০২। টিণ্ডারিয়ায় কিছু করবার বা কোথায়ও যাবার ছিল না। একদিকে স্টেশন আর অপরদিকে গয়াবাড়ী ছাড়া। তাই মনে আছে সুহৃৎ সারা সকাল মাথায় সোলার টুপি দিয়ে ছেলে-দুটোকে নিয়ে বাগানে বসে রোদ পোহাত ও পাহারা দিত এবং রেলগাড়ির যাতায়াত দেখত।

সন্ধ্যাবেলা আমরা চারজনে গ্রাবু খেলতুম। যদিও আমি এত কাঁচা খেলোয়াড় ছিলুম যে, কি ২ রঙ বেরিয়ে গেছে তাই হিসেব রাখতে ২ মুখে কথা ফুটত না। গম্ভীর হয়ে বসে খেলতুম। আর রাত্রে ঠাকুরঝিরা শুয়ে পড়লে আমি শুতে যাবার আগে তাঁর খাটের পাশে একটা আলনার বাক্‌সের উপর বসে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে তবে শুতুম। ওঁরা ঠাট্টা ক'রে বলতেন, 'বিবি স্বাস্থ্যরক্ষা করছে!' কিন্তু খাবার পর কিছুক্ষণ বসা আমার বাপের বাড়ীর বরাবরকার অভ্যাস। বিয়ের পর থেকেই এই তফাৎটা আমার নজরে লেগেছে। কারণ ওঁরা সব ভাই দেখতুম খেয়েই শুতে যাবার পক্ষপাতী।

বড়ঠাকুরের ৬ নং বালিগঞ্জ স্টোর রোডের প্রাসাদোপম বাড়ীতে (এখন পর-হস্তগত) কতবার নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখেছি আহারান্তে বাড়ী যাব বলে যেমন একদিকের সিঁড়ি দিয়ে নাবছি, অপরদিকের সিঁড়ি দিয়ে বড়ঠাকুর ততক্ষণ তেতলায় শোবার ঘরে উঠতে আরম্ভ করেছেন।

টিণ্ডারিয়ার চৌকিদারের সুন্দর ছোট মেয়েরা খাবার টেবিলের কাছে এসে রোজ দাঁড়াত, আর কি খেয়েছে জিজ্ঞেস করলে রোজ বলত—'রাইকো শাক

আওর ইস্‌কুস্' – অর্থাৎ squash। এই তরকারিটির বিশেষ কোন স্বাদ নেই, দেখতে অনেকটা কাঁটাওয়ালা ছোট লাউয়ের মত। কিন্তু ওখানে এই squash, এবং ধুতুরা ফুল, ও ঝুম্‌কো ফুল, এই তিন জিনিষ খুব বড আকারের হত। আবার 'মধেশ' বা সমতল ভূমিতে এনে পুঁতে দেখেছি সে গর্ব্বাকৃতি চেহারা খর্ব্বাকৃতি হয়ে যায়।

এখন মনে হয় টিওারিয়া আসবারও আগে, বিয়ের বছর ১৮৯৯-তেই একবার দার্জ্জিলিং বেড়াতে আসি। মহারাণী সুনীতি[৩৪] আমাদের এত পুরনো বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমার বিয়ের নিমন্ত্রণে আসেন নি। এই কারণে যে মা ২।৪ জন বিশেষ পুরনো বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু মহারাণীদের পত্র-দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন; সে ত্রুটি মার্জ্জনা হয় নি। তাই আমাকে পাহাড়ে একটা যেন ব্রেস্‌লেট উপহার ও পরে একটা ছোট গরম ক্লোক দেন, যা অনেকদিন পর্য্যন্ত পরেছি।

দার্জ্জিলিং

কবে কিসের থেকে ওঁর দার্জ্জিলিংয়ে গিয়ে ব্যারিস্টারী করবার কল্পনা মাথায় উদয় হল তা ঠিক মনে নেই। হয়ত অত ব্যারিস্টার ভাই সব এক জায়গায় গুঁতাগুতি ক'রে থাকার চেয়ে তফাৎ থাকাই সার কথা ভেবে থাকবেন। এইটুকু জানি যে মার্চ্চ থেকে ডিসেম্বর ১৯০৪ পর্য্যন্ত আমরা ঐ উদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিং গিয়ে থাকি। এবং তাতে যেন শ্বশুরবাড়ীর আবহাওয়াটা একটু হাল্‌কা হয়ে আসে। সেজঠাকুর স্টেশনে তুলে দিতে এসে একটা নরম গরম রাগ্‌, এবং অনেক টাকার খুচ্‌রা চক্‌চকে রেজ্‌কি উপহার দেন মনে আছে। প্রথমে জলাপাহাড়ের রাস্তায় Catherine Villa No.1-এ গিয়ে থাকি; ষোড়া বাড়ীর অপরার্দ্ধে শীল নামক এক সাহেব ছিল। মামা আমাদের পৌঁছিয়ে দিতে এসে শীতে কাঁপতেন এবং এক মস্ত পাগড়ী পরে বসে থাকতেন।

আর মার্চ্চ মাসে বাস্তবিক বড় কন্‌কনে হাওয়া বইত। বাইরে বেড়াতে গেলে ঠাণ্ডা হাওয়ার চোটে কাপড় চোপড় ঠিক রাখা কঠিন হত, ও বড় বিরক্তি বোধ হত। ঘরের ভিতর সমস্ত ক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে নিজেকে এপিঠ ওপিঠ ফিরিয়ে সেঁকা যেত।

কাশী

ভ্রমণ কাহিনীই যখন এই জীবনকাহিনীর প্রধান উপজীব্য দেখতে পাচ্ছি, তখন এখানে উল্লেখ করা দরকার যে বিয়ের পরে প্রথম পূজোর ছুটিতে আমরা ছোট ননদ মৃণালিনী দেবীর অতিথি হয়ে কাশীতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের 'হরধাম' [illegible] গিয়ে থাকি। আরও আত্মীয়বন্ধু সেখানে দলপুষ্টি করেন, যথা মহারাজা

নাটোর, অশ্বিনী বাঁড়ুয্যে ইত্যাদি। ভাঁড়ার ঘর একতলায় নীচে ছিল, এবং মেনা কখন চুপিচুপি এতজন লোকের ভাঁড়ার দেওয়ার কাজ সারত, তা টেরও পেতুম না।...সেখানে বেশ আরামে আমোদে কাটিয়েছিলুম।

মহারাজা নানাপ্রকারে খাতিরযত্ন করতেন; তার মধ্যে এক খিলি ॥০ দামের ডুমো ২ পান খাইয়েছিলেন মনে আছে। তাতে কি এমন হীরেমুক্ত মশলা দেয় যাতে অত দাম হয় তা জানিনে, তবে মুখে দিলে একেবারে মিলিয়ে যায় বটে। কাশীর মিষ্টান্ন প্রসিদ্ধ, তার বিশ্বেশ্বর মন্দির প্রসিদ্ধ, তার অলিগলি বাজার প্রসিদ্ধ, তার ঘাটের দৃশ্য প্রসিদ্ধ; এ বিষয়ে আমি কি আর নতুন বর্ণনা করতে পারি?

আর একবার কাশী যাই বোধহয় বিয়ের আগে। সেবার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের[৩৫] বাড়ীতে থাকি। তাঁর ত সব ভাল ২ স্বাস্থ্যনিবাসে একটা ক'রে বাড়ী আছে। সত্যদাদার শ্বশুরবাড়ী বলে কাশীর সঙ্গে আমাদের একটা বিশেষ যোগ ছিল। তাঁর শ্বশুরমশায় মৃত্যুঞ্জয় মুখুয্যের একাধিক কন্যা আমাদের বাড়ীর বউ হয়েছেন, এবং তাঁর শাশুড়ী সুরসুন্দরী[৩৬] পিসিমা ছিলেন ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে। কাশীর বিখ্যাত সরস্বতী বাইয়ের গান শুনেছি··· আমার খাতায় লেখা আছে। কোথায় ২ কার ২ কাছে যে গান না শিখেছি তাই ভাবি।

আমার কিন্তু ঐ অস্বাভাবিক সেঁকতাপের চেয়ে বাইরের স্বাভাবিক রৌদ্রতাপ সেবন করা ঢের বেশি প্রীতিকর লাগত। দুঃখের বিষয় সেটা আগুনের মত আয়ত্তাধীন নয়। কোত্থেকে আমাদের একটা প্রকাণ্ড কুকুর জুটেছিল জানিনে; বোধহয় ওঁদের বন্ধু নিমাই বোস অ্যাটর্ণির কুকুর পাহারার জন্য আমাদের রাখতে দিয়েছিলেন। সেও তার বিপুল বপু বিস্তার ক'রে আমাদেরই কৌচে শুয়ে পড়ত; যদিও অত বড় কুকুরের সঙ্গে অতটা মাখামাখি আমি কোনকালেই পছন্দ করতুম না, এখনো করিনে। কুকুর পুষতে হয় ত নিজেদের কোলে নিয়ে আদর করবার মত মাপের হলে তবে ত পুষে সুখ হবে। আমার ছেলেবেলায় সেরকম দুএকটি আদুরে পোষাকুকুর ছিল, দুঃখের বিষয় বেশিদিন টিকল না। তারপর আর কিছু পুষি নি। কুকুর বিড়াল-প্রীতি দেখেছি প্রতিমার[৩৭] ও কমলের,[৩৭] — কোলে ক'রে নিয়ে বসে, খাইয়ে নাইয়ে সাজিয়ে, সে কি আদর যত্ন। মীরারই[৩৭] বা কম কি? আমার অত আসে না।

দার্জ্জিলিংয়ে কুচবিহারের দলই আমাদের প্রধান বন্ধু ছিলেন; যাতায়াত নিমন্ত্রণাদি চলত। কেশববাবুর বড় ছেলে করুণার[৩৮] অত সাহেবী ছিল না, তিনি স্বদেশী কাপড় পরতেন, স্বদেশী গানবাজনা ভালবাসতেন। বলতেন আমি অত 'হ্যাট্‌-ম্যাট্‌ গ্যাট্‌' ভালবাসিনে। কিন্তু সে-বেচারার কপালেই শেষে মেম-বউ জুটল; যদিও তাকে দেখে গিয়েছিলেন কি না সন্দেহ। কেশববাবুর নিজেরই ত দুই মেম-বউ ও এক মেম নাত-বউ হয়, — পছন্দ করুন বা নাই করুন। ওঁরা

নিজের আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর তাদের বেশ মানিয়েও নিতে পারতেন।

কত খাঁটি মেমকেই মহারাণী সাড়ী পরিয়ে পাত পেতে বসিয়ে খাইয়েছেন; ঘরের বউকে বাঙালী বানানো ত কম কথা। কেশব-কন্যাদের যত না সুচেহারা, তার চেয়ে অঙ্গসৌষ্ঠব ও চালচলনের স্বাভাবিক সৌজন্য বেশি ছিল, —যাকে ভাষায় বলে লক্ষ্মীশ্রী। আর পৈতৃক বাগ্মিতা সকলেরই কুছ নেই ত থোড়া ২ ছিল, সেটা উপাসনার বেলা বোঝা যেত। মহারাণী কথকতাও করতেন। এদিকে যতই সাহেব বা মেম হোন না কেন বাড়ীতে আবার তেমনি খাঁটি বাঙালী ছিলেন। মাটিতে থেব্‌ড়ে বসে বঁটিতে তরকারি কোটা, নিজের হাতে রাঁধা-বাড়া, দেশী ধরনে সাড়ী পরা, খাওয়া ইত্যাদি।

বোনেরা সব প্রায় মহারাণীর কাছেই মানুষ হয়েছিল, কিন্তু ভাইদের মত অত সাহেবিয়ানার স্রোতে ভেসে যায় নি, হাবুডুবু খায় নি; নিজেদের বংশের মর্য্যাদা ও আচার-ব্যবহার ঠিক রেখেছিল। মহারাণীর শুচিবাইয়ের কথা মনে পড়ে; চায়ের বাসনের সঙ্গে একটি ছোট বাটিতে বরাবর জল থাকত, একটা কিছু খেয়েই তাতে আঙুলের ডগা ডুবিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতেন। নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে এসে মাথার কাঁটা এবং জড়োয়া গয়না পর্য্যন্ত ধুয়ে তুলতেন শুনেছি ত অন্যে পরে কা কথা!

মনে পড়ে দার্জ্জিলিং ক্লাবে তিনি একবার ছদ্মবেশ-নাচের মজলিশে রাণী ক্লিওপ্যাট্রা সেজে গিয়েছিলেন, আর সেই পোষাকে কি সুন্দর তাঁকে মানিয়েছিল; যেন মুখের কাটে কি একটা মিশরীয় ছাঁচ ছিল। নাচের নিমন্ত্রণ অনেক করতেন, কিন্তু নিজে কখনো নাচতেন না। যদিও মহারাজা প্রসিদ্ধ নাচিয়ে ছিলেন। তাঁর সুন্দরী মেমের পিছনে (কালো শাদা দুইই!) ছুটোছুটির জন্য মহারাণীকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে। কিন্তু রাজরাণীর কপালই ত ঐ।

সেই জন্যই ত আমি বলতুম যে, প্রণাম করলে 'রাজরাণী হও' বলে প্রাচীন-দের একটা আশীর্ব্বাদ করবার যে রীত আমাদের সেকালে ছিল, তার প্রতি আমার কোনদিনই পক্ষপাত ছিল না; কারণ যে কয়টি রাণীর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়, তাদের কারোরই জীবন আমার লোভনীয় বলে মনে হত না—বরং আমাদের শিক্ষিত জনসাধারণের দাম্পত্যজীবন তার চেয়ে ঢের সুখস্বস্তিসম্মানজনক।

তখনকার কালে শুনতুম বাঙলা দেশে সত্যকার স্বাধীন রাজবংশ দুটিমাত্র আছে এক কুচবিহার, দুই ত্রিপুরা। তবে জমিদার রাজার মধ্যে নাটোর, দিঘাপতি, নদীয়া, সন্তোষ—এঁদের সকলের সঙ্গেই আমাদের চেনাশোনা যাতা-য়াত ছিল। একবার মনে আছে গ্রীয়র পার্ক মেয়েদের জন্য খোলার উপলক্ষ্যে যে লাটপত্নী[৩৭] এসেছিলেন (মিণ্টো?) তাঁকে পঞ্চরাণী পাঁচ এয়োর মত বরণ ক'রে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তারপর তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য সাবিত্রী-

সত্যবানের টাব্লো বা মূকাভিনয় করা হল। বিদেশীদের বোধগম্য করবার জন্য প্রত্যেক দৃশ্যের আগে ইংরিজী চুম্বক পড়বার ভার দেওয়া হয়েছিল ডব্লিউ সি. বাঁড়ুয্যের মেজমেয়ে সুশীলা[৪০]ওরফে সুশীর উপর। তিনি এত বেশী বিশুদ্ধ ইংরিজীতে ঝোঁক দিয়ে 'Savitri' ২ নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন যে, আমাদের কান ত ঝালাফালা হয়ে গেল; জানিনে বিদেশিনীদের কেমন লাগল।

'টাব্লো' জিনিষটা আমাদের সেকালে খুব হত[৪১], আজকাল তেমন হতে দেখিনে, যথা:—(১) প্যারী রায়দের[৪২] ওখানে দিনু প্রভৃতিকে দিয়ে বুদ্ধ-জীবনের চিত্রাভিনয় (২) তারকবাবুর মেয়ে লিলের[৪৩] উদ্যোগে প্রকাশ্য থিয়েটারে রামায়ণের চিত্রাভিনয় (৩ N. I. A.-র উৎসবে শকুন্তলার চিত্রাভিনয় (৪) I. C. W. না ঐরকম আর একটা স্ত্রী-সভার বড় অধিবেশন উপলক্ষ্যে সরলা দেবী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক 'সন্ধ্যানী' নামক সভায় 'জীমূতবাহনে'র চিত্রাভিনয়, এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী-কর্ত্তৃক বৈদিক থেকে মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত প্রধান ২ নারী-চরিত্রের বিশেষ ২ জটিল ঘটনার চিত্রাভিনয়;—আর কত বলব।

দ্বিজু রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সে সময়ে একবার কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিং এসে ছিলেন এবং আমাদের ওখানে প্রায়ই আসতেন। তাঁদের পরিবার কৃষ্ণনগরের আমল থেকে আমার শ্বশুর পরিবারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে আমাকে তাঁর 'বঙ্গ আমার' (তখন নতুন রচিত হয়েছে, এবং আমি যখন প্রথম বাইরে সামাজিক নিমন্ত্রণে গাই, তখন খুব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল)—'আর কেন মা ডাকছ আমায়', 'পাগলকে যে পাগল ভাবে', 'একই ঠাঁই চলেছি ভাই', 'আমার ২ বলে ডাকি' ইত্যাদি অনেক গান শিখিয়েছিলেন, যা হাসির নয়। অথচ এখনো অনেক লোক আছে হয়ত যারা জানেই না তিনি 'হাসির গান' এবং নাটকের গান ছাড়া আরো কত সুন্দর ২ গান লিখেছেন। পরে অবশ্য কলকাতায় তাঁর আত্মীয়ের কাছে ঐ ধরনের আরও অনেক গান শুনি ও শিখি। তাঁর স্বদেশী গানের মধ্যে 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' আর 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা' খুব প্রচলিত এবং বিখ্যাত। তাঁর স্ত্রী সুরবালা (ডাঃ প্রতাপ মজুমদারের বড় মেয়ে) বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন; এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে অকালে মারা যান। সেই ছেলে স্বনামধন্য দিলীপ রায়ের নাম ও গান কে না জানে ও শোনে?

আর একটি কাজের সূত্রপাত এই দার্জ্জিলিং বাসকালেই হয়েছে। অর্থাৎ মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীর ইংরিজী অনুবাদ। তার স্বত্ব তিনি বাবা ও রবি-কাকাকে দিয়ে যান, পরে তাঁরা আবার আমাকে দেন। এই সেদিন পর্য্যন্তও তাঁরই কমিশনস্বরূপ কিছু ২ টাকা আমি বিলেতের ম্যাক্‌মিলান কোংয়ের কাছে

পেয়েছি, যতদিন না সে বইয়ের এক সংস্করণ উঠে যায়। বাবার সঙ্গে আমিও অনুবাদে হাত লাগিয়েছিলুম। তিনি সে সময় আমাদের কাছে দার্জ্জিলিংয়ে এসে দিনকতক ছিলেন। দুঃখের বিষয় আমাকে সেসময় পাহাড়ী উদরাময় রোগে ধরেছিল; আমি তা অগ্রাহ্য ক'রে বাবার সঙ্গে হেঁটে লম্বা ২ পাড়ি দিতুম, এমন কি সিঙ্গামারী (৫ মাইল দূরে) পর্য্যন্ত। সেটা ঐ অবস্থায় বুদ্ধির কাজ হয় নি; কিন্তু সে বুদ্ধি আমার তখন যোগায় নি, যদিও যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। তাই ত বলি যে, একটা বয়সের পর ছেলেমেয়েদের নিজেকে নিজে চালাতে শেখানোও একটা মস্ত এবং অতি জরুরী শিক্ষা, যা আমরা পাই নি। ফলে আমি ক্রমশঃ রোগা হয়ে যেতে লাগলুম।

দার্জ্জিলিং

উনি যে উদ্দেশ্যে পাহাড়ে বাসা বাঁধলেন, তা সিদ্ধ করবার তোড়যোড় গিয়েই আরম্ভ ক'রে দিলেন। অর্থাৎ নেপালী শিক্ষকের কাছে নেপালী ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন, রোজ নিয়মিত পাহাড়ে রাস্তায় নামা-ওঠা ক'রে আদালতে যাতায়াত করতে লাগলেন, ইত্যাদি। বন্ধুবান্ধবও দু'চারজন ছিল।

তার মধ্যে ভাগলপুরের দীপনারায়ণ সিংহের একটা মজার গল্প মনে পড়ে যে, তাঁর বাড়ীতে একদিন সান্ধ্য-মজলিশে বন্ধুবান্ধবকে পানীয়ের সঙ্গে অনুপান যোগাবার জন্য যখন ক্রমাগত প্লেট ২ আলুভাজা ফরমাস দেওয়া হচ্ছে তখন এক সময় বাবুর্চ্চি অক্ষমতা জানিয়ে নাকি বলেছিল যে আর দিতে পারবে না, কারণ এর মধ্যে তিন সের আলু খরচ হয়ে গেছে! একটা দেশী ক্লাবও বোধহয় ছিল; যদিও মহারাজা কুচবেহার যে Central Club বাঙ্গালীদের জন্য স্থাপন করেন, সেটা তখন হয়েছিল কি না মনে নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরের মধ্যে এতবার দার্জ্জিলিং বেড়াতে গেছি যে, এক সময়ের ঘটনা আর এক সময়ের ঘাড়ে ফেলা আশ্চর্য্য নয়। তবে এক একটা বাড়ীর চার দেওয়াল ঘটনা ও লোককে কতকটা সীমাবদ্ধ করে বটে; তাও এতদিন পরে ভরসা পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যখন ইতিহাস লিখছিনে, সামান্য ব্যক্তিগত বিবরণী মাত্র, তখন একটু আধটু ভুলচুক অনিবার্য্য এবং অমার্জ্জনীয় নয়। সাক্ষী ত কেউ অবশিষ্ট নেই যে ডাকব।

Catherine Villa-য় থাকতে আবদুল নামে আমাদের যে ছোকরা চাকর ছিল, তাকে এখানে একবার স্মরণ করি। সে ভালই রাঁধত, এবং কমলালয় থেকে আমাদের কাছে ছিল। তবু পাশের বাড়ীর সাহেবের বাবুর্চ্চির কাছে গিয়ে আপনা থেকে কত ভাল ২ রান্না শিখে এসেছিল। এখনকার চাকরদের মধ্যে সে যত্ন কোথায়?

শুধু নিজের বাড়ী নয়, বন্ধুবান্ধবের নামের সঙ্গে তাঁদের ধামও কতক ২ মনে

আছে। যথা – জগদীশ বসু-দম্পতি[৪৪] থাকতেন Abbey Hall-এ, রমেশ দত্ত-পরিবার[৪৫] Rothiemayতে, করুণা সেন[৪৬] Oaklands এ, ইত্যাদি। দার্জ্জিলিংয়ের আদ্ধেক বাড়ীর মালিক ছিলেন কুচবেহারের মহারাজা। তাঁর নিজের বাড়ীর নাম ছিল Colinton, আর তাঁদের বিশিষ্ট বন্ধু Ezraদের Sligo Hall-এ থাকতে দিয়েছিলেন। সেখানকার একটা মজার ঘটনা এই মনে পড়ে (অবশ্য যার হয়েছিল তার পক্ষে খুব মজার নয়) যে একবার মধ্যাহ্নভোজনের পর একজন মেম পান মনে ক'রে যে কলাপাতার খিলিতে চুণ ছিল সেটা মুখে পুরে দিয়েছেন। তারপর বেচারার সরষের তেলের ভাপ থেকে আরম্ভ ক'রে কত রকম কষ্ট ভোগ করতে হল, তা সহজেই অনুমেয়। নিমাই বোস অ্যাটর্ণি ছিলেন 'বাবমারি'তে – বোধহয় নিজের বাড়ী। দিঘাপতিয়াদেরও নিজের বাড়ী ছিল জলাপাহাড়ে, কিন্তু এতদিন পরে নামটা মনে পড়ে-২ করেও পড়ছে না। প্রিয়কৃষ্ণ মজুমদারের[৪৭] বাড়ী ছিল Point Clear।

কিন্তু বাড়ীর পরিচয়ের চেয়ে বিশিষ্ট ঘটনাদির পরিচয় দেওয়া ভাল। একটা হচ্ছে মহারাণী সুনীতি দ্বারা মহারাণী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। সেটা এখনো চলছে, এবং তাতে দার্জ্জিলিংয়ের বাঙ্গালী অধিবাসীদের খুব সুবিধে হয়েছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বরোদার গায়েকুওার ও মহারাণী লক্ষ্মী বাইয়ের শুভাগমন।

স্বদেশী রাজারাণী পেয়ে স্থানীয় বাঙ্গালী অধিবাসী যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে কি ক'রে তাঁদের অভ্যর্থনা করবে ভেবে পেল না। আমরা মেয়েরা ঠিক করলুম যে Central Clubএ (তাহলে বোধহয় তখন হয়েছিল) তাঁকে একটা সম্বর্দ্ধনা করা হবে। যখন তার উদ্যোগপর্ব্ব হচ্ছে, তখন আমি নিমন্ত্রিতবর্গের মধ্যে মিস্ কর্ণীলিয়া সোরাবজীর[৪৮] নাম করেছিলুম বলে বাঙ্গালী মেয়েদের সে কি ঘোরতর আপত্তি! সে নাকি বৃটিশ সরকারের গুপ্তচরগিরি করত, ওরা বেশ জানে ইত্যাদি। তর্কচ্ছলে আমি তাতে বল্লুম যে, রাজারাণীর আগমনে কয়েদীদেরও মুক্তি দেওয়ার প্রথা আছে। তবে ওদের আপত্তির বহর দেখে আর পেড়াপিড়ি করি না। নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ হল, মিস সোরাবজীকে বাদ দিয়ে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, সেণ্ট্রাল ক্লাবে যখন মহারাণী সুনীতি প্রমুখ আমরা অভ্যর্থনার জন্য দরজায় সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছি, তখন বরোদারাণীর সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে অম্লানবদনে কর্ণীলিয়া সোরাবজী চলে এলেন দেখে আমাদের চক্ষুস্থির এবং মুখ চুন! সে কি কম ধড়িবাজ মেয়েমানুষ! সদর পথে প্রবেশের পত্র পেল না দেখে সে ফুস্‌লে ফাস্‌লে খিড়কি দুয়োর দিয়ে চলে এসেছে; আমাদের উপর এক হাত নিয়ে প্রধান অতিথির অনুগামী দলে ঢুকে পড়েছে! অতএব কিছু বলবার জো নেই, কাষ্ঠহাসি হেসে অভ্যর্থনা করতে হল! সে আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য ওখানে একটা পাঠচক্র স্থাপন করেছিল, সে

কথাও বলতে হয়। তারও আগে না পরে কোন সময়ে সে কলকাতায় একটা মেয়েদের গ্র্যাজুয়েট সভাও চালিয়েছিল। বহুকাল পরে যখন মিস মেয়োর বই* নিয়ে কলকাতার বাঙ্গালী সমাজে হুলুস্থূল বেধে যায়[৪৯], এবং মিস সোরাবজী তার সহায়ক বলে তাকে আমরা সকলে বয়কট করি তখন মিস সোরাবজী আমার কাছে কেঁদে ফেলে বলেছিল – আমি তোমাদের জন্যে এত করলুম, রাত জেগে বই পড়ে ২ আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, – আর তোমরা আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করলে! – নিজের দোষ ত কেউ দেখে না; মিস্ মেয়োর কোনরকম সাহায্য করেছে তাও সে স্বীকার করবে না; কিন্তু গুজব ত সেই-রকমই। – ওরা আবার ছিল বোম্বাইয়ের খুব নীচ জাত হিন্দু, যাকে বলে মাহার; তার থেকে খৃস্টান। কিন্তু কয় বোনই বিদুষী, তা মানতে হবে, – রূপসী হোক-না-হোক। কর্ণীলিয়া বেশ কালো ছিল, কিন্তু মুখের কাট টিকলো, আর গড়ন খুব লম্বা, যাকে ভাষায় ঢ্যাঙা বলা যেতে পারে। তার উপর কাপড় চোপড় পরত ভাল, খুব টক্‌টকে লাল বা কমলা রঙের পাতলা কাপড়ের শাড়ী জামা, আর কোন একরকম চন্দ্রকান্ত মণির হার, – তাতে ওকে বেশ মানাত, আর ঘরে ঢুকলেই নজরে লাগত।

কর্ণীলিয়া সোরাবজী বোধহয় প্রথম ভারতীয় নারী যে আইনব্যবসা করবার অনুমতি পেয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে সে বিলেত থেকে প্রথমেই সোলাপুরে আসে এবং সেখানেই আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। সে কথা সোলাপুর অধ্যায়েই বলা উচিত ছিল। তারপর কি জানি কেন, তার আইনব্যবসা করা হল না। এইজন্য আমার সঙ্গে তার বহুকাল থেকে চেনা-জানা। – কিন্তু হলে কি হবে? গোড়ায় গলদ না ক'রে শেষে গলদ করলে! বেচারি এখন মারা গিয়েছে।

সেই বৎসরের পূজোর সময় বোধহয় মা আমাদের দেখতে দার্জ্জিলিং এলেন, এবং কাছাকাছি আলাদা বাড়িতে উঠলেন। সেখানে রান্নার হাঙ্গামা ও খরচ বাঁচাতে গিয়ে দরওয়ানের হাতের রুটি তরকারি খেয়ে খুব অসুখ বাধালেন। একটা-না-একটা খেয়ালের উপরেই ত চলতেন। কিন্তু আসল বিপদ হল, – আমাকে এত রোগা দেখে একেবারে কেঁদেকেটে এমন তুলকালাম্ কাণ্ড করলেন যে, আমাদের কলকাতায় নেবে যাবার ঠিক না ক'রে আর উপায় রইল না।

---

* পাদটীকা।

একালের পাঠক যদি এমন কেউ থাকেন যাঁর কাছে মেয়োকুমারীর কীর্ত্তিকলাপ অবিদিত, তাঁর অবগতির জন্য সংক্ষেপে বলি যে ঐ নামধারী বিদেশিনী কুমারী বিশেষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই বই প্রকাশ করেন যাতে সামাজিক নর্দ্দামার পাঁক ঘেঁটে যতরকম সত্যমিথ্যা মিশিয়ে এ দেশকে আস্তাকুঁড় ও আবর্জ্জনার স্তূপ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। সে কারণে এ দেশের লোক তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল, এবং মিস সোরাবজী তাঁর নোংরা তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন বলে তাঁর উপরেও আক্রোশটা গিয়ে পড়েছিল।

অথচ তখন দার্জ্জিলিংয়ে স্থায়ী হবে বলে উনি কুচবেহারের Ulick Villas no. 1 সবে এক বৎসরের জন্য ভাড়া নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু নদী যবে ধায় সিন্ধুপানে, ইত্যাদি। চিরকাল নিজের ইচ্ছায় চলেছেন ও চালিয়েছেন; কার সাধ্য রোধে তাঁর গতি। আমাদের ত সে সাধ্য ছিলই না। অতএব শত অসুবিধা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাত্তাড়ি গোটাতে আরম্ভ করলুম। অবশ্য তাঁর হয়ে এটুকু বলব যে, ওজনে দেখা গেল আমি ১ মণ ১৮ সের থেকে ১ মণ ৫ সেরে নেবে গেছি; সেটা সকল মায়ের পক্ষেই দুশ্চিন্তার কারণ। তবে সকল মেয়ে-জামাই হয়ত অত বাধ্য হত না এবং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে চাইত।

যাক সে কথা। আমার নিজের এক হাস্যকর দৃশ্য এই মনে পড়ে যে, চতুর্দ্দিকে ছোটবড় নানা ছড়ানো জিনিষপত্রের মধ্যে মেঝের উপর বসে তা গুছিয়ে বাক্সবন্দী ক'রে তোলবার আশায় হতাশ হয়ে কেঁদে ফেলতে বাকি রেখেছিলুম —কিম্বা বাকি রাখি নি,—ঠিক মনে নেই। বিশেষ ছোটকাকিমা (গগনদা'র মা[৫০]) আমাকে নেহাৎ ছেলেমানুষ ঠাউরে কতকগুলি খেলনার মত ছোট ২ রাঁধবার সরঞ্জামাদি দিয়েছিলেন, সেগুলি কোথায় ধরাব ভেবে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু অবশেষে সব সমস্যাই মিটে যায়।

আমরাও পাহাড়ের মায়া কাটিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৪ কলকাতায় নেমে এসে সবে ১৯ নং স্টোর রোডের একতলার সিঁড়ির ঘরে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় শাশুড়ী ঠাকুরুণের দাসী এসে সুখবর (?) দিয়ে গেল যে—কাল রাত্রে ফুলবউমার (নলিনীর[৫১]) একটি মেয়ে হয়েছে। এই সেই অপু ওরফে অপর্ণা যে এখন ভারিক্কী গিন্নিবান্নি, চার ছেলে মেয়ের মা ও সুখে দুঃখে —বিশেষতঃ দুঃখে ভাবনাচিন্তায় সংসারের সাতপাকে জড়িত। আমরাই তার 'অপর্ণা' নাম একটু নতুন ভেবে দিয়েছিলুম—যদিও এখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে;—কারণ দেখলুম আমাদের ঘরে সব মেয়েদেরই নাম তিন অক্ষরের এবং আকারান্ত। আমি আবার তার নামের একটা ব্রোচ করিয়ে দিয়েছিলুম —একটা সোনার পাতা, তার আগে একটা 'অ' এবং পরে একটা আকার। তার বড় দিদি কোজাগর পূর্ণিমায় জন্মেছিল বলে শাশুড়ীমা নাম দিয়েছিলেন 'সুরমা'; আর ছোট পূর্ণিমা[৫২] ত এখনো আমাদের ঘর আলো ক'রে রয়েছেন; যদিও কপালক্রমে অতি ম্লানভাবে।

২৫ নং ল্যান্সডাউন রোড

বাপের বাড়ী এসে নামলুম বটে কিন্তু মনের সুখে রইলুম না। এতদিন পরে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এইভাবে বাঁধা ঘরসংসার (যেটুকু ছিল বা হত) হড়ুদ্দুম ক'রে ফেলে চলে আসতে বাধ্য হয়ে মনে একটা ধিক্কার জন্মেছিল। এবং যা কখনো করি নি, লুকিয়ে ২ ঠিকে গাড়ি ক'রে বেরিয়ে আশপাশে ভাড়া

বাড়ী পাওয়া যায় কি না খোঁজ করতুম, যাতে উঠে গিয়ে আলাদা থাকতে পারি। কারণ আমাদের নিজের বাড়ী কমলালয় তখন ভাড়া দেওয়া ছিল।

এই সময় কি সূত্রে ঠিক মনে নেই, আমার সেজ ভাসুররাও বাড়ী খুঁজছিলেন—তখনও আমাদের জমি কিনে নিজের বাড়ী করেন নি। তাই ঠিক হল যে তাঁরা, আমরা, সুহৃৎরা এবং আমার বড় ননদ প্রসন্নময়ী দেবী ও ভাগ্নী প্রিয়ম্বদা দেবী, এতগুলি পরিবার সব একসঙ্গে ২৫ নং ল্যান্সডাউন রোড ভাড়া ক'রে থাকব। সে বাড়ীটা ছিল পুরনো বন্ধু ৺রজনীনাথ রায়ের স্ত্রী বিধুমুখী দেবীর—এবং যথেষ্ট বড়। সাধারণতঃ যেখানে এক ২ তলায় মাঝে একটা বড় বসবার ঘর ও চারপাশে চারটে শোবার, এই ৫টি ঘর থাকে; এ-বাড়ীর সে স্থলে প্রত্যেক তলায় পাশে দুটির বদলে তিনটি ক'রে ঘর ছিল, আর মাঝের ঘরটিও বেশ রীতিমত বড় এবং কাঠের মেঝে দেওয়া—বোধহয় সেকালে নাচপোচ হত। বাগানও বেশ খানিকটা ছিল আর সামনে গাড়িবারান্দা; অথচ এখনকার তুলনায় ভাড়া কমই বলতে হয়। আমাদের এতগুলি লোককে বেশ অনায়াসে ধরে গেল।

দোতলার একদিকে সুহৃৎরা ও সেজঠাকুররা থাকতেন,—আর একদিকে আমরা ও ঠাকুরঝিরা। একতলায় ছিল খাবার ও আফিস ঘর। বলতে গেলে এই আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়া। কারণ যদিও প্রত্যেকে নিজ ২ নির্দ্দিষ্ট খরচ দিয়ে থাকতুম, তবুও একসঙ্গে এক সংসারে ত থাকা। নলিনী সেজদি আমার দুই জা-ই সাংসারিক জ্ঞানে আমার চেয়ে ঢের পাকা, যদিও বয়সে আমার মেয়ের মত। তবু আমি তাঁদের সঙ্গে অপটু হাতেও সাংসারিক কাজে যোগ দিতুম। আর সেজদির (পরে মেজদির) সঙ্গে ঠিক করেছিলুম যে আমরা উভয়পক্ষই পরস্পরকে 'দিদি' সম্বোধন ক'রে সম্পর্ক ও বয়সের সামঞ্জস্য সাধন করব। আজ পর্য্যন্তও সেই নিয়ম রক্ষা ক'রে চলেছি, যদিও সকলেরই সুখের সংসার ভেঙ্গে গেছে।

তারাকুমারের মৃত্যু

পারিবারিক দিক থেকে এ-বাড়ীতে থাকা-কালীন প্রধান ঘটনা ছিল দুর্ঘটনা, অর্থাৎ প্রিয়ম্বদার একমাত্র ছেলে তারাকুমারের কাশীর ইস্কুলে বছর ১২ বয়সে অকালমৃত্যু। কুল্‌পীওয়ালার স্কুলে আসা বারণ থাকা সত্ত্বেও তারাকুমাররা পাঁচিলের এক জায়গা গর্ত্ত ক'রে তার ভিতর দিয়ে লুকিয়ে তার কাছ থেকে কুল্‌পি কিনে খায়, তার ফলে বাধা ওলাউঠা হয় ও কর্ত্তৃপক্ষের যথাসাধ্য চেষ্টা চিকিৎসা সত্ত্বেও দু'টি ছেলের প্রাণ রক্ষা হয় না তার মধ্যে বিধবার ঐ একমাত্র সন্তান একজন।

যখন টেলিগ্রামে সেই খবর এল, তখন ঠাকুরঝি ও আমি আমার ছোট ননদ

মেনার বাড়ী বীডন স্ট্রীটে বেড়াতে গেছি, সুহৃৎ-এর দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে। আশ্চর্য্য, যে ছেলেটি এই টেলিগ্রাম হাতে ক'রে খবর দিতে এসেছিল, তাকে দেখেই ঠাকুরঝি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন: তারাকুমার মারা গেছে! অতি আদরের একমাত্র নাতি, ঐ ছেলেটির ভীত মুখশ্রী দেখেই তার অমঙ্গল আশঙ্কাই প্রথমে মনে জেগেছে।

তারপরে সেই খোলা ফিটন গাড়িতে বীডন স্ট্রীট থেকে কি ক'রে যে ল্যান্সডাউন রোডে পৌছলুম তা চিরকাল মনে থাকবে। একদিকে পিছনের সীটে আমি ঠাকুরঝির পাশে বসে তাঁকে সামলাবার চেষ্টা করছি – তিনি একবার গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে চাচ্ছেন, একবার গলার হার ছিঁড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছেন। আর ওদিকে সামনের ছোট সীটে বসে দুই ছোট ছেলে পড়ে না যায় তাই দেখছি। কোনরকমে ধ্বস্তাধস্তি করে ত বাড়ী এনে ফেল্লুম। ঠাকুরঝি কোথায়ও স্থির হতে পারছেন না; একবার ছুটে ২ গাড়ি বারান্দায় যাচ্ছেন, আবার ছুটে ২ ঘরে আসছেন, আর আমি সঙ্গে ২ ছুটছি।

উনি বাড়ী ছিলেন না, রংপুর সাহিত্য সম্মিলনে[৫৩] গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঝি বড়ঠাকুরের বাড়ী যাবেনই, তাঁকে ভয়ানক ভালবাসতেন। কি করি, ঠিকে গাড়ি ক'রে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। বলতে ভুলে গেছি যে, আমার সেজ জা ও ফুল জা দু'জনেরই সে সময় অন্তঃসত্বা অবস্থা, তাই দৌড়দৌড়ির ভার বেশির ভাগ আমার উপরেই পড়েছিল। বড়ঠাকুরের বাড়ীর গেটে ঢুকে অবধি ঠাকুরঝি চেঁচিয়ে ২ তাঁকে নাম ধরে ডেকে ঐ খবর দিচ্ছেন। কি ক'রে যে পারলেন তাই ভাবি। আমি ত শোকের সময় নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে কুণ্ঠিত হই। তবে ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। একবার নীচে জুতো ফেলে উপরে ছুটে যাচ্ছেন, আমি আবার কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে চলেছি; আবার বড়ঠাকুরকে এই সব কথা চেঁচিয়ে ২ বলছেন, তিনি বৃথা থামতেও বলছেন করছেন (?) – এইরকম আর কি। আবার টানতে ২ বাড়ী নিয়ে এলুম। সেখানেও স্থির ন ন, একবার এখানে, একবার সেখানে বেড়াচ্ছেন বসছেন উঠছেন। আর আমি সঙ্গে ২ ছুটছি। উনি বোধহয় সেইদিন সন্ধ্যাতেই রংপুর সাহিত্য সম্মেলন থেকে ফিরলেন। সিঁড়িতে উঠছেন অমনি ঠাকুরঝি উপরের ধাপে বসে চেঁচিয়ে ২ এই অমঙ্গল সংবাদ দিতে লাগলেন। বাড়ী আসতে-না-আসতে এই কথা শুনে মানুষের কি মনের অবস্থা হয় তা সহজেই অনুমেয়। প্রিয়কে কখন শোনানো হল আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু তার ব্যবহার যে ঠিক মায়ের উল্টো তা মনে আছে। তিনি যেমন পাগলের মত চেঁচামেচি বকাবকি ছুটোছুটি করছেন, মেয়ে একেবারে তেমনি স্থির পাথরের মূর্ত্তির মত শুয়ে আছে, নড়ন-চড়ন শক্তিরহিত, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

কথা হল সে কাশী গিয়ে প্রকৃত ঘটনার বিষয় নিজে সব জেনেশুনে বুঝে আসবে। সুহৃৎকে বলতেই সে তখনি সব কাজকর্ম্ম ফেলে তাকে সঙ্গে ক'রে

কাশী নিয়ে যেতে রাজি হল। এইখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার ক'রে রাখি যে আত্মীয়স্বজন যে-যখন বিপদে পড়েছে, যখনি বিদেশে কারো সাহায্যে যাবার দরকার হয়েছে, তখনি সুহৃৎ বিনা বাক্যব্যয়ে তার কর্ত্তব্য পালন করেছে। কাশীতে সত্যদাদার (সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীর) শ্বশুরবাড়ী ছিল, সুহৃৎ ও প্রিয় তাঁদের সেই খাজুরিয়া বাঙ্গলোতে উঠে, দুদিন থেকে, খুঁটিয়ে সব তথ্য জেনে এলেন; মোটের উপর আমি আগে যা বলেছি তাই। প্রিয় ফিরে এসে শুধু এই কথাটি বল্লে যে—'লোকে ছেলের মরা মুখ দেখ, বলে গালি দেয়, কিন্তু আমি তাও দেখতে পেলুম না।'

তারপর কয় দিন ও রাত্রি যে কি-ভাবে কাটল তা আর বলবার নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে আমরা যে-পাশে থাকতুম, ঠাকুরঝিদের ঘর সেইদিকেই ছিল। তাঁরা বড় শোবার ঘর ছেড়ে এসে আমাদের অপর পাশের ছোট ঘরে মা-মেয়েতে একটা ছোট খাটিয়ায় শুতেন। প্রিয় একেবারে ধীর স্থির চুপচাপ, আর ঠাকুরঝি সেই ভোর হতে না-হতে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নাকাটি সুরু ক'রে দিতেন। কে কতক্ষণ ঘুমোতুম মনে নেই। তারপরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সারাদিন লোকসমাগম। যে যখন আসছে ঠাকুরঝি তার কাছে কেঁদে ২ সমস্ত ইতিহাস বলছেন। বিশেষ যখন মেনা, আমার ছোট ননদ পরদিনই এল, তখন দুই বোনে যা কাণ্ড করলেন, সে অভাবনীয় ব্যাপার। কারণ তারাকুমারকে কাশীর ইস্কুলে পাঠানো তাঁদের প্ররোচনাতেই হয়েছিল। মোট কথা, কিছুদিন এইরকম হতে ২ আমার এমন শারীরিক মানসিক অবস্থা হল যে ৫০নং পার্ক স্ট্রীটে (আমাদের পুরনো বাড়ীতে) একটা স্যানাটোরিয়ম খোলা হয়েছিল জ্যোতিকামশায় ওঁরা বলে কয়ে একদিন আমাকে সেখানে পাঠালেন।

প্রথমেই স্বাস্থ্যনিবাসের কর্ত্তা আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমার কোন 'family worries' আছে কি না? তদুত্তরে আমি বল্লুম—আমার familyই নেই ত worries থাকবে কি। তারপরে আমাকে ওরা যা করলে সে একরকম ধোবা-বাড়ী দেওয়া বল্লেও হয়। প্রথমে একটা কফিনজাতীয় বাক্সে শুইয়ে দিয়ে, মাথায় ঠাণ্ডা ভিজে গামছা জড়িয়ে বাক্সের চারদিকের বিজলী বাতির তাতে যেন শরীর পুড়িয়ে লাল করিয়ে দিলে। তারপরে একটা নাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বাগানের hose-pipe—জাতীয় পদার্থ দিয়ে একবার ঠাণ্ডা একবার গরম পিচ কিরি পালাক্রমে দিতে লাগল তারপর একটা ছোট ঘরে খাটে শুইয়ে শরীরে কি যেন সব দিয়ে ডলাই-মলাই বা massage করতে লাগল। যখন কাপড় চোপড় পরিয়ে ছেড়ে দিলে, তখন এত দুর্ব্বল বোধ করছি যে মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না। পরদিন জ্যোতিকামশায় এসে ঐ অবস্থা দেখে বল্লেন ঢের হয়েছে, আর স্বাস্থ্য চর্চ্চায় কাজ নেই। ঐ পর্য্যন্তই থাক।

জুলাই ৩০শে এই কাণ্ড ঘটে গেল। তারিখটা খুবই মনে আছে, কারণ ঐ

তারিখে কতবার ওঁদের নিজের ঝাউতলার বাড়ীর হলে আমাকে উপাসনা করতে ডেকেছেন। পরে অগস্টের ২০শে নলিনীর ছোট ছেলে রাজীব (ওরফে বেটু) হল, এবং অক্টোবর ১২ই সেজদির প্রথম মেয়ে অলকা।

সিমুলতলা

তার আগে আমরা সিমুলতলা বেড়াতে যাই,—বোধহয় আমারই শরীরের জন্য। সেটা পুজোর ছুটিতে হবে। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ[৫৪] ওরফে এস. পি. সিন্‌হার বাড়ী পাওয়া গিয়েছিল; বাড়ী ভাল। নলিনীর মেজ মেয়ে অপু[৫৫] তখন তার 'মুথু' অ য়্যার (ছোট আয়ার) বিরহে কাতর ছিল, মাঝে ২ কাঁদত। অন্যান্য বন্ধুর মধ্যে ছিলেন বেহারী গুপ্তরা[৫৬]। তাঁর বড়জামাই কুমুদ সেনের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ২ বাড়ী তৈরি তদারক করতে ২ এমন অসুখ হয়ে পড়ল যে শেষে তাতেই মারা গেলেন। তাঁর বড় মেয়ে লটি (স্নেহলতা) ছোটবেলা থেকে আমার বন্ধু ও লোরেটোতে সহপাঠি ছিলেন। শেষ বয়সে কুটুম্বও হলেন; কারণ তাঁর ছোট ছেলে মটরুর[৫৭] (কুলপ্রসাদের) সঙ্গে আমার ছোট ভাইঝির (জয়শ্রীর) বিয়ে হয়। কলকাতার রাজেন মুখুয্যে সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে[৫৮] প্রভৃতি রইস্ লোকও ওখানে বাড়ী করেছিলেন।

একটা সুতা ধরে টানলে কত স্মৃতিই চলে আসে। সিমুলতলার হাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ভাল ছিল, তবে ছোট জায়গা বলে জিনিষপত্র খাবারদাবার বিশেষ কিছু পাওয়া যেত না। কিন্তু সুরেনবাবুর ছোট মেয়ে সরযূ এমন পাকা রাঁধুনী ও গৃহিণী ছিল যে বাপকে পাঁউরুটি পর্য্যন্ত ক'রে খাওয়াত। আমার নিজের ওখানকার টাট্‌কা মুড়ি পান্তুয়ার রস দিয়ে খাবার মধুর স্মৃতি এখনো জিভে লেগে রয়েছে। আর ওখানকার G. Q. M. ভবনাথ সেনের একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারে যাওয়া ও গরম ২ জিলিপি খাওয়া এবং করতে শেখা আর একটি সরস স্মৃতি। তাঁর একটি রোগা ঢ্যাঙা পুত্রবধূর বেশ নাম দিয়েছিলেন—'আকাশ-পিদিম'! ওরকম সুশৃঙ্খলাপূর্ণ একান্নবর্ত্তী বড় পরিবার বিরল; আজকাল ত নেই বল্লেই হয়।

খাবার কথা যখন হচ্ছেই, তখন বলি রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের[৫৯] পরিবারের সঙ্গে ওখানেই ঘনিষ্ঠতা ও পরে কুটুম্বিতার সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ ঠাকুরঝি তাঁর বড় ভাইপো আর্য্যকুমারের[৬০] সঙ্গে রণেন্দ্রবাবুর একমাত্র সন্তান ও পরমাসুন্দরী কন্যা লীলার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। তার মা সুলাজিনী সুন্দর মিষ্টি তৈরি ক'রে পাঠাতেন, যথা, বীট দিয়ে রঙকরা লাল বরফি, পেস্তার সবুজ বরফি ইত্যাদি। আমাদেরও ছোট ২ ক্ষীরেলা তৈরি করতে শিখিয়েছিলেন; আমরা শিশি ২ তৈরি ক'রে কলকাতা পর্য্যন্ত পাঠাতুম। ওখানে দুধের সুবিধে ছিল বলে এ-সব সৌখীন খাবার করা এত সহজ হত। যে জন্য প্রিয় সরের ঘীও তৈরি করত।

কিন্তু বাঙালীর ভোজন-বিলাসিতার আর কত পরিচয় দেব ?

উনি মাঝে ২ আসাযাওয়া করতেন. ও সবসুদ্ধ আমাদের সিমুলতলাপ্রবাস ভালই কেটেছিল। অলকা[৬১] হবার সময় সেজদিদি ২।৩ দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন বলে সেজঠাকুর ওঁকে টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতায় ডেকে পাঠালেন। তখন মনে আছে আশ্চর্য্য লেগেছিল, কারণ পুরুষমানুষ সে অবস্থায় কি সাহায্য করতে পারে ? – কিন্তু এখন বুঝি, তাতে কতটা ভ্রাতৃভাব প্রকাশ পেয়েছিল।

২৫ নং ল্যান্সডাউন রোডে কতদিন ছিলুম তা ঠিক মনে নেই। কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবাহ, জীবনের এই তিন প্রধান ঘটনার তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এই প্রধান তিন ছাড়াও ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙ্গালীর, তথা আমাদেরও জীবনে কমবেশি আলোড়ন এনেছিল। বোধহয় সিমুলতলা যাবার আগে আমাদের নিজের কমলালয়ের বাড়ীতেই তখন ছিলুম। কারণ বেশ মনে আছে 'স্বদেশী'র বীজ তখন আমাদেরই বাড়ীতে গোপনে রোপণ হচ্ছিল। তার প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ (?) ছিলেন জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরা কাকুজো[৬২]। তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিল্পজ্ঞ ছিলেন ; সেই সূত্রে বোধহয় কিছুদিন মার্কিন দেশের শিল্পক্ষেত্রে বাস করেছিলেন। স্বনামধন্যা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ও সম্প্রীতি ছিল। তাঁর বিখ্যাত বই Ideals of the East-এর ইংরাজী অনুবাদ ভগিনী দেখে দেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, তেমান ওকাকুরার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, প্রতিভা থাকলে স্কুলকলেজের ঘানির ভিতর না গিয়েও অনতিপরিচিত ভাষাকে কিরকম অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করা যায়। আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথের ঐ সব দলে খুব যাওয়া আসা ছিল।

'স্বদেশী'র বীজ হাওয়ায় অনেকেরই মনে অল্পবিস্তর ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যারিস্টার পি. মিত্রের[৬৩] নাম এখনকার লোকের কাছে হয়ত ঐতিহাসিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনিও কমলালয়ের উক্ত পরামর্শ-সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন ; তথা স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ। সুতরাং এখন ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে আড্ডাটি জমেছিল মন্দ না। আমি যদিও বাইরে ২ থাকতুম, সুতরাং ভিতরের খবর কিছু দিতে পারব না। 'স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ' লেখা না থাকলেও, আমার স্বভাবতঃ রাজনীতির প্রতি কোনকালেই ঝোঁক ছিল না ; এখনো যে বিশেষ আছে তা বলতে পারিনে।

এর পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হল ; তার ইতিহাস ত সকলের কাছে সুবিদিত। তার মধ্যেও কেবলমাত্র 'বাংলার মাটি' গানটুকুর সঙ্গেই আজও সম্পর্ক রয়ে গেছে। যার যেদিকে ঝোঁক।

আর মনে হয় যেন সিমুলতলায় সুরেন্দ্র বাঁডুয্যে মেয়েদের এক সভায় বক্তৃতা দিয়ে আমাদের সকলকেই 'স্বদেশী' পণ লইয়েছিলেন। সর্ব্বদা না হোক. আমাদের

দলের অনেকের চেয়ে আমি বেশী স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টা ক'রে এসেছি এবং এখনো করি। যদিও একবার স্বদেশী সাবান ব্যবহার ক রে গায়ে চুলকানি হয়েছিল বলে উনি উল্টদিকে 'ভীষণ পণ' করেছিলেন যে আর কখনো স্বদেশী সাবান মাখবেন না। তাও বলি যে আমাদের দেশের লোকেরও একটু দোষ এই আছে যে, হয়ত শিল্পপ্রদর্শনীতে একটা সাবান খুব ভাল বলে পুরস্কার পেলে; কিন্তু তার পর সেই সাবান বাজারে যেই এল অমনি খারাপ হতে আরম্ভ করল, ভেজাল দিতে লাগল।

স্বদেশী ব্যবহারের একটা অলিখিত নিয়ম এই ছিল যে, ভারতবর্ষে যে জিনিষ না পাওয়া যায়, তার জন্য য়ুরোপে না গিয়ে অন্ততঃ এশিয়ার কোন দেশের জিনিষ নিতে হবে। সে হিসেবে টেবিলে খাবার ভাল কাঁচের বিলিতী বাসন না কিনে আমি একবার দয়ালচাঁদ নন্দীর দোকান থেকে এক প্রস্থ জাপানী খানার বাসন শ'খানেক টাকার উপর দিয়ে কিনি, ও পরে ২০০ টাকায় বিক্রি করি। সেটা বিখ্যাত চীনে বাসনের মত সূক্ষ্ম সৌখীন না হোক, কিন্তু রঙচঙ গড়ন পেটনে একটু নতুনত্ব, এবং গুণতিতে অনেক ছিল। এখনো তার গোটাকতক নমুনা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে যদি না এ-বাড়ী ও-বাড়ী করতে ২ ভেঙে চুর হয়ে গিয়ে থাকে।

আমার বিয়ের সময় নিকট আত্মীয়রা সব পরামর্শ ক'রে আমাকে ভাগ ক'রে কাজের জিনিষ যৌতুক দিয়েছিলেন;—কেউ শ্বেতপাথরের, কেউ চীনেমাটির খাবার বাসন, কেউ কাঁচের গেলাস, ইত্যাদি। জ্যোৎস্নাদা বেতের এক প্রস্থ চৌকি কৌচ দিয়েছিলেন, সেগুলি কমলালয়ের বারান্দায় রাখা হয়েছিল; সত্যদাদা আফিসের সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, ইত্যাদি। আর মা ওঁরা ত জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কোনটাই বাকি রাখেন নি। তখন মেঝেয় মাদুর পাতা রেওয়াজ ছিল, তাই ঘরের মাপ নিয়ে ক্যাশ থেকে 'মুঞ্জ' নামে একরকম দড়ির নক্সাকরা মাদুর, বসবার ঘরের জন্য জেল থেকে নক্সাকরা সত্রঞ্চি ইত্যাদি ফরমাশ দিয়ে আনিয়েছিলেন; সাটীনের উপর ময়ূরের সেলাইকরা নক্সা দেওয়া নতুন ধরনের চৌকী কৌচ করিয়েছিলেন। এ-সব বিষয় সত্যদাদা মামা-মামীর খুব সহকারী ছিলেন; জিনিষপত্র সব কিনেকেটে দিয়েছিলেন।

আমারও একটু পরিষ্কার পরিপাটি ক'রে বাড়ী সাজানো গোছানোর দিকে ঝোঁক ছিল। পরে যখন টাকাকড়ির একটু সুবিধে হল তখন সমস্ত বাড়ী মেরামত করিয়ে, রান্নাবাড়ী দরওয়ানের ঘর বাড়িয়ে, মেঝেয় ও সদর সিঁড়িতে পাথর বসিয়ে বাড়ীটিকে ছবির মত ক'রে তুলেছিলুম। যদিও অত সাজানো গোছানো দেখে আমার শাশুড়ী মাস্-শাশুড়ী দুঃখ ক'রে বলতেন যে,—ন'বউমার একটি ছেলেপিলে হল না ত ঘরদোর অগোছালো করবে কে?—বাড়ীর ছাদের বাইরের কার্ণিশের উপর চৌকা ২ ঘরকাটা ছিল; ওঁর আর

আমার নাম মিলিয়ে তার ভিতর লাল জমির উপর শাদা পদ্ম ও ত্রিশূলের নক্সা বসিয়েছিলুম, বেশ দেখতে হয়েছিল। সেগুলি এখনো আছে, যদিও বাড়ী বহুকাল হল পরহস্তগত। একতলাটা এত উঁচু ছিল যে নিচের কোকরে মানুষ বেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। কখনো '২ চাকরবাকরও সে ঘরে থেকেছে।

বাগানের নয় বিঘা জমির মধ্যে আন্দাজ আদ্ধেকটা আমার সেজ ভাসুর কুমুদনাথ চৌধুরী কিনে নিয়েছিলেন। তিনি যে আইনজ্ঞ বন্ধুকে সে জমির দাম ঠিক ক'রে দিতে বলেছিলেন, আমাদেরও মনে হয় সে বন্ধুত্বের খাতিরে অতি সস্তা দরের একতরফা ডিক্রি দিয়েছিল। কিন্তু যাক সে কথা। সেজঠাকুর সে জমির উপর যে সুন্দর বাড়ী তৈরি করেন, সেখানে আমরা বহুদিন বাস করবার সুযোগসুবিধে পেয়েছি। যদিও শেষজীবনে যখন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, সেই বাড়ীর জমিরই এক কোণে আমরা একটি ছোট বাড়ী ক'রে বাস করব এবং পরে সেটা ওঁরই ছেলেদের দিয়ে যাব বলে প্রস্তাব করেছিলুম, তখন কোন হিতৈষী আত্মীয়ার পরামর্শে সেজঠাকুর তাতে রাজি হলেন না। যদি হতেন, তবে আমাদের কত ঝঞ্ঝাট ও শারীরিক মানসিক ক্লেশ বেঁচে যেত মনে করলে তাঁদের দুজনের প্রতিই একটা দুঃখমিশ্রিত অভিমানের (অথচ তাঁদেরও লাভ বই লোকসান হত না) উদয় হয়। আবার বলি—যাক সে কথা।

তাঁর সে সুন্দর বাড়ী এখনো দাঁড়িয়ে আছে, যদিও তার আলো নিভে গেছে। যখন হিন্দুমুসলমানের বিতণ্ডার সময় আশেপাশে অনেকেই বাড়ী ঘর-দোর ছেড়ে পালালে, তখনও আমার সেজ জা রাধারাণী দেবী[৬৪] সাহসে বুক বেঁধে ঐ বাড়ীতেই পড়ে ছিলেন, এবং এখনো রয়েছেন। যদিও ভোগ করবার লোক সব চলে গেছে।

দেওঘর

ইতিমধ্যে একবার হঠাৎ দেওঘর ঘুরে আসি মনে আছে। যদিও ঠিক সনতারিখ মনে নেই। যত লিখছি মনে হচ্ছে সবই দেশভ্রমণের কথা। তখন কি কেবল ঘুরেই বেড়াতুম? এখন ত পাদমেকং ন গচ্ছামি গোছ মনোভাব। সম্ভবতঃ প্রতি পূজোর ছুটিতে কোথায়ও-না-কোথায়ও যেতুম। উক্ত ভ্রমণের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে, তার পাথেয় জুগিয়েছিলেন সরলাদিদি,[৬৫] তাঁর 'ভারতী' পত্রিকায় ওঁর এক লেখার জন্য গোটা পনেরো টাকা পারিতোষিক দিয়ে। এখন শুনলে লোকে হাসবে যে ঐ সামান্য টাকায় কোন বিদেশে নাকি বেড়াতে যাওয়া যায়—তাও আবার দুজনে! কিন্তু সেকালে ত অন্ততঃ পথ-খরচ ঐ টাকাতেই হয়েছিল বলে মনে হয়। হিরণদিদি (স্বর্ণপিসিমার বড় মেয়ে) দেওঘরে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্তের[৬৬] বাড়ী পেয়েছিলেন, সেখানে তাঁর কাছে আমরা যাব ঠিক করলুম ;—আশা করি আহূত হয়ে,—রবাহূত নয়।

বাড়ীটা ছিল মস্ত; মাথার উপর একটা চিলে-কোঠা-গোছ ছিল, এবং প্রকাণ্ড এক হাতা। হিরণদিদির বড় ছেলে প্রসাদ তখন ছোট, সে ঐ জঙ্গুলে হাতায় এক টাট্টু ঘোড়া দাব্‌ড়ে বেড়াত। আমরা যখন মধ্যাহ্ন ভোজনে বসতুম, সে ঐ কড়া রোদ্দুরে মায়ের কাছে ক্রমাগত 'মা, আমি ঘোড়ার উপরে চড়ব' বলে ঘেঙিয়ে ২ সুর ক'রে এমন নাছোড়বান্দা আবদার করত যে, অবশেষে তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে তাকে অনুমতি দিতে বাধ্য হতেন। হিরণদিদি যখন বারান্দায় বঁটি নিয়ে তরকারি কুটতে বসতেন, তখন আমি টেবিলের ছুরি নিয়ে ঘোড়া পেতে বসে তাঁর সাহায্য করতুম।

এমনি এক দিন বসে আছি, এমন সময় এক টেলিতে দুই পারিবারিক খবর এল—এক হচ্ছে বিলেতে ডবলিউ. সি. বাঁড়ুয্যের মেজ মেয়ে প্রমীলার[৬৭] সঙ্গে আমার ছোট দেবর অমিয় চৌধুরী ওরফে 'অমি'র বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। আর একটা কি এখন মনে করতে পারছিনে—সুবীরের[৬৮] জন্ম?—হতে পারে, যদি ১৯০৫-য়ে হয়; কারণ সে ঐ বৎসর পুজোর সময় জন্মেছিল।

দেওঘরের প্রধান দ্রষ্টব্য ত্রিকূট পাহাড় দেখতে অবশ্য গিয়েছিলুম, এবং একটা গুহার মধ্যে বালানন্দ স্বামী(?)কে দেখেছিলুম একটু ২ মনে আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ সুন্দর। নতুন আলাপীর মধ্যে হিরণদির সঙ্গে নড়ালের রায়দের বাড়ী গিয়েছিলুম। রাজেন মুখুয্যে পরিবারের সঙ্গেও যেন তাঁর মাধ্যমে ঐখানেই প্রথম আলাপ হয় মনে হয়। আর চন্দ্রমাধব (?) ঘোষদের পরিবার। কর্ত্তা পেট-রোগা ছিলেন বলে তাঁর জন্য কলকাতা থেকে টিনে ক'রে মাগুর মাছাদি আসত।

এই ঘোষ পরিবারের সঙ্গে ভবানীপুর থাকাকালীন সুহৃদনলিনীদের সবিশেষ ও সেই সূত্রে আমাদেরও কিঞ্চিৎ আলাপ হয়েছিল। ঐ আর একটি সেকালের বড় একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত। কর্ত্তা এবং তাঁর তিন ছেলে এক বাড়ীতেই থাকতেন। সেই সঙ্গে দুই বিধবা কন্যা। বড়টি সকলেরই মামণি, এবং বাপের বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি আবার ছোট বোনের এক ছেলেকে পুষ্যি নিয়ে মানুষ ক'রে বিয়েথাওয়া দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের কাছে গল্প করেছেন যে তাঁর আদ্ধেক দিন পুরো খাওয়া বা আদ্ধেক রাত পুরো ঘুম হয় না। হয়ত সকলকে খাইয়ে দুফুরে খেতে বসেছেন, এমন সময় খবর দিলে কোন্ ছোট ছেলে বারান্দার রেলিঙের ভিতর দিয়ে গলে পড়ে গেছে। অমনি উঠে পড়ে তার তদন্ত করতে ছুটলেন, খাবার রইল পড়ে। অসুখ বিসুখের সময় রাত্রেও তাই। মেয়েবউগুলিকে শেখাবার দিকে ওঁদের বেশ ঝোঁক ছিল। নাতনীরা লোরে-টোতে পড়তে যেত, বেয়ালা শিখত ইত্যাদি। যদিও বিয়ের পরে বেয়ালা বেশির ভাগ আলমারির মাথার উপরেই পড়ে থাকত বলে দুঃখ করতেন। বউ করবেন বলে মেয়ে দেখতে গিয়ে এত নাকি পাউডার মাখিয়েছে বল্লেন যে, উঠতে গেলে ঝর্‌ঝর্ ক'রে পড়েঁ যাচ্ছে।

আর একবার নাকি বাবুরা মেয়ে দেখে এসে বল্লেন বেশ সুন্দর, কিন্তু যখন ঘরে এল দেখলেন বেশ কালো—তার মানে পাউডারের চোটে তাঁরা বোধহয় আসল রঙ বুঝতে পারেন নি।

এঁরা আবার ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে ছেলেদের পৈতে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কতরকমই দেখলুম। মা-মণি দিদিমণি ওঁরা ঐ একখানি সাদা থান পরে বিলেত-ফেরত ব্রাহ্মসমাজেও বেশ মেলামেশা করতেন। তখন ব্যারিস্টার প্যারী রায়ের, (ওরফে পি. এল.) স্ত্রী (ভূতপূর্ব্ব অ্যানি চক্রবর্ত্তী) আমাদের বিলেতফেরৎ সমাজকর্ত্রীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন ও খুব নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করতেন। সে সময় অভিনয়, মূকাভিনয় প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের নানা আয়োজন থাকত। প্যারী রায়ের সঙ্গে দিনুদের একটু কুটুম্বিতাও ছিল, কারণ তাঁর বড় ভাই রাখাল রায়ের মেয়ে সুশীলা ছিলেন দিনু নলিনীর মা।

তিনি বড় ভালো মানুষ এবং দেখতেও ভাল ছিলেন। গানের গলাও বড় মিষ্টি ছিল। শেষ বয়সে সংসারের নানা দুঃখকষ্টে পড়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যা হয়েছিলেন। নিরামিষাশী ছিলেন বলে মনে আছে আমরা যখন টেবিলে বসে খেতুম, তিনি দরজার বাইরে নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অভিনয়ও বেশ ভাল করতে পারতেন। দুঃখের বিষয়, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ক্ষয়রোগে মারা যান।

সুশীলা বোঠানের সংসার যেমন জাঁদ্রেলী চেহারা তেমনি জাঁকালো গলা ছিল (কবি দেবকুমার রায়চৌধুরীর মা)। আমরা তাঁদের বরিশালের বাড়ীতে গিয়ে শুনেছি, যখন অর্গ্যানের সঙ্গে গলা ছেড়ে দিয়ে গাইতেন 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও'—তখন ঘরখানা গম্‌গম্ করত।

অমলা দাশ

ঘুরে ফিরে গানের কথাই এসে পড়ে। যখন সে কথা হচ্ছেই তখন সেকালের আর একজন স্বনামধন্য সুগায়িকার উল্লেখ করি,—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন অমলা দাশ।[৬৯] তাঁর অত ভারি না হোক, সরু মিষ্টি গলায় যে যথেষ্ট জোর ছিল তা এই বল্লেই বোঝা যাবে যে, কলকাতার কংগ্রেসে[৭০] ১০০০০ লোকের সভায় দাঁড়িয়ে উঠে একা বন্দে মাতরং গেয়েছিলেন, এবং শোনবার কোন অসুবিধে হয় নি। মাইক ছিল কি না ঠিক মনে নেই; তখন সবে রেওয়াজ শুরু হয়েছে বোধহয়।

গ্র্যামোফোনে তাঁর আর কয়েকটি রেকর্ড আছে—'এ কি আকুলতা ভুবনে', 'চির সখা হে ছেড়োনা', 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী', 'যমুনারি জলে মোরে কি নিধি মিলিল', 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'—ইত্যাদি। এখনো শুনলে তাঁকে স্পষ্ট মনে পড়ে। একসময়ে আমাদের পূর্ব্বোক্ত ভবানীপুরের বাড়ীতে (তাঁরই

বাপ ভুবনমোহন দাশেরই ত বাড়ী) রোজ বিকেলে তাঁর ভাজ বিমলার (সত্য দাশের স্ত্রীর) সঙ্গে বেড়াতে আসতেন এবং গানগল্প ক'রে ফিরে যেতেন। আমার ছোট কাকিমার সঙ্গিনী হিসেবে অনেকদিন যোড়াসাঁকোর বাড়িতে কাটিয়েছেন[১১]। মনে হয় 'ওলো সই' ২ গানটি ওঁদের দুজনকে দেখে লেখা। পরে নাটোরের মহারাণীর কাছেও ঐ সূত্রে বহুকাল ছিলেন।

আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথ মহারাজার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন বলে প্রায় রোজ সেখানে নিমন্ত্রণ খেতে যেতেন, আর অমলার রান্নার খুব সুখ্যাত করতেন, বিশেষতঃ তাঁর ছানার পায়সের। শেষ বয়সে পুরুলিয়াতে বিধবাশ্রম করেছিলেন। ঘর না গুণে কিরকম টপ্ টপ্ করে দশপঁচিশের ঘুঁটি ঠিক ২ জায়গায় বসাতেন সে একটা দেখবার জিনিষ। সবসুদ্ধ খুব বুদ্ধিমতী চৌকোষ মেয়ে ছিলেন।

ইতিমধ্যে কবে যে সেজঠাকুররা আমাদের জমিতে বাড়ী তৈরি করেছিলেন, তার সনতারিখ ঠিক মনে নেই। তবে পূর্ব্বোক্ত জন্মমৃত্যুর হিসেব থেকে মনে হয় ১৯০৮-এ সেখানে আমরা ছিলুম, কারণ নলিনীর ছোট মেয়ে পূর্ণিমা ওরফে 'বুবু'র জন্ম সেখানে হয় মনে আছে।

দার্জ্জিলিং

কিন্তু ১৯০৫-এ যদি পুজোর সময় দেওঘর গিয়ে থাকি, এবং ১৯০৬-এ সিমুলতলায়, তাহলে ১৯০৭-এ আর একবার দার্জ্জিলিং গিয়েছিলুম মনে হয়; কারণ অমিয় বিয়ের আগে প্রমীলা আমাদের কাছে পাহাড়ে এসেছিল মনে আছে। বাড়ীটার নাম ছিল Emerald Bank, এবং আমরা এক মস্ত দল সেখানে গিয়েছিলুম—অর্থাৎ ২৫নং ল্যান্সডাউনের সমস্ত দল, তার উপর প্রতিভাদিদি ওঁরাও সপরিবারে। তা ছাড়া ছোট ননদের ছোট মেয়ে উমারাণী ওরফে পুটুয়া সঙ্গে ছিল বেশ মনে আছে। কারণ সে যখন-তখন নিজের কাপড়ের তোরঙ্গের সামনে থেব্ড়ে বসে কি সব করত, জিজ্ঞেস করলে বলত—আমি 'settle' করছি। সেই পুটুয়া এখন নিজে কিরকম settled হয়ে ছেলে বউ নতিনী নিয়ে ঘর করছে।

প্রমীলার প্রিয়র সঙ্গেই বেশি ভাব-সাব হয়েছিল ও গুজগুজব হত। প্রিয়র ঐ এক গুণ ছিল, যে সকলকে খুব অন্তরঙ্গ ক'রে নিতে পারত। মেয়েরা তাকে খুব ভালবাসত, আর আমাকে শুনেছি বলত sarcastic। তা হবে। ঠাকুরঝিকে দেখে প্রমীলা বলেছিল যে দেখলেই অমিয় বোন বলে চেনা যায়; যদিও আমার মনে হয় তাঁর মেজ ভাইয়ের সঙ্গেই বেশি আদল আসত।

এ বাড়ীর একটা সামান্য মজার ঘটনা এই মনে আছে যে, একদিন আমরা সকলে বাড়ীর সামনের ছোট গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করছি, এমন সময় উপরের রাস্তা থেকে কে একজন ভদ্রলোক নেমে আসছেন দেখে ঠাকুরঝি খুব

উৎসাহ সহকারে চেঁচিয়ে বল্লেন – এই যে দ্বিজু, এস এস। মাথায় টাক ইত্যাদিতে দ্বিজুবাবু বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতই কতকটা দেখাচ্ছিল বটে ; আর কৃষ্ণনগর বাসের দরুণ আমার শ্বশুরপরিবারের সঙ্গে তাঁদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু যতই নেবে কাছে আসছেন ততই বোঝা যাচ্ছে যে ভদ্রলোকটি মোটেই যাঁকে মনে করা গিয়েছিল সে দ্বিজুবাবু নন। তখন ভুলটা বুঝতে পেরে ঠাকুরঝিরা অপ্রস্তুত হয়ে সব বাড়ীর মধ্যে দে পিট্টান – সেই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বলবার জন্য বেচারা আমাকে একলা ফেলে রেখে !

রোজ বিকেলে শাল মুড়ি দিয়ে যখন আমরা বেড়াতে বেরতুম, তখন সুহৃৎ বলতেন – আমাদের hobgoblin-এর মত দেখায়। তা হতে পারে, কিন্তু বিলিতী গরম উপরকোট যে আমাদের সাড়ীর সঙ্গে মানায় তা আমার মনে হয় না। এবং এখনো পর্য্যন্ত এ সমস্যা সমাধান করতে পারি নি।

তার পরের বছর আবার দার্জ্জিলিং যাই মনে আছে এই জন্য যে, ১৯০৮ সালে প্রমীলার প্রথম ছেলে মুচুর (ওরফে জয়ন্তের)[৭২] জন্ম হয়, বুবুর মাস দুই আগে ; এবং তাকে কোলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে সে দিনকতক ছিল। সে বাড়ীটার নাম ছিল The Dingle। এবং মনে হচ্ছে সুহৃৎ-এর বড় দুই ছেলেমেয়ে সুরমা ও সঞ্জীবকেও[৭৩] সেবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সে এক বিপদ। আমরা দোতলায় যে ঘরটায় শুতুম সেখানে সুরমা আমাদের সঙ্গে শুতো আর তার পাশেই নীচে একটু সরু গলিতে সঞ্জীব শুতো। তার আবার রাত্রে ওঠা বাই ছিল। ঠিক রাত ১২টায় একটি শাদা রাতকাপড়পরা ছোট ছেলেকে আমাদের বিছানার পাশে হঠাৎ এসে দাঁড়াতে দেখে কেমন ভয় ২ করত ; কিন্তু একটু ধমক দিলেই আবার সুড়সুড় ক'রে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত। আবার ভোর হতে না-হতে সুরমা ফোঁস্ ফোঁস্ আরম্ভ ক'রে দিত, মায়ের জন্য মন কেমন করছে বলে ! ভাল মুস্কিলেই পড়েছিলুম। এদিকে দিনের বেলা বেশ হাসিখুসিতে থাকত।

পাহাড়ের চূড়ায় Ierpsithea নামক বাড়ীতে সিংহসাহেবরা থাকতেন, তাঁদের ছোট ছেলেমেয়ে বিজলি ও বুচুর সঙ্গে এদের বেশ জমে গিয়েছিল ; গাড়িবারান্দায় একটা দোলনা ছিল, তাতে দুলত ইত্যাদি। আর একবার ঐ চূড়ার বাড়ীতে এক বিশপ সাহেব ছিলেন, তিনি বলেছিলেন অনেক দেশ বিদেশে ঘুরেছেন, কিন্তু ওরকম সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য পৃথিবীর মধ্যে খুব কম দেখেছেন।

দার্জ্জিলিংয়ের টাইগার হিলের উপর থেকে সূর্য্যোদয়ের বিখ্যাত শোভা দেখবার জন্য কত লোকে কষ্ট ক'রে ঐ কন্‌কনে শীতে ঘোড়ায় চড়ে বা ডুলি ক'রে ভোর রাত্রে উঠে যায়, বা আগের দিন রাত্রে পাহাড়ের উপরের ডাকবাংলায় গিয়ে শুয়ে থাকে, তা অনেকেই শুনে থাকবেন। যদিও আমরা কখনো এ কষ্ট স্বীকার করি নি, তা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি। কিন্তু আমাদের কথা ছেড়ে দাও।

Hailey's Comet ৭০ বছরে একবার ওঠে শুনেও বিছানা ছেড়ে ভোর চারটের সময় উঠে দেখলুম না। রাঁচিতে বাড়ীর পাশের মাঠে এরোপ্লেন নেবে রয়েছে জেনেও সেটা কাছ থেকে দেখতে গেলুম না। যদিও এখানে একবার অনুরূপ অবস্থায় ঘটনাচক্রে কাছ থেকে দেখবার একটু সুযোগ অনেকদিন পর হয়েছিল বটে। কিন্তু নীচে থেকে কিছু ভাল বোঝা গেল না।

কিন্তু ১৯০৮ সালে যেমন মুচুর জন্ম, তেমনি ১৯০৭ সালে আমার বড় ভাইঝি মঞ্জুশ্রী[৭৪] ওরফে মঞ্জুর জন্ম হওয়ায় এবং তার দশ মাস বয়সে ১৯০৮-এর প্রথমেই আমাদের সঙ্গে রাঁচি যাওয়ায় দার্জ্জিলিং এবং রাঁচির সঙ্গে আমার একটু গুলিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় ১৯০৮ জানু-তে রাঁচি এবং পুজোর সময় দার্জ্জিলিং যাই ; তাহলে দুদিকই মিলে যায়। সেই যে দার্জ্জিলিং থেকে পৈটিক রোগ নিয়ে ১৯০৪-এর শেষে নেমে আসতে বাধ্য হই, তখন থেকে আমার চিকিৎসা-চেষ্টায় ক্রটি হয় নি বলা বাহুল্য। তারপরে শ্যামাচরণ নামে এক সাধারণ কবিরাজের ওষুধে আমার উপকার হল। তিনি দুধের সঙ্গে একটা কি শাদা গুঁড়ো খেতে দিতেন, আমাদের ত মনে হয় সেটা আফিমঘটিত। যাই হোক, অসুখ সারলেই হল।

রাঁচি

তখন রাঁচি সহরটার স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর বলে জয়জয়কার ঘোষণা করতে সবে আরম্ভ করেছেন তখনকার ছোট লাট Fraser সাহেব। মা অমনি আমার স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে সে জায়গাটা পরিদর্শন করবার জন্য মামাকে পাঠিয়ে দিলেন। মামা দেখে এসে ভাল রিপোর্ট দিলে মা বল্লেন – আমার মেয়ের শরীর যেখানে ভাল হবে আমি সেইখানে বাড়ী করব।

১৯০৮-এর আরম্ভে মাঘ বা জানুয়ারি মাসে আমরা প্রথম রাঁচি যাই। তখন বাড়ীতে একটি বিশেষ স্নেহপাত্রের বিয়ে বলে মা যেতে পারলেন না ; তাই আমরা চারজন, অসহ্য ঠাণ্ডা হবে জেনেশুনেও গেলুম। সুরেন সেই যে মারহাটী পার্শী দম্পতিকে ১৯ নং স্টোর রোডে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই জাইবাইও আমাদের সঙ্গে গেলেন। বউ ও আমি যখন তরকারি কুটতুম, সে দেখেশুনে বলত যে, এতরকম তরকারি খাওয়া সে কখনো দেখে নি। সত্যি, এক কলাগাছ থেকেই বাঙ্গালী কতরকম সুখাদ্য বের করেছে দেখলে অন্য জাতের ত আশ্চর্য্য হবারই কথা।

প্রথম ২ রাঁচির আদিম বাসিন্দা কোলদের নিম্নশ্রেণী যখন দেখলুম, তাঁদের সেই একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, খাঁদা নাক ও কালো শুষ্ক চামড়া দেখে মনে হত যে এরাও মানুষ আর আমরাও মানুষ ?—যেন কি এক বিকটাকার রাক্ষসে চেহারা দেখে ভয় ২ লাগত, যখন তারা দল বেঁধে ভিক্ষা চাইতে আসত।

আর একরকম ভয় করত আমাদের আত্মীয় সুকুমার হালদারের[১৫] বড় ছেলে সনৎকে দেখে। রাঁচিতে এসে যাঁরা সেকালে বসবাস করেছেন সেই বাঙালিদের মধ্যে তাঁর বাবা রাখাল হালদার প্রথম এবং প্রধান একজন। তাঁর অনেক জমি-জমা ছিল, সুকুমারবাবু তার বড় ছেলে সনৎকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ সেখানে চাষবাস করতে পাঠিয়েছিলেন। তাকে ঐ সব বিষয়ে উপদেশ দিয়ে খুঁটিয়ে কত লম্বা ২ চিঠি লিখতেন তা আমরা দেখেছি। এবং এখনো মনে করলে মায়া হয় এই মনে ক'রে যে ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য বাপমায়ে কত পরিশ্রমই না করে। কিন্তু সে সব ভস্মে ঘী ঢালা; কারণ সনৎ-এর সে মাথা ছিল না যাতে সে-সব উপদেশমত কাজ করতে পারে। সে বিলক্ষণ ছিটস্থ ছিল, এবং আমাদের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চাইত আর ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসত বলেই কেমন যেন ভয় ২ করত।

সুকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; একবার যখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী (সুপ্রভা দেবী, আমার পিসতুতো বোন) চাইবাসায় বদলি হয়ে যান তখন সুপ্রভাদিদি সনতের উপর গরুর খোরাকীর ভার দিয়ে যান। কিন্তু দুধ খাবার লোক কমে গেল বলে সনৎ গরুর খোরাকীর বরাদ্দ আদ্ধেক কমিয়ে দিল। ফলে গরু রোগা হয়ে তার দুধ বন্ধ (এবং দম বন্ধ!) হবার যোগাড় হল। সুপ্রভাদিদি গল্প করলেন যে তিনি যেদিন ফিরলেন সেদিন তাঁর চা খাবার জন্যেই যেন মাত্র একটি পোয়া দুধ দিলে! সনতের বুদ্ধির গল্প আর কত করব? তবে তার গুণের মধ্যে ঐ এক গান গাইতে পারত মন্দ না, এবং তার অনেক গান এখনো আমার খাতায় লেখা আছে।

মামা আমাদের জন্য যে বাড়ী রাঁচিতে ঠিক করেছিলেন, সেটা কাশিমবাজারের মহারাজার। মস্ত বাড়ী, যদিও খালি হাঁ হাঁ করছে - আর মস্ত বাগানে মেলাই ফলগাছ। ওখানকার গাছের এক মজা দেখলুম এই যে, উপরদিকে না বেড়ে, নিচের দিকে ডালপালা ছড়িয়ে যেন মাটি ঢেকে দেয়।

এক ঠিকে ফীটন গাড়িতে চড়ে শীতের হাতের মার থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য বউ মাথায় ফ্যাটা বেঁধে আমরা চারজনে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরতুম; নয়ত কেউ আমাদের বাড়ী আসতেন। এই প্রথম হাতেখড়ির পর এতদিন ধরে এতবার রাঁচি বেড়াতে গেছি যে, কোন বার কার সঙ্গে আলাপ হয়েছে মনে রাখা শক্ত; তবে সবসুদ্ধ সেখানকার অনেক লোকের সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। আর মা যা চেয়েছিলেন তাই হল। রাঁচিতে গিয়ে আমার অসুখ সারল, এবং মা ওঁরা সেখানে বাড়ীঘর করলেন, পরে আমরাও করলুম। প্রথমে ভিন্ন ২ ভাড়া বাড়ীতে থাকবার পর জ্যোতিকামশায় মোরাবাদী পাহাড় পত্তনী নিয়ে অধুনা বিখ্যাত 'শান্তিধামে'র ভিত পত্তন করলেন[১৬]। এবং আমরা কোকরে এক খণ্ড জমি কিনে তার উপর এক একতলা বাংলো-প্যাটার্ণ বাড়ী করালুম।

দোষের মধ্যে সেটা ভাঁটিখানার খুব কাছে ছিল বলে পথে যেতে-আসতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যেত! নইলে পাড়াটা মন্দ ছিল না, বাজারহাট লোকালয় থেকে মোরাবাদীর মত অত দূরে নয়। আর বাগানে একটা মস্ত কাঁটালগাছ বেশ গোল ছত্রাকারে বিরাজ করত।

বাড়ীটা আমাদের অনুপস্থিতিতে করিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের নতুন বন্ধু কালীবাবু (কালিপদ ঘোষ)—যাঁকে একপ্রকার রাঁচির G. O. M. বলা যেতে পারে। ওকালতী ক'রে অনেক পয়সা রোজকার ও মস্ত বাড়ী ঘরদোর করেছিলেন। মেয়েদের নাম যথাক্রমে শরৎ বসন্ত হেমন্ত ছিল মনে আছে। এবং ছোটটিকে রেখে তার মা আঁতুড়ে মারা গেলে তাকে পাণিবাবুর স্ত্রী মানুষ করেন (পানি—স্যর কে. জি. গুপ্তের ভাই। অন্যান্য বন্ধুর মধ্যে ছিলেন পি. এন. বোস, কান্তি সেন, জয়কালী দত্ত, স্থানীয় স্থায়ীর দলে; আর অস্থায়ীর মধ্যে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন মুখুয্যে, সুনীতি মহারাণী ইত্যাদি সেখানে আসা-যাওয়া করতেন। মহারাণীর বাড়ী সত্যধামের নকলে পদ্মপ্যাটার্ণ করা হয়েছিল; তবে অনেক বড় বলে আটপৌলে না করেও মানিয়ে গিয়েছিল।

তার বাগানে সামনেই তাঁর তদানীন্তন বউ নিরুপমা দেবী[৭৬ক] ছেলেদের জন্য একটা মুকুটের নমুনায় খেলাঘর বানিয়েছিলেন, ছোট ২ জানলা সব নিজের হাতে তৈরি ক'রে। সে খেলাঘর এখনো রয়েছে, কিন্তু তাঁর স্বামীর ঘর ভেঙ্গে গেছে। রাজবধূর পদ ত্যাগ ক'রে গৃহস্থ বিয়ে ক'রে মহাত্মা গান্ধীর স্থাপিত কস্তুরবা গ্রামসেবিকা হয়ে নদীয়া জেলার কোথায় কাজ করছেন। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। তাই বলি, এঁদের জীবনীই লেখবার মত। আমাদের জীবনে আর কি বৈচিত্র্য আছে? Mark Twain-এর মত Got up, had breakfast, went to bed."

রাঁচির অন্যান্য ভাড়াবাড়ীর উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রাখাল হালদারের এক বাড়ীতে যখন ছিলুম হিদ্দা (সেজকাকা হেমেন্দ্রনাথের বড় ছেলে হিতেন্দ্রনাথ) এসে আমাদের কাছে দিনকতক ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাড়ী ফিরে গিয়েই যে তাঁকে কি রোগে ধরল, সেই অসুখেই মারা গেলেন।

আবার সেই বাড়ীর সঙ্গে একটা সুখের স্মৃতিও আছে। টাটা কোংয়ের আবিষ্কর্তা প্রমথনাথ বসু[৭৭] (ওরফে পি. এন. বোস) বিয়ে করেছিলেন রমেশ দত্তের বড় মেয়ে কমলাকে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের সৌহার্দ্দ্য। তাঁদের নিজের প্রাসাদোপম রাঁচির বাড়ী যখন তৈরি হয় নি, তাঁরা সেজ [?] মেয়ে প্রতিমার বিয়ের আয়োজন করবার জন্য আমাদের উক্ত বাড়ীতে দিনকতক এসে ছিলেন। কষ্ট করেই থাকতে হয়েছিল, বারান্দায় দরমা-ঘেরা নাবার ঘর ব্যবহার ক'রে, ইত্যাদি।

কিন্তু কমলা বল্লেন তিনি ১৬ বছর বয়স থেকে ভূতত্ত্ববিৎ স্বামীর সঙ্গে বনে

জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাই তাঁর এ-সব অসুবিধে সওয়া আছে। বিয়েরও নানা হাঙ্গাম। কন্যাপক্ষ ব্রাহ্ম, বরপক্ষ হিঁদু। কোন্ মতে কি হবে, তাই নিয়ে এক-একদিন এক-এক মত স্থির হয়, আর এঁরা চিঠি পেয়ে অস্থির হন। অবশেষে জস্টিস সারদা মিত্র দাঁড়িয়ে থেকে শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন করালেন। হোমও হল, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীতও গাইলুম; তাই শেষ পর্য্যন্ত কোন্ মতে ঠিক হল তা এখনো বলতে পারব না। তবে এইটুকু জানি যে স্নেহের প্রতিমা বহু বৎসর সুখে সম্মানে স্বামীর ঘর ক'রে সম্প্রতি তাঁকে হারিয়ে ছেলে বউ নাতি নিয়ে ঘর করছে; মাঝে ২ এখনো দেখা হয়।

তাঁকে বিয়ের সময় এই দোভাষী দুটি কবিতা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি :

প্রতিমা, তোমারে এই করি আশীর্ব্বাদ
হও তুমি লক্ষ্মীর প্রতিমা।
পূরে যেন সব তব হৃদয়ের সাধ,
সুখের না থাকে যেন সীমা॥
পরিপূর্ণ সে সুখেরে অঞ্জলি ভরিয়া
চৌদিকে করিয়ো বিতরণ।
দুঃখ যদি কভু আসে, তাহারে লইয়া
রচিয়ো শান্তির নিকেতন॥
নূতন বরষে তুমি নববধূবেশে
প্রবেশিবে যে নূতন ঘর,
আপন করিয়ো তারে, কিন্তু অবশেষে
আমাদের করিয়ো না পর॥

O sweet seventeen !
as you journey through life,
May it be your good fate
to discover,
That though from a maid
you have turned to a wife,
Yet your husband
is always your lover !

অন্যান্য ভাড়া বাড়ীর মধ্যে বলিহারের রাজবাড়ীতেও ছিলুম, তার একটা ছোট, একটা বড় বাড়ী ছিল। প্রতিভাদিরা[৭৮] বোধহয় একবার ছোট বাড়ীতে বাস করেন, আর বড় বাড়ীতে গগনদা[৭৯] সপরিবারে। সেখান থেকেই তাঁর সেই শিরঃপীড়া ও যার থেকে চোখ খারাপ আরম্ভ হল, শিল্পীর পক্ষে যেটা সব চেয়ে

কষ্টকর ব্যাপার ; সেজন্য ছবি আঁকা বন্ধ ক'রে দিতে হল।

বেশ মনে আছে, আমরা তখন মোরাবাদীর পাহাড়ের বাড়ী শান্তিধামে বাস করছি। একসঙ্গে হয়ত বেড়াতে গেছি, গগনদা হঠাৎ রাস্তার মাঝে বসে পড়লেন। আবার একটু সলজ্জ হাসি হেসে ঝেড়েঝুড়ে উঠে পড়লেন, যেন কিছুই হয় নি। এরকম দু'একবার হতে কিন্তু উনি নবুকে[৮০] সাবধান ক'রে দিলেন যে —দেখ নবু, তুমি কলকাতায় গিয়ে তোমার বাবাকে ভাল ডাক্তার দেখিয়ো। এ সব লক্ষণ আমার বড় ভাল লাগছে না। ওঁর সতর্কবাণীই ফলে গেল। কলকাতায় ফেরবার কিছুদিন পরেই গগনদা একদিন সকালে উঠে সেই যে বিছানার পাশে ধপ ক'রে মাটিতে বসে পড়লেন, সেই থেকে মাথার কোন শিরা ছিঁড়ে বাকশক্তি রহিত হয়ে গেলেন. পরের বার বা তার পরের বার ঐরকম হতে সব শেষ হয়ে গেল।[৮১] কিন্তু সেই যে একাদিক্রমে নয় বৎসর ঐ ভাবে ছিলেন, অতদিন সমানে মুখে সেই অমায়িক হাসি দিয়ে সকলকে অভ্যর্থনা করতেন ; দেখলে এত কষ্ট হত। আত্মীয়স্বজনেও তেমনি সকলে মিলে সমানে তাঁকে সেবা যত্ন করেছে। এইটুকু মাত্র মানুষের হাতে আছে, তাই করেই সুখ, নইলে কেউ ত কাউকে ধরে রাখতে পারে না।

রাঁচির কোন একটা বাড়ীর কুয়োর জল অতি সুন্দর ছিল, ঠাণ্ডা ও মিষ্টি, যেন সরবৎ।

শান্তিধাম ১৯১৯-এ শেষ হয়. বোধহয় তার ফলকেই লেখা আছে। ততদিন ওঁরা তার গুদমঘরে থেকে মূল বাড়ীটা তৈরি শেষ করেন। আর আমাদের কোকরের বাড়ী যে ১৯০৯-য়ে তৈরি হয়, তা মনে রাখবার বিশেষ কারণ এই যে কল্যাণ ও প্রবীর[৮২] দুজনেরই ঐ সালে জন্ম হয় (ছয় মাসের আড়াআড়ি আর দুজনের কচি বয়সে তখন আমাদের সঙ্গে রাঁচি গিয়েছে। প্রবীরের পাহাড়ের বাড়ীতে হল তড়কা, ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেলেন ; শেষে রণরাম নামক এক পাগল-সারানো বহু পদকপ্রাপ্ত কবিরাজের হাতে ভাল হল, যদিও মাথাটা চিরদিন দুর্ব্বলই রয়ে গেল।

তারপর কোকরের বাড়ীতে আমার হল নিউমোনিয়া - বোধহয় নতুন বাড়ী শুকোতে না শুকোতে আমরা এসে দখল করেছিলুম বলে। তার উপর হাট দেখে ফিরে এসে শ্রান্ত হয়ে ঘেমে আমি সত্রক্ষিপাতা মেঝের উপর শুয়ে পড়েছিলুম, তাতে ভিজে মেঝের দরুণ সম্ভবতঃ ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। মাতো সেইখানেই বাস ক'রে আমার খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করতে লাগলেন। আর সুহৃৎকে কলকাতা থেকে আনিয়ে তাঁরা সপরিবারে আমার সেবা ক'রে সারিয়ে তুল্লেন। যদিও মোটে দিন ১৫ শয্যাগত ছিলুম, তবু উঠে একেবারে চলতে পারছিলুম না, কেন কে জানে। প্রিয়[৮৩] দিনকতক থেকে চলে গেল ; সেজদি-রাও চলে গেলেন। ওদিকে প্রবীরের তড়কা, তা ত বলেছি।

হেমলতা বৌঠানও[৮৪] তখন দিনকতক পাহাড়ের বাড়ীতে এসে ছিলেন, এবং সেইখানে জ্যোতিকামশার উৎসাহে, তাঁর কবিতা লেখায় হাতে-খড়ি হল। আমি সেরে উঠলে ওঁরা দুই জায়ে আমাকে জন্মদিনে কবিতায় চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন, আমিও সেই ভাবে উত্তর দিলুম। সে সব কবিতার উত্তর প্রত্যুত্তর এখনো আমার খাতায় লেখা আছে। এখন ত সেই হেমলতা দেবী স্বনামধন্য লেখিকা। ওঁর সঙ্গেও দুই ভাজের, বিশেষ হেমলতার রসরচনা বিনিময় ঐ খাতাতেই পাওয়া যাবে। আমার কবিত্বশক্তি এখন পর্য্যন্ত জন্মদিনে ও সহি-খাতায় ছড়া ছড়ানোতেই আবদ্ধ, এবং আমার নাতি-নাতনীদের ফরমাস খাটাতেই নিবদ্ধ।

আমার ১৯০৯ সালের জন্মদিন অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত যদি রাঁচিতে থেকে থাকি, তাহলে ১৯১০-এর কোন্ মাস নাগাদ কলকাতায় ফিরলুম তা ঠিক মনে না করতে পারলেও স্বভবন বা কমলালয়ে ফিরেছিলুম বলেই মনে হচ্ছে। তার মানে তখন কোন ভাড়াটে ছিল না। ঐ মাঝে ২ ভাড়া দেওয়ার দরুণই দেশকালপাত্রের সঙ্গে ঘটনাবলী মেলানো মুস্কিল হয়ে পড়ে।

যখনই ভাড়া হত আমরা সেজঠাকুরদের ওখানেই থাকতুম। তিনি আমাদের জমির আদ্ধেক কিনে নিজের পছন্দমত একটি সুন্দর বাড়ী আমাদের পাশেই তৈরি করিয়েছিলেন, তা আগেই বলেছি। সেই বাড়ীটি এখনো আছে, যদিও আমাদের অন্যান্য আত্মীয় যাঁরা বালিগঞ্জে নিজে বাড়ী করিয়েছিলেন অধিকাংশই ছেড়ে চলে গেছেন—কেউ স্থায়ী কেউ অস্থায়ীভাবে,—অর্থাৎ বিক্রি ক'রে কিম্বা ভাড়া দিয়ে। শ্বশুরবাড়ীর মধ্যে এক মেজ সেজ বাড়ীর উত্তরাধিকারীরাই ভোগ করছেন। আর বাপের বাড়ীর ওঁরা কোনপ্রকারে কোণঠেসা হয়ে আছেন—দেনার দায়ে বাড়ী জমি ছাঁটতে ২ নির্ম্মূল। যাক্ সে সব দুঃখের কথা। এখনো যে কলকাতায় গেলে তার একপাশে একটু ঠাঁই পাই, তাতে 'ভাব থাকলে তেঁতুল পাতায় ধরে'—এই প্রবাদবাক্যই প্রমাণ হয়।

শিলং

যতদূর মনে আছে ১৯১১-র পূজোর ছুটিতে আমরা শিলং পাহাড়ে বেড়াতে যাই,—এবং একটি বোর্ডিং হাউসের একদিকটা এক মাসের জন্য ভাড়া নিই। তার একটা মহা সুবিধে এই ছিল যে, পাশের পাহাড়ের উপরিস্থিত Bonnic Brac নামক হোটেলের কর্ত্রী সেখান থেকে আমাদের খাবার পাঠিয়ে দিতেন, নিজেদের কোন ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হত না।

শিলংয়ের লাল মাটির রাস্তায় বাসে চড়ে এঁকেবেঁকে পাহাড়ে উঠে মাঝে সোলনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা থেকে আরম্ভ ক'রে এই সুন্দর নির্জ্জন শৈলবাসে শান্তিতে ও আরামে মাসখানেক যাপন পর্য্যন্ত সুখের স্মৃতিই রয়ে গেছে।

আগন্তুকের মধ্যে আমাদের কুটুম্বস্থানীয় হরীশ শর্ম্মা রোজই একবার ক'রে আসতেন, এবং নানা বিষয়ে গল্পগুজব ক'রে সময় কাটিয়ে দিতেন।

রোজ বিকেলে একবার ক'রে বেড়াতে যেতুম, বিশেষতঃ সরকারী বাগানের হ্রদের ধারটি বড় মনোরম স্থান, – আধুনিক কালে যেখানে আসামের রাজ্যপালের কন্যার আংটি পড়ে যাওয়ায় হুলস্থূল বেধে গিয়েছিল। আর একটি অতিথির কথা মনে পড়ে – সিস্টর ক্রিস্টীন, – যিনি ভগিনী নিবেদিতার সহকর্ম্মী এবং আমাদের উভয়েরই পক্ষপাতী ছিলেন।

শিলংয়ে থাকাকালীন ঘটনাবলীর চেয়ে যেদিন কলকাতা ফিরে গেলুম, সেদিনকার ঘটনার একটু বিশেষত্ব আছে। 'ঠিক দুক্কুর বেলা' আমাদের ট্রেন যে-ই স্টেশনে পৌঁছল, সেই সময় আমাদের কমলালয় বাড়ীর সামনের অংশ বা গাড়িবারান্দাটা দড়াম্ ক'রে পড়ে গেল। বাড়ীটা তখন মেরামত হচ্ছিল। মূল বাড়ীটার সঙ্গে গাড়িবারান্দার যোগটা একটু আলগা হয়ে পড়েছিল, তাই মুটেমজুর আনাগোনা করবার সময় একটা মজুরণীকে নিয়ে গাড়িবারান্দাটা ধ্বসে পড়ল। সামনের বাড়ীতে আমাদের পরিচিত এক মারাঠী ডাক্তারনী ছিলেন, তিনি অ্যাম্বুল্যান্স ডাকিয়ে তাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

এ-সব কথা অবশ্য আমরা পরে শুনতে পাই। প্রথমে এসে মা ওঁদের কাছে ১৯ নংয়ে নামি, সেখানে তখন জ্যাঠামশায় দিনকতক থাকতে এসেছিলেন। তাঁকে বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দেওয়া হয়েছিল যেন আমরা বাড়ী আসতে আসতেই এই দুর্ঘটনাটার কথা না বলা হয়। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের আর তর সইল না; যেমনি এসে নামলুম অমনি সুখবরটি দিয়ে দিলেন। অবশ্য আমরাও যে শুনেই ধমাস্ ক'রে পড়ে গেলুম তা নয়। তবু তাঁর ছেলেমানুষী স্বভাবের পরিচয় দেবার জন্য কথাটা বল্লুম।

এই হুজ্জতে আবার অনেকদিন – কয়েক মাস হবে, আমরা বাড়ী ঘর ছেড়ে ১৯ নংয়ে মা'দের ওখানে রইলুম। এই স্নেহচ্ছায়া সর্ব্বদা মাথার উপরে না থাকলে কি যে হত তা জানিনে। বাবা ওঁদের খুব পাখী পোষবার সখ ছিল, আমাদের গাড়িবারান্দা সাজাবার জন্য এক মস্ত জালের খাঁচাভরা সুন্দর ছোট ২ পাখী দিয়েছিলেন – দুঃখের বিষয় তারা সব সেই গাড়িবারান্দা চাপা পড়ে মারা গেল। মেরামতের পর অবশ্য বাড়ীটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি।

সবুজপত্র

বাঙ্গলা ১৩২১ সনে এবং ইংরাজি ১৯১৪ খৃঃ-এ এই কমলালয়েই 'সবুজপত্রের উদ্গম'[৮৫] হয়, সে কথা ওঁর 'আত্মকথা'তেই প্রকাশ (পূর্ব্বাশা, পৌষ, ১৩৬০)। ১৯১২ সালে যদি শিলং ফেরতা মেরামতাদির পর নবকলেবরধৃত

কমলালয়ে এসে বসে গিয়ে থাকি ত এই কয় বৎসর সবুজপত্রকে ঘিরেই আমাদের জীবনযাত্রা ঘুরছিল বলতে হয়। বৈষয়িক দিক থেকেও যতদূর মনে পড়ে এই সময় আমাদের সচ্ছলভাবে কেটেছে। প্রথমে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর, পরে গোপাল শীলের এস্টেটের ঋষিবরী এবং তদুপরি বছর খানেক ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজারি পাওয়ার দরুণ তখন আমাদের আয় মন্দ ছিল না। সবুজপত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে উনি 'আত্মকথা'য় এইরকম লিখেছেন :

"আমি আর মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর তাঁর বোটে একবার কিছুদিন থাকতে যাই।...এই বোটেই মণিলালের কাছে শুনি যে রবীন্দ্রনাথ বলেন আর লিখবেন না, তিনি ঢের লিখেছেন।...তিনি বলেন যে, প্রমথ যদি একটা কাগজ বার করে, তাহলে আমি তাতে লিখতে রাজি আছি। আমি বললুম—আপনি যদি লেখেন তাহলে আমিও কাগজ বার করতে রাজি আছি। তিনি বললেন, অন্য কোনো কাগজে আমি লিখব না।

মণিলালের একটি কাগজ ছিল। কথা ঠিক হয় যে, সেই কাগজই সবুজ-পত্র নামে ছাপানো হবে। এই নতুন নাম আমিই দিয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে, ১৩২১ সালের বৈশাখে সবুজপত্র প্রথম বেরোয়।

এই কাগজ উপলক্ষ্য করে যে সব যুবক কমলালয়ে আমার কাছে আসতেন, তার মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় ও তাঁর ভগ্নিপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন। আর ছিলেন ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখুয্যে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু। প্রবোধচন্দ্র ও সুবোধচন্দ্র চাটুয্যে, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বরদাচরণ গুপ্ত, হারীতকৃষ্ণ দেব, সুধীন্দ্রনাথ সিংহ, সতীশচন্দ্র ঘটক, মাণিকচন্দ্র দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য, সোমনাথ মৈত্র প্রভৃতি।...

এই সবুজ সভার সভ্যগণ হপ্তায় একদিন ক'রে আমার কাছে বিকেলে আসতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কখনো সাহিত্যালোচনা, কখনো সঙ্গীত-চর্চ্চা হত। মণ্টু (দিলীপ রায়) যখন আসত, সে গান করত। বাড়ীর মেয়েরাও কখনো ২ করত।

লেখবার মধ্যে আমিই নিয়মিত মাসে ২ সবুজপত্রে লিখতুম। আর রবীন্দ্র-নাথ বোটে আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা তিনি অক্ষরে ২ পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা অঙ্গীকার না ক'রে সবুজপত্রের কোনো সংখ্যাই বেরোয় নি। এবং তাঁর এই সাহচর্য্য না পেলে যে আমি ছয় মাসও সবুজপত্র চালাতে পারতুম না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সবুজপত্র আকারে চৌকোনা ও ছোটই ছিল, আট-ন' ফর্ম্মার বেশি নয়। তার মলাটের রং বাস্তবিকই সবুজ ছিল, এবং তার উপরে একটি কালো তালপাতার নক্শা থাকত। সেটি নন্দলালের হাতের আঁকা। কাগজ এবং ছাপা ভালোই ছিল। সবুজপত্র ছবি এবং বিজ্ঞাপন-ছুট ছিল।...প্রকাশিত

প্রবন্ধগুলির রচনায় যাতে একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ রক্ষিত হয়, সম্পাদক হিসেবে আমি বরাবর সেই চেষ্টাই ক'রে এসেছি। এবং আজ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য-সমাজে সবুজপত্রের সুনাম আছে,—সে ঐ কারণেই।…যতদিন পর্য্যন্ত সবুজ-পত্র বেঁচেছিল, ততদিন পর্য্যন্ত একভাবেই চলেছিল। তারপর গতপূর্ব্ব যুদ্ধের সময় জিনিষপত্র সব আক্রা হওয়ায় আমি সবুজপত্র বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হই। প্রথম পর্যায় সবুজপত্র ১৩২১ থেকে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে চলে। তারপর ক'বছর বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩০ থেকে ১৩৩৪ পর্য্যন্ত চালিয়েছিলুম। তারপর আর পারলুম না। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের জন্মমাস বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে বছর আষ্টেক সমানে চলে। দ্বিতীয় পর্যায় আমার জন্মমাস শ্রাবণ থেকে আরম্ভ করি; পর বৎসর ভাদ্র, তার পরের বৎসর আশ্বিনে বেরোয়, তার পরে বন্ধ হয়ে যায়।'

এই ত ওঁর কথায় সবুজপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমার কেবল মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের সাহচর্য্যের দুর্লভ সৌভাগ্য পেয়ে তবু যে উনি আরও কিছুদিন কাগজটা চালাতে পারলেন না, সে অনেকটা মণিলালের[৮৬] বৈষয়িক সুপরিচালনার অভাবে। কারণ ওঁর সেদিকে মোটেই স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল না; যদিও পরের বিষয় হাতে নিয়ে ভাল চালাতে পারেন নি তা নয়,—যাকে বলে ঋষিবরী। যে কারণেই হোক, অত শীঘ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। তবে এইমাত্র সান্ত্বনা যে যতদিন চলেছিল, সুনাম রেখে গেছে যার সৌরভ ও গৌরব একাল পর্য্যন্ত চলে এসেছে।

আমার দিক থেকে বলবার আছে যে, আমার যেটুকু রচনাশৈলীর শিক্ষা হয়েছে, সে ঐ সবুজপত্রেরই দৌলতে। ১৯০২ সালের রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-ঘটিত কাটখোট্টা রচনার পর যে এই ১০।১২ বৎসরে সঙ্গগুণে বা যে-কারণেই হোক, অনেক উন্নতি করেছিলুম, তার প্রমাণ এই যে আমার সবেধন নীলমণি 'নারীর উক্তি'[৮৭] বইখানি (সবুজপত্রে লেখা প্রবন্ধেরই সংগ্রহ) তখনকার কালে উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছিল, এবং এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য সঙ্কলনে 'ভদ্রতা'[৮৮] নামক তার একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে; যদিও নিজের মুখেই বলছি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক একটি বিশেষ ঘটনারও যোগ রয়েছে। সেটি হচ্ছে ঐ বৎসরের মহাযুদ্ধে আমার দেবর ডাক্তার সুহৃৎনাথ ও পরে মন্মথনাথের যোগ দেওয়া[৮৯]। ছোট্‌ঠাকুরপো (মন্মথ) ত পল্টনের ডাক্তার বা I. M. S.-এ ছিলেন, এবং তাঁর পদমানধনের কোন অভাব ছিল না তা আগেই বলেছি। সুহৃৎ হয়ত নিজের অবস্থার উন্নতির আশায় যোগ দিলেও দিয়ে থাকতে পারেন, যদিও তিনিও তখন একটু অবজ্ঞাচ্ছলে যাকে G. P. বা General Practitioner বলতেন, সে ক্ষেত্রে নেহাৎ মন্দ রোজগার করতেন

না ; অন্ততঃ ক্রমবর্দ্ধমান পরিবারকে ত ভরণপোষণ ক'রে চলেছিলেন।

আমি এই দুই ভাইয়েরই যুদ্ধে যোগদানকে অন্য গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি। অর্থাৎ দুজনেই বাঙ্গালীর ভীরু বদনাম খণ্ডন এবং পৃথিবীর অন্যান্য সাহসী জাতির সঙ্গে সমকক্ষতা স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। এবং সেই জন্য উভয়েই শারীরিক মানসিক এবং সুহৃৎ এর ক্ষেত্রে আর্থিক ক্লেশ অসুবিধা ও প্রাণ সংশয় বিপদ চার বৎসর ধরে যথেষ্ট সহ্য করেছিলেন।

সুহৃৎ-এর যাবার আগে যে প্র্যাকটিস ছিল, চার বৎসর পর ১৯১৮-য় ভগ্নশরীরে ফিরে এসে সেটি আর সংগ্রহ করতে পারলে না, ততদিনে তারই দেওয়া অন্য ডাক্তার তার বাঁধা রোগীদের ঘরে জমিয়ে বসেছে। যদিও তাকে স্থায়ীভাবে পল্টনের কাজ দিতে সরকারবাহাদুর চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বা তার পরিবারের কারো সেটা মনঃপূত হল না। আর সত্যই, তাদের যেরকম পরিবারগত প্রাণ, তাতে ওরকম ছোট মফঃস্বল সহরে আধাসাহেবীভাবে জীবন কাটানো খুব যে সুখের হত মনে হয় না। তাই কিছুদিন বিরসভাবে বাড়ীতে বসে থাকবার পর ওঁর সাহায্যে সুহৃৎ হিন্দুস্থান কোং-এর ডাক্তারী পদে বাহাল হল এবং আমাদের বাড়ী ছেড়ে নিজেরা ভিন্ন ২ ভাড়া বাড়াতে থাকতে গেল। প্রথম যে বাড়ীতে গেল—১৫নং ল্যান্সডাউন রোড—সেখান থেকেই ওর বড় এবং মেজ মেয়ের বিয়ে অল্পদিন আগেপিছু সুসম্পন্ন হল। কিন্তু আগের কথা আগে।

সুহৃৎ বিলেত যাবার সময় তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ ছেলেমেয়েকে আমাদের জিম্মেয় রেখে গিয়েছিলেন। সেই জন্য আজ পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ীর সকলের মধ্যে তাদের সঙ্গেই আমাদের বেশি ঘনিষ্ঠতা রয়ে গেছে। সেটি আরো ঘনিষ্ঠ হল আমার বড় ভাইপো সুবীরের সঙ্গে ১৯৩৩ খৃঃএ তাঁর ছোট মেয়ে পূর্ণিমার বিয়ে হবার দরুণ। যদিও সে সুখের সম্পর্কের উপরেও সম্প্রতি শোকের বাজ পড়ে[৯০] সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তবে ১৯১৩ থেকে ১৯৩০-য়ে পৌছতে এখনো ঢের দেরি। এরকম ক্রমাগত আগুপিছু করেই শেষে স্মৃতির খেই হারিয়ে ফেলি।

এইরকম সময়ে একত্র থাকবার দরুণই সবুজপত্রের দলের সঙ্গে সুহৃৎ-এর ছেলেমেয়েদেরও বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে যায়। এবং এখনো তারা কত হাসি-গল্প করে সে-সব কথা নিয়ে,—কে স্বপাক আহার করত, কে ইঁদুর না আরশোলা দেখে ভয়ে সাত হাত দূরে লাফিয়ে পড়ত, ইত্যাদি। বাড়ীর মেয়েরা কখনো ২ গানবাজনায় যোগ দিত, তা উনি 'আত্মকথা'তেই লিখেছেন। তার মধ্যে রমা দেবীর[৯১] (সৌম্যেন্দ্রনাথের দিদির) 'এই যে কালো মাটির বাসা', 'আমার একটি কথা বাঁশী জানে' প্রভৃতি গানগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল মনে আছে। আর সুহৃৎ-এর মেজ মেয়ে অপর্ণার[৯২] (ওরফে অপুর) গলায় 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে', আর 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার' গান দুটি বড় মিষ্টি শোনাত।

আমি বোধহয় মাঝে ২ পিয়ানো বাজাতুম ; যা এই বুড়োবয়সেও বাজাতে ও

শুনতে ভালবাসি। আর মনে পড়ে (তখনকার) নতুন গান 'শ্রাবণের ধারার মত' শুনে মহারাজা নাটোরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—বল্লেন, এই গানের জন্যই রবিবাবুর আর একবার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত! ছেলেরাও নিজেদের মধ্যে ওঁর নামে একটা P. N. ক্লাব করেছিল, তাতে খেলাধূলা হত।

আমাদের কমলালয়ের সে সময়কার জীবনযাত্রার একটি যথাযথ বর্ণনা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সদ্যপ্রকাশিত বই 'চলমান জীবন'[১৩]-এ পাওয়া যাবে। তিনি সবুজপত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে কিছুদিন আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে ছিলেন, এবং আমার শ্বশুরপরিবারের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঐ বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। কথায় বলে পরের চোখে নিজেকে দেখা দরকার।

তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক ভাইয়ের বাড়ীতেই একটি দুটি ক'রে আত্মীয় মানুষ হত; কারণ ওঁরা নিজেও সেইভাবে মানুষ হয়েছিলেন। আমার কাছে মহেন্দ্র রায় বলে হরিপুরের দূরসম্পর্কের একটি আত্মীয় তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে নিয়ে থাকতেন। আমাদের নানা রকম কাজ ক'রে দিতেন ও ছেলেদের নানারকম গল্প বলতেন। তা ছাড়া বিনয় বলে একটি নাতি-সম্পর্কীয় ছেলেকে তার বাপ বলিহারের ব্রজেন্দ্র লাহিড়ী ১১ বছর বয়সে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে আমাদের ওখানে থেকে ইস্কুল যেত। কিন্তু আজ আমার মনে হয় আমার নিজের ছেলে-পিলে না থাকার দরুণ তার লেখাপড়ার দিকে ঠিকমত দৃষ্টি রাখতে পারি নি। আমাদের ওখানে থেকে তার কিছু হল না, কিন্তু যে-ই সে সেজদির ওখানে গিয়ে রইল, তখন একে ২ সব পরীক্ষা দিয়ে বি-এ-পাশ করলে এবং এখন তাঁদেরই বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে রয়েছে।

সেজদির ছোট ছেলে, আমাদের পরমপ্রিয় কালিপ্রসাদেরও[১৪] এই সময়, অর্থাৎ ১৯১৫-তে জন্ম। আমার বেশ মনে আছে সুহৃৎ-এর বড় মেয়ে সুরমা আমাকে বল্লে—নমা, সেজজ্যেঠিমার কেমন সুন্দর ছেলে হয়েছে দেখবে এস। সে তাঁদের রান্নাঘরে আমাকে নিয়ে গেল, দেখলুম বারান্দায় এক বেতের টুকরিতে একটি সুন্দর ছেলে শুয়ে আছে, তাকে যেই চুমো খেতে গেলুম সে ছোট্ট লাল জিভ বের ক'রে আমাকে চেটে দিলে। সেই যে তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল, সে ভাব তার স্বল্পায়ু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। কিন্তু সে দুঃখের কথা যথা-স্থানে হবে।

আর একটি অনাথ হরিপুরের ছেলে—বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী—(দূর জ্ঞাতি-সম্পর্কে আমার ভাসুরপো হত) অনেকদিন আমাদের কাছে ছিল, এবং উনি তাকে দক্ষিণেশ্বর ঋষিবরী এস্টেটে একটা কাজ করিয়ে দিয়েছিলেন। সে মামা-বাড়ীতে মানুষ হয়ে বিশেষ কিছু শিখতে পারে নি, সামান্য বাঙ্গলা লেখাপড়া জানত মাত্র। তবে গুণের মধ্যে একটা জাঁহাবাজ গলা ছিল। তার একটি শ্যামাবিষয় গান যেন এখনো কানে বাজছে—'মনেরই বাসনা শ্যামা শবাসনা

শোন্ মা বলি'। পরবর্ত্তী খ্যাতনামা গ্র্যামোফোন গায়ক (তখনো রেডিয়োর চল হয় নি) তারই সমবয়সী হরেন দত্তের সঙ্গে দুই বন্ধুতে গলা মিলিয়ে যখন এই গানটি গাইত বড় সুন্দর লাগত।

জাপানী

১৯ নংয়ে অনেক জাপানী এসে জুটেছিলেন, কি সূত্রে ঠিক জানিনে।[৯৫] চিত্রকর য়োকয়ামা টাইকন ও হিসিদা দুজনে আমাদের সামনেই মাটিতে বসে ছবি আঁকতেন এবং খেলাচ্ছলে তাঁদের অঙ্কনকৌশল দেখাতেন। আমার দাদার কাছে ব্যাখ্যা শুনে ২ গীতার রথোপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন, সরস্বতী, কালী, এই সব হিন্দু পৌরাণিক চিত্র এঁকেছিলেন। তার রং ও রেখা চমৎকার, কিন্তু সব মুখাবয়বের ভিতরেই সেই মঙ্গোলীয় ছাঁচটি আপনা হতে এসে যেত। সরলাদেবী চৌধুরাণীর বাড়ীতে এখনো হয়ত দেবীদ্বয়ের ছবি আছে। তবে আমাদেরগুলি সম্ভবতঃ ১৯ নং মেরামতের সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

আর একজন হোরি[৯৬] বলে জাপানী ছোকরা দিনকতক এসে ১৯ নংয়ে ছিল। সে যখন তেতলার ঘরে একদিন গাইলে, তখন সকলের হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে পড়েছিল। য়োকয়ামা টাইকন পরে খুব খ্যাতনামা শিল্পী হয়েছিলেন, এবং রবিকার 'জাপানের পত্রে' তাঁর উল্লেখ আছে। জাপানী সংসর্গের প্রভাব আমাদের চিত্রশিল্পে, বেশভূষায় গৃহসজ্জায় নানাদিকে রয়ে গেছে।

ওকাকুরা দেশে গিয়ে আমাদের প্রত্যেককে সুন্দর ২ উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কিছু ২ চিঠিও এখনো আমার কাছে আছে। বেচারা অকালে মারা গেলেন। সুরেনদের কাছে তাঁর কিংখাপে মোড়া একখানি সামুরাই তলোয়ার এখনো আছে। সুরেনের 'সকুরা পুষ্প'[৯৭] বলে একটি জাপানী বইয়ের তর্জ্জমাও বেরিয়েছিল। ওকাকুরার সঙ্গে তিনি বুদ্ধগয়া প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর একটা স্মৃতিকথাও[৯৮] লিখেছিলেন।

নিবেদিতা

কমলালয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে আছে, যদিও আবার বলছি ঠিক সনতারিখ দিতে পারব না। সেটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর সিস্টর ক্রিস্টীনের ভগিনী নিবেদিতাকে আমাদের ওখানে নিয়ে আসা[৯৯]। কেঁদে ২ তখন তাঁর চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। মেয়েমানুষ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সমান। একজন না-একজন কাউকে ভালবাসা চাই। কি বলে আর তাঁকে সান্ত্বনা দেব। দু'একদিন থেকে চলে গেলেন।

একবার মাত্র বিবেকানন্দকে দূর থেকে দেখেছিলুম মনে আছে। হিন্দু থিয়েটার না কোথায় একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন, শুনতে গিয়েছিলুম। সেই

বড় ২ চোখ ও পাগড়ী পরা বলিষ্ঠ চেহারার ছবি সকলেই দেখেছেন। আমার মনে হয়েছিল অনেকটা দিদুর মত দেখতে। সুভাষ বোসকেও ঐরকম একবার মাত্র কোন সভায় আসতে দেখেছিলুম। তিনিও লম্বাচওড়া সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। মহাপুরুষ মাত্রই প্রায় সুপুরুষ হন ; একমাত্র মহাত্মাজি ও পরমহংস-দেবই তার ব্যতিক্রম।

ভগিনী নিবেদিতা আমাদের কোন স্ত্রী সমিতিতে ইতিহাসের ভাষণও দিতেন। তাঁর Web of Indian Life[১০০] বইয়ে এ-দেশের স্ত্রীলোকের বর্ণনায় তাদের প্রতি তাঁর সহৃদয় সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি ঝি'রা যে একখানা সাড়ী পরে আধখানা শ্যামল অঙ্গ অনাবৃত রাখে, সেটাও তাঁর চোখে সুন্দর লেগেছে। ওকাকুরার কাছেও যেন স্নানরতা বঙ্গনারী সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য শুনেছি। যদিও সুদূর পাড়াগাঁয়ে পর্য্যন্ত এখন আমরা শেমিজ ব্যবহার করাকে সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ বলে বিবেচনা করি।

নিবেদিতা স্কুল স্থাপন ক'রে[১০১] তিনি তাঁর দেশহিতৈষিতার প্রমাণও দিয়ে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' বইখানায় শিল্পীর কলমে তাঁর সুন্দর রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে। আমিও স্কুল কর্ত্রীপক্ষের অনুরোধে সেদিন তাঁদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিবেদিতা সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ স্মৃতিকথা লিখে দিয়েছি।

কমলালয়ের ঘরের খবর খানিকটা দেওয়া গেল। কিন্তু পুরুষদের সভা ছাড়া স্ত্রী-সভার কথা কিছু বলা হল না। সেই ১৯০২ খৃঃতে সভাসমিতিতে হাতে খড়ি হবার পর থেকে লেখাতেও যেমন, স্ত্রী সভার কাজেও তেমনি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলুম। গানের সভার কথাই আগে মনে পড়ে, কারণ ঐ জিনিষ নিয়েই জীবনস্মৃতির গোড়া থেকে কাটিয়েছি এবং শেষ পর্য্যন্ত কাটিয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে।

সঙ্গীতসঙ্ঘ

বিয়ের কিছুকাল পরেই—এস্থলে কি ভাগ্যি সনতারিখ সঠিক বলতে পারব—১৯০৮ খৃঃতে—আমার বড় জা তথা খুড়তুতো বোন প্রতিভাদেবী তাঁর প্রাসাদো-পম বালিগঞ্জের বাড়ীতে আনন্দ-সভা[১০২] নাম দিয়ে ঘরোয়াভাবে একটি সঙ্গীত-সভা স্থাপন করেন। তিনি নিজে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, তা হয়ত আগেই বলেছি।

ক্রমশঃ সেই সভাটি হাত পা ছড়িয়ে বাইরে ভিন্ন ২ ভাড়াবাড়ীতে উঠে গেল এবং শিক্ষক ও নিয়মাদি দ্বারা সুগঠিত হয়ে 'সঙ্গীতসঙ্ঘ' নামে রীতিমত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পরিণত হল। এখনকার অনেক খ্যাতনামা ওস্তাদ তাতে কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দিতেন ও পরীক্ষা নিতেন ; 'নিয়মিতভাবে জলসা এবং পুরস্কার বিতরণও হত। ১৯২৩ খৃঃ এ প্রতিভা দেবীর মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি নিয়মিতভাবে

তাঁর সঙ্গে সঙ্গীতসঙ্ঘ পরিচালনায় সহযোগ করেছি, পরিদর্শন ও পরীক্ষা করেছি, হিসাব তদারক করেছি, ইত্যাদি। তার পর থেকে আমার সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর উপযুক্ত মধ্যম পুত্র অশ্বিনী কুমারের হাতে অনেকদিন তার ভার ন্যস্ত ছিল। এখন শুনেছি নানা কারণে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন প্রতিষ্ঠাতার অভাবে আমাদের দেশে প্রায়ই হয়ে থাকে।

সঙ্গীত সম্মিলনী

প্রায় ঠিক ঐ এক সময়ে এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে শ্রীমতী প্রমদা চৌধুরাণী (মিসেস্ বি. এল. চৌধুরী) সঙ্গীত সম্মিলনী নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার সঙ্গেও সভানেত্রীরূপে আমি অনেকদিন যুক্ত ছিলুম; তিনিও ঐ স্কুলের জন্য শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অবর্ত্তমানে তারও এখন শুনতে পাই দৈন্য দশা। তবে যতদিন স্কুল দুটি চালু ছিল তাদের কাজ ক'রে গেছে এবং একটা নতুন পথ খুলে দিয়ে গেছে, একটুকু যা সান্ত্বনা।

এখন ত অলিতে গলিতে নৃত্য গীত বাদ্যের ইস্কুল, তার অনেকগুলি ভালই চলছে। আমাদের কালে নাচের উপর অত ঝোঁক ছিল না। অধুনা বিখ্যাত নর্ত্তকী অমলাশঙ্কর তখন সঃ সম্মিলনীতে সামান্য দু'একটা নাচ দেখাতেন বলে দু'একটি গোঁড়া ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা সম্মিলনীতে আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন! তখন আর এখন! কি তফাৎ! এখন নাচ আমাদের ডালভাতের মত অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। অমৃতে অরুচি হবার যোগাড়। নাচের চাপে অভিনয়-কলা মারা যেতে বসেছে, সেজন্য আমার দুঃখ হয়।

বাইরের ইস্কুল ত পরের কথা ও দূরের কথা। তার আগে ঘরে ২ যতদূর স্মৃতি পিছিয়ে যায় সর্ব্বদাই যেন গানের স্রোতে ভাসছি বলে মনে হয়। আর রবীন্দ্রনাথ সেই গানের তরীর চির সহযাত্রী বা কর্ণধার বল্লেই বেশি ঠিক হয়। সব চেয়ে ছোটবেলার স্মৃতি বোধহয় ভানুসিংহের পদাবলীর সঙ্গে জড়িত। 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' যে ৭ বৎসর আন্দাজ বয়সে সিমলা পাহাড়ের চূড়ায় বসে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে[১০৩] শুনিয়েছি এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ইন্দু কথার মানে জানিনে বলায় তিনি চিরকালের মত অর্থটি আমার মনে মুদ্রিত ক'রে দিলেন, এবং ভুট্টা পুড়িয়ে মাখন নুনমরীচ মাখিয়ে, ছুরি দিয়ে দানাগুলি চেঁচে নিয়ে কি ক'রে খেতে হয় শিখিয়ে দিলেন—সে কথা স্পষ্ট মনে আছে।

জ্যোতিকামশায়ের অশ্রুমতী নাটকের[১০৪] 'প্রেমের কথা আর বোল না' গানটি কেউ [বলে] নাকি ইটালিয়ান ঝিঁঝিঁট, যেমন 'পুরানো সে দিনের কথা' স্কচ ভূপালী নামে অভিহিত।) আমাদের কাছে খুব সমাদর লাভ করেছিল।

মামার বাড়ীর পাড়ায় পূজো দেখতে গিয়ে, গাইতে অনুরুদ্ধ হয়ে ঐ গানটি গেয়েছিলুম ; তখন বয়স ঐরকম আটের কোঠায়ই হবে। ভদ্রলোকেরা কি মনে করলেন এখন তাই ভাবি।

আমাদের সঙ্গীতচর্চ্চার ইতিহাস যখন অনাদি না হলেও অনন্ত, তখন অন্য কর্মযোগের প্রসঙ্গ তোলাই শ্রেয়। গান ছাড়া স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধায়িনী নানা-রূপ সভাও সমান্তরালে আমার জীবনের মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ পর্য্যন্ত চলেছে। ১৮৮৩ খৃঃতে যখন আমার পিসিমা স্বর্ণকুমারী দেবী দুঃস্থ অসহায় বিধবাদের স্বাবলম্বী করবার উদ্দেশ্যে সখী সমিতি[১০৫] স্থাপন করেন, তখন আমার নিজেরই স্বাবলম্বী হবার বয়স হয় নি। তবে বছর ত্রিশেক পরে তাঁর উপযুক্ত কন্যা সেই সমিতির উত্তরাধিকারসূত্রে যখন মহিলা সমিতি ও ক্রমশঃ সখী শিল্প সমিতি[১০৬] নামক সভা একই উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন, তখন আমি তাঁর কাজে যোগ দিই, এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁর নামের বিধবাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলুম, যদিও নামে মাত্র।

হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রম

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা রায় এই সময়ের কাছাকাছি একটা মহিলা সমিতি স্থাপন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই (যদি আগে না বলে থাকি) যে তাঁর অনুরোধে রবিকা উক্ত সমিতির সাহায্যকল্পে তাঁকে 'মায়ার খেলা' গীতিনাটিকার স্বত্বাধিকার দান করেন[১০৭]। আর আমার তরফ থেকে উল্লেখ-যোগ্য এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেশীয় সৈনিকদের মহিলা সমিতির থেকে যে তত্ত্ব পাঠানো হয় আমাকে তার কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছিল।

তখন আমাদের নিজের টাকা Thos Cook-এর ব্যাঙ্কে রাখা হত (ওঁর কাছে শুনেছি বিলাতযাত্রী মারোয়াড়ীরা নাকি তাদের বলত 'টাস্‌ কুক্‌'!) এবং দুর্বুদ্ধিবশতঃ সমিতির টাকাও সেইখানে রাখা এমন ভীষণ জট পাকিয়ে গিয়েছিল যে, মনে আছে একদিন রাত ১৷৷০ টা পর্য্যন্ত পাস-বই নিয়ে বসে থোড়-বাড়ি-খাঁড়া ক'রে কোনরকমে হিসাব উদ্ধার করলুম ; তাও সামান্য কিছু গুণগার দিয়ে তবে মেলাতে পারলুম। বরাবরই আমার এই অবস্থা হয়, যেমন সেই পুরনো বাউল গানে বলে : আমি শেখলাম সব, ঠিক দিতে পারলাম না। অথচ সেই অবধি আর আজ পর্য্যন্ত কেন যে কোষাধ্যক্ষ হবার ভার প্রায়ই আমার উপর পড়ে তা জানিনে, যে মানুষ নিজের ঘরের হিসেবের ২+২=৪ মেলাতে পারে না। এতে একমাত্র এইটুকু প্রমাণ হয় যে, আমার স্বজাতি স্বজনগণ বিশ্বাস করেন আমি তহবিল তছরূপ করব না ; আজকালকার দিনে সেটাও কম প্রশংসার কথা নয়।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল

সরলাদিদি (দেবী চৌধুরাণীও) অনুমান এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল[১০৮] বা চলিত ভাষায় জেনানা মিশন স্থাপন করেন। তাতে আমি কোন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ না করলেও নানা স্থানে অধিবেশনে যোগ দেওয়াতে কলকাতার অনেক খাস 'হিঁদু' বাড়ীর ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, যা অন্যথা হবার সম্ভাবনা কম ছিল। কারণ স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও বিলাতফেরৎ সমাজেই বেশি চলাফেরা করতুম। সে-সব পরিচয়ের জের এখন পর্য্যন্ত চলে এসেছে। মহামণ্ডল ক্রমে তার গোড়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধান্তে ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদনে শেষ পরিণতি লাভ করা পর্য্যন্ত আমি তার সঙ্গে অল্পবিস্তর জড়িত ছিলুম। সেই পুরনো আত্মীয়বাৎসল্য।

একবার মেয়েরা (বিয়ের আগে) কোন উপলক্ষ্যে আমাকে চূণকাম ক'রে গ্রীক মর্ম্মর মূর্ত্তি সাজাবার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু মা রাজি হলেন না, কেন কে জানে। তাঁর কতকগুলি ঐরকম নিজস্ব মতামত ছিল। বি. এ. পাশের পরে আমাকে ডিগ্রী নিতে সমাবর্ত্তন উৎসবে যেতে দেন নি; আদি সমাজের সাহায্যার্থে টাকা তোলবার উদ্দেশ্যে বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ে আমাকে যোগ দিতে দেন নি; কান বেঁধাতে দেন নি, ইত্যাদি।

আমার মনে হয় অনুমান ১৯১২-তে আমরা আর একবার সিমলা বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমার ভাজ সংজ্ঞার শরীর ভাল যাচ্ছিল না বলে তার হাওয়া-বদলের জন্য সুরেনরা গেল, আমরা দুজনেও সঙ্গে গেলুম। কতবার কত লোকের সঙ্গে কত উপলক্ষ্যে কত পাহাড়ে বেড়াতে গেছি, তার যেন ইয়ত্তা নেই। দার্জ্জিলিং সিমলাই প্রধান,—তারপর টিণ্ডারিয়া, খরসাং, শিলং, মসূরী, নীলগিরি, মহাবলেশ্বর, মাথেরান,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কিছুই বাকি নেই, মায় Mt. Abu পর্য্যন্ত।

একবার ওঁর সঙ্গে হিসেব ক'রে দেখেছিলুম আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি জায়গায় বেড়াতে গেছি। উনি বিলেতের অনেক ছোটবড় সহরের নাম ক'রে শেষে গুনতিতে জিতে গেলেন।

উল্লিখিত সিমলা ভ্রমণে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ে না। এক টালার যোগেন্দ্র মুখুয্যের সঙ্গে আলাপ হওয়া ছাড়া, যিনি খুব ভাল সেতার বাজাতেন ও পরে আমাদের সঙ্গীতসঙ্ঘের সঙ্গে অনেকদিন পর্য্যন্ত যুক্ত ছিলেন। ঘুরে ফিরে সেই গানবাজনারই কথা।

লাহোর

আর মনে হয় ফিরতিপথে আমরা লাহোর হয়ে সরলাদিদির শ্বশুরবাড়ী দুদিন থেকে তাঁর নতুন ঘরকন্না দেখে আসি। তাঁর ১৯০৬ খৃঃএ বিয়ে হয়েছিল

লাহোরের উকীল পণ্ডিত রামভজ দত্তের[১০৭] সঙ্গে ; যাঁর সুচেহারার দরুণ তাঁকে লোকে বলত 'moon of the Punjab'। তাঁর পূর্ব্বপক্ষের ২।৩টি ছেলে মেয়ে ছিল, তাদের জন্য সরলাদি যথেষ্ট করেছিলেন। নিজের একমাত্র ছেলে দীপক দত্তচৌধুরী এখনো বর্ত্তমান। বাড়ীতে সর্ব্বদা রাজনৈতিক হট্টগোল চলায় প্রথম বয়সে দীপকের লেখাপড়া নিয়মিত হয় নি। তবে পিতার অবর্ত্তমানে মাতা কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফিরে এসে অনেক কষ্টে তাকে বি. এ. পর্য্যন্ত পাশ করিয়ে বিলেত ঘুরিয়ে ব্যারিস্টার করিয়ে এনেছিলেন।

পণ্ডিতজী আমাকে 'বিবিজী' বলে ডাকতেন ও ঠাট্টা তামাসা করতেন। যে দুদিন তাঁদের ওখানে ছিলুম শরীর ভাল ছিল না বলে বাজার থেকে তৈরি ঘোল বা 'লসি' আমার জন্য আনাতেন, সেটি যেমন উপকারী তেমনি সুস্বাদু ছিল,—একেবারে ঠিক পরিমাণমত নুন চিনি মেশানো। আর একটি মুখরোচক জিনিষ গুরুদ্বারার কাছে বিক্রী করত তাকে বলত 'গোল গব্বা' ; ঠিক ফুলো ২ ছোট ফাঁপা কচুরির মত দেখতে, তার মধ্যে ফুটো ক'রে একরকম তেঁতুলের ঝোল ভিতরে ঢেলে দিয়ে খেতে হত। বাড়ীতে খাওয়া বেশির ভাগ নিরামিষই হত, তাতে ফুলকা বা রুটিরই প্রাধান্য।

একটা জিনিষ আমাদের বাঙালী চোখে নতুন লেগেছিল এই যে, রান্নাঘরে একদিকে চৌকা বানিয়ে মুসলমানে রাঁধছে, আর সেই ঘরেরই আর একদিকের চৌকায় হিঁদুতে রাঁধছে। আমাদের তথাকথিত 'খৃস্টান' বিলাতফেরৎ বাঙালী বাড়ীতেও এতদূর উদারতা কল্পনা করতে পারি কি ? খাবার খুব সাদাসিধেই হত। বাঙালীর মত ভোজনবিলাসী জাত কি দুটি আছে ? পাঞ্জাবীরা দেখতেই বা কি সুন্দর—লম্বা, পুরুষালী বলিষ্ঠ গঠন, টিকলো নাকমুখ, সাফ রং ; দেখে আর্য্যদের সাক্ষাৎ বংশধর বলেই বোধ হত। তার উপর পাগড়ী জামাপাজামা বেশে আরও খুলত।

সরলাদির আসবাবপত্রের মধ্যে নতুন লেগেছিল হোশিয়ারপুরের কাঠের কাজের চৌকি ইত্যাদি। তাতে সব হরিণ বাঘ প্রভৃতি জীবজন্তুর খোদাই করা মূর্ত্তি থাকত, তার উপর আবার সোনার জলের সাজা, তবে সব জিনিষে বড় ধুলো পড়ে থাকত ; সে হিসেবে তাঁকে খুব ভাল গিন্নি বলতে পারিনে।

তিনি একবার গল্প করেছিলেন মনে আছে যে, পণ্ডিতজীর[১১০] অনুপস্থিতিতে কোন বন্ধু এসে তাঁর বাড়ীতে উঠে কারো অনুমতি না নিয়েই যখন খুসি তাঁর গাড়ি নিয়ে বেরোত ইত্যাদি ; দেখে যেন সরলাদির কেমন ২ লাগত। সেই কথা পণ্ডিতজীকে বলাতে তিনি বলেছিলেন, 'সে তো ভাল কথা, তাতে বোঝা যায় যে তিনি আমার বাড়ীকে ঠিক নিজের বাড়ীর মতই মনে করেন।' নিজের প্রথম পক্ষের ছেলেদের সঙ্গে দীপককে তুলনা ক'রে দেখিয়ে নাকি বলতেন—দেখ তোমার ছেলে আর আমার ছেলে। তা সত্যি, ওদের সঙ্গে শারীরিক সৌষ্ঠবে

আমরা পেরে উঠিনে.; মানসিকে যাই হোক্।

পরে পণ্ডিতজী যখন জেলে যান, সরলাদি নিজে তাঁর মামলা মকোদ্দমার কাগজ পড়ে কৌঁসুলীকে সাহায্য করেছিলেন শুনেছি। এরকম আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভারতবর্ষের ঐক্য সাধনের একটা সদুপায় বটে ; কিন্তু দাম্পত্য সুখের অনুকূল কি না কে জানে।

আমাদেরই একজন বন্ধুকন্যা অনুরূপ ক্ষেত্রে বলেছিলেন—'I dont like those Congress marriages'। একে ত বিয়ে মাত্রই অন্ধকারে ঢিল মারা, তার উপরে নিজের অভ্যস্ত পরিবেশের সঙ্গে খুব বেশি তফাৎ হলে খাপ খাওয়াতে আরো বেশি কষ্ট হবার ত কথা,—বিশেষতঃ পরিণত বয়সে। আর আমরা ত য়ুরোপীয়দের মত শুধু স্বামীটিকে বিয়ে করিনে, তার গোটাগুষ্টির মন যোগাতে হয়। অবশ্য সেকাল গেছে বইয়া বঁধু। অথবা ফরাসীরা যাকে বলে—Nous avons changé tout cela। আর স্বামীর উপরেই অনেকটা নির্ভর করে।

১৯১৩ খৃঃর জানুয়ারি মাসে বোধহয় আমার সেজ ভাইপো মিহির[১১১] হয়। আর তার যখন বছর তিনেক বয়স, তখন আমরা তাদের সঙ্গে একবার কার্সিয়ং বেড়াতে যাই মনে আছে—এই কারণে যে, সে ছেলেমানুষী সরু মিষ্টি গলায় যে অনর্গল কথা বলত তা ওঁর এত ভাল লেগেছিল যে কলকাতায় এসে ক্রমাগত ঐ কথা বলতেন বলে অমিরা ওঁকে ঠাট্টা করত। তখন একজন বি. এ. পাশকরা মাস্টার প্রবীরদের পড়াবার জন্য সুরেন ঘরে রেখেছিলেন, তাকে একটু২ মনে পড়ে।

১৯১৩ সনে আমরা দার্জিলিংয়ে Snow View নামে হিরণদিদির[১১২] একটা বাড়ীতে মাসখানিক গিয়ে থাকি। আমার স্বাভাবিক সজ্জাপ্রবণতাবশতঃ সেখানকার কাঁচের জানলার ঘরেছোপানো রঙীন পরদা ঝুলিয়ে বেশ চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছিলুম। সেজঠাকুর এক ব্যারিস্টার বন্ধু সহ আমাদের কাছে এসে দুদিন ছিলেন। তাঁর বন্ধু আমাকে Clock Patience নামক ঐ একক খেলার একটা রকমফের শিখিয়েছিলেন মনে আছে, সেটা এখন ভুলে গেছি। তারপরে ১৯৪৪ খৃঃএ সুহৃৎ যুদ্ধে চলে যেতে নলিনী ভেবে২ রোগা হয়ে যেতে লাগল, তাদের হাওয়াবদলের জন্য ইতিপূর্ব্বে তাহলে আর একবার খরসাং গিয়েছিলুম, সেটা বরং আর একটু স্পষ্ট মনে আছে।

সেবার হাথ্‌রাসের রাজার বাড়ী অমনি পাওয়া গিয়েছিল, সেটা একতলা অথচ বেশ বড় বাড়ী। সেটা Dow Hill-এর উপর ছিল, অনেক দূর নেবে গিয়ে তবে ডাকঘর ইত্যাদি পাওয়া যেত। সঞ্জীবের বয়স তখন বছর বারো ; তার ১৯০২-এ জন্ম, সে হিসেবেও ১৯১৪ সাল মিলে যায়। তাকে ছেলেমানুষ বলে কিছু বেশি টাকা নিয়ে পোস্টাপিসে পাঠাতে ইতস্ততঃ করছি দেখে উনি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন মনে আছে যে, ১১ বছর বয়স থেকে ওঁদের বড়দাদার বিলেতের

খরচা যোগাবার জন্য বন্ধুবাড়ীতে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে হত ; কেন সঞ্জীব পারবে না।

স্যর কে. জি. গুপ্তের বড় মেয়ে লাবণ্যের সঙ্গে বীরেন সেন সিবিলিয়নের বিয়ে হয়েছিল। তাঁরা সে সময়ে কার্সিয়ঙে ছিলেন মনে হয়। ঐ লাবণ্যের কলকাতায় দুবার বিয়ে হয়েছিল বোধহয়,—একবার ইংরেজিতে সাহেবদের জন্য, আবার বাঙলায় বাঙালীদের জন্য। তা কেন, আমার মামাতো বোনেরও ত দুদিন দুরকম বিয়ে হল ;—একবার হিঁদুমতে মামাদের জন্য, আর একবার ব্রাহ্মমতে বরপক্ষের সন্তোষের জন্য।

আর ঐ লাবণ্যের ভাইয়ের সঙ্গে একবার একজনের সম্বন্ধের কথা তুলতে সে বলেছিল,—'দেখ ভাই বিবি, আমাদের ছেলেবেলায় বাইরে যাবার জন্য দুখানা ভাল সাড়ী থাকত, তাই ঢের মনে হত ; আমার ভাই ৩০০্ মাইনে পায়, তাতে ত আজকালকার মেয়েদের রেশমী মোজার খরচই কুলবে না, শেষে তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে!'

তারপরে কার্সিয়ঙে কন্‌ভেন্ট ছিল, আর একটা ঝরণার উপর সাঁকো দিয়ে .বেশ সুন্দর বেড়াবার পথ ছিল।

যদি ১৯১৪-তে নলিনীদের নিয়ে একবার, আর ১৯১৫ (?) তে মিহিরদের সঙ্গে আর একবার কার্সিয়ং গিয়ে থাকি ত দ্বিতীয়বার নলিনীদের কোথায় রেখে গেলুম! তারা কি আর কারো সঙ্গে আর কোথাও গেল, না বাড়ীতেই রইল? —খুব সম্ভব তাই, কারণ ১৯১৮-য় সুহৃৎ-এর যুদ্ধ থেকে ফেরা পর্যন্ত তারা যে আমাদের হেফাজতে ছিল, এটা নিশ্চিত। এর মধ্যে দীর্ঘদিন সুহৃৎ-এর চিঠি না এলে কি হৈ চৈ পড়ে যেত তা মনে আছে। একবার ঐরকম ক্ষেত্রে যোড়া-সাঁকোর গোপাল সরকার ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি জাহাজ কোং-এর ওখানে জামাই-বাবুর খোঁজের জন্য ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগল, অথচ নলিনীদিদিমণির কাছে লুকোতে হবে যে কোন ভয়ের কারণ আছে। অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল যে সুহৃৎ সৈন্যদের Mozambique/Madagascar না কোথায় দূরে পৌছতে গেছে, তাই চিঠি আসছে না। সে বাড়ীর লোকের ছবি চেয়েছিল বলে আমরা কত অ্যাল্‌বাম সাজিয়ে ২ পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, বিলেতে সুখ্যাতও হয়েছিল। তার আগে (না পরে?) সুহৃৎ একবার এই দেশেই কোথায় উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধযাত্রায় গিয়েছিল—টঙ্ক বলে এক জায়গায়—সেখানে ভয়ানক গরম বলে আমরা তাকে নানারকম আরামদায়ক 'ঠাণ্ডাই' পাঠিয়েছিলুম, তার মধ্যে iced Eau-de-Cologne নামক একটা (অন্ততঃ আমার পক্ষে) নতুন পদার্থ ছিল মনে পড়ে।

ঐ এক কার্সিয়ংয়ে যাওয়া ছাড়া ১৯১৪-১৯১৮, এই যুদ্ধের চার বৎসর মোটের উপর চুপচাপ নিজেদের কমলালয় বাড়ীতেই কাটিয়েছি বলে মনে হয়। তবে পুজোর সময় বাইরে যাওয়াটা বাদ গিয়েছিল কি না ঠিক মনে করতে পারছিনে। যদিও গিয়ে থাকি ত রাঁচি গেছি এবং নলিনীরাও সঙ্গে গেছে নিশ্চয়। রাঁচির বাড়ী হয়ে অবধি পুজোর সময় সেখানে যাবার নিয়মের ব্যতিক্রম কমই হয়েছে। কত স্মৃতি যে রাঁচির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা বছরে ২ ভাগ ক'রে নেওয়া শক্ত।

সেখানকার বন্ধুদের মধ্যে এক খৃষ্টান দম্পতির কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। কর্ত্তাটির নাম Rev. A. C. Chatterjee, নামেই প্রকাশ যে বাঙালী। তাঁর মেয়ে লিলিয়ান ছিল বুবুদের ডায়সিসন স্কুলের সহপাঠী। আর স্ত্রী ছিলেন পাঞ্জাবী মেয়ে, তেমনি লম্বা চওড়া ও কর্ম্মক্ষম। অনেকগুলি ছেলেপিলের মা হলেও বাড়ীতে গোরু রেখে মাখন ইত্যাদি তুলে সুন্দর ব্যবসা চালাতেন; আমরাও তাঁদের কাছ থেকে নিতুম।

আমাদের কোকরের বাড়ী ভাড়া দেওয়া বা বিক্রির সময় চাটুয্যে সাহেব সাহায্য করেছিলেন; কিন্তু সব জিনিষপত্রের যে সুষ্ঠু হিসেবপত্র পেয়েছিলুম তা বলতে পারিনে। সেটা আমাদেরই দোষ। নিজের জিনিষ নিজে না সামলালে কে সামলাবে? চিরদিনই আমরা তাই ঠকতেই আছি।

আর একটি সিং নামে পাঞ্জাবী দম্পতি নিজেদের বেশ সুন্দর বাড়ীবাগান ক'রে রাঁচিতে স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন। তাঁরা আমাদের মাঝে ২ চা খাওয়াতেন, তাঁদের ঘরে-তৈরি মাখনের ফুলো ২ ভরাট ডিমের স্যাণ্ডউইচের কথা এখনো মনে পড়ে। দুঃখের বিষয় তাঁদের দুই বড় ছেলে বিলেত থেকে ফেরবার সময় জাহাজডুবি হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তখন পর্য্যন্তও তাঁদের আশা ছিল যে তারা কোনক্রমে বেঁচে আছে এবং হয়ত একদিন ফিরে আসবে; কিন্তু সে আশা কোনদিন পূর্ণ হয়েছিল কি না সন্দেহ।

রাঁচিতে একটি অন্ধাশ্রম ছিল, আমরা কখনো ২ দেখতে যেতুম, এবং অন্ধদের হাতের তৈরি বেতের জিনিষ দু'একটা কিনতুম। আর রাঁচির উন্মাদাশ্রম ত বিখ্যাত। আমাদের সেটা দেখতে যাওয়া উনি বড় পছন্দ করতেন না, আর বাস্তবিক দুঃখের উদ্রেক ছাড়া গেলে ত কোন উপকার হত না। তবে আমরা নিছক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে যেতুম, তা নয়; নিজেদের দু'একটি আত্মীয় দেখাও উদ্দেশ্য ছিল; যদিও সেই সঙ্গে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাও চোখে পড়ত। ওখানকার তদানীন্তন সাহেব কর্ত্তা Major Berkely Hill-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ ছিল। তিনি এক মাদ্রাজী ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি আমাদের সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন; তবে অবশ্য খুব উন্মাদ পাগলদের দিকে আমাদের নিয়ে গেলেন না। পাগলদের চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধূলা ও মাঝে

২ গানের জলসাদি হত। তাদের হাতের সেলাই প্রভৃতি কাজও বিক্রি হত; আমরা কিনেছি। কিন্তু তাদের দেখলে মন মুষড়ে যায়।

রাঁচির লেস্ স্কুলও বিখ্যাত, এবং মেয়েদের মনোলোভা শিল্পস্থান। সকলেই জানেন যে আমাদের তথাকথিত আদিবাসীদের বাসভূমেতেই খৃষ্ট জগতের নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় পাপীদের পরিত্রাণায় এসে থাকেন। সেই সঙ্গে তাদের নানা অর্থোপার্জ্জনের বিদ্যাও শেখান, তা স্বীকার করতেই হবে। রাঁচিতেও এক Ursuline Convent রোমান ক্যাথলিক Nunরা স্থাপন করেছিলেন। সেখানে কোলের মেয়েদের নানাপ্রকার সুন্দর কারুকার্য্য শেখানো হত; আমরাও তাই লোভে পড়ে দেখতে যেতুম ও কিনতুম। আমি প্রত্যেক বছরে কলকাতার জা ও ননদদের জন্য কিছু-না-কিছু ফরমাস দিয়ে নিয়ে যেতুম। অবশ্য ওদের নক্সা সব বিলাতী ধরনের, তা হলেও বেশ সুন্দর।

রাঁচির স্বদেশী দ্রব্যের মধ্যেও বেতের কাজ, কাঠের কাজ, কাঁসার কাজ এসব পাওয়া যেত; আর একরকম পুরু চাদর, কম্বল ও লালপেড়ে সাড়ী।

ত্রিপুরার বড়াঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ[১১৩] কিছুদিন ওখানে ছিলেন, তাঁর মেয়েদের হাতের শিল্পকার্য্য ত বিখ্যাত। তিনি নিজেও শিল্পী ছিলেন,—ছবি তোলা, ছবি আঁকা, বেয়ালা বাজানো, বই লেখা নানারকমে। তাঁর এক প্রস্ত ছবির সঙ্গে একটি stereoscope জ্যোতিকাকামশায়কে দিয়েছিলেন, সেটি এখনো যত্নপূর্ব্বক আমার কাছে রাখা রয়েছে।

সুহৃৎ ১৯১৮ খৃঃ তে যুদ্ধান্তে বাড়ী ফিরে আসবার আগে কমলালয়ে দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ছাড়া আর কি করতুম তাও ভাল মনে পড়ছে না। ক্রমান্বয় দেশ ভ্রমণের তালিকা ধরে দিতে না পারলে কি জীবনী লেখা এগোয় না? আমাদের বাড়ীতেই ত লোক মন্দ ছিল না। তার উপর আমার বিশেষ সৌভাগ্য এই ছিল যে শ্বশুরবাড়ী, বাপের বাড়ী, মামার বাড়ী এই তিন কুলেরই লোক কাছাকাছি বালিগঞ্জ পাড়াতেই বাস করতেন; আনাগোনা দেখাশুনা ক্রমাগতই হত। বেশ মনে আছে বছরে ২ রাঁচি যাবার আগে ঘুরে ২ সকলের সঙ্গে বিদায় নিতে ২ প্রায় ট্রেন ফেল হবার যোগাড় হত। আমিও না ক'রে ছাড়ব না। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বড়ঠাকুরের বাড়ীতেই বেশি হত। অন্যদেরও পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে হত।

আমাদের জন্মদিনটা একটা প্রধান উৎসবের মধ্যে ছিল। বাবা আবার সেদিন উল্টে নিমন্ত্রিতদের উপহার দিতেন, বিশেষ ছোটর দলকে। আমার মা ও ভাজ দুজনেরই দেবার খুব হাত ছিল। ধুমধাম করবার সখটাও ছিল; আর দুজনেরই স্বামী তাঁদের কোন ইচ্ছায় বাধা দিতেন না। এরকম স্বামীসৌভাগ্য ক'জনের হয়? আমার জায়েরা বিশেষ ২ দিনে পরস্পরকে নতুন কাপড় দিতেন; যথা: প্রতিভাদিদি বড়ঠাকুরের জন্মদিনে জ্যৈষ্ঠ মাসে; মেজদি পূজোয়;

সেজদি দোলে ; নলিনী জন্মদিনে ; প্রমীলা নববর্ষে। আমার ত কাপড় কিনতেই হত না। তার উপর ছেলেদের বিয়েথাওয়াতে প্রণামী পাওনা ছিল। অনেকে সেগুলি তখনি ২ পরে ফেলত। কিন্তু আমি জমিয়ে ২ রেখে হয়ত পরে কারও আইবুড়ো ভাতে দিয়ে দিতুম।

পিসিদের হিসেবী ধাত কতকটা পেয়ে থাকব। দেবার মধ্যে বিশেষ২ লোককে জন্মদিনে দিতুম। আমার নতুন জা লীলা[১১৪] দূরে ২ থাকত, সে আমাদের সামাজিক নিয়মের বড় ধার ধারত না। সব চেয়ে হাত দরাজ ছিল নলিনীর ; অথচ ভাইদের মধ্যে তার স্বামীরই বোধহয় সব চেয়ে কম আয় ছিল। আমার ছোট ননদ মেলা ও পূজোর সময় সকলকে কাপড় দিত।

সুহৃৎ-এর বাড়ী ফেরবার দিন স্টেশনে যাবার কেলেঙ্কারী কখনো ভুলব না। আমার নানা দোষের মধ্যে গয়ং গচ্ছতা একটু ছিল ; যদিও বিয়ের পরে কিছুটা সময়ানুবর্তী হয়েছিলুম। সুহৃৎ strawberry pink রঙটা ভালবাসত বলে আমরা নলিনীকে সেদিন সেই রঙের সাড়ী পরিয়েছিলুম।

সে তো সব হল। কিন্তু বম্বে মেল আসবে ৫৷৷০টায়, আমাদের হাওড়া স্টেশনে সময়মত পৌঁছতে হলে অন্ততঃ ঘণ্টা খানেক হাতে রেখে ত ছাড়া উচিত। আমার সাজসজ্জার শেষ টানটোন দিচ্ছি. আর নলিনী আয়নার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেশ মনে আছে ; বেচারা ভালমানুষ বলে বড় জা-কে তাড়া দিতে পারছে না। অবশেষ যখন ছাড়লুম তখন ঠিক ক'টা বেজেছে মনে নেই—কিন্তু যখন হওড়ার পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন স্টেশনের বড় ঘড়িতে দেখতে পাচ্ছি ৫৷৷০টা বাজতে বড় বেশি দেরি নেই। অথচ ঠিক আমাদের মোটরের সামনে গোরুর গাড়ীর এক লম্বা সার ঢিকতে ২ চলেছে। আমার যে তখন মনের অবস্থা কিরকম হচ্ছে ও আর কি বলব ; ইচ্ছে করছে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে হাত দিয়ে গোরুগুলোকে ঠেলে জোরে চালিয়ে দিই। তখন প্রত্যেক মিনিটই বহুমূল্য ; কারণ চার বৎসর পর সুহৃৎ বিলেত থেকে ফিরছে, আর আমার দেরির দোষে যদি নলিনীকে স্টেশনে দেখতে না পায় ত আমার লজ্জা ও ধিক্কারের সীমা থাকবে না। কিন্তু ভগবান সহায় ; সেই গাড়িগুলোর পিছনে ঢিকতে ২ গিয়েও যখন অবশেষে স্টেশনে নামলুম ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্লুম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বম্বে মেল হুশ্‌ হুশ্‌ শব্দে হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম্মে এসে ঢুকল ; আমারও মুখ রক্ষা মান রক্ষা হল।

আমার মা ওদিকে বাড়ীতে সানাই বসিয়েছিলেন ; সুহৃৎরা পৌঁছতেই উৎসবের বাজনা বেজে উঠল। মা তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে দুজনকে এক কৌচে জোড়ে বসিয়ে ফুলের মালা পরালেন, ইত্যাদি। এই সব সুন্দর অনুষ্ঠানের দিকেই মেয়েদের স্বাভাবিক ঝোঁক. আমার মায়ের ত খুবই ছিল ; আর এই সব ছোটখাটো উৎসবই গার্হস্থ্য জীবনকে মধুময় ক'রে তোলে।

সুহৃৎ যদিও প্রধানতঃ নিজের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করবার জন্যই অত কষ্ট সহ্য ক'রে যুদ্ধে গিয়েছিল ও প্রাণ হাতে ক'রে ফিরে এসেছিল—কিন্তু দুঃখের বিষয় ফলে বরং হিতে বিপরীত হল। কারণ তার আগেকার প্র্যাকটিস যে চারু ডাক্তার (দাস)কে দিয়ে গিয়েছিল, সে-সব ঘর তাঁর হাতেই রয়ে গেল, অথচ আশানুরূপ নতুন ঘরও সুহৃৎ-এর হাতে এল না। তাই সে আমার ঐ কমলালয়ের বারান্দায় মুষড়ে বসে থাকত আমাদেরও দেখে খারাপ লাগত। আর পরিবার প্রতিপালন ত করতে হবে? পুরুষ মানুষের শুধু ২ বসে থাকতে ভালই বা লাগবে কেন, চলবেই বা কি ক'রে? উনি অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় ঠাওরালেন; এবং হিন্দুস্থান ইন্স্যুরান্স কোংয়ের তদানীন্তন ডাক্তারকে পাকেপ্রকারে সরিয়ে দিয়ে, তার জায়গায় সুহৃৎকে বসালেন।

তারপর ক্রমে ২ রোগীও আসতে লাগল, একরকম চলে গেল; কিন্তু আগের মত প্র্যাকটিস আর জমল না। অবশ্য সরকার বাহাদুর সুহৃৎকে সৈন্যবিভাগে পাকা চাকরী দিতে প্রস্তুত ছিলেন: কিন্তু সুহৃৎ তা নিতে রাজি হল না। আর মনে হয় একদিকে সে ঠিকই করেছিল, কেননা নলিনী যেরকম পরিবারগতপ্রাণ বাঙালী মেয়ে, তাতে ছোট স্টেশনের অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ধরনের জীবনযাত্রা তার কখনো ভাল লাগত বলে বোধ হয় না।

সুহৃৎরা যখন আমাদের ছেড়ে ১৫ নং ল্যান্সডাউন রোডের ভাড়া বাড়ীতে উঠে গেল, তখন খারাপ লাগল অবশ্য; কিন্তু হয়েদরে ভালই হল। বাড়ীটি দেখতে বেশ ছিল, দেড়তলা, বড় ২ ঘর আর বাগান ছিল। সেই বাগানে নলিনী একবার বাড়ীর লোকেদের যে চা খাওয়ালে, তা দেখে আমি অবাক—বলে, 'ফুল-বোঠান, এ করেছেন কি?' –কলকাতা সহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে যতরকম খাবার বাজারে পাওয়া যায়, তার কোনটা বোধহয় বাকি ছিল না। বড়বাজারের সরের লাড়ু থেকে চৌরঙ্গীর দোকানের কেক পর্য্যন্ত। ঐ বাড়ীতে জা লীলা তার ছেলেপিলে নিয়ে অনেকদিন এসে রইল, কি সূত্রে ঠিক মনে নেই—হয়ত ছোট্‌ঠাকুরপো তখনো যুদ্ধ থেকে ফেরেন নি। তার ছোট ছেলের উপর সুহৃৎ-এর বড় মেয়ে সুরমার এমন মায়া পড়ে গিয়েছিল যে তারা চলে যাবার পর সুরমার মন ভাল করবার জন্য সুহৃৎ তার বিয়ে দেবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল।

ঐ বাড়ী থেকেই পর ২ সুহৃৎ-এর দুই মেয়েরই বিয়ে হল বড় মেয়ের হল ইন্দু সিকদারের সঙ্গে, সে সামান্য ইন্স্যুরান্সের চাকরী থেকে ক্রমশঃ সুপারিশ ও নিজগুণে ব্যাঙ্কে বেশ ভাল পদ পেলে; আর মেজ মেয়ে অপর্ণা ওরফে অপুর হল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে নবেন্দ্রনাথ ওরফে নবুর সঙ্গে। সে ছবি আঁকত বলে ফুলশয্যায় অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে নলিনী তার এক সন্দেশের প্রতিকৃতি পাঠিয়েছিল—চশমা ও রঙের সাজসরঞ্জামসুদ্ধ। আর ত্রিপুরার বড় ঠাকুরের মেয়েরা কি সুন্দর মালা ও ফুলের গয়না ক'রে দিয়েছিল তা দেখবার মত। ওরা

বাস্তবিক জাতশিল্পী।

অপুর বিয়ে হিঁদুমতে দিতে হবে বলে নলিনী প্রথমে খুব আপত্তি করেছিল ; কিন্তু মেয়ে সুখে থাকবে বলে দ্বিপুদাদা অনেক ক'রে বোঝাতে শেষে রাজি হল।

এ সম্বন্ধে আমার একটি নিজস্ব মত আছে, যা এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যদিও অনর্থক হতে পারে। সেটি হচ্ছে এই যে, যে-সমাজে কন্যার বাড়ী বরের গিয়ে বিবাহ করবার রীতি প্রচলিত আছে এবং যতদিন আছে, ততদিন বরের পক্ষে কন্যাকর্ত্তার বংশরীতিপদ্ধতি মতে বিবাহ করা শোভন ও সামাজিক সৌজন্যসম্মত কাজ। যে বংশের মেয়েকে তোমার ঘরের বধূরূপে বা তোমার ধর্ম্মপত্নী রূপে স্বগৃহে আনবার ইচ্ছা ও মত করেছ, সে বংশের বিবাহপদ্ধতিতে তোমার আপত্তি করা শুধু অনুচিত নয়, আমি ত বলি অনধিকার চর্চ্চা এবং অভদ্রতা। কারণ তখনো সে তার বাপের মেয়ে, বাপের বাড়ীতে রয়েছে, বাপের বংশপরম্পরাগত রীতির বশবর্ত্তী আছে ; তখনো তার উপর সামাজিক মতে বা আইনমতে বরের কোন অধিকার জন্মায় নি। তারপর তোমার ঘরে এনে তুমি তোমার বংশরীতি মতে তাকে চালাও, – যদি সে চলতে রাজি থাকে। আমাদের দেশে মেয়েরা এত সস্তা এবং নিরুপায় বলেই বরপক্ষ এত অন্যায় চাপ দিতে ও মতামত খাটাতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ সময় ব্রাহ্মমতে বিবাহ এবং হিন্দুমতে বিবাহ নিয়ে গোলযোগ বাধে। সে ক্ষেত্রে আমি বলি অবশ্য অত্যন্ত ভয়ে ২ যে, ব্রাহ্মবিবাহে হিন্দুর আপত্তি হওয়ার কোন কারণ নেই, কেন না ভগবানের নাম নেওয়ায় কোন হিন্দুর আপত্তি হতেই পারে না, কেবল বিয়েটা আইনসম্মত হলেই হল। আর হিন্দুমতে ব্রাহ্মদের একমাত্র আপত্তি হতে পারে যদি কোনরকমে মূর্ত্তিপূজা করতে হয়। কিন্তু আমি যতদূর জানি বাংলাদেশের হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠানে শালগ্রাম বা নারায়ণশিলা কেবল সাক্ষীমাত্র থাকেন। তাঁকে কোনরকম পূজা বা প্রণাম পর্য্যন্ত করতে হয় না। তা যদি হয় ত ব্রাহ্ম বরের সেই শিলার সঙ্গে একঘরে বসে বিয়ে করতে কি আপত্তি হতে পারে ? ঘরের আর পাঁচটা জড়-পদার্থের মত মনে করলেই হল।

কেউ ২ হোমেতেও আপত্তি তোলেন ; মহর্ষিও নাকি বাদ দিয়েছেন[১১৫]। অবশ্য আহুতি দেওয়া হয় বলে কতকটা অগ্নিপূজার মত মনে করা যেতেও পারে। (গোপনে আবার বলি যে সাধনপথে যদি কোন প্রতীক কল্পনা করতেই হয় ত অগ্নির মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একাধারে সাকার-নিরাকার প্রতীক আর কী আছে !)

তবে আসল কথা হচ্ছে এই যে, এ সব মতামত যুক্তিসাপেক্ষ নয়। পুরুষানুক্রমে যে অনুষ্ঠান পদ্ধতির সঙ্গে মানুষ আজীবন জড়িত, সেটা ত্যাগ

করতে তার মজ্জাগত সংস্কারে বাধে, বংশমর্য্যাদাজ্ঞানে আঘাত লাগে—বিশেষ মেয়েমানুষের জন্য। ছাড়তে হয় তারা ছাড়ুকগে। অথচ এই আপাত-তুচ্ছ মতভেদ দরুণ কত ভাল ২ সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে, জীবনের সুখ নষ্ট হচ্ছে। তাই এত কথা বলা।

আর্থিক অবনতি

আমরা 'সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু' তা 'অনলে পুড়িয়া গেল' না বটে তবে অন্যরকমে হাতছাড়া হল বা করা হল, যার ফলে নানা দুর্গতি ভোগ হল। তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ওঁর অসমাপ্ত 'আত্মকথা' থেকে তুলে দিচ্ছি :

'যুদ্ধের পর অকস্মাৎ কলকাতার সব জমি ও বাড়ীর দর বেড়ে গেল। সেই সুযোগে আমিও আমার ১।। নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ী বিক্রী ক'রে ফেললুম মহারাজা-নদীয়ার কাছে। বাড়ী ছেড়ে প্রথম আমার দাদার কুটুম্ব সিলেটের নগেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ৭ নং সানি পার্কের বাড়ীতে গিয়ে উঠি ও সেখানে সাত মাস থাকি। তারপর মাস দেড়েক আমার ডাক্তার ভাই সুমন্তনাথের ভবানীপুরের বাসায় কাটিয়ে আমার সেজদাদা কুমুদনাথের ২।১ নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ীতে আশ্রয় নিই। ইতিপূর্ব্বেই বালিগঞ্জের বর্ত্তমান মে ফেয়ার রোডের প্রান্তে এক খণ্ড জমি নতুন বাড়ী করবার উদ্দেশ্যে কিনেছিলুম। এবং সুরেন মুখুয্যে নামক একজন কণ্ট্রাক্টর তখন মে ফেয়ারের অন্যান্য বাড়ী তৈরি করায় নিযুক্ত ছিলেন বলে তাঁরই হাতে আমার নতুন বাড়ী নির্ম্মাণের ভার দেওয়া সঙ্গত মনে করলুম। সেজদার বাড়ী থেকে আমি এই বাড়ী তদারক করতে যেতুম। নানা কারণবশতঃ আমার এই বাড়ী (পরে ২০ নং মে ফেয়ার বলে পরিচিত) তৈরির সঙ্গে অনেক ঝঞ্ঝাট ও লোকসানের স্মৃতি জড়িত। তাতে আমারও হয়ত দোষ ছিল, অন্যেরও দোষ ছিল ; সে বিচারে এখন ফল নেই। মোট কথা, 'কমলালয়' ফলক নামেমাত্র নতুন বাড়ীর ফটকে শোভা পেলেও প্রকৃতপক্ষে কমলা সেখান থেকেই আমার কাছে বিদায় নিলেন। প্রথমতঃ যখন মহারাজা-নদীয়ার কাছে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ টাকায় পুরণো ১। নম্বর ব্রাইট স্ট্রীটের 'কমলালয়' বিক্রি করি, তখন অভিপ্রায় এবং আশা ছিল যে, আমাদের থাকবার উপযোগী নতুন একটা মাঝারি গোছের বাড়ী তৈরি করেও যে টাকা হাতে থাকবে, তার সুদে আমরা বুড়ো বয়সে ঘরে বসে খেতে পারব। কিন্তু নানা দুর্দ্দৈবে নতুন বাড়ী করতে প্রায় সমস্ত টাকাটাই লেগে গেল। তা ছাড়া পুরনো বাড়ীর টাকা পাবা মাত্র একজন নিকট আত্মীয় সমস্তটা ধার নিলেন বলে এবং সময়মত শোধ করতে পারলেন না বলে, নতুন বাড়ীর অনেক টাকাই ধার ক'রে শুধতে হল। এই ধার অধিকাংশ হিন্দুস্থান ইন্সিয়রান্স কোম্পানির কাছ থেকে নিই।

পূর্ব্বোক্ত আত্মীয় আমার বাকি পাওনা কতক জমি ও কতক জমিদারি দ্বারা শোধ করেন। সেই জমি বা ধোব্‌ড়াকোল এস্টেট নদীয়া জেলায় স্থিত। প্রথম কয় বৎসর তার থেকে বেশ আয় হয়েছিল, এবং সংসারযাত্রাও নির্বিঘ্নে চলেছিল। কিন্তু পরে শিকস্তি প্রভৃতি নানা কারণ সমবায়ে আয় কমে যেতে লাগল। এদিকে আমার গোপাল শীলের চাকরি গেল, ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের ঋষিবরিও গেল।'

উদ্ধৃত কয়টি পংক্তিতে অতি সংহতভাবে আমাদের বাড়ীবিক্রির ইতিহাস সবটাই দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্ত্তী ভ্রমণবৃত্তান্ত যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা স্বীকার করছি। কিন্তু আর একটু বিস্তারিত ক'রে না বল্লে আমাদের মনঃপূত হয় না। তাই নিম্নলিখিত টীকাটিপ্পনী দিতে প্রবৃত্ত হচ্ছি :

(১) যতদূর মনে পড়ে কমলালয় বাড়ী কেনা হয়েছিল ৩৯ হাজারে, আর বিক্রি হল ১৭৩ হাজারে। তাই লাভের পরিমাণ থেকে সহজেই লোভের পরিমাণ কষা যায়। মা অনেকদিন পরে একটু দুঃখপ্রকাশ ক'রে বলেছিলেন যে, 'তোমার বিক্রি করবার সময় একবারও মনে হল না যে আমরা ও বাড়ী তোমাকে দিয়েছি?' অথচ তাঁরা যে ঐ সময় ২ নিজেদের ১৯ নং স্টোর রোডের বাড়ী (যেটা ৬৪ হাজারে কেনা) চার লক্ষ টাকা দর পেয়ে বেচে দিয়েছেন, আমাকে বলবার সময় সে কথাটা তাঁর একবারও মনে হল না? অবশ্য তাঁদেরও সে টাকা রইল না, আমারও রইল না, সে আলাদা কথা। — কিম্বা একই কথা!

(২) যে অভিপ্রায়ে বাড়ী বেচলুম, — যে নতুন বাড়ী করেও বুড়োবয়সে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করবার সংস্থান থাকবে — সে আশা যে পূর্ণ হল না, সেও আর একটি নিকট আত্মীয়ের গুণে (বা দোষে)। তাঁর উপর বাড়ী তৈরি-তদারকের ভার দেওয়া হয়েছিল, — কিন্তু তিনি সে বিষয়ে নানা ব্যক্তিগত কারণে এমনি বেপরোয়া ভাবে চল্লেন যে নিতান্ত পর কণ্ট্রাক্টর সহকারী কর্ম্মী ভদ্রলোকেরা আমাদের সাবধান ক'রে দিলেন যে, আমাদের বিল অনেকদূর মাত্রা ছাড়িয়ে চলে গেছে। অবশ্য আমাদেরও আগে অবহিত হওয়া উচিত ছিল; যে জন্য উনি লিখেছেন যে 'হয়ত আমারও দোষ ছিল।' যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল, তখন আর ভুল সংশোধন করবার উপায় রইল না।

(৩) সিলেটের নগেন চৌধুরীর বড় বাগানওয়ালা বাড়ীতে মন্দ ছিলুম না। এবং যদিও তাঁরা ভাড়া নেন নি, তবু নানারকমে তাঁদের বাড়ীর বাকি কাজ সেরে দিয়ে, জিনিষপত্র দিয়ে সাধ্যমত প্রতিদান দিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তাঁরাও চিরদিন যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছেন।

(৪) সুহৃৎ-এর ভবানীপুরের বাড়ীও এখানে ওখানে মেরামতাদি ক'রে কিছু উন্নতি ক'রে দিয়েছিলুম। আমার ওটা যেন একটা বাতিকেরই মধ্যে। ভাঙা-চোরা ছেঁড়াখোঁড়া দেখতে পারিনে বলে নিজের বাড়ীতেও যেমন, পরের বাড়ীতে

থাকতে গিয়েও তেমনি যেটুকু পারি পারিপাট্য বিধান করি। তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং উক্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, একই বাণে দুই পাখী মারা হয়।

(৫) সেজঠাকুরের বাড়ী থেকে যে উনি ঐ এব্ড়ো-থেব্ড়ো ইঁটের উপর দিয়ে নতুন বাড়ী তদারক করতে যেতেন, তাই থেকেই ওঁর হার্নিয়ার উৎপত্তি হল আমার মনে হয়। তবে ঠিক বলতে পারিনে। কারণ বংশে ঐ রোগ অন্যদেরও ছিল।

২০ নং মে ফেয়ার

যতদূর মনে পড়ে ১৯২০ সনের ১৫ই মে এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ আমাদের সাধের কমলালয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। তারপর এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরতে বছরখানেক কেটে যায়। ইতিমধ্যে মনের মত হোক বা না-হোক আমাদের নতুন বাড়ী তৈরি হয়ে যায়। মনে আছে পরিত্যক্ত কমলালয়ের ছবি তুলে রেখে দিই; সেটা এখনো আমার কাছে আছে। আর একটা ইচ্ছে ছিল যে, তার গাড়িবারান্দার সুন্দর শ্বেত পাথরের সিঁড়ির উপর সবুজপত্রের দল বসিয়ে একটা শেষ স্মরণচিত্র তুলে রাখি। কিন্তু সেও পূর্বোক্ত আত্মীয়টির গাফিলতিতে তোলা হল না; তিনি সময়মত এলেন না। কিম্বা এলেও মন দিয়ে তুল্লেন না। যাক্, স্মৃতিফলকের ছবিই সব চেয়ে নির্ল্যাঠা, কারো উপর নির্ভর করতে হয় না।

পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৯২১ খৃঃএ আমরা যখন পুজোর সময় নিত্য নিয়মিত সফরে রাঁচি যাই, সেই সময়ই সুহৃৎ সপরিবারে নতুন বাড়ীতে উঠে আসে। এ বিষয়ে একটু মজার পারিবারিক ইতিহাস আছে। প্রথম যখন এই নতুন দোতলা বাড়ী হয়, (পরে ২০ নং মে ফেয়ার) তখন স্থানাভাবে আমরা গাড়িখানা, রান্নাঘরাদির উপরে খুচরা ঘরও দোতলায় করতে বাধ্য হই—মূল বড় বাড়ী থেকে একটু দূরে। আমি প্রথমে প্রস্তাব করেছিলুম যে, আমাদের কোন আত্মীয় পরিবার—তার নাম করব না,—সঙ্গে এসে থাকুন, কারণ আমরা মাত্র দুটি প্রাণী, অত বড় বাড়ী ত লাগবে না, অথচ তাঁদেরও একটু সুবিধে হবে। কিন্তু ওঁর মোটেই সে ইচ্ছে ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে একত্র থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে ফেল্লেন।

প্রথম কেনবার সময় যেরকম এঁদো জমিটা ছিল, তা জ্যোতিকামশায় ওঁদের দেখে বড় সুবিধে মনে হয় নি, যখন ভিত পতনের জন্য তাঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলুম। (অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নি!) কিন্তু তারপর বাড়ীটা খুঁটির উপর বসিয়ে আর বাগানটা চৌরস ক'রে গাছপালা লাগিয়ে দেখতে নেহাৎ মন্দ হয় নি; যদিও প্রথম কমলালয়ের কাছে লাগে নি। দক্ষিণপশ্চিমে একতলা দোতলার বারান্দায় জালি কাজেরও একটু বাহার ছিল, যদিও মোটের উপর যে দাম দিতে

হল তাতে মজুরি পোষায় না। উপর নীচে মোট চারটে ক'রে আটটা ঘর ছিল তা ছাড়া নাবার ঘর, দক্ষিণ পশ্চিম দুই দিকে পাথর বসানো বারান্দাদি। সুহৃৎ-এর একসঙ্গে থাকা যখন স্থির হল তখন বড় বাড়ীর সঙ্গে ছোট বাড়ী জুড়ে একটা খোলা বৈঠকখানা-গোছ ক'রে দেওয়া গেল, সামনে সরু বারান্দা, আর নীচে বেশ কলসের পাঁচিল দেওয়া ছোট বাঁধানো উঠান। তাতে সে বাড়ীটাও বেশ ভব্যযুক্ত হয়ে গেল। আমরা যখন রাঁচির পূজাভ্রমণ সেরে প্রথম নব গৃহপ্রবেশ করি তখন সুহৃৎরাও সানাই বাজিয়ে মঙ্গল-ঘট বসিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল। বাঙালী মাত্রেরই সখের প্রাণ। তারপর বহু বৎসর আমরা সুখেস্বচ্ছন্দে একসঙ্গে কাটিয়েছি। তবে স্বাচ্ছন্দ্যটা ক্রমেই কমে আসছিল, সে আভাস আগেই দিয়েছি। তার কারণও বলেছি। বাড়ীর ক্রম পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা শুনলেই অবস্থা বোঝা যাবে।

প্রথমে ১৯২১-এ ত আমরা বড় বাড়ীতে এসে রইলুম, সুহৃৎরা ছোট বাড়ীতে। দুই বাড়ীর জিনিষপত্র এক বাড়ীতে ধরা সম্ভব নয় বলে দুই পক্ষকেই কিছু কিছু জিনিষ বিক্রি ক'রে ফেলতে হল। কোন্ সংস্কৃত শ্লোকে আছে না যে, স্ত্রীলোক ও ফুল মাথায় ধারণ করলেই শোভা পায়, স্থানচ্যুত হলেই আর কোন মর্য্যাদা থাকে না। তেমনি আমিও কতবার বলি যে, বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে থাকলে সব জিনিষই যেখানকার যেটি কেমন মানিয়ে যায়; কিন্তু যেই বাড়ী থেকে স্থানান্তর করতে হয় তখনি সেগুলি কি বাহুল্য আবর্জ্জনা হয়ে পড়ে, মনে হয় কি করতে ও কেন মরতে এত বাজে জিনিষ জড় করেছিলুম। তবু ত শিক্ষা হয় না। আবার নতুনতর নিম্নতর পরিবেশেও ক্রমশঃ ২ সেই বাজে জিনিষ জড় করতেই থাকি। স্বভাব মলেও যায় না। সাধে আমাদের দেশে লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে উপদেশ দিত।

সখের প্রাণ থাকলেও পোকা মাকড় ইঁদুর উইয়ের উৎপাত থেকে এ দেশে কোন সৌখীন দ্রব্য বাঁচানো শক্ত। প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত। তারপরে যখন ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বড় বাড়ীটা ভাড়া দিতে বাধ্য হলুম, তখন নিজেরা ছোট বাড়ীতে এসে রইলুম। সুহৃৎরা অন্যত্র উঠে গেলেন। তাতেও যখন কুললো না, তখন সমস্ত বাড়ীটাই ছেড়ে দিয়ে সেজদিদের ওখানে উঠে গেলুম।

কিন্তু বাড়ীতে ঢোকবার বর্ণনার সঙ্গে ২ তার থেকে বেরবার কথা তোলাটা শোভন হয় না। অত শীঘ্র 'ফুললো আর মোলো' ক'রে জীবনযাত্রা চলে না। আমরাও প্রথমে ২০ নংয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছিলুম। আত্মীয়স্বজন সদাসর্ব্বদা আসতেন, বন্ধুবান্ধবেরও অভাব ছিল না। দোতলায় বসবার ও শোবার ঘর, এবং একতলায় খাবার ঘর, ওঁর কাপড় ছাড়বার ঘর, অফিস এবং লাইব্রারি ছিল। এই শেষ ঘরটির দেওয়ালের মাপে ২ উনি সুন্দর ক'রে বইয়ের খোলা তাক বানিয়ে নিয়েছিলেন, এবং তাতে সুন্দরতর বই সাজিয়েছিলেন। সেটা

সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ আমার মায়ের বদান্যতায়। জামাই তাঁর অত পুঁথিগত প্রাণ বলে তাঁকে তিনি ১০০০ টাকা দিয়ে গ্রন্থবিলাসী প্রিয়নাথ সেনের[১১৬] সমস্ত ফরাসী গ্রন্থসংগ্রহ কিনে উপহার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে কতকগুলি কি চমৎকার সৌখীন সংস্করণ ছিল। তা ছাড়া ওঁরও বহুকাল থেকে বই কেনার সখ ছিল; তাই লাইব্রারিটি সেজেছিল ভাল।

তখন সবুজপত্রের দল ভেঙে গেলেও, সবুজপত্র একেবারে শুকিয়ে যায় নি, টেনেটুনে আরও বছর ৭/৮ বেঁচে ছিল, যদিও খুব নিয়মিত বেরোত না। পণ্ডিচেরির স্বনাধন্য কবি ৺সুরেশ চক্রবর্ত্তী দিন কতক এই বাড়ীতে সহঃ-সম্পাদকরূপে ছিলেন, এবং আমাদের সঙ্গে রাঁচিতেও গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তাঁর একটু মস্তিষ্কবিকার হয়েছিল, কেন কে জানে। আমাদের নিত্য-সঙ্গীদের মধ্যে দেখতে পাই এ রোগ সুপ্রচলিত।

এখনো কত লোকের মুখে শুনি যে ঐ ২০ নংয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। আমরা সেখানে নম্বর দ্বারাই বাড়ী সনাক্ত করতুম, – যথা ২০নং, ১।।০ নং ইত্যাদি। এখানে নতুন আগন্তুকের মধ্যে আমার পূজনীয়া শাশুড়ীঠাকরুণ দিনকতক এস বসবাস করেছিলেন – আজকালকার ভাষায় বলতে গেলে 'প্রধান অতিথিরূপে'।

আমার মেজভাসুর কুমুদনাথ চৌধুরী[১১৭] যখন দিনকতক পাটনায় গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করবেন মনস্থ করেন, তখন মাকে আমাদের কাছে রেখে যান। তাঁর তখন বেশ বয়স হয়েছে, ও বুদ্ধি খুব পরিষ্কার ছিল না। কারণ মনে আছে ১৯২২ খৃঃ-এ আমার বড় জা প্রতিভা দেবী যখন মারা যান, তখন ওঁর ছেলেরা যে সকলে অশৌচের দরুণ কামাতেন না ইত্যাদি, বা প্রতিভাদিদি যে কখনো দেখা করতে আসতেন না, – সে সব তাঁর খেয়ালের মধ্যেই আসত না। তাঁর কাছে বিজলী বলে একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল,. সে যখন নিজের অবস্থার উন্নতি করবার জন্য ছেড়ে গেল, তখন মা তাদের উদ্দেশ ক'রে বেয়ালা বাজানোর ভঙ্গি নকল ক'রে দেখাতেন। ভাবখানা বোধহয় – ঠিক জানিনে – যে বিজলি তাঁর বৌমার (প্রতিভা দিদির) গানের ইস্কুলে বেহালা শিখতে গেছে!

প্রতিভাদিদিও আশ্চর্য্য, হঠাৎ মারা গেলেন। অবশ্য নানা রোগে ভাবনা চিন্তায় রোগা ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন। তবে এমন কিছু শয্যাগত ছিলেন না এই বল্লেই বোঝা যাবে যে, সেদিন কাপড়চোপড় পরে গাড়ি ক'রে বিকেলে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বুকে ব্যথা ধরল, সেই যে শুয়ে পড়লেন, আর উঠলেন না। পরে শুনলুম angina pectoris। আমরা ত সব হতভম্ব, কি করতে হয় না-হয় কিছুই জানিনে। তারপর আমাদের পারিবারিক পরম হিতৈষী বন্ধু ও প্রতিবেশী ব্যারিস্টার হরিদাস বসুর স্ত্রী এসে আমাদের সব বলে কয়ে দিলেন। মেনা এসে দরজায় মাথা রেখে দাঁড়িয়ে ২ কত কাঁদতে লাগল মনে

আছে। বড়ঠাকুর ছেলেমানুষের মত 'প্রতিভা' ২ বলে কেঁদে ২ বেড়াতে লাগলেন, সে ভগ্নস্বর এখনো যেন কানে বাজছে। তাঁর ছেলেরা, বিশেষ বড় ছেলে আর্য্যকুমার—তাঁকে শোকের সময় খুব সেবা যত্ন করেছে, তা বলতে হবে।

সঙ্গীতসঙ্ঘ ত্যাগ

কিছুদিন পরে সব একটু শান্ত হলে, প্রতিভাদির প্রিয় সঙ্গীতসঙ্ঘের এক সভা বড়ঠাকুরের আফিস ঘরেই ডাকা হল। তাতে আমি একটা প্রস্তাব করেছিলুম যে, সঙ্গীতসঙ্ঘকে দুই ভাগ ক'রে একটা অংশকে 'প্রতিভা সভা' নাম দেওয়া হোক, তাতে মাঝে ২ গানবাজনার চর্চ্চা ও জলসাদি হবে; কতকটা সম্মিলনের মত; অন্যটা যেমন সঙ্গীতশিক্ষালয় আছে তাই থাকুক। বলা বাহুল্য, তাঁর নাম রাখবার জন্যই আমি সরলভাবে এই প্রস্তাব করেছিলুম, এবং চিরদিনই তাঁর এই কাজে সাধ্যমত সাহায্য ক'রে এসেছিলুম।

কিন্তু তাঁর মেজ ছেলে কি জানি কেন উল্টো বুঝলেন যে আমি যেন তাঁর মায়ের হাতে তৈরি জিনিষটা ভেঙে দিতে চাচ্ছি। তাই শুধু যে এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না, তা নয়, সেদিন সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে নিজের মতে চলতে ও চালাতে লাগলেন। বড়ঠাকুরও তখন অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন, জানি তিনি এ-সব বিষয়ে সভাপতির জোর খাটাবেন না বা খাটাতে পারবেন না—তাই বেগতিক বুঝে তাঁকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলুম। বোধহয় সহ-সম্পাদিকা না কি একটা ছিলুম। তার পরে সঙ্ঘের পুরনো কর্ম্মী অনেকে আমাকে আবার কাজে যোগ দেবার জন্য পেড়াপিড়ি করতে এসেছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হই নি; ভাবলুম মানে ২ সরে পড়াই ভাল। কবি যথার্থই বলেছেন:

> খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
> হেথা হতে আয়রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা!

২০ নং মে ফেয়ার

এই ২০ নং বাড়ীতে আমাদের অনেক গুরুজনই পদধূলি দিয়েছিলেন, শুধু শাশুড়ীমা ন'ন। সে হিসাবে ১।। নং কমলালয়ের উপর ২০ নং টেক্কা দিয়েছিল, আর কিছুতে হোক না হোক। বাবা যদিও জ্যোতিকামশার সঙ্গে অনেক কাল রাঁচি শান্তিধামে কাটিয়েছিলেন, তবু তাঁর মত অত একান্তভাবে রাঁচিভক্ত ছিলেন না; শেষ বয়সে আমাদের কাজেই ২০ নংয়ে এসে ছিলেন। তাঁরাও চিরদিনই উপাসনাভক্ত; রাঁচিতে থাকতে দুই ভাইয়ে নিত্যনিয়মিত বাঁধানো কুসুমতলার বেদীতে বসে রোজ সকালে যথারীতি গান ও মন্ত্রপাঠ দ্বারা

ব্রহ্মোপাসনা করতেন। সুহৃৎদের জন্য ২০ নংয়ে যে বৈঠকখানা নির্মিত হয়েছিল বলছি, সেইখানে বাবা থাকতে ২ প্রতি রবিবার সকালে আমাদের পারিবারিক সমবেত উপাসনা হত। পরে সুহৃৎরা চলে গেলে সেই অংশ আমরা এক শিখ পরিবারকে যখন ভাড়া দিয়েছিলুম, তারা সেই ঘরে গ্রন্থসাহেব রেখেছিল। আমরা বড় বাড়ী থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতুম আর সারা সকাল একজন-না-একজনের হারমোনিয়মের সঙ্গে ভজন গাওয়ার আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। একজন উঠে যাচ্ছে ত আর একজন বসছে – ঘণ্টার পর ঘণ্টা কামাই নেই। যদিও সেই সঙ্গেই শুনতুম যে বাড়ীর কর্ত্তা রাত্রিবেলা তাঁর স্ত্রীকে ধরে মারতেন; – সুতরাং সে ধর্ম্মের উপর খুব যে ভক্তি হয় তা নয়।

আর এক সা নামক গুজরাটি ভদ্রলোককে সপরিবারে ঐ অংশ ভাড়া দিয়েছিলুম, তাঁরা কিন্তু বেশ লোক ছিলেন। শুধু যে আমাদের মাঝে ২ সুন্দর ২ নিরামিষ খাবার পাঠাতেন তা নয় -- যথা সাগুর পাঁপড় ইত্যাদি – কিন্তু সা গিন্নি এমন অল্প লোক রেখে, অল্প খরচে সংসার চালাতেন, যদিও স্বামী ছিলেন সিবিলিয়ান – যে সে একটা দেখবার মত জিনিষ। মাঝে ২ যখন বিরলা প্রভৃতি স্বজাতি বড়লোকদের খাওয়াতেন তখন ভদ্রমহিলা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রান্নাঘরে যাবার জন্য কতবার লোহার ঘোরালো সিঁড়ি দিয়ে উঠানাবা করতেন, দেখলে তাজ্জব লাগত। বোম্বাই প্রদেশে বহুকাল নিজেরা থেকে দেখে, এবং অন্যের কাছে শুনেও জানি যে, সে-সব দেশের মেয়েরা সচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও নিজেদের হাতে ঘরকন্না রান্নাবান্নার কাজ পরিপাটিরূপে করে। শুধু তা নয়, এত শীঘ্র সারে যে নিজেরাও পরিপাটি বেশে বাইরে বেড়াতে যাবার সময় পায়। 'যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না' বিধান তারা মানে না, বা দিনরাত রান্নাঘরে ঢুকে বসে থাকে না।

একজন মুসলমান দরজি আমাদের বলেছিলেন যে, হিন্দুরা মুসলমানের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? – আমরা এক রুইমাছ কিনে বড় ২ টুক্‌রো দিয়ে ঝোলভাত খেয়ে কাজে বেরিয়ে গেলুম, যাবার আগে জামাকাপড় কেটে মেয়েদের দিয়ে গেলুম, তারাও খাওয়া সেরে সারাদিন বসে সেগুল কলে সেলাই ক'রে রাখলে, আমরা বেচতে নিয়ে গেলুম। আর পাশের বাড়ীর হিঁদু মেয়েরা হয়ত সারা সকাল বসে একটা লাউয়ের তরকারি রাঁধল, আবার তার খোসার একটা ভাজা করল, তারপরে হয়ত সস্তায় পচা কুচোচিংড়ি কিনে এনে মশলা দিয়ে তার ঝাল-চচ্চড়ি করল – অথচ পুষ্টিকর কিছুই খাওয়া হল না। সারাদিন নাইতে খেতে খাওয়াতে গেল ত তারা অন্য কাজ করবে কখন? কথাটা নেহাৎ মন্দ বলে নি।

বাঙালী ভোজনবিলাসী এবং বাঙালিনী রন্ধনবিলাসী – দুজনে মিলেছে ভাল। যত দূর দেখেছি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোকের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে

চের বেশি সরল ও সাদাসিধে। বাঙালীর অবশ্য বুদ্ধি-বিদ্যার নাম আছে—বা আগে ছিল। এখন ত আবার তাও লোপ পেতে বসেছে।

শিখ ভাড়াটেদের আর একটা প্রথা দেখেছিলুম, ওদের মেয়েরাও একটা ক'রে ছোট 'কৃপাণ' সঙ্গে রাখে। এই নারী-ধর্ষণের দুর্দ্দিনের পক্ষে মন্দ নিয়ম নয়।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদের এই কুঁড়েঘরে এসে দু দিন থেকে গিয়েছিলেন—অন্যে পরে কা কথা। বোধহয় রাণু মুখুয্যের[১১৮] বিয়েতে যাবার সুবিধে হবে বলে আমরা আসতে অনুরোধ করেছিলুম ও ২৫শে জুন ১৯২৫-এ এসেছিলেন তিনি। তবে শুধু দুটি দিনের জন্য, তার বেশি নয়। একদিন বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ শুনলাম চলে যাবার সব ব্যবস্থা করেছেন। আমরা অবশ্য তাতে একটু ক্ষুণ্ণ হলুম; কারণ তাঁকে আরামে রাখবার সাধ্যমত ব্যবস্থা করেছিলুম। ভাবলুম কোন কারণে তাঁর সুবিধে হচ্ছে না নিশ্চয়, সর্ব্বদা লোক-জন যাতায়াত হয় ত ভাল লাগছে না। রাণুর বিয়েতে তিনি কি যত্ন ক'রে না কাঁচের আলমারিতে নিজের সমস্ত বই ভাল ক'রে বাঁধিয়ে তাকে যৌতুক পাঠিয়ে দিলেন। সেই জন্যই এসেছিলেন, কাছে থেকে পাঠাবার সুবিধে হল। যেই কাজটি ফুরলো, অমনি আর মন টিকল না, চলে গেলেন। খেয়ালী লোকের ঐ রকমই হয়ে থাকে, তাতে আর আশ্চর্য কি। তখন প্রিয়ও[১১৯] শরীর সারাতে আমাদের এখানে এসে দিন কতক ছিল। সে আগেই বুঝতে পেরেছিল যে রবিকা একদিনের জন্য যোড়াসাঁকো যাব বলে যে গেলেন, আর ফিরলেন না।

পিতৃদেবের মৃত্যু

অর্শ আমার বাপের বাড়ীর একটি বংশগত রোগ, বাবারও ছিল। মনে হয় ১৯২২ খৃঃ কোনসময় আমাদের কাছে থাকতে আসেন। গ্রীষ্মকালে সেবারে পুরী বেড়াতে গিয়ে বেশ ভাল ছিলেন, সমুদ্রে নাইতেন; চিরদিন ত সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতেন ও পারতেন। আমার খুড়তুতো ও প্রতিভাদির আপন বোন শোভনা বাবার সঙ্গে পুরী গিয়েছিল ও তাঁকে খুব আদর যত্ন করেছিল। সে সব সময় হাসত বলে বাবা তার সঙ্গে দেখন-হাসি পাতিয়েছিলেন। তিনিও ঐরকম হাসিখুসি কইয়ে বলিয়ে মেয়েই ভালবাসতেন। ভিতরে ২ বাবার কিন্তু অর্শের ব্যামোটা বেড়ে গিয়েছিল। তখন বুঝতে পারলুম আমার দেওর মন্মথকে ডাকিয়েছিলুম। তিনি ত ভাল ডাক্তারই ছিলেন, ওষুধও দিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় কিন্তু তিনি ৭ই পৌষে জোর ক'রে বোলপুরে গেলেন। উনি সে জন্য পরে আমাকে কত বকেছেন। এখন মনে হয় যেন তাঁর প্রিয় বড়দাদার সঙ্গে শেষ দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তাঁর প্রিয় বোন স্বর্ণকুমারীর নাতনী কল্যাণীর পাকা দেখা উপলক্ষ্যে তাঁর ওখানে গিয়ে উপাসনা করলেন। তখনি তাঁর গলা কিরকম অস্বাভাবিক লাগছিল; যেন দুর্ব্বলতা ঢাকতে জোর

ক'রে চেঁচিয়ে ২ কথা বলছেন। বাড়ীতেও ঐ দুর্ব্বল অবস্থায় বসবার ঘরে এসে পিয়ানোর টুলের উপর বসে উপাসনা করতেন। শেষ পর্য্যন্ত উপাসনা ছাড়েন নি; জ্যোতিকামশায়ও তাই। ক্রমে শয্যাগত হয়ে পড়ায় একবার স্যর নীল-রতনকেও[120] আনিয়েছিলুম। তাঁর কাছে গগনদারা খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন। সুরেনরাও যোড়াসাঁকো থেকে যাতায়াত করত। তার সঙ্গে দেনাপাওনায় আমার কাছে ধোব্‌ড়াকোল এস্টেট বাঁধা ছিল। এই দেনা শোধ করবার জন্য হিরণদিদি[121] একবার প্রস্তাব করেছিলেন বাবাদের জমিদারীর একাংশ আমাকে লিখে দিতে। তিনি তাতে রাজি হয়ে পরামর্শের জন্য রবিকাকে একবার ডেকেছিলেন। কিন্তু তিনি এত দেরি ক'রে এলেন যে, তখন আর বাবার লেখবার অবস্থা ছিল না। সুরেন তাঁর মনোমত উইলের মুসাবিদা করেছিলেন, তা-ও সই হল না।

যেদিন রাত্রে খুব খারাপ দেখে সুরেনরা বাড়ী গেল, সেইদিনই রাত ৩টেয় ২৪শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারি ১৯২৩ সব শেষ হয়ে গেল। বউ[122] বলে এই ঘটনা সে স্বপ্নে দেখেছিল। তার আগে যখন অক্সিজেন আনা হল, তখন নিজেই বল্লেন—আমারও অক্সিজেন দিতে হবে?—এতদূর জ্ঞান ছিল। সঞ্জীব ও চুণি সারারাত পাশের ঘরে থেকে খুব সেবা করেছিল মনে আছে। মা রাঁচিতে ছিলেন, তাঁকে অসুখের কথা চিঠিতে লিখেছিলুম, কিন্তু অতটা বাড়াবাড়ি বোধহয় বুঝতে পারেন নি। পরদিন সকালে এসে পৌঁছলেন। সুরেনরা স্টেশনে গিয়ে তাঁকে নিয়ে এল। ততক্ষণ বাড়ী লোকে ভরে গেছে। রবিকাও এসে-ছিলেন। সেই খাটের কাছেই মাটিতে বসে উপাসনা করলেন। তার পরে আপনার লোকে তাঁকে যথারীতি নিয়ে গেল। এই শোক আমাকে যত লেগেছিল, আমার বোধহয় আর কোন শোক তত লাগে নি। পরে পাশের ঘরে রাত্রে শুয়ে কতদিন শুধু যে ঘুম হত না তা নয়, কিরকম একটা হতাশ মনের মধ্যে জেগে উঠত, যা আর কখনো হয় নি। কতদিন তাঁর শূন্য চৌকি বারান্দায় দেখে প্রাণে বেজেছে, কতদিন কোথায়ও বেরোই নি।—যাক, সে সব কথা। সময়ে সবই সয়।

তখন থেকে মা আমাদের কাছেই রইলেন। ঠিক মনে নেই আগে একবার কবে পায়ে সায়াটিকা হয়ে খুব ব্যথায় অধীর হয়ে রাঁচির বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর সঙ্গে আমাদের ওখানে চলে আসেন। তারপরে বাড়ীতে ডাক্তার অজিত বোসের বিজলী চিকিৎসা করিয়ে তবে কত কষ্টে ভাল হয়। মেয়েদের চিকিৎসা করবার জন্য আবার ডাঃ বোস স্ত্রীলোকদের সব শিখিয়ে নিয়েছিলেন, তারা বেশ নিয়মিতভাবে বাড়ীতে যন্ত্র এনে কর্ত্তব্য ক'রে যেত। তিনি নিজে ফী নিতেন না, যা পাওনা হত সব চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে দিয়ে দিতে বলতেন।

মা একটু কষ্ট-অসহিষ্ণু ছিলেন—শরীর মন দুই ক্ষেত্রেই। নিজের বৃদ্ধ বাপ মা,

একমাত্র ভাই, কারো মৃত্যু তাঁর সামনে হয়েছে বলে মনে হয় না। আমাদের কাছে পরে খবর পেয়েছেন, হয়ত রাঁচিতে। কিন্তু কলকাতায় থাকলেও ঘরে যেতেন কি না সন্দেহ, যদিও টাকাকড়ির ব্যবস্থা সব করতে প্রস্তুত ছিলেন ও করতেন। এক একজন ঐরকম স্পর্শকাতর আছে, কষ্ট দেখতে পারে না। কিন্তু তাদের দ্বারা আর যাই হোক, সেবা ত হয় না। অথচ আত্মীয়স্বজনের ভারি অসুখ করলে ত মা হয় তাদের নিজের বাড়ী এনে, নয় নিজে তাদের বাড়ী গিয়ে সেবা করেছেন, ও রবিকার প্রত্যেক সন্তান হবার সময় যোড়াসাঁকোয় কাকিমার কাছে গিয়ে থেকেছেন, তা বোধহয় আগেই লিখেছি। সম্ভবতঃ নিজের অতি প্রিয়জনদের অসুখেই কাবু হয়ে পড়তেন।

বাবার কাজ কিরকম হল, কোথায় হল, তা মনে করতে পারিনে, কেন জানিনে। আমি নিশ্চয় বাড়ীতে যথারীতি চতুর্থী করেছিলুম, আর সুরেন যোড়াসাঁকোয় আদ্যশ্রাদ্ধ। আমি তাঁর বিষয় দু' একটা কবিতা লিখেছিলুম, স্বর্ণপিসিমাও লিখেছিলেন ; এখনো খাতায় আছে।

ঈডেন গার্ডেনের প্রদর্শনী

সেই বৎসরই (১৯২৩) ঈডেন গার্ডেনে একটা মস্ত প্রদর্শনী হয়, তার মেয়েদের বিভাগের ভার আমার উপর দিয়েছিল। আমার মনে হয় আমার মন খারাপ দেখে কোন বন্ধুর প্ররোচনায় এটি হয়েছিল, যাতে অন্যমনস্ক হতে পারি। যে কাজের ভার নিই সাধ্যমত ভাল ক'রে করাই আমার অভ্যাস। এটাও তাই করেছিলুম, এবং বোধহয় কৃতকার্য্যও হয়েছিলুম। অবশ্য সহকর্ম্মীও যথেষ্ট ছিল। একটা অর্দ্ধবৃত্ত আঙিনার চারদিকে নানা ভিন্ন ২ ছোট দোকানে মেয়েদের হাতের কাজ প্রদর্শিত হয়েছিল। গয়না, কাপড়, সেলাই, শিল্পাদি। কুমোরদের ফরমাস দিয়ে অবনদার পরিকল্পনামত মাঝে একটু বড় ক'রে ভারতমাতার মূর্তি, এবং চারদিকে তাঁর ভিন্ন ২ প্রদেশের কন্যাদের স্বজাতীয় বেশ পরে মূর্তি ঘিরে দাঁড় করিয়ে আঙিনার মাঝখানটি কেমন সুন্দর সাজিয়েছিলুম। পরে তার ছবি নিয়ে মাকে পাঠিয়েছিলুম ; হয়ত এখনো কোথায়ও আছে। এখনকার স্বনামধন্যা অমলাশঙ্করের বাবা অক্ষয়কুমার নন্দী তাঁর Economic Jewellery Works দোকান থেকে মেয়েদের হাতের সোনা-বাঁধানো শাঁখা প্রভৃতি ; ত্রিপুরা রাজ্যের মেয়েদের হাতে-বোনা সুন্দর রিয়া ও শাল প্রভৃতি ; কাশীর রাজা কিষেনচাঁদের ঘরের মেয়েদের হাতে তৈরি বড় ২ গুড়িয়া পুতুল ; আমার এক খুড়তুতো বোনের হাতের সেলায়ের ছবি ; অর্থাৎ তুলি দিয়ে আঁকার বদলে ছুঁচসুতো রেশম জরি দিয়ে ছবি এঁকে মস্ত ২ ফ্রেমে বাঁধানো। এই শেষোক্ত দুটি পদেই এত বেশি দাম ফেলা হয় যে বেশ বোঝা যায় শুধু প্রদর্শনই তার উদ্দেশ্য, বিক্রি করা নয়। আর এক খুড়তুতো বোন, গগনেন্দ্রনাথের আপন ভগ্নী

ক্রোশের কাজের অনেকরকম পুতুল প্রভৃতি ক'রে দিয়েছিলেন, কেউ হুঁকো খাচ্ছে ইত্যাদি। আর মধ্যে দশপঁচিশ খেলার একটি ছক ও ঘুঁটি এখনো আমার কাছে আছে। বলতে ২ মনে হল যে, এখনকার মেয়েরা বোধহয় দশ-পঁচিশের নামও জানে না, খেলা ত দূরের কথা।

কিন্তু আমার দোকান পসারের মধ্যে সব চেয়ে নাম ও দাম হয়েছিল কতকগুলি সুন্দর সেকেলে কাঁথার, সেগুলি নদীয়ার রাজার কোন কুটুম্ব তাঁর জমিদারি থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। অত দাম দিয়ে যদিও এদেশে বিক্রি হল না, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে, অর্থাৎ পর বৎসরে (১৯২৪ ? বিলেতে মস্ত Wembley প্রদর্শনী হল, তার জন্য আমার দোকান থেকে অনেক কাঁথা বেশ দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেল, এবং বোধহয় চতুর্গুণ দামে সেখানে বিক্রি করল। তার ছবি পর্য্যন্ত ওদের চিত্রপুস্তিকায় বেরিয়েছিল। সুতরাং জয়জয়কার।

এখন অবশ্য সেরকম পরিশ্রম ক'রে সেরকম কাঁথা কেউ সেলাই করে না, করলেও তার মূল্য কেউ বোঝে না। কালে ২ সূচি-শিল্পেরও ফ্যাশন বদলায়, এবং সামাজিক অবস্থার উপরেই ব্যবস্থা নির্ভর করে। এখন সব সহজিয়া পন্থা। পাড়ে ২ মিলিয়ে পাড়ের কাঁথা, কিম্বা ছবির মত এঁকে ছবির কাঁথা। মোট কথা সব দেশে সব কালেই গৃহিণীরা অবসর বিনোদন ও গৃহের প্রসাধনের জন্য একটা কিছু শিল্পকাজ করবেই।

১৯ শতকে যেমন বিলিতী নিকৃষ্ট শিল্প, —যথা কার্পেটের ছবি, আঁশের সাজি এবং তুলোর কাকাতুয়ার চলন হয়েছিল—কি ভাগ্যি এখন রুচি ঘুরে গিয়ে আমাদের সুন্দর স্বদেশী কারুকার্য্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এবং তার মূলে যোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনের প্রভাবই বেশি। আমাদের দেশের আলপনা প্রভৃতি গ্রাম্য বা পল্লীশিল্পের উদ্ধার ও উন্নয়ন ত যতদূর জানি যোড়াসাঁকোর প্রদর্শনী থেকেই আরম্ভ হয়। তারপরে চামড়ার কাজ ও কাঠিওয়াড়ী সেলাই ফোঁড়াই এবং জাভার বাটিক ত শান্তিনিকেতন থেকে বাঙলাদেশময় ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের ছেলেবেলায় সেই কন্‌ভেণ্টের শিক্ষার দরুণ বিলিতী ছাঁদের পশমের কাঠি ও ক্রোশে কাঠির বুননই অভ্যস্ত ছিল। তবে আমি রিপু ছাড়া কোন সেলায়েই বিশেষ পারদর্শী হই নি। কলের সেলাই ঐ কল কেনা পর্য্যন্ত, তারপর পরহস্তগত। কাট ছাঁট ত কোন জন্মেই শিখলুম না। মোট কথা, কোনদিনই কোন কাজে লাগবার কাজ শিখি নি। বাস্তবপক্ষে সংসার করতে হল না বলে কোনরকমে পার পেয়ে গেলুম। বাপের বাড়ীর অবস্থা সচ্ছল ছিল, স্বামীর বেশি রোজগার না থাকলেও কোনদিন কষ্ট ক'রে সংসার চালাতে হয় নি—বিশেষ ছেলেপিলে ছিল না বলে। আর মা-বাপ যতদিন ছিলেন কোন কষ্ট হতে দেন নি। তবে শোক দুঃখের উপর কার হাত আছে; যখন যা পড়ে সহ্য

করতেই হবে।

বাবা যাবার সঙ্গে ২ যেন সুখের সংসারে ভাঙন ধরল। ১৯২২-এ প্রতিভাদিদি গেলেন, ১৯২৩ এ বাবা গেলেন, ১৯২৪-এ বড়ঠাকুর, ১৯২৫-এ জ্যোতিকামশায়, —সব যেন পরামর্শ ক'রে। মা বাপ কারোই চিরকাল থাকে না, আমাদের যে এতদিন ছিলেন তাই ভগবানের অনুগ্রহ। তবে অকালে স্নেহপাত্র গেলেই বেশি কষ্ট হয়। এ দীর্ঘ জীবনে পরে তাও ভোগ করতে হল।

আবার দার্জ্জিলিং

বোধহয় আমার মন ভাল করবার জন্যই ১৯২৩ গ্রীষ্মাবকাশে আমার ছোট জা প্রমীলা দেবী তাঁদের দার্জ্জিলিংয়ের সুন্দর Wigwam নামক বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। পাহাড়ে বাড়ীর ত সব উঁচুনীচুর ঠিক ঠিকানা নেই, তাই যদিও তাঁদের একতলার একটা প্রশস্ত ঘরে আমাদের স্থান দিয়েছিলেন, তবু সেটা বাইরের একটা রাস্তার সমান উঁচু ছিল বলে সেদিক দিয়ে ঢোকা ও বেরনো যেত। আবার তাঁদের তেতলার ঘর দিয়ে অপর উচ্চতর রাস্তায় বেরনো যেত। ঘরদোর সুন্দর সাজানো ছিল এবং বাগানে কতরকম রঙবেরঙের ফুল ফুটে থাকত।

আহারাদির প্রকার ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে অমিরা একটু বিলিতী কেতায় চলত। মনে আছে ওখানে পূর্ব্বোল্লিখিত সনৎ মুখুয্যে নামক আত্মীয় প্রায়ই আসতেন ও তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে ২ বেলা হত বলে প্রমীলা আমাকে খোঁটা দিয়ে বলত, 'ন'দি, তোমার একটা প্রাইজ পাওয়া উচিত।'

উক্ত সনৎ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগ্নে মদনবাবুদের বাড়ীর ছেলে,—যেমন সুপুরুষ তেমনি সৌখীন ও খরচে ছিল। তার নাকি বৈকালিক বেশভূষায় এত সময় লাগত যে লোকে ঠাট্টা ক'রে তার নাম রেখেছিল Toilet Mookerjee। তার স্ত্রীও ঘুরেফিরে ছিল আমাদের কুটুম্বকন্যা এবং সুন্দরী, অন্ততঃ গৌরী। তেমনি তাকে সুন্দর এক প্রস্ত সবুজ jade-এর গয়না ৩০০, [৫০০,?] দিয়ে কিনে দিয়ে সনৎ আমাদের দেখাতে নিয়ে এসেছিল। চারটে ওয়র্দ্দিপরা কুলিকে তার রিক্‌শ টানবার জন্য ১০০, মাইনে দিয়ে রেখেছিল, আর ওখানকার সব চেয়ে চড়া দামের অভিজাত হোটেল Mt. Everest-এ ঘর ভাড়া ক'রে ছিল। সেখানে একবার আমাদের কি সুন্দর চা খাইয়েছিল, যেখানে Mille Fleurs নামক মুখরোচক pastry cake-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় বেশ মনে আছে, কিন্তু অত সম্মিলিত বাবুয়ানা বেশিদিন সইল না, নিজেও অকালে মারা গেল। তার একটি সুন্দরী মেয়ে আমাদের দৌহিত্র-বধূ হয়েছে।

১৯২৩-২৫ এই তিন বছরের মধ্যে উপরি ২ ক' বার দার্জ্জিলিংয়ে যাওয়া হয়। ১৯২৪-এ গিয়েছিলুম মনে আছে ঐ জন্য যে, বড়ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকীর উপাসনা

সেখানে করি। তিনি ঐ বৎসর মে মাসেই মারা যান। এবং তাঁর সমনামী স্বনামধন্য জষ্টিস্ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঐ একই ২৪শে বা ২৫শে মে পাটনায় মারা যান,[১২৩] পরে তাঁর দেহ কলকাতায় আনা হয় এবং সমারোহ-পূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয় মামাবাড়ীর সূত্রে। দুই পরিবারই একসময় পদ্মপুকুর রোডে বাস করতেন, এবং পরস্পর যাতায়াত ছিল। আমরাও সেই সুবাদে দু'একবার তাঁদের বাড়ী গেছি। তাঁর স্ত্রী বেশ সুন্দরী ছিলেন মনে আছে। আর তাঁর এক জা আবার আমাদের জামাই অশ্বিনী বাঁড়ুয্যের বোন হতেন, তিনিও বেশ দেখতে ছিলেন।

আমাদের পরিবারই বোধহয় একটু সৌন্দর্য্যভক্ত, বিশেষতঃ আমার মায়ের ত কথাই নেই। তাঁর বিলেতে প্রথম বরফপড়া দেখে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে অসুখ বাধাবার কথা ত আগেই বলেছি; তারপরে এক, লক্ষ্ণৌয়ের ছাপা ছিটের পরদার রঙ পছন্দ বলে গায়ে জড়িয়ে বসে থাকতে তাঁকে দেখেছি। আমাদের বাড়ীর রূপের একটু খ্যাতিই ছিল, কারণ সুন্দর দেখে ২ বউজামাই আনা হত; ক্রমশ সেটা চলে যাচ্ছে। বাইরের লোকের মধ্যে আমার সুন্দর লেগেছে গোবর-ডাঙ্গার এক বউ এবং ডি. গুপ্তের ঘরের বউদের। নববিধান সমাজের আনন্দবাজার উৎসবাদিতে মাঝে ২ সুন্দর মুখ দেখা যেত, আর উত্তরপাড়ার একজন সুন্দরী বউকেও জানতুম।

১৯২৫ সালে বোধহয় দু'বার দার্জ্জিলিং যাই, একবার গরমে ও একবার পূজার সময়। দু'বারই The Maples নামক একটি হোটেলজাতীয় জায়গায় থাকি—বোধহয়। এবং তার মধ্যে অন্ততঃ একবার আমাদের সঙ্গে কালীবাবু[১২৪] ছিল। ছোট ছেলের নতুন চোখে প্রথম পাহাড় দেখবার অদম্য উৎসাহের কথা আর একটা দৈনিক লিপিতে লেখা আছে। Maples-এর বাড়ীওয়ালীর নাম ছিল Miss Hudson, তা এখনো মনে আছে। তিনি একটি শীর্ণকায় চিরকুমারী, যেমন ওদের হয়; কিন্তু বেশ ভদ্র এবং আমাদের যত্ন করতেন।

একবার ছিলুম দোতলায়, সে ঘরটি বেশ প্রশস্ত। এবং এক ঘরে ডবল নাবার ঘর ছিল, যা কদাচ দেখা যায়। সেবার যেন মনে হয় কেশববাবুর নাতনী মট্রি সকন্যা ঐ একই পান্থনিবাসে ছিল, এবং মাঝে ২ নিজের স্বদেশী রান্নার ভাগ আমাদের দিয়ে মুখবদলের সাহায্য করত। আর একবার ছিলুম নীচের তলায়। সে-বার যেন আর এক পাকা রাঁধুনী বন্ধু. অর্থাৎ স্যর কে. জি. গুপ্তের মেয়ে ও ব্যারিস্টার নির্ম্মল সেনের স্ত্রী সরযূ উপর তলায় ছিলেন, এবং তাঁর রান্নার জল কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে আমাদের নীচের ঘরে একটু ২ পড়ত। তৎসত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে দু' একটা রান্না শিখে নেবার সুযোগ পেয়ে খুসি হয়েছিলুম, যা এখনো আমার খাতায় লেখা আছে। ওঁদের ঢাকার রান্না ত প্রসিদ্ধ।

সেবার আর একটি বাঙালী জুড়িও আমাদের একই গৃহবাসী ছিলেন মনে

পড়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বাড়ুয্যের দোহিত্রী মনীষা (ওরফে রাণী) ও তাঁর সিবিলিয়ন স্বামী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। কত লোকই না এ জীবনে দেখেছি ; যেন চলচ্চিত্রের মত মনশ্চক্ষের সামনে দিয়ে ভেসে চলে যায়। ধূর্জটি মুখুয্যেও সেবার দার্জ্জিলিংয়ে ছিল, ও প্রায় আমাদের কাছে আসত। সে ত আমাদের সবুজপত্রের পুরনো দল ; তার আগেও রাঁচী থাকতে তার সঙ্গে প্রথম আলাপ। তখন কি সুন্দর কোঁকড়া ২ চুলে ভরা মাথা ছিল, যেখানে এখন টাক বিরাজ করছে। তার সঙ্গে পরিচয় এখন পর্য্যন্ত অটুট রয়েছে, যদিও খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এর মধ্যে ত Hague ঘুরে এল।

দুঃখের বিষয় পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে মানুষের মন সে পরিমাণে বড় হয় নি। সেই সন্দেহ, সেই শত্রুতা, সেই গোপনে ২ যুদ্ধের আয়োজন, প্রকাশ্যে শান্তির বুলি।

১৯২৫ খৃঃ জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে দার্জ্জিলিংয়ে Step aside বাড়ীতে এবং রাস্তায়ও মাঝে ২ দেখেছি। মহাত্মা গান্ধীও তাঁর ওখানে গিয়েছিলেন ; তিনি কেমন যত্ন ক'রে তাঁর গায়ে কম্বল তুলে ২ দিতেন মনে আছে। মহাত্মাজী মেয়েদের একটা সভাতে ভাষণও দিয়েছিলেন। চিত্ত একরকম বোতাম-দেওয়া নতুন ধরনের গরম আচ্‌কান পরতেন। সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা।

আর একবার ওরই কাছাকাছি সময়ে Caroline Villa নামক একটি অনুরূপ পান্থনিবাসে দার্জ্জিলিং গিয়ে থাকি—বোধহয় ১৯২৬-এ—ঠিক মনে নেই। কিন্তু তার ঘরদোর লোকজন অনেকটা মনে আছে। সাহেবসুবোরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট শোবার সময়ের পরে অনেক রাত পর্যন্ত নাচপোচ হৈ হল্লা করত, এই যা একটু অসুবিধে। নইলে আমরা ভাল ঘরদোর পেয়েছিলুম, খাওয়াদাওয়ারও অসুবিধে ছিল না। একলা বসে ২ হঠাৎ কেন জানিনে আমরা সন্ধ্যাবেলা সমস্ত বাইবলের ওল্ড টেস্টামেন্ট ক্রমে ২ পড়ে শেষ করলুম। যদিও সে অজ্ঞাত জাত-কুলের কুলজি পড়ে ঐহিক বা পারত্রিক কোনরকম উন্নতি হবার সম্ভাবনা কম।

একটি বিশেষ ঘটনার জন্যই এবারকার পাহাড় যাত্রা উল্লেখযোগ্য,—সেটি হচ্ছে Mdme Laura Finch-এর সঙ্গে পরিচয়। তিনি নিজে যেচে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। শুনলুম তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য এদেশে এসেছেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কোন উপযুক্ত গুরু খুঁজে পান নি। পরে অবশ্য হাবড়ার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ শর্ম্মা তাঁর সে আশা পূর্ণ করেছিলেন। আমরা তাঁকে সেদিকে বিশেষ কিছু সাহায্য করতে না পারলেও, সাধারণভাবে নানা বিষয়ে আলাপালোচনা ক'রে দু' পক্ষই তৃপ্তি লাভ করেছিলুম। বিশেষতঃ তাঁর নিজের জীবন একটি বিচিত্র কাহিনীর মতই ছিল। জাতিতে স্বচদেশীয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে ১৭ বছর বয়সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাপের প্ররোচনায় ও চক্রান্তে একটি ধনী প্রবীণ অস্ট্রেলীয়ের

সঙ্গে বিবাহ হয়, ২।৩টি ছেলেও হয়। কিন্তু মনের মিল না হওয়ায় অবশেষে স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চলে আসেন। কয়েক বৎসর ফ্রান্সে থেকে বিখ্যাত প্রেত-তত্ত্ববিৎ Paul Richot[১২৫]র সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা স্থাপন করেন। তার প্রেত-অনুসন্ধিৎসাঘটিত নানা কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতার গল্প আমাদের কাছে করতেন। চেহারাও তাঁর দেখবার মত ছিল। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, কাটা ২ মুখনাক, আর নিজের উদ্ভাবিত বেশভূষা ক'রে, বিশেষ মাথায় য়ুরোপীয় টুপির বদলে নেটের ওড়না পরে ও পায়ে লম্বা বুট দিয়ে যখন বেরতেন, তখন একটা আভিজাত্যের ছাপ পাওয়া যেত ও বোঝা যেত যে বয়সকালে একজন রীতিমত সুন্দরী বলে নিশ্চয় গণ্য ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কতকগুলি সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক ও রক্ষক ব্যবস্থা চেয়ে নিয়েছিলুম, যা এখনো আমার কাছে আছে,—চুল-ওঠা নিবারণাদির। Caroline Villa-র কর্ত্রীর কাছেও কতকগুলি ব্যবস্থা লিখে নিয়েছিলুম, বোধহয় অধিকাংশ রান্না ও ঘরকন্না সংক্রান্ত।

এগুলি সংগ্রহ করা আমার একটা বাতিকেরই মধ্যে। নিজের না হোক অন্যের ত কাজে লাগতে পারে এবং লেগেও থাকে। ওখানেও রান্নাঘরে ঢুকে মাঝে ২ ওদের সরকারি রান্নার আয়োজন লক্ষ্য করতুম। সুরুয়াটা সারাদিন একটা মস্ত হাঁড়িতে চড়ানো থাকত, তাতে মাংসের হাড়গোড় ছাঁটছোঁট টুকিটাকি যা বাঁচত সব ফেলা হত, শুধু একদিন নয়, দিনের পর দিন। তাই অত ভাল তার হত। তবে শীতদেশে ছাড়া এ বিধান চলে না, অত বাসি খাওয়াও বাঙালির শুচিতায় বাধে।

আমার সময়মত রান্নাবাড়া শেখা না হলেও ওদিকে একটা স্বাভাবিক মেয়েলি ঝোঁক বরাবরই ছিল এবং আছে। আগে যতটা এ বিষয়ে অজ্ঞানতিমিরান্ধ ছিলুম, কাশীতে একবার পূজোর সময় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে থেকে, তার প্রশস্ত রান্নাঘরে বসে ২ রান্না দেখতে ২ যেন কতকটা আবছায়া জ্ঞান লাভ হল। সেই রন্ধনবিদ্যার, যা মেয়েদের অবশ্য শিখনীয় বলে এখনো মনে করি, মুখে বলি, কলমেও লিখে থাকি।

বছরের পর বছরের আঁচল ধরে কোনরকমে ত ১৯২৫ পর্য্যন্ত পৌঁছনো গেল। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে ১৯২৭-কে কোন বিশেষ ঘটনা দ্বারা সনাক্ত করতে পারছিনে। ঘটনার মধ্যে ত দেখি প্রধানতঃ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, তাও এক জায়গার বর্ণনা ক্রমাগত করতে গেলে একঘেয়ে হয়ে পড়ে। ১৯২৭-এ যে আবার পাহাড়ে যাই নি, সেটা একরূপ স্থিরনিশ্চিত ; এবং তা না গেলে প্রায় তেমনি যে রাঁচি গিয়েছিলুম। কোথায়ও না গিয়ে পূজোর সময় কলকাতায় বসে থাকাটাও যেন সম্ভব মনে হয় না। তাহলে রাঁচি গিয়েছিলুম বলেই ধরে নিচ্ছি, যখন আদালতে হলপ ক'রে বলতে হচ্ছে না। তারপর ঘটনার একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্য একটি সত্য দুর্ঘটনা এই বছরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি। যথা : একবার রাঁচি

থাকতে আমার শ্বশুরের মৃত্যুবার্ষিকী পড়ে। সেই উপলক্ষ্যে আমি মিষ্টান্নং ইতরে জনাকে বিতরণ করা দেখতে বাক্সবন্ধ করতে ২ বাক্স খোলা রেখে পাহাড়ের বাড়ী থেকে নীচের বাড়ীতে অল্পক্ষণের জন্য নেবে যাই। আমাদের রসবতীর হাতে সব জলখাবার যথাযোগ্য পরিবেশন হয়েছে দেখে, উপরে চলে এসে বাকি বাক্সবন্ধ সেরে যথারীতি ও যথাসময়ে সে বছরকার মত রাঁচির মায়া কাটিয়ে চলে আসি।

গহনা চুরি

পরদিন সকালে কমলালয়ে পৌঁছে বন্ধ বাক্স খুলে আলমারিতে জিনিষ তুলব বলে ছোট গয়নার বাক্সটি যেই হাতে ক'রে তুলেছি কেমন যেন হাল্কা ঠেকল। খুলে দেখি সামান্য যা গয়না নিয়ে গিয়েছিলুম তার মধ্যে দিদিমার দেওয়া একটি সরু সোনার চীক, ওঁর দেওয়া সেই সোনার শিকলযোড়া, মায়ের দেওয়া দু' একটি উড়িষ্যার সোনার ব্রোচ প্রভৃতি নেই। তক্ষণাৎ রাঁচিতে তার ক'রে খোঁজ করতে বল্লুম। বেশ বুঝলুম সেই যে বাক্স বন্ধ করতে ২ খোলা রেখে নীচে চলে গিয়েছিলুম, সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই 'গৃহেতে পশিল চোর' – আর তাও বাইরে থেকে কখনো নয়, নিশ্চয়ই ঘরের লোক। সে কে তাও অনেকটা আন্দাজে বুঝলুম, মোগলজান নামে একটা মুসলমান ছোঁড়া চাকর। পরে তাকে ছাড়িয়ে দিলুম – আর কি করব, – কোন ত প্রমাণ নেই। বাবা ওঁরাও তদন্ত ক'রে কোন খোঁজ করতে পারেন নি বলা বাহুল্য – আমাদের পুলিশ দ্বারা কোনদিন কোন চোর ধরা পড়তে ত দেখি নি।

অনতিবিলম্বেই অবশ্য বাবা আমার চুরির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২০০, আবার কেঁচে যোতুক করলেন, সেই টাকা দিয়ে যে নতুন গয়না মনের মত ক'রে গড়ালুম, পাঁচজনের নমুনা দেখে, – তা কত পরেছি এবং এখনো আমার কাছে রয়েছে। কেবল দিদিমার চীকটির জন্য দুঃখ হয়, – যতই নতুন ক'রে সেরকম চীক গড়াই না কেন, তাঁর সেই নিজস্ব জিনিষটি ত আর পাব না!

ঘড়ির ইতিহাস

গহনা চুরি আমাদের কপালে এই প্রথম নয়; আরো অনেকবার ছোটবড় জিনিষ চলে গেছে। ছিঁচ্কে চুরির কথা বাদ দিলে সিমলে পাহাড়ে বাবার শোবার ঘরের খোলা জানলার পাশে আয়নার টেবিলে রাখা তাঁর সোনার ঘড়ি বেশ বেমালুম কে একজন হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে। তিনি দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি খোঁজাখুঁজি করেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পাহাড়ে দেশে-উঁচুনীচু জঙ্গলে-পথে একবার উধাও হলে কি আর সহজে কাউকে ধরা যায়? এই সূত্রে একটি পারিবারিক ছোট গল্প আছে যে, সুরেন বি. এ. পাশ করার পর যে সোনার

ঘড়ি পুরস্কার পেয়েছিল, সেটা সে বাবাকে এই চুরির পর ব্যবহার করতে দিয়েছিল। এ গল্পের জের আছে আর একটু।

আমাদের প্রথম কমলালয়ের বাড়ী থাকতে একদিন রাত্রে শুতে গেছি, পাশের ছোট নাবার ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হল দেয়ালে কিসের ছায়া পড়েছে, যেন একটা চারপেয়ে জানোয়ার চলে আসছে। আমার প্রথমে মনে হল বাগানে কোন লোক চলে যাচ্ছে, তারই ছায়া পড়েছে (যদিও পরে বুঝলুম লণ্ঠন নিয়ে চল্লেও সেরকম জায়গায় ছায়া পড়বার কথা নয়)। তারপরে বুঝলুম একজন মানুষই হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভিতর আসছে। তখন 'কে ও'! বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সে পালিয়ে গেল। আমি তখন ওঁকে ঠেলেঠুলে ঘুম থেকে তুল্লুম, নিজেও উঠলুম, কিন্তু ভাবলুম চোরটা কিছু নিতে পারে নি, সাড়া পেয়ে শুধু হাতেই পালিয়েছে। এমন সময় উনি আমাকে বল্লেন—'ক'টা বেজেছে দেখ ত?'—আয়নার টেবিলের উপর case-এ ঘড়ি থাকত—ওঁর বিয়ের ঘড়ি; দেখলুম ঘড়ি সেখানে নেই!—দেখতে ২ ক্রমশঃ প্রকাশ পেল যে, আলনা থেকে দু' একটা ভাল সাড়িও গেছে। তখন হাঁকডাক ক'রে যে-যেখানে ছিল জড় করা গেল, খোঁজ ২ রব পড়ে গেল। কিন্তু চোর কি ততক্ষণ আমাদের জন্য বসে আছে?—যদিও বাড়ীটা ছিল দেড়তলা, তার নীচের তলার অলিগলিতে ইচ্ছে করলে চোর বেশ লুকিয়ে বসে থাকতে পারত।

পরদিন সকালে পুলিশ লোকে লোকারণ্য। তারা সব দেখেশুনে লিখেপড়ে নিয়ে গেল। ২।৪ দিন পরে একটা কালো মুষ্কো জোয়ানকে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে চিনতে পারি কি না। আমি সেই মাঝরাত্রে আবছায়ায় ঘুমের ঘোরে দেখা ক্ষণিকের অতিথিকে সনাক্ত করতে পারলুম না। বলা বাহুল্য, যদিও সম্ভবতঃ কালো এবং জোয়ান দুইই ছিল। কিন্তু পাশের ছোট বারান্দার রেলিঙে একটা শাদা ঝাড়ন বাঁধা আছে, পরদিন সকালে দেখে মনে হল যে ঐ চিহ্ন দেখিয়ে আমাদেরই ঘরের কোন দাসী রাস্তার ওপারের খালি বাড়ীর (চোরের আড্ডা বলে খ্যাত) কোন লোককে ঘরে ঢোকবার পথ বাৎলে দিয়েছিল, তার সঙ্গে যড় ছিল।

কিন্তু ঘড়ি দিয়ে আরম্ভ গল্প ঘড়ি দিয়েই শেষ করি। যেমন মেয়েকে তেমনি জামাইকেও বাবা ঐ সুরেনের দেওয়া ঘড়ি দিয়ে চুরির ক্ষতিপূরণ করলেন। দুবার ক'রে ঘড়ি যৌতুক করা হল। তাই ত বলি সে স্নেহযত্ন, আদর ক্ষতিপূরণ আমাদের কে করবে?—কিন্তু এখানেও শেষ নয়। বউয়ের একটা কি রূপোর ঘড়ি চুরি গিয়েছিল, তাই সুরেনের শেষ অসুখের সময় দেখাশুনা করবার অসুবিধে হত। সেই সময় সুরেন বল্লেন আমাদের কাছে ঘড়িটা চেয়ে নিতে, কারণ সেটা তাঁরই ঘড়ি, বাবাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এতদিন পরে হক্কের ধন হক্কে ফিরে এল।

যখন চুরির কথা হচ্ছেই তখন আর একটা ঘড়ি চুরির বৃত্তান্ত বলি, যদিও সে বহুকাল পরের কথা। সুবীরের[১২৬] অসুখের সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা যখন যোড়াসাঁকোয় যেতুম, তখন আমি প্রতিমার[১২৭] ঘরে থাকতুম, ও রাত্রে একটা আয়নার টেবিলের উপর আমার Cyma হাতঘড়িটা তার বাক্সের মধ্যেই রেখে দিতুম, এবং সকালে স্নানাদি সেরে এসে রোজ সেটা কাঁধের কাপড়ে আটকে পরতুম। বিলেতে যদি ফ্যাশন্ মহলের বাসিন্দা হতুম কত লোকে এই নতুন ফ্যাশনের নকল করত। দুঃখের বিষয় একটু ট্যারা হয়ে ঘড়ি দেখতে হত; নইলে কাঁধে কাপড় আটকাবার সহজ উপায় মন্দ নয়। সেই অলক্ষণে দিনে কুক্ষণে স্নানান্তে ঘরে ফিরে এসে আয়নার টেবিলে দেখি ছোট বাক্স আছে, তাতে ঘড়ি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজিতেও যখন পেলুম না তখন সরকারকে বল্লুম পুলিশে খবর দিতে, নিজে চিঠিও লিখে দিলুম।

কিন্তু মনে হল বাড়ীর সরকার প্রভৃতি পুলিশ ডাকতে তত ব্যস্ত নয়। কারণ সেদিন সমস্তদিন কেউ এল না। আমি সে-সময়ে আবার রবীন্দ্রজয়ন্তী স্রোতে ভাসছি। পরদিন বাইরে থেকে ফিরে এসে শুনলুম দারোগা এসে খোঁজখবর ক'রে গেছেন। পরদিন সকালে তাঁকে ডাকতে বলে দেখা করলুম। জিজ্ঞাসা করলেন কাউকে সন্দেহ করি কি না। বল্লুম নিজের দাসীকে ত নয়ই (যদিও যোড়াসাঁকোর দল শুনলুম তার উপর দোষারোপ করবার চেষ্টায় ছিল), ওদের একটা নেপালী চাকরের উপর আমার সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু সে কথা বোধহয় বলি নি।

আমার ঐ হয় মুস্কিল। পরের বাড়ী থেকে তাদের চাকরকে সন্দেহ করলেও প্রকাশ করতে বা পুলিশ ডাকতে সঙ্কোচ লাগে; মনে হয় তার অভাবে তাঁদের হয়ত কত অসুবিধে ও কষ্ট হবে। নইলে একজন আত্মীয়া বলেছিলেন যে প্রথম সকালেই চাকরদের সব বাক্স খুলে খানাতল্লাসী করা উচিত ছিল। বলা বাহুল্য পুলিশে কিছুই করলে না। ঘড়িটা সবে ২০৲ দিয়ে মেরামত করিয়েছিলুম তাই আরো দুঃখ লাগল। নেপালী চাকরকে আমি সন্দেহ করেছিলুম (তার আগেও আমার ২।১টা খুচরা জিনিষ ঘর থেকে যায়)—পরে শুনলুম সে বিঃ ভাঃ'র [বিশ্বভারতীর] আরো জিনিষ নিয়েছে; সুতরাং আমার সন্দেহই ঠিক, প্রমাণ হল। যোড়াসাঁকো থেকে আমার একটা নতুন তসরের সাড়ীও গেল। কিন্তু আমার গয়না সম্বন্ধে ক্ষতির পিঠ ২ পূরণ আসে তা আগেই বলেছি। এ স্থলেও বিশ্বভারতী যখন আমাকে সম্বর্ধনা করলেন, তখন অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে আমাকে একটা হাতঘড়ি দিলেন, সেটা আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার করছি।

কি ভাগ্যি ১৯২৮-এর একটা প্রধান ঘটনা মনে আছে। সেটা হচ্ছে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনী,[১২৮] যার সভাপতি উনি হয়েছিলেন। বোধহয় জানুয়ারি মাসে হয়; কারণ মনে আছে সকলে ভয় দেখিয়েছিল, দিল্লীতে এমন কন্‌কনে শীত হবে যে হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে দেবে; সাহেবরা নাকি বলে যে বিলিতী

শীতকে হারিয়ে দেয়, এবং ফুটন্ত জলভরা পাদানির উপর পা রেখে তবে কথঞ্চিৎ আরাম পাওয়া যায়, ইত্যাদি। ননী বলে আমাদের পুরনো চাকরকে একটা পুরনো গরম উপরকোট দিয়ে নিজেরা যে যার গরম কাপড় সাধ্যমত নিয়ে নিলুম। আমাদের দলে ছিলেন আমার ছোট ননদ মৃণালিনী বা মেনা এবং সুহৃৎ-এর বড় ছেলে সঞ্জীব। এলাহাবাদ থেকে বন্ধুবর ধূর্জটি মুখুয্যে আমাদের সঙ্গ ধরলেন মনে আছে; বোধহয় তাঁকে লেখা হয়েছিল; অথবা তিনিও মনে করলেন যে, এই একটা গুরুতর কার্য্যক্ষেত্রে ওঁর সঙ্গে সৎপরামর্শদাতা, পাত্রমিত্র-সভাসদ যাওয়া উচিত।

কিন্তু আমরা বড় শুভদিনক্ষণে যাত্রা করি নি। কারণ যেদিন দিল্লী পৌঁছাই সেইদিনই নাকি লাহোরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করা হয়েছিল—এতদিন পরে ঠিক কার্য্যকারণ মনে নেই[১২৯]। সেই জন্য অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি ও অঞ্চলের ২।১টি বিশিষ্ট সাহিত্যিক দিল্লীতে আসতে পারেন নি, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের বাসের জন্য যতদূর মনে পড়ে সুলতান সিং নামক দিল্লীর একজন রইস্ লোকের সুন্দর দেড়তলা বাগানবাড়ী নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, এবং আদরযত্নের কোন ত্রুটি হয় নি। আমাদের আত্মীয় স্বনামধন্য শিল্পী অসিত হালদার[১৩০] উপস্থিত ছিলেন, এবং মেনা সুযোগ পেয়ে তাঁর সঙ্গে টাঙ্গা ক'রে ঘুরে ২ দিল্লীর সব দ্রষ্টব্য যেমন নিঃশেষে নিরুপদ্রবে দেখে নিলেন, আমি তা পারি নি। কারণ ওঁর অবশ্য রোজই সাহিত্য-সভার অধিবেশনে আজকাল যাকে বলে 'পৌরোহিত্য' করতে যেতে হত; আর আমিও না গেলে ভাল দেখাত না। আমাকে ওঁরা মহিলা বিভাগের সভানেত্রী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বল্লুম শ্রীমতী হেমলতা দেবী (শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা) ঢের বেশি যোগ্য লোক হবেন; তাই তাঁকেই করা হল।

এইখানে একটি সামান্য ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করছি—আশা করি তাতে পাত্রপাত্রী কিছু মনে করবেন না,—সেটি হচ্ছে এই যে, এই সাহিত্য-ক্ষেত্রেই বন্ধুবর অমল হোম[১৩১] তাঁর জীবনসঙ্গিনী (হেমের মেয়ে)-কে নির্ব্বাচন করেছিলেন, অথবা নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। ভিতরের সঠিক বিবরণ আমাদের জানবার কথা নয়; তবে বাইরে থেকে দেখলুম যে অমল খুব দর্শনধারী একটি গোলাপী রঙের জামিয়ার গায়ে দিয়ে ক'দিন ঘুরে বেড়ালেন। সভার অধিবেশনান্তে আমিও যথাসম্ভব দিল্লীর সহর দেখে ও দোকানবাজার ঘেঁটে বেড়ালুম। এখনো কুতব মিনার, হুমায়ুনের কবর, জুম্মা মসজিদের বিরাট ছক-কাটা প্রাঙ্গণ, ও তার সংলগ্ন হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম শিল্পের দোকান এবং মোতি মস্‌জিদের সুন্দর শ্বেতগম্বুজ মনে আছে। এখান থেকেই আগ্রা ঘুরে আসি বা অন্যসময়ে দেখেছি মনে পড়ছে না। কিন্তু তাজমহল দেখতে বাকি নেই।

কাল হঠাৎ 'সবুজপত্র' সম্বন্ধে সোমনাথ মৈত্রের[১৩২] একটা হাতের লেখা

আবিষ্কার ক'রে মনে হল এখানে তুলে রাখলে মন্দ হয় না, যখন সাহিত্য সম্মেলনের কথাই হচ্ছে। অবশ্য অনেকদিন থেকে আমার বিশেষ ইচ্ছে ছিল (বা এখনো আছে ?) যে, ওঁর 'আত্মকথা' যখন নানা কারণে সম্পূর্ণ করতে পারলুম না, তখন সবুজপত্রের ভূতপূর্ব্ব দলের কাছ থেকে সবুজ যুগ সম্বন্ধে তাদের ব্যক্তিগত স্মৃতির একটা সঙ্কলন (অধুনা symposium ?) ক'রে সেই ক্ষতিপূরণ করব। কিন্তু অনেক আশার মত যখন এটিও দুরাশা বলে প্রতিপন্ন হতে চলেছে, আমারও 'সময় হয়েছে নিকট', তখন সোমনাথের মত একজন বিশিষ্ট সবুজসভ্যের স্মৃতিকথা একাই একশো। তিনি লিখেছেন :

'সবুজপত্র'-কথা

বাঙলা সাহিত্যে সবুজপত্রের আবির্ভাব একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা, কারণ সবুজপত্র বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করে। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা কাব্যে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, প্রবন্ধে - সবুজপত্রেই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া সবুজপত্রের প্রেরণায় অনেক নতুন লেখক এই সময়ে লিখতে সুরু করেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। গতানুগতিক আঁকড়ে না থেকে বাহির পানে তাকিয়ে জগতটাকে দেখতে, কোন জিনিষ গ্রহণ করবার আগে তাকে বুঝতে ও বিচার করতে, ইংরেজি ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে—একটা প্রবল বাসনা এই সময় বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা দেয় তার চিরাচরিত অভ্যাস এবং চিন্তায় সজোরে একটা ধাক্কা লাগে—কি কি শক্তির সংঘাতে তা ঐতিহাসিক ও সমাজ-তাত্ত্বিক নির্দ্দেশ করতে পারেন। তবে সবুজপত্র যে বাঙলা দেশে তখন এই নবযুগের বাহক ও প্রতীক হয়েছিল সে কথা অনস্বীকার্য্য। সবুজপত্র যে বাঙলার চিন্তাজগতকে আলোড়িত ক'রে তুলল, সাহিত্যে নবসৃষ্টি উদ্বুদ্ধ করল—সে কৃতিত্বের গৌরব মূলতঃ সবুজপত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরীর প্রাপ্য। আমাদের অনেকের কাছেই তাই সবুজপত্রের কথা মানে প্রমথনাথের কথা। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা, চলতি কথাকে সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁর অজেয় উৎসাহ ও সফলতা—এসব আলোচনায় মধ্যে আমি আজ যাব না। আমি শুধু সবুজসভা এবং সে সভার সুলেখক, সুপণ্ডিত, বিদগ্ধ সভাপতি সম্বন্ধে দু' চারটি স্মৃতিকথা বলব।

তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা জানেন কি অসাধারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, যাতে বুদ্ধির উজ্জ্বলতার সঙ্গে স্নেহপ্রবণতা এসে মিশেছিল। যে দলটি তাঁকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল তার সকলেই যে পরে বড় লেখক হয়ে উঠেছিল বা জীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তা হয়ত নয়। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁদের জীবন যে সমৃদ্ধ হয়েছে, দৃষ্টি যে স্বচ্ছ হয়েছে,

মন যে সংস্কারমুক্ত হয়েছে, sense of values যে উন্নত ও মার্জ্জিত হয়েছে —একথা তাঁরা প্রত্যেকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করবেন।

প্রমথনাথের অনেক আশ্চর্য্য গুণের মধ্যে একটি প্রধান গুণ ছিল সকল রকমের ও সকল বয়সের মানুষের সঙ্গে সহজে মিশবার এবং প্রত্যেক লোককে অত্যন্ত interesting মনে করবার ক্ষমতা। তা যদি না হত তাহলে ২১।২২ বছর বয়সে কখনো তাঁর কাছে ঘেঁষতেই সাহস করতাম না। প্রথম প্রথম এই পণ্ডিত, সাহিত্যরসিক, শিল্পী প্রভৃতির সভার একটি টেরে গিয়ে বসতাম। কিন্তু কিছুদিন গেলেই দেখলাম যে নিতান্ত নগণ্য হয়েও কেউ তাঁর কাছে গণ্যমান্যদের চেয়ে কম আদর পায় না। তা ছাড়া ভয় ভাঙল আরো একটা কারণে। দেখলাম সবুজসভায় কেবল বড় বড় পণ্ডিতী কথাই যে হয় তা নয়, নানারকম কৌতুকপ্রদ গল্পগুজব এবং প্রায়ই গানবাজনার আসর বসে।

এই সঙ্গীতের আসর আমাদের অনেকের কাছে ছিল ১নং ব্রাইট স্ট্রীটের একটা প্রধান আকর্ষণ। যাকে আজকাল উচ্চ সঙ্গীত বলার রেওয়াজ হয়েছে সে সঙ্গীত ত হতই, তা ছাড়া নেপথ্য থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসত শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর পিয়ানোতে বাজানো বিদেশী সঙ্গীত বা রবীন্দ্রনাথের গানের সুর। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে তাঁর কোনো কোনো নতুন লেখা টাটকা টাটকা শোনবার সুযোগও মাঝে ২ আমাদের হত। মনে আছে 'সঙ্গীতের মুক্তি'[১৩৩] তিনি প্রমথনাথের আমন্ত্রণে আমাদের শোনান, তার মধ্যে যতগুলি গানের টুক্‌রো আছে নিজে গেয়ে।

সুবেশ সুদর্শন সে সময়কার প্রমথনাথের চেহারা চোখের সামনে ভাসছে: ছিপ্‌ছিপে লম্বা, মাঝখানে সিঁথিকরা চুল তখনো বেশীর ভাগই কালো, বুদ্ধিদীপ্ত মুখচোখ, প্রশস্ত ললাট, মোটা কাঁচাপাকা গোঁফ, একের পর এক ৫৫৫ স্টেট এক্সপ্রেস্ সিগারেট খেয়েই যাচ্ছেন। সবুজসভার প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল তাঁর সহৃদয় ব্যবহার; প্রতি অধিবেশনের পূর্ব্বে নিজ হাতে নিমন্ত্রণলিপি লিখে পাঠাতেন। কলকাতায় থাকলে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যোগ ত রাখতেনই, বাইরে গেলেও চিঠিপত্র লিখে সে যোগ ছিন্ন হতে দিতেন না।

সবুজসভা ভেঙে যাবার পর ইদানীং তিনি আমাদের দু'চারজনের কাছে প্রায়ই আসতেন, এবং যখন যা লিখতেন ছাপাবার আগেই পড়ে শোনাতেন। তাই খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। লেখক হিসেবে প্রমথনাথকে যেমন অসামান্য মনে করেছি, মানুষ হিসেবেও তাঁকে তেমনি শ্রদ্ধা করেছি। যাঁরা তাঁকে ভাল ক'রে চিনতেন না, তাঁদের অনেকের কাছেই শুনেছি তিনি ছিলেন নাকি বুদ্ধিসর্ব্বস্ব একজন intellectual মাত্র। এ বিষয়ে অনেকদিন আগে প্রকাশিত একটি ইংরেজি লেখায় যা বলেছিলাম তার থেকে কয়েক ছত্র পড়ে আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব:

People have suspected Pramatha Chaudhuri of being a freak; they say he has dispensed with the heart and lives by intellect alone. If that were true, how should we explain his wonderful hold on the youth of Bengal? Orthodoxy of course was once furious with him, and still crooks out its curses from its broken citadels. But those who were young in the first days of *Sabuj Patra* and those also who are young to-day, love him just as much as they admire him. He is their friend and trusted counsellor. No heartless cynic could hope to be that, however dazzling his talents. Those who have come in close touch with him know how gentle and kindly is this ruthless foe of sham and cant; those who have not may yet discern in his writings the wells of emotion beneath his practised restraint.

সোমনাথ কলমের দু' চারটি সুষ্ঠু টানে বোধহয় অল্পের মধ্যে সবুজসভার ভিতরের সকলের এবং বাইরেরও অনেকের ওঁর সম্বন্ধে মনের কথা টেনে বের করেছেন; সে জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। লোকে বলে অন্যে আমাদের যে ভাবে দেখে, নিজেকে সেই ভাবে দেখতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু শুধু নিজে নয়, যারা সব চেয়ে কাছে থাকে সেই আপনার লোকই কি আমাদের ঠিক ভাবে দেখতে পারে? ছবির মত মানুষের কাছ থেকেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে তবে তাকে ঠিক দেখা যায়।

• পারিবারিক পরিচয় ছেড়ে দিলে, এ পর্য্যন্ত জীবনকথার মালমশলারূপে আমি বেশির ভাগ হাওয়াবদল এবং বাড়ীবদল কোন্ সালে কোথায় হয়েছে তারই ব্যবহার করেছি। কিন্তু কেবলমাত্র দেশ ও কাল নির্দ্দিষ্ট করলেই জীবনী রচনা হয় না, – তার মধ্যে পাত্রকেই প্রধান স্থান দিতে হয় – অর্থাৎ তার মনের উপর জীবনের নানাপ্রকার ঘটনার প্রভাব কি হল দেখানো। নইলে লোকে ভাববে কেবল ভিন্ন ২ বাড়ী ও দেশে ঘুরে বেড়িয়েই বুঝি জীবন কাটিয়েছি। অবশ্য আমি প্রথম থেকেই বলেছি যে আমার জীবন ঘটনাবহুল নয়; এবং দীর্ঘকাল ধরে নানা সমাজের নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং মেলামেশার সুযোগ ঘটলেও তাদের ছবি এঁকে লোকরঞ্জন করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু যে কারণেই হোক, যখন জীবনকথা লিখতে বসেছি, তখন তা শেষ করতেই হবে এবং ঘটনা ও মানুষের ছবি শুধু যে আঁকতে হবে তা নয়, নিজেকেও তার কেন্দ্রস্থলে দেখাতে হবে। সেইটেই সব চেয়ে মুস্কিল।

একটি একটি ঘটনার উপর পা ফেলে ২ যেমন বছর ২ এগিয়ে যাওয়া যায়,

তেমনি আবার এক একটি ঘটনা থেকে পিছিয়ে এলেও মধ্যবর্ত্তী পথ কতকটা আলোকিত হয়। ১৯৩২-এ সেইরকম দু'টি ঘটনা মনে পড়ে; এক হচ্ছে সুবীরের পাঁচ বৎসর পর ৩রা জুলাই বিলাত থেকে প্রত্যাবর্ত্তন, আর একটি হচ্ছে ঠিক সেই দিনই আমার নপিসিমা স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যু—বোধহয় ৭৫।৭৬ বৎসর বয়সে[১৩৪]।

আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথ (ওরফে সুরেন) সুবীরকে ১৬ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ আন্দাজ ১৯২১ খৃঃ-এ মায়ের আঁচল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রথমে শান্তিনিকেতনে ভর্ত্তি ক'রে দেন। সেখানে সে এল্মহার্স্ট সাহেবের[১৩৫] তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শ্রীনিকেতনে দিনকতক শিক্ষালাভ করে। পরে কোন্ সালে ঠিক মনে নেই কাশী এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দেন। মনে আছে জ্যোতিকামশায় যখন মারা যান—মার্চ্চ ১৯২৫—তখন সুবীরকে অত ভালবাসতেন বলে তাকে কিছুদিন আগে কাশী কলেজ থেকে আনানো হয়। সে যে তাঁর জীবনের শেষ কদিন কাছে থাকতে পেরেছিল, সেটা আমার একটা সান্ত্বনা রয়ে গেছে। মা'র ত চিরদিনই সুবীর অন্ত প্রাণ, সব জায়গায়ই তার খোঁজে ২ থাকতেন। তাই যখন কাশীতেও বিশেষ সুবিধে হল না, আর সুবীরের মন খারাপ দেখে তাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলেন তার বিলেত যাবার ইচ্ছে—তখন তিনিই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার ভার নিলেন।

প্রথমে কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হবার কথা হল, তারপর কতরকম হেরফের ক'রে শেষে ১৯২৭-এ সুবীর বিলেত যাত্রা করলে। তখম মা আমাদের ২০ নংয়ের ছোট বাড়ীতে আছেন: কারণ আগেই বলেছি বাবা কাকা দু'জনেই চলে যাবার পর আমরা আর তাঁকে একলা বিদেশে পড়ে থাকতে দিলুম না। এক হপ্তা সুবীরের চিঠি না এলে কিরম অস্থির হয়ে পড়তেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আর এখানে করব না; কারণ তাঁর ব্যস্তবাগীশ স্বভাবের পরিচয় কতকটা আগেই দিয়েছি। তিনি তখন নিজে পেন্সন্ পেতেন। তাঁর হিসেবপত্র শেষাশেষি আমিই রাখ-তুম; কিন্তু তখন নয়। তবে ঠাকুর এস্টেট তখন ওঁর হাতে ছিল বলে ঘুরে ফিরে সুরেনের কিছু টাকাও ওঁর হাতে আসত, এবং সবসুদ্ধ সুবীরকে বিলেতে বেশ ভালরকম মাসহারাই পাঠানো হত।

লেখাপড়ার দিকে সেখানেও সুবীর বিশেষ কিছু পাশ করতে পারল না বটে, তবে ততদিন বিলেতে থাকার দরুণ ইংরেজি বলতে কইতে বেশ শিখেছিল, নানা বিষয় চোখ কানও খুলে গিয়েছিল। খেলার মধ্যে table-tennis-এ ভাল ছিল, এবং দেশে ফিরে এসেও তার কতক অভ্যাস রেখেছিল। আর একটা গুণ তার ছিল যে, চট্ করে একটা অভ্যাস ছেড়ে দিতে পারত; যেটা খুব সহজ কাজ নয়। যেমন, বিলেতে যদিও সিগারেট খেত, কিন্তু ওর মা ভালবাসেন না বলে লিলুয়া স্টেশনে পৌঁছে সেই যে সিগারেট ফেলে দিল শুনেছি আর অনেকদিন খায় নি।

পরে অবশ্য সিগার ধরেছিল।

বেশ মনে আছে সুবীর প্রথমে বাড়ীতে নেমেই ওর মাকে কচি মেয়ের মত আড়কোলা ক'রে তুলে কেমন অবলীলাক্রমে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে গেল। তখন শরীরও যেমন সুগঠিত, চেহারাও তেমনি সুন্দর ছিল। সেই সুন্দর চেহারা দেখে অন্ততঃ একজন ত ভুলেছিল, যার সঙ্গে পরে বিয়ে হল। তখন সুহৃংরা লালবাংলার দোতলা ভাড়া ক'রে ছিল, তাই পরস্পর দেখাশুনার সুবিধেও ছিল। আর সুরেনরাও তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল, পাছে বিলেতের কোন মেমবন্ধুকে বিয়ে ক'রে বসে। কিন্তু পরের কথা পরে।

জোতিকাকামশায়ের মৃত্যু

জ্যোতিকাকামশায়ের শেষ সময়ে আমরাই কাছে ছিলুম। সুরেন কাজের হিড়িকে থাকতে পারেন নি, চলে গিয়েছিলেন। মা যদিও কাছে ছিলেন, কিন্তু ব্যামো যে কত গুরুতর হয়েছে তা বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি; নিয়মমত ঘরকন্নার কাজ ক'রে যাচ্ছেন। জ্যোতিকামশায় বরং এক আধবার বলতেন—মেজবোঠান আমার কাছে একটু বসেন না কেন! চিরদিনই আমাদের এই সব খাপছাড়া খেয়ালী ভাব দেখে ২ কি ক'রে আর সংসারজ্ঞান জন্মাবে?—তাই আজ এই দশা। সব পেয়েও সব হারাই। অথচ এক ২ জন সামান্য পেয়েও কিরকম শেষে গুছিয়ে নেয় দেখেছি।

জ্যোতিকামশায় যে কতদিন হার্ণিয়ায় ভুগছেন, সে জিনিষটা যে কি, তা পর্য্যন্ত মা জানেন। না একদিন শুনে আমি ত অবাক! আর তিনিও ঐ রোগ নিয়ে বছরের পর বছর কি ক'রে যে একলা ঐ পাহাড়ের উপর কাটিয়ে গেলেন;—একটা চাকর ডাকবার দরকার হলেও পাহাড়ের মাঝরাস্তার ছোট বাড়ী থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে তবে তাকে আনতে হত। এও আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। অথচ ঐ অন্ত্র বেরিয়ে পড়লে যে কত শীঘ্র কত সাংঘাতিক অবস্থা হতে পারে তা কি আর তিনি বুঝতেন না?—অথচ একলা থাকতে ত কোন ভয়ডর ছিল না। সে ঘণ্টা জাপান থেকে রবিকা এনে দিয়েছিলেন, তার চেহারা এখনো চোখে ভাসছে; আর শেষদিন বেলা ৫টা পর্য্যন্তও সেই ঘণ্টা নিজের হাতে বাজিয়েছেন, তার আওয়াজ এখনো কানে বাজছে;—অথচ ছ'টার সময় সব শেষ হয়ে গেল।

বুকে কাশি বসেছিল—চিরদিনই ত ওঁদের হাঁপানি কাশির ধাত। ভাল সাহেব ডাক্তারই দেখেছিল, কিন্তু কিছু করতে পারলে না। আমাদের দু'জন অনুগত লোক রাতদিন কাছে থেকে যথেষ্ট সেবা করেছিল। আর সেই শেষ পর্য্যন্ত রোগশয্যায় বসেও উপাসনায় যোগ দিয়েছেন, যেমন ওঁদের ভাইদের ধাত ছিল।

কতদিন পরে সেই ঘরে ঢুকে দেখেছি দেয়ালে টাঙানো তারিখ-পত্রে মার্চ্চ

৪ঠা এই তারিখটি তখনো মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে, কারণ যে হাতটি যত্নপূর্ব্বক রোজ তার সাক্ষ্য সত্য ক'রে তুলত, সে হাতটি সরে গেছে। গৃহবাসীর সঙ্গে গৃহও মৃত হয়েছে। নতুন কাকিমার[১৩৬] একটি নিজ হাতে আঁকা পেন্সিলের ছবিই সেই ঘরের একমাত্র সজ্জা ছিল। এঁরাই ছিলেন অধুনা কালের ঋষিতুল্য।

সেবাধাম

জ্যোতিকামশায়ের উইলে গগনদাদাকে তাঁর সব আঁকবার খাতা দিয়ে যান; সেগুলি আমিই বাক্সতে গুছিয়ে তাঁদের পাঠিয়ে দিই। অবশ্য তাঁর অবর্ত্তমানে অনেক নষ্টও হয়েছে; অবশেষে বিঃ ভারতী কিনে নিয়েছে[১৩৭]। সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ও বাজনার বই আমাকে দিয়ে যান। আমিও নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তার যথোচিত যত্ন করতে পারি নি।

তবে তিনি যে জমিটুকু মোরাবাদীর রাস্তার উপরে কুয়ো খোঁড়াবার জন্য কিনেছিলেন ও বাড়ী তৈরি করতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাঁরই ব্যাঙ্কে জমা টাকা দিয়ে সে-বাড়ী শেষ ক'রে তাঁরই নির্দ্দেশমত ঐ অঞ্চলের গরীব আদিবাসীদের হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণার্থে 'সেবাধাম' নাম দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করি তাঁরাও সেই নির্দ্দেশ পালন ক'রে চলেছেন। আমরাও বহুকাল রাঁচি-ছাড়া। তবে যতদিন যাতায়াত ছিল, দেখেছি তাঁরা বেশ সুন্দর ক'রে বাড়ীবাগান সাজিয়ে রেখেছেন, এবং গরীবের চিকিৎসার সঙ্গে রাঁচির ভদ্রলোকদের জ্ঞানপিপাসাও মেটাবার ব্যবস্থা করছেন।

কত দুর্দ্দৈব, কত ভাগ্যবিপর্য্যয়, ঘটনাচক্র ও জীবনের পট-পরিবর্ত্তনের পর আজও (১।১০।৫৪) শ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামিজীর সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন অটুট রয়েছে। বুবুকে[১৩৮] এখনো খুব স্নেহ করেন ও পত্রদ্বারা খোঁজখবর নেন, যদিও দেখাশুনা কমই হয়। আমরা সেবাধাম তাঁদের হাতে দেবার পর কিছুদিন মাসহারা দিয়েছিলুম. কিন্তু বেশী নয় ও বেশিদিনের জন্য নয়। তারপর থেকে তাঁরা নিজের মতে ও নিজের পথেই চালিয়েছেন। এবং ওখানকার ভক্তের দানেও তাঁদের অনেক উপকার হয়েছে। তাঁরা ভাল টালি দিয়ে ছাত ক'রে দিয়েছেন; সামনে একটা চিঠির বাক্স বসিয়ে দিয়েছেন, বাগানের রাস্তায় কাঁকর ফেলিয়ে, বসবার জন্য বিলিতী মাটির চবুতারা ক'রে দিয়েছেন। এমন কি বাগানের শেষে (জমিটা একটু লম্বা সরুঙ্গে গোছ ছিল, ভক্তরা স্বামীজির নির্জ্জনবাসের জন্য একটি ছোট পাকা ঘর পর্য্যন্ত ক'রে দিয়েছেন। আমার পুরণো চাকর ননী একদিন দেখে এসে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, স্বামীজি পেস্তাবাদামাদি দামী ২ জিনিষ বেশ রসেকষে খাচ্ছেন! বিবেকানন্দ স্বামীজী যে হিন্দু ধর্মকে kitchen religion বলে খোঁটা দিয়েছিলেন, সে অপবাদ ঘোচাবার জন্য

তাঁর শিষ্যরা বদ্ধপরিকর।

আমার অনেকদিন থেকে সাধ আছে—কিন্তু কোন্ সাধই বা পূর্ণ হয়?—যে শান্তিধামের পাহাড়ের বাড়ীতে জ্যোতিকামশায়ের ঘরের সামনে, মন্দিরে যাবার রাস্তার মুখে, তাঁর একটি শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি বসানো হয়। তার নমুনা পর্য্যন্ত 'প্রবাসী' পত্রিকায় দেখে রেখে দিয়েছি। আর নীচে সত্যধাম বাড়ীর বাগানে একটা উঁচু ঢিবিমত আছে, তার উপর তেমনি বাবার একটা শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি রাখা হয়। বাড়ীর নামটা তাঁরই ইচ্ছায় 'সত্যধাম' দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আর বেশিদূর এগোবার সাধ্য আমাদের কারো নেই। কোনকালে যদি তাঁদের বংশধরদের হয়। কিন্তু সে তো আর আমরা দেখতে আসব না; তাই মনের ইচ্ছে মনে রেখে এই খানেই তাঁদের সভক্তি প্রণাম জানাচ্ছি। তা ছাড়া সত্যধাম ত হাতছাড়া হয়ে গেছে; শান্তিধামেরও প্রায় সেই অবস্থা। তাঁরা দুই ভাই যথেষ্ট ভোগ ক'রে গেছেন, বহুকাল সেখানে শান্তিতে কাটিয়েছেন, এইমাত্র সান্ত্বনা। এখন আমার বড় ভাসুরের একমাত্র মেয়ে অশোকা[১৬৯], এবং তাঁর ছোট ছেলে দেবকুমার ওখানে বাড়ী ক'রে রাঁচি সহর ও মোরাবাদী সহরতলীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র টেনে রেখেছে। আজও শান্তিনিকেতনের স্বচ্ছ জ্যোৎস্নারাত্রি দেখলে রাঁচির শুক্লপক্ষের তুলনা মনে আসে—কলকাতা সহরের ইটকাঠের দংষ্ট্রাখণ্ডিত ধূলিধোঁয়ামণ্ডিত আকাশে বাতাসে যা স্বপ্নাতীত দুর্লভ। তবু রাঁচি পরদেশ, কলকাতা আমাদের দেশ; তার নিন্দে করব না। অনেক অন্নজল খেয়েছি। সেখানেই বেড়াতে গেছি, হাবড়া স্টেশনে ধীরমন্থর গতিতে যখনি ট্রেন ঢুকেছে তখনি মনে হয়েছে বাড়ী এসেছি এবং স্টেশনে দু' একটি প্রিয় পরিচিত মুখ দেখে আশ্বস্ত হয়েছি। আবার এদিন উদ্বাস্তু-অধিকৃত স্টেশন দেখে নিজেকেও সেই একজন বলে কল্পনা ক'রে শান্তিনিকেতনের শান্তিক্রোড়ে ফিরে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। বিচিত্র মানুষের মন ও জীবন।

বুবুর বিয়ে

১৯৩৩ খৃঃ র ডিসেম্বর মাসে আমার বড় ভাইপো সুবীরের সঙ্গে সুহৃৎ-এর ছোট মেয়ে পূর্ণিমার শুভবিবাহ হয়। আগেই বলেছি লালবাংলা নামক আমার দাদার বাড়ীর উপরনীচে দুই তলায় দুই পরিবার থাকার দরুণ তাদের মেলামেশা আলাপপরিচয় করবার সুযোগ ঘটেছিল। তার কিছুদিন আগেই বোধহয় সঞ্জীবের বিয়ে হয়, ময়মনসিংহের এক দাসপরিবারের মেয়ের সঙ্গে। সেও নিজে দেখেশুনে পছন্দ ক'রে স্থির করেছিল। মেয়েটি সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা, এবং সুগৃহিণী। সকলেরই খোঁজ খবর করে, বড় বউয়ের যেমন হওয়া উচিত। পরে নলিনী যোড়াসাঁকোর ও-বাড়ীর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে নিজের ছোট ছেলে রাজীবের (ওরফে বেটুর) বিয়ে দেয়।

বুবুর বিয়ে সেজঠাকুরের বাড়ী হয়। ওদের সম্পর্ক একটু ঘনিষ্ঠ – অর্থাৎ সুবীর এবং নলিনী (বুবুর মা) দুই খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলেমেয়ে বলে – সুবীর আমাদের বিশেষ বন্ধু হিন্দু আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয়ের পরামর্শ নিয়ে বিবাহ রেজিষ্ট্রী করে গৌর বিল অনুসারে। আদি সমাজের বিয়েতে রেজিষ্ট্রী করা এতদিন মহর্ষির মত ছিল না এই জন্য যে, ১৮৭২-এর ধারা অনুসারে বলতে হত, 'আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই' ইত্যাদি; অথচ মহর্ষির বিশেষ ইচ্ছা যে আদিব্রাহ্ম-সমাজের বিয়ে মূর্ত্তিপূজা বাদে হিন্দু বিয়ে বলেই চলে। গৌর বিলে অবশ্য এখন এ অস্বীকারোক্তি করতে হয় না। সুরেনেরও হয়ত অন্য কারণে রেজিষ্ট্রীতে তেমন মত ছিল না, কিন্তু ছেলেরা যা করতে চাইত উনি ত কখনো তা'তে 'না' বলতেন না।

আর একটা নতুনত্ব বুবুদের বিয়েতে এই হয়েছিল যে, আমাদের সমাজের বাঁধা পুরোহিত কাউকে পাওয়া গেল না, অগত্যা আমরা দুই স্ত্রী-পুরোহিত খাড়া করতে বাধ্য হলুম – হেমলতা বোঠান এবং সরলাদিদি। ইন্দুদিদির যেমন কাজ, সেই সভার মধ্যেই আস্তে ২ আমাকে বলছেন, – 'ও বুড়ি দুটো কে?' – সেজঠাকুরের লাইব্রারি ঘরের আলমারি ভাল ২ সাড়ী দিয়ে ঢেকে, তার উপর গাঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে আমরা সাধ্য মত ঘরটাকে বিবাহ-সভা রূপে সাজিয়েছিলুম। গান কি ২ হল ও কে গাইল মনে নেই, তবে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নি নিশ্চয়। সেজঠাকুর সম্প্রদান করলেন। তখন কে জানত এত শীঘ্র তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

পরদিন সকালের প্রধান দৃশ্য মনে আছে মঞ্জু জয়ার[১৪০] বালুচরী সাড়ী পরে সেজেগুজে দাদার বউকে নিতে আসা। আর বুবুর মায়ের গলা জড়িয়ে মা-মেয়ে দু'জনেরই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসানো। যদিও তার শ্বশুরবাড়ী মানে বাপের বাড়ীর সামনা সামনি এক বাড়ী। তবু বাপ মায়ের অধিকার ছেড়ে চলে যাওয়া ত – সেইটেই হল আসল কথা! এইরকম ক্ষেত্রে বর এবং বরপক্ষকেও বিচলিত হতে দেখেছি; যেন কি একটা অন্যায় কাজ করছে।

বুবুর বিয়ের সময় আমরা সেজবাড়ী উঠে গিয়েছি কি না ঠিক মনে করতে পারছিনে। কিন্তু নাও গিয়ে থাকি ত তার অল্পদিন পরেই গেছি। কারণ ঐ সময় থেকেই আমাদের আর্থিক অধোগতি হয়ে আসছিল তা আগেই বলেছি, এবং তার কারণও দেখিয়েছি যে, ওঁর সব ঋষিবরী গিয়ে একমাত্র ল-কলেজের অধ্যাপনায় উপার্জ্জন এসে ঠেকেছিল, তার সামান্য আয়ে সংসার চলা সম্ভব ছিল না। তাই ২০ নং মে ফেয়ারের ছোট বড় দুই অংশই ভাড়া দিয়ে নিজে অন্যত্র সরে পড়তে হল। এবং যখনি এরকম পরিস্থিতি, অর্থাৎ নিজের বসতবাড়ী ভাড়া দিতে হয়েছে, তখনই সেজবাড়ী মুক্তদ্বারে আমাদের আদর ক'রে স্থান দিয়েছে। কিন্তু মা'কে ত আমার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেতে পারিনে, – তাঁর কিছু

না থাকলেও একটা মানসম্ভ্রম ত আছে। তাই এতদিন পরে তাঁকে নিজের ছেলের বাড়ী লালবাংলায় যেতে হল। ধর্ম্মতঃ সমাজতঃ সেইটেই তাঁর আসল স্থান, এবং সেইখানেই বছর আস্টেক পর তিনি প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করলেন। যদিও বিধির বিধানে তাঁর একমাত্র পুত্র আগে গেলে[ন]।

আমাদের ২০ নং মে ফেয়ারের যৌথ জীবনযাত্রার মধ্যে মায়ের অসুস্থতার স্মৃতিই বেশি মনে জাগে। বয়স ত ক্রমেই বাড়ছিল। হাজার সুস্থ সবল শরীর থাকলেও—(মা ওঁদের ছিল বলেই আমরাও কিছুটা পেয়েছি) একটা কোন উপসর্গ হয়ে ক্রমে ভাঙ্গতে ত আরম্ভ করবে। ওঁর পেটে একটা ব্যথা হত বলে মনে আছে, তার জন্য আমাদের এক খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আত্মীয় অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করেছিলেন, এবং অনেক দূরে তাঁর বাড়ী থেকে লোক পাঠিয়ে পথ্যের জন্য নানা গাছগাছড়া আনতে হত। মামার বাড়ীর পুরণো দাসী গোলাপ অনেকদিন তাঁর সেবা করেছে, এবং তার বোন আতর ত শেষ পর্য্যন্ত ছিল।

এখন যেন চাকর দাসী কেউ পুরণো হতে চায় না, ভেসে ২ বেড়ায়, আজ এখানে কাল সেখানে। সে বিষয়ে আমার ভাগ্য ভাল। ননী বলে অতি কর্ম্মক্ষম বুদ্ধিমান এক চাকর ত্রিশবত্রিশ বৎসর আমাদের কাছে ছিল এবং অকালে যমে না নিলে বোধহয় আজও থাকত। মাখন ব'লে এক ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ ড্রাইভর প্রায় যতদিন আমাদের মোটর ছিল ততদিন ছিল (১৫।২০ বৎসর ?), তারপরে নিতান্ত গাড়ি রাখতে পারলুম না যখন, বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল। গোফুর বলে একজন খানসামা ঐরকম বহুকাল ছিল,—নিতান্ত যখন হিঁদু মুসলমান দুই হেঁসেল রাখতে পারলুম না, তখন বাধ্য হয়ে তাকে বিদায় করতে হল। ইচ্ছেপূর্ব্বক কেউ ছেড়ে যায় নি, এইটুকু নিজেদের হয়ে বলতে পারি। ওঁর ত মুখে কথাই ছিল না। আর আমিও বোধহয় খুব খারাপ মনিব ছিলুম না। এ বিষয় প্রতিভাদিদি (আমার বড় জা) বেশ বলতেন যে—নঠাকুরপোদের ত সংসার করতে হয় না, তাই চাকরদের বকাবকি না করে বেশ সুনাম কেনেন ; কিন্তু আমরা যারা সংসার চালাই ওদের সঙ্গে বকাবকি করতেই হয়, তাই আমাদের নাম খারাপ হয়। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

এই দীর্ঘ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বিবাহিত জীবনের মধ্যে ওঁকে দু'বার মাত্র রাগ ক'রে চাকরদের গায়ে হাত তুলতে দেখেছি। একবার বোধহয় ননীর এক গুণধর দাদা শশী যখন মদ খেয়ে বদিয়তি করেছিল, তাকে একটা চড় মেরেছিলেন। আর একবার আমাদের ২০ নংয়ের বড় বাড়ীর ভাড়াটে মেম-সাহেবের সঙ্গে মালী কি অসভ্যতা করেছিল শুনে তিনি গম্ভীরভাবে লাঠি হাতে ক'রে ছোট বাড়ীর একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের সব সরিয়ে দিলেন আর মালীকে ডেকে পাঠিয়ে তার পিঠে দু'ঘা লাঠি কষিয়ে দিলেন। সেটা

আমার মনে হয় কতকটা 'token-cut'-এরই মত ; অন্ততঃ ওঁর ভাইদের হাতের মারের তুলনায় নগণ্য, যেরকম গল্প শুনেছি। যদিও মালীটা পরদিন বল্লে সে কোমরের ব্যথায় উঠতে পারছে না। অবশ্য আমি ছোট ছেলে বা চাকরবাকরের গায়ে হাত তোলা মোটেই পছন্দ করিনে, কারণ ওরা আমাদের তুলনায় এত অসহায় যে ন্যায়যুদ্ধ বলে মনে হয় না। এক পাশ্চাত্য কোন ২ দেশে যেরকম শুনেছি, চাকরদের কড়া কথা বল্লে তারাও ফস্ ক'রে ছোরা বের ক'রে উঁচিয়ে ধরে, সে ক্ষেত্রে অবশ্য সমানে ২ লড়ালড়ি চলতে পারে, —যাকে ভাষায় বলে 'তুম্ ভি মিলিটারি, হাম্ ভি মিলিটারি !' – কিন্তু যাই হোক, আমাদের মত একেলে হিন্দু রমণীর ধমনীতে সে উষ্ণরক্ত প্রবাহিত হয় না যাতে ক'রে মানুষ-মর্দ্দিনী হতে পারি। বোধহয় এতদিন বিজাতীয় পদদলিত পর্দ্দানশীন থেকে ২ গায়ের রক্ত জল হয়ে গেছে। যে-কারণেই হোক, ঝাঁসির রাণীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তির চেয়ে একালে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস বাণীই আমাদের মনকে বেশি টানে।

আর একটি জিনিষ মনে পড়ে মায়ের জীবনী[১৪১] ঐ ২০ নং মে ফেয়ারেই লিখতে আরম্ভ করি। অন্য অনেক বিষয়ে যেমন এটাও তেমনি বেশি দেরিতে আরম্ভ করেছিলুম, আরো আগে হাত দিলে ভাল হত। দিনু এবং রমাই এ বিষয়ে আমাকে প্ররোচনা করেছিল ; বলত – বিবিপিসি, তুমি মেজদিদির জীবন লিখে নাও না কেন ? কত মেয়ে ত বাপমায়ের বড় ২ জীবনচরিত লিখেছে দেখতে পাই। আমরাই কোন কর্ম্মের নয়। তবু যে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে এটুকুও লিখে নিতে পেরেছিলুম, অর্থাৎ আমরা মানুষ হবার পর পর্য্যন্ত তাই যথালাভ মনে হয়। কারণ তার পরের ঘটনা ত আমাদের অনেকটা সমসাময়িক জ্ঞানগোচরের মধ্যে পড়ে।

ওঁর ত একবার এই বাড়ীতে সঙ্ঘাতিক রোগ হয় – অর্থাৎ হার্ণিয়ার যাকে বলে strangulation। অন্যান্য দু' একবার হলেও সুহৃৎ-এর পরামর্শমতে বরফ দিতে ২ আপনিই মিলিয়ে যেত। কিন্তু এবার তা হচ্ছে না দেখে ডাঃ মৃগেন মিত্রকে[১৪২] ডেকে পাঠানো হল। আশ্চর্য্য তিনি সিঁড়ি দিয়ে যেই উঠছেন, আর ঠিক সেই সময় হার্ণিয়া নেবে গেল, বাঁচা গেল। তাঁকে আর কিছুই করতে হল না। আরো ক'বার ওঁর ঐরকম হার্ণিয়া ওঠা নিয়ে ভুগতে হয়েছিল ; যদিও ওটা তাঁর শেষ রোগ নয়। সর্ব্বদাই হাতের কাছে আপনার লোক ভাল ডাক্তার থাকা যে কত সৌভাগ্যের বিষয় এখন তাই ভাবি। যদিও তারা ধন্বন্তরি নয় যে সকলকে বাঁচাবে, কিন্তু যত্নচেষ্টা ত যথাসাধ্য করে, সেইটেই হল আসল।

আমার বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ী দুই পরিবারই বৃহৎ, কাজেই কবির কথায় 'ফেলিয়া লোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় ২।' ২০নং মে ফেয়ারের ছোট বড় দুই বাড়ীতে মিলে অনুমান ১০।১২ বছর ছিলুম (১৯২১-১৯৩৩ ?) – পিছিয়ে দেখতে গেলে মনে হয় এর মধ্যে অনেক পরমাত্মীয়কে হারিয়েছি। এক জীবনের

জালে যারা জড়িত তারা চলে যাবার সময় আমাদের জীবনেরও কিছু ২ অংশ সঙ্গে নিয়ে যায়, এমনি ক'রে ক্রমে ২ সবটা ক্ষয়ে যায়। এক একটা বাড়ীই যেন কৌটার মত জীবনের এক একটা অধ্যায় ধরে রাখে, এ-কথা অন্য ক্ষেত্রেও বলেছি।

আমার দেশ ব্যাখ্যান

আবার এই বাড়ীতেই আমাদের যা বংশের ধারা, গানবাজনা, সভাসমিতি, অভিনয় তারও কোন কমতি ছিল না। বাবা যাবার পর তাঁর নামে একটা সভা সমিতি করলুম, তার ।০ [চার আনা] ক'রে চাঁদা ধার্য্য হল। তাতে পাড়ার সব আত্মীয় ছেলেপিলে এসে হপ্তায় একবার ক'রে মিলিত হয়ে কোন ভাল বিষয় পড়াশুনা ইত্যাদি করত। সেটা বেশিদিন না টিকলেও, সেই সূত্রে আমার মাথায় 'আমার দেশ ব্যাখ্যান' নামক এক বই প্রকাশ করবার যে কল্পনা উদয় হয়েছিল, সেটার কিছু সুফল ফলে নি তা নয়। আমার কল্পনা ছিল এই যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রধান ২ জ্ঞাতব্য বিষয় – যথা ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদি – বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে এমন সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে লেখানো হবে যাতে সব বইটা পড়লে স্ত্রীলোক ও বালকদের মনে সমগ্র স্বদেশ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হতে পারবে। বারোটা বিষয় নির্ব্বাচন ক'রে প্রত্যেকটার বিশেষজ্ঞ লেখকের নাম পর্য্যন্ত লিখে রেখেছিলুম ; এখনো সে ফর্দ্দ আমার কাছে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওঁকে দিয়ে 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি'[১৪৩] (এখনো সেটা ওঁর একটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বলে ধরা হয়) লেখবার পরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে ইতিহাস লেখাবার চেষ্টা করতে গিয়ে শুনি যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। সেই যে বাধা পড়ে গেল, অনেকদিনের মত জিনিষটা সেইখানে দড়কচা হয়ে পড়ে রইল। তারপরে আমার প্রথম কল্পিত অনেক লেখক যখন পরলোকগত হলেন, তখন আর এক লোকে, বহুকাল পরে আবার কল্পনাটা কতক কার্য্যে পরিণত হয়েছিল তাও সম্পূর্ণভাবে নয়।

অর্থাৎ বহুকাল পরে যখন জাপানী বোমার ভয়ে ১৯৪১-এর শেষে শান্তি-নিকেতন পালিয়ে আসি তার কিছুদিন পরে এক মহিলা-সমিতি[১৪৪] স্থাপিত হয়। এবং তার অধিবেশনে সেই পূর্ব্বকল্পিত 'আমার দেশ ব্যাখ্যান' একে ২ পড়বার কথা শুনে বন্ধুবর ৺কান্তিচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, এখানেই ত আপনার সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত করবার উপযুক্ত লোক সব রয়েছেন, আমি ঠিক ক'রে দেব। এবং তাঁর উৎসাহ ও সাহায্যে সত্যই পর ২ অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ বক্তা মহিলা সমিতির কাছে অনুগ্রহ ক'রে ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার মত উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে যে বলছি সম্পূর্ণভাবে হয় নি, তার মানে আমার যে ইচ্ছে ছিল প্রত্যেক বক্তৃতাটি লিখে নিয়ে পরে 'আমার দেশ ব্যাখ্যান'

নাম দিয়ে একত্র ক'রে একটা বই ছাপানো হবে, সে কাজটি প্রত্যেক বক্তাকে দিয়ে করিয়ে উঠতে পারলুম না ; সকলে নিজের ২ কাজ নিয়েই ব্যস্ত। যদিও আমি প্রত্যেকের ভাষণের সঙ্গে ২ অনুলিখনের ব্যবস্থাও করেছিলুম, তবু শেষটা তাঁরা দেখে না দিলেও ছাপানো যায় না। সে অবসর বা অধ্যবসায় তাঁদের সকলের মধ্যে পেলুম না ; তবে দুএকজন একেবারে লিখে এনে পড়েছিলেন। তাঁদের সে লেখা বোধহয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের[১৪৫] গ্রন্থমালার অন্তর্গত হয়ে গেছে। ইতিহাস, ধর্ম্মসম্প্রদায়, জাতি, সঙ্গীত, শিল্প সাহিত্য ও দর্শন – এই ক'টা বিষয় বোধহয় বলা হয়েছিল ; যদিও সব লেখা হয় নি।

কথাটা যখন উঠলই, তখন এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের সম্পাদিকা মমতা সেন আমাকে প্রফুল্ল ঘোষের একটা বই দেখালেন, যাতে তিনি জেলে বসে ২ ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে অবিকল আমায় কল্পনামত রচনা লিখেছিলেন – ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি। দেখে ভারি খুসি হলুম। কেবল তফাতের মধ্যে তিনি হিন্দু আমল থেকে আরম্ভ ক'রে মুসলমান আমল পর্য্যন্ত এনে শেষ ক'রে দিয়েছেন ; আর আমার পরিকল্পনা স্বাধীনতালাভ পর্য্যন্ত টেনে এনেছিল।

জ্যোতিঃ সভা

জ্যোতিকামশায় ১৯২৫ খৃঃ-এ আমাদের ছেড়ে চলে যান, তা আগেই বলেছি। তাঁর যাবার পরেও জ্যোতিঃ-সভা নাম দিয়ে আর একটা সমিতি করেছিলুম, তাতে বেশির ভাগ গানবাজনা হত। একবার জয়াকে[১৪৬] শরৎলক্ষ্মী সাজিয়ে তার চারদিকে ঘুরে ২ ছোট রঙীন লাঠি বা 'টিপ্‌রি' নিয়ে 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি ছেলেদের দিয়ে গাইয়েছিলুম মনে আছে। এই টিপ্‌রি-খেলা আমি বম্বে থাকতে কির্লোস্কার নাট্যসম্প্রদায়ের কাছে দু' একরকম শিখেছিলুম, হয়ত আগে বলেছি। তারপর ত কত মাদ্রাজী স্কুল প্রভৃতিতে 'কোলাট্টম' বলে ঐরকম লাঠিনৃত্য দেখেছি। ছেলে ও মেয়েকে গোপ-গোপী সাজিয়ে সেই মামুলী রাসলীলারই রূপান্তর বলে মনে হয়। আবার উপর থেকে দু' রঙের কাপড় ঝুলিয়ে এক ২ ফালি বাঁ হাতে ধরে ঘুরতে ২ বিনুনির মত হয়ে যায়, আর উল্টোদিকে ঘুরলে বিনুনিটা খুলে যায়। কতকটা বিলিতী Maypole dance-এর মত।

মোদ্দা কথা, আদিম মানবের শারীরিক ক্ষুধাবোধ ও মানসিক সৌন্দর্য্যবোধ যে দুই প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে তৃপ্তিলাভ করে, যথা নতুন ধান্য এবং নতুন পত্রপুষ্পের উদ্গম – সেই দুই উপলক্ষ্যে বোধহয় সমস্ত পৃথিবীময় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানুষে একটা-না-একটা উৎসব পালনপূর্ব্বক আনন্দপ্রকাশ ক'রে থাকে। মঞ্জু ওরা নিজে থেকেই বর্ষার গানের সঙ্গে অল্পস্বল্প নাচবার যে চেষ্টা

করত, সে বোধহয় শান্তিনিকেতনেরই প্রভাবে। কারণ অনেক ছোটবেলাতেই সেখানে গিয়ে থেকেছে, পড়েছে—ওদের ১৯ নং স্টোর রোডের বাড়ী যুদ্ধের চড়া বাজারে বিক্রি হয়ে যাবার পর থেকে। 'ফাল্গুনী' যখন যোড়াসাঁকোয় প্রথম হয়,[১৪৭] তখন ওরা প্রকৃতির অংশ গ্রহণ করেছিল। যদিও আমরা যে হাবভাব শিখিয়েছিলুম, রবিকা তাকে 'ডায়সিসনের নাচ' বলে ঠাট্টা করতেন। আমরা সেই অতি ছেলেবেলায় একবার, তারপরে মাঝে এক আধবার শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসে শেষে এই বুড়োবয়সে ভাঙা হাটে বাসা বাঁধতে এসেছি।

সেজঠাকুরের মৃত্যু

বুবুর বিয়ের শুভকর্ম্মের আনন্দের রেশ ফুরোতে না-ফুরোতেই অকস্মাৎ আমাদের পরিবারের উপর এক বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। সেজঠাকুরের শিকারী খ্যাতির কথা আগেই বলেছি। বয়সের সঙ্গে ২ সে নেশা সমানই থাকলেও শরীরের শক্তি যে সমান থাকে না, সে কথা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় না। শুনেছি এই সময় ম্যাণ্টন কোংয়ের ওখানে বন্দুক কিনতে গিয়ে তিনি নাকি একদিন সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এই সব কারণে আত্মীয় স্বজন তাঁকে এই পরিশ্রম ও বিপদসঙ্কুল ব্যসন থেকে বিরত করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যুক্তি পরামর্শেই যদি বশ হয় তবে লোকে নেশা বলবে কেন। তিনি জনকয়েক শিষ্যস্থানীয় যুবাবন্ধু নিয়ে উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি রাজার ওখানে শিকার অভিযানে গেলেন।

সেজদি আবার সেই অবসরে—বোধহয় মার্চ মাসের শেষাশেষি ছেলেমেয়ে নিয়ে মোটরে ক'রে রাঁচি সফরে বেরলেন। আমরা তখন তাঁদের বাড়ীতে এবং নলিনীরা আমাদের বাড়ীতে। ১লা না ২রা এপ্রিল নলিনী আমাকে ডেকে পাঠালে। আমি কার সঙ্গে হাসতে ২ গল্প করতে ২ তার ওখানে গেলুম। সেই ছোট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-না-উঠতে নলিনী কাঁদতে ২ বল্লে যে—সেজদির সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। তারপর শুনলুম যে আমাদের পারিবারিক বন্ধু ব্যারিস্টার হরিদাস বসুর কাছে কালাহাণ্ডি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে যে সেজঠাকুরের বাঘের হাতে প্রাণ গিয়েছে।

তিনি সুহৃৎ-দের খবর দিয়েছেন, এবং রাঁচিতে মেজঠাকুর ছিলেন, তাঁকে তার করেছেন সেজদিকে বলতে। মেজঠাকুর আর ও-কথা কি ক'রে বলবেন, তাই সেজদিদের বলেছেন যে কুমুদের খুব সাঙ্ঘাতিক accident হয়েছে। তাই শুনে তাঁরা তাড়াতাড়ি ক'রে ফিরে এলেন, সেদিনের কথা কখনো ভুলব না। সন্ধ্যা-বেলা সেজদিদের মোটর যখন পৌঁছল, নলিনী আমি সব সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। সেজদি নেমেই একবার এদিক ওদিক চাইলেন; মনে হয় ভাবলেন হয়ত সেজঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় নীচের কোন ঘরে শুয়ে আছেন। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বল্লুম না বলে হয়ত কিছু বুঝেছিলেন, ঠিক জানিনে। তারপরে নলিনী

তাঁকে ধরে ২ উপরে নিয়ে যেতেই নিজের ঘরের বিছানায় মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন। ছেলেরা নীচেই কান্নাকাটি করতে লাগল। এমনি ক'রে সে রাত কাটল।

পরদিন সকালে সঞ্জীব ছেলেদের স্টেশনে নিয়ে গিয়ে তাঁর দেহসহ বাক্স লরি ক'রে নিয়ে এসে গাড়িবারান্দায় নাবিয়ে রাখলে আমরা সব সেজদিকে নিয়ে নেমে গেলুম। সে কি করুণ দৃশ্য। বন্ধুবান্ধবও কেউ ২ উপস্থিত ছিলেন। সেজদি 'তোমার জিনিষ তুমি নাও' বলে হাতের চুড়িগুলি খুলে বাক্সে ফেলে দিলেন। দেখলুম তাঁকে চিৎ ক'রে শুইয়ে রেখে দিয়েছে, যেন ঘুমচ্ছেন। কিন্তু পরে শুনলুম তিনি আহত বাঘকে অনুসরণ করায় (যে-কাজ করতে মুখে ও লিখে সকলকে বার ২ বারণ করেছেন) বাঘটা তাঁকে সম্ভবতঃ পিছন থেকে টেনে শুইয়ে ফেলে খুব আহত করেছে, ডাক্তাররা অনেক কষ্টে ঠিকঠাক ক'রে তবে পাঠিয়েছে।

তারপর আর কি?—সেই দিনের পর দিন আত্মীয়বন্ধুর আসা-যাওয়া, সেই এক কান্নাকাটি,—যা হয়ে থাকে। তাঁর বয়স বোধহয় ৬৭ হয়েছিল—১৮৬৭-১৯৩৪। তাঁর স্মৃতিস্বরূপ ছেলেমেয়েকে পত্রচ্ছলে লেখা ইংরিজী শিকারকাহিনী এবং প্রিয়ম্বদা দেবী-কৃত তার অনুবাদ 'ঝিলে জঙ্গলে'[১৪৮] বই দু'খানি রয়ে গেছে।

জন্ম মৃত্যু বিয়ে এই তিন নিয়ে জীবন যে বলে, সে-কথা স্থূলভাবে দেখতে গেলে ঠিকই, তবে সেগুলি জীবনযাত্রার পথচিহ্ন হলেও তার মধ্যেকার পথ চলার অংশেরও ছোট বড় অনেক খবর দেবার থাকে; নইলে জীবনীই বা লেখা হবে কি ক'রে—যদি নিতান্ত লিখতেই হয়। সেদিন দেখলুম একজন লেখকের পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচক একটা অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন 'মানস জীবন'। আমার সে পদার্থটা কম বলেই আমার বিশ্বাস, তাই এই তথাকথিত জীবনী অকিঞ্চিৎকর (অন্ততঃ পাঠকের পক্ষে) ঘটনাবলীর বিবরণীতেই পর্য্যবসিত হয়। যাকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রসভায় বলে প্রতিবেদন।

দূর থেকে পিছিয়ে দেখতে গেলে স্মৃতিফলকে সেই ঘটনারই ছবি পড়ে যা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে উল্লেখযোগ্য; এবং দুঃখের বিষয় দীর্ঘজীবনে আত্মীয়-বিয়োগই অনেকটা স্থান অধিকার করে, বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং বড় পরিবারে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যেমন উপরি ২ কতকগুলি শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল, চতুর্থ দশকেও কতকটা তাই। কোন্ দশকেই বা কম তা ত জানিনে।

১৯৩২-এ স্বর্ণপিসিমা গেলেন, ১৯৩৪-এ সেজঠাকুর, ১৯৩৫-এ ভাগ্নী প্রিয়ম্বদা, ১৯৩৬-এ তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবী। ঐ বুড়ো বয়সে মায়ের আগে মেয়ে চলে গেল, সেইটেই দ্বিগুণ দুঃখের বিষয়। কিন্তু মহাকাল ত কালাকাল মানেন না।

আমাদের দেশের চলতি কথায় বলে যার যতদিন আয়ু তার বেশি তাকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। যদিও এতে 'যে যখন যায় সে যায়'-এর বেশি কিছু বলা হল বলে আমার কোনদিনই মনে হয় নি।

ছেলেপিলে না থাকলে দীর্ঘজীবী লোকের পরিত্যক্ত গৃহস্থালীয় শেষকৃত্য মেটানো যে কি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার তা ঠাকুরঝি প্রিয়র জিনিষপত্রের বিলিবন্দেজ করতে গিয়ে ঠেকে শিখেছিলুম। আমার ছোট জা প্রমীলা ও আমি স্বেচ্ছায় এই কর্ত্তব্যভার তুলে নিয়েছিলুম; বাড়ীও সব কাছাকাছি ছিল বলে সুবিধে। যে ২ বিষয়ে তাঁদের লিখিত ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে গিয়েছিলেন তার মিটমাট করা বরং সহজ ছিল। কিন্তু দু'জনেই লেখিকা ছিলেন বলে কাগজপত্র-বই লেখা প্রভৃতি এত জমেছিল যে তার ব্যবস্থা করতে বেগ পেতে হয়েছিল। কক্ষচ্যুত হলে জড়পদার্থ এক বিষম বোঝা হয়ে ওঠে।

আমার একটা ধারণা রয়ে গেছে যে ১৯৩৬ সনে মাকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে শেষ রাঁচি যাই, – সে ধারণা সত্য কি না তা যাচাবার সুবিধেও নেই, প্রয়োজনও নেই। তাঁর যে সেই একটা ব্যথা পেটে হত – কেউ ২ বলত বয়সের দরুণ ভিতরের নাড়ি ঢিলে হয়ে গেছে, – নানা চিকিৎসায় সেটা কমল না দেখে মনে হল হাওয়া বদল ক'রে দেখা যাক কিছু উপকার হয় কি না; রাঁচিতে ত ভালো ডাক্তারও আছে। সুহৃৎও সঙ্গে গেলেন। আগেই ত বলেছি তিনি বিপদে মধুসূদন – যার যখন দরকার সব কাজ ফেলে তার সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

জামশেদপুরে পৌছে এই আর্ত্তবন্ধুর সঙ্গের উপকার আবার হৃদয়ঙ্গম হল। মা'কে একটা আলাদা আরামচৌকীতে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম, যাতে ট্রেনের ঝাঁকানিটা কম লাগে। তবু তিনি বল্লেন এত অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে যে ঐখানেই নেবে যাবেন, আর পারছেন না। আমি ত প্রমাদ গুণলুম। তখন ২॥ টে / ৩ টে রাত্তির, জামশেদপুর স্টেশন আর গাড়ির মধ্যে বেশ একটু রেললাইনের ব্যবধান। ঐ অক্ষম রোগীকে কি ক'রে পার করব, কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলব? পাশের গাড়িতে সুহৃৎ ছিল, তাকে খবর দিতেই সে এসে দেখেশুনে একটু ব্র্যাণ্ডির ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে সে যাত্রার মত আমাদের নিশ্চিন্ত করলে, এবং আমরা যথাসময়ে রাঁচি গিয়ে পৌছলুম। সেখানে ডাক্তার দেখিয়ে তার নিয়মে থেকে মায়ের একটু উপকার হয়েছিল বলেই মনে হয়। যে রাঁচি আমাদের নিত্যগম্যস্থান ছিল, এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যে তার ছায়া মাড়াই নি মনে করলে আশ্চর্য্য লাগে। তার চেয়ে দুঃখ বেশি হয় যখন ভাবি যে নানা কারণে মায়ের-দেওয়া বাপের-নাম-রাখা বাড়ী বিক্রী ক'রে ফেলার দরুণ ইচ্ছে থাকলেও রাঁচিতে বেড়াতে যাবার পথ নিজেই বন্ধ করেছি। আর যাবই বা কিসের জন্য? কাকে দেখতে?

ঠাকুরঝির মৃত্যু

এসময় একবার কিন্তু রাঁচি থেকে ফিরে সেজবাড়ী উঠতে পারি নি, কারণ আমরা যে অংশে থাকতুম সেটা সেজদি ভাড়া দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে সময়ে অবশ্য ঠাকুরঝি ছিলেন এবং সাধ্যমত ঘরদোর গুছিয়ে তাঁর বাড়ীতে আমাদের যত্ন ক'রে রেখেছিলেন। তাহলে সেটা ১৯৩৬-এর আগে কোন সময় হবে। তারপর প্রতিভাদির ছোট ছেলে দেবু (দেবকুমার) কিছুদিন তাঁর ওখানে এসে থাকে। বড় ভাইও তাঁর ছেলেদের ঠাকুরঝি কি ভালই না বাসতেন। বড় বাড়ীর কারো অসুখ হলে রোজ লোক পাঠিয়ে খবর নিতে হবে বলে প্রিয় সময়ে ২ বিরক্ত হত।

ভাইদের মৃত্যুবার্ষিকীতে উপাসনা করবার জন্য সর্ব্বদা আমার ডাক পড়ত। ঐ ক'রে ২ মুখে ২ বলবার কতকটা অভ্যাস আমার হয়েছিল, যেটা পরে কাজে লেগেছে। দেবু একদিন চা খেতে বলেছিল, তখন ঠাকুরঝি অসুস্থ। তাঁকে দেখতে যে ঘরে গেলুম কে জানত সেই শেষ দেখা। অত শীঘ্র যে যাবেন তা ভাবি নি। অবশ্য বয়স যথেষ্ট হয়েছিল, আর বেশি যে ভোগেন নি সেটাও ভালই। এখনো পর্য্যন্ত কত সময় মনে করি যে. দেখা করতে গেলে অত আন্তরিক খুসি যখন হতেন, তখন আরো ঘন ২ কেন তাঁর কাছে যেতুম না। কত লোকের সঙ্গে ত দেখা করতুম, যারা হয়ত আমাকে দেখে তার সিকির সিকিও খুসি হত না।

আবার ভাবি যে দুনিয়ার এই দস্তুর, বয়স বাড়ার সঙ্গে ২ ক্রমশঃ একলা পড়ে যেতেই হয়। ভাঁটার সময় যেমন জেলে ডিঙ্গি বালির তীরে উপুর হয়ে একলা পড়ে থাকে। তফাতের মধ্যে রক্তমাংসের শরীরে জোয়ার আর দ্বিতীয়বার আসে না। তখন 'খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা'। সে খেলায় আমরা আর যোগ দিতে পারিনে, তার নিয়মকানুন জানিনে, বুঝিনে। অবশ্য নাতিনাতনীদের সঙ্গে দিদিদাদুদের সম্পর্কের বেলা এ কথা খাটে না, — সে যে বড় মধুর সম্পর্ক। আমার নিজের সে সৌভাগ্য না হোক, চারিদিকে ত এ খেলা কত দেখেছি বা দেখছি। কথায়ই ত বলে আসলের চেয়ে সুদ বেশি।

আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথ (জীবনে কখনো তাঁকে মুখে দাদা বলি নি যদিও) বলতেন যে তিনি এতদিনে বুঝেছেন দাদা দিদিমাদের সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য যে, তাঁরা নাতিনাতনীদের কেবল আদর করবেন আর বাপ মা তাদের শাসন করবেন। এখনো শশা দিয়ে মুড়ি খেতে গেলে মনে পড়ে নাতিদের সঙ্গে নিয়ে এই খাওয়াটি তাঁর কত প্রিয় ছিল। আমার বোধহয় ফ্রেনলজিতে যাকে বলে philoprogenitiveness (জ্যোতিকাকামশায়ের দৌলতে[১৪৯] ঐ বিদ্যার দাঁত-ভাঙা নামগুলির সঙ্গে আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় হয়েছিল!) সে ঢিবিটা আমার মাথায় এমটু কম উঁচু, কারণ নিজের ছেলেপিলে হয় নি বলে কখনো সত্যিকার দুঃখ হয়েছে বলে মনে হয় না; যদিও কত মেয়ের ত হয়ে থাকে শুনেছি। অবশ্য

একাধিক সুন্দর ছেলে ভিন্ন ২ সময় মন ভুলিয়েছে। কিন্তু সুন্দর কুৎসিৎ ভালো-মন্দের বিচার থাকলে ত যথার্থ অপত্য স্নেহ হল না। কবি বলেছেন 'গুণহীন যে সন্তানগণ মাঝে'—ইত্যাদি। তাই বোধহয় ভগবান আমাকে সন্তান দেন নি। নানাকারণে সেটা ভালই হয়েছে বলতে হয়। নইলে শেষ রক্ষা ত করতে পারতুম না।

যখন একুল ও-কুল দু'কুল গেল, তখন বাপের বাড়ী লালবাংলাতেই আশ্রয় লাভ করলুম, যেমন চিরকাল হয়ে আসছে। সেজবাড়ী ছাড়বার আগে একটা বিষম দুর্ঘটনার হাত থেকে ভাগ্যক্রমে উদ্ধার পেলুম। অর্থাৎ ওঁর একবার হার্নিয়া এমন ঠেলে উঠল যে কিছুতে নামতে চায় না। যখন সুহৃৎ এবং পূর্ণানন্দ রায় (আমার ভাগ্নী জামাই) নানাপ্রকার হাতের কস্‌রৎ করেও কিছুতে কিছু করতে পারলেন না, তখন দু'জনে আস্তে-গলায় কি-সব পরামর্শ করে। আমি যেখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেখানে সুহৃৎ এসে আমাকে বল্লেন যে, ওঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং ইঙ্গিত করলেন যে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। আমি আর কি বলব?—কিন্তু এমনি ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা যে, যে-সময়ে চরম নিরাশা দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়েই পূর্ব্ব চেষ্টার ফলেই হোক বা যে-কারণেই হোক, আবার আশা দেখা দিল এবং সে ধাক্কাটা অন্ততঃ কেটে গেল।

২০নং মে ফেয়ার বিক্রি

আর একটা দুর্ঘটনার স্মৃতিও এই সময়ে ঐ ২।১ নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ীর সঙ্গে জড়িত; যদিও সে বাড়ীতে সুখের দিনও অনেক কাটিয়েছি। আগেই বলেছি যে, আমাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হয়ে আসছিল, অর্থাৎ আয়ের চেয়ে ব্যয় তথা দেনাও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল। সংসার চালাবার জন্যে প্রথমে হিন্দুস্থান ইন্‌সুরান্স কোংয়ের কাছে কলকাতার বড় বাড়ী বাঁধা রেখে ধার করা হল, ক্রমে রাঁচির ছোট বাড়ীও বাঁধা পড়ল। তাতেও যখন তাদের সুদ কুলিয়ে উঠল না, তখন তারা ২০নং মে ফেয়ারের বাড়ীটা বিক্রি ক'রে দেনা শোধ নেবার প্রস্তাব করলে। যতদূর মনে পড়ে তারা ৬০০০০৲ টাকা পেত, আর ঐ বাড়ী-জমিতে আমাদের লক্ষ টাকার উপর খরচ পড়েছিল। সেও অবশ্য কতকটা আমাদের গাফিলীর জন্য। কিন্তু যাই হোক। আমরা দর বাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও অকৃতকার্য্য হলুম (কোন্ বিষয়ব্যাপারেই বা কৃতকার্য্য হয়েছি?)। কাজেই ৬৫ না ৬৬ হাজারেই অগত্যা রাজি হতে হল। সেই লেখাপড়া ব্রাইট স্ট্রীটের সেজবাড়ীর সুন্দর বারান্দার সুন্দর টেবিলে বসেই সই করা হল। যে আইনজ্ঞ ভদ্রলোক হিন্দুস্থানের পক্ষ থেকে এসেছিলেন, তিনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন বলে মনে আছে তাঁকে খোঁটা দিয়ে বলেছিলুম যে, সুবিধে

পেয়ে আমাদের গলায় পা দিয়ে কম দরে ঐ বাড়ী নিয়ে নিচ্ছেন। যদিও তাতে নিজের মনের ঝাল ঝাড়া এবং ভদ্রলোককে অপ্রতিভ করা ছাড়া আর কি সুফল ফলেছিল জানিনে!

রাঁচির ছোট বাড়ী বাঁধার সুদও অনেকদিন ধরে গুণতে হয়েছিল; শেষে যখন একজন আত্মীয় সেটা কিনতে চাইলেন, তখন নলিনী সরকারকে[১৫০] এই শান্তিনিকেতনেই অনেক ক'রে বলে তাঁর এক কথাতেই হিন্দুস্থান কোং বন্ধক ছাড়িয়ে দিলে, যে কাজ বহুদিন অন্য কর্ত্তাদের খোসামুদি করেও হাসিল হয় নি। সে জন্য তাঁর প্রতি খুব কৃতজ্ঞ আছি।

লালবাংলা

ঠিক কবে আবার লালবাংলায় থাকতে পেলুম তার সনতারিখ বলতে পারব না, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি আমি ইতিহাস লিখছিনে যে ভুল হলে কোন ক্ষতি হবে। কোন কারণে (পরে যথাস্থানে বলব) মনে হয় যে ১৯৩৮ খৃঃএ সেপ্টেম্বর মাসে গিয়েছিলুম। আসল জিনিষ হচ্ছে সুরেন আমাদের যথেষ্ট আদর যত্ন ক'রে বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন। কোনদিনই ত তাঁর ভদ্রতার ত্রুটি ছিল না।

আমার সেজ ভাইপো মিহির তার নিজের দোতলার শোবার নাবার ঘর আমাদের জন্য ছেড়ে দিল। এই সব জিনিষই মনে রাখা দরকার। সেটা যে তার ঘর ছিল তার চিহ্ন এখনো সেখানে বর্ত্তমান, কারণ বারান্দায় বেরবার দক্ষিণ দুয়োরের গোড়ায় বিলিতী মাটি কাঁচা থাকতে ২ সে নিজের নাম 'মিহির' সেখানে খুদে রেখেছে। তখন ত সব বাড়ীটাই ওঁদের অধিকারে ছিল; এখনকার মত উপর নীচে ডাইনে বাঁয়ে ভাড়াটে দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ নয়। জমিও যথেষ্ট ছিল, ধারশোধ করবার জন্য তখনো কচুকাটা করা হয় নি। খাবার জন্য আমাদের একটা সামনাসামনি ছোট ঘর দিয়েছিলেন, তার যেটা নাবার ঘর হতে পারত, তাতে বাসনাদি ধোওয়া হত।

বৈঠকখানা ঘরটা এজমালী ছিল, তার পাশের গোল কাঁচের ঘর উনি লেখা-পড়ার জন্যও ব্যবহার করতেন ও তার পাশের সরু বারান্দায় সন্ধ্যাবেলা আমরা বসতুম। কোন বিষয়ে অসুবিধে ছিল না। তবে ওঁর শরীর ক্রমশই ভেঙ্গে পড়তে লাগল, সে আর ওঁরা কি করবেন। এখন মনে হয় শেষ যেবার রাঁচি গিয়েছিলুম, দু'একবার বাগানে ও ঘরে উনি শুধু ২ বসে পড়ে গিয়েছিলেন, যেমন আগে গগনদার হয়েছিল বলে উনি নবুকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই মস্তিষ্কের কোন দুর্ব্বলতা আরম্ভ হয়ে থাকবে, যেটা আস্তে ২ বেড়ে ২ বছর দশকের মধ্যে শরীর ক্ষয় ক'রে দিলে, যদিও তখন ঠিক বুঝি নি।

১৯৩৪-এ বুবুর প্রথম মেয়ে সুপূর্ণা হয়। আমরা যখন লালবাংলা থাকতে যাই তার সঙ্গী সাথী কেউ ছিল না। লিজি বলে এক খৃস্টান আয়া সকন্যা তার

পরিচর্যার জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় তাকে ঘুম না পাড়িয়ে লিজি যে কি করত তা জানিনে ; সুপূর্ণা উপরে আমাদের খাবার টেবিলের কাছে বেশ রাত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াত, যখন তার মা একতলায় খেতে যেত, কখনো ২ তার জন্য কাঁদত। তার আর একটা অভ্যাস ছিল আমার মশলা চুরি ক'রে খাওয়া ; যেখানে যেরকম ভাবেই মশলার কৌটো লুকিয়ে রাখি না কেন, সে গন্ধে ২ কোন-রকম ক'রে বের করবেই। আশ্চর্য্য ! এখন পর্য্যন্ত তার ভাইবোনদের ঠিক সেই অভ্যাসটি আছে। যেটি বড়রা করে ঠিক সেইটি ওদের না করলেই নয়। আমরা যাবার পরে ১৯৩৮ নবেম্বরে বুবুর বড় ছেলে সুপ্রিয়[১৫১] হয়। আগেই বলেছি সুন্দর ছেলেদের প্রতি আমার একটু পক্ষপাত ছিল। প্রথমে প্রতিভাদিদির ছেলে শিবু, তারপরে সেজদিদির ছেলে কালীবাবু[১৫২], তারপরে মঞ্জুর ছেলে গৌরাঙ্গ[১৫৩] (ওরফে গুলু), তারপর শেষ এই সুপ্রিয়। সেও বেশ সুন্দর ছেলে ছিল। এখনো যে নেই তা বলছিনে

—

প্রাসঙ্গিক তথ্য ও রচনা-ধৃত প্রসঙ্গ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর (২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩—১২ আগস্ট ১৯৬০) 'জীবনকথা'র প্রথম পর্ব 'এক্ষণ' শারদীয় ১৩৯৯ সংখ্যায় প্রকাশের পর বর্তমান বৎসরে পরবর্তী অংশ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হল। 'জীবনকথা' প্রথম পর্বের রচনাকাল ৭ আগস্ট ১৯৫৩ থেকে ২২ নভেম্বর ১৯৫৩। 'এক্ষণে'র বর্তমান সংখ্যার সূচনা 'বিবাহিত জীবন' অধ্যায়ের অনেকখানি ১৯৫৩ সালের ২২ নভেম্বর লেখিকা রচনা করেছিলেন, তারপর খুব নিয়মিত না হলেও ইন্দিরা দেবী তাঁর জীবনকথা ক্রমশ লিখে চলেছিলেন—২০ ডিসেম্বর ১৯৫৫ পর্যন্ত। এই তারিখে লেখা তাঁর শেষ বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। অনুমান করা চলে, আর কয়েকটি অনুচ্ছেদের পরই জীবনকথায় ইতিরেখা টানা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

'জীবনকথা'র পূর্ববর্তী পর্যায়ে ইন্দিরা দেবী তাঁর বাল্য কৈশোর জীবন থেকে বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবন পর্যন্ত ব্যক্তি ও ঘটনা সমাকীর্ণ একটি বৃহৎ অধ্যায়ের স্মৃতি আমাদের জানিয়েছেন। বর্তমান পর্বে তাঁর বিবাহ-পরবর্তী জীবনের কথা—যেখানে পূর্বপ্রকাশিত অধ্যায়ের মতো নিজেকে যথাসম্ভব অন্তরালবর্তী রেখে, নানা ব্যক্তি ও ঘটনাবহুল একটি বৃহৎ কালকে উপস্থাপিত করেছেন। বিস্তারিত-ভাবে যাঁরা ইন্দিরা দেবীর শ্বশুরকুল ও তৎকালীন সমাজের কথা জানতে আগ্রহী, তাঁরা, প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজা প্রসন্নময়ী দেবী রচিত 'পূর্ব্বকথা' (পুনর্মুদ্রণ 'এক্ষণ' শারদীয় ১৩৮৬) শীর্ষক মূল্যবান স্মৃতি-আলেখ্যটি পড়লে সবিশেষ জানতে পারবেন।

এখানে তাঁর স্মৃতিকথা থেকে চৌধুরী পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ধৃত হল—

> 'আমাদের গ্রামের আদি নাম কি তাহা জানি না ও এক্ষণে জানিবারও কোন উপায় নাই।…আমার পূর্ব্বপুরুষ শাক্ত, পূজা হোম বলি তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। "হরি মৈত্র ও মৈত্রের পুত্র যাদবানন্দ চৌধুরী" চৈতন্যদেবের ধর্ম্মসঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া হঠাৎ তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রামের নাম "হরিপুর" রাখিয়াছিলেন। আমার পিতৃগৃহ এখনও সেই স্মৃতিময় হরিপুরেই। তাহার পূর্ব্বের সব ভগ্নাবশেষ এ যুগেও আমাদের নিকট তেমন মর্ম্মস্পর্শী ও সুখপ্রদ।
>
> আমার পিতৃদেব ৺দুর্গাদাস চৌধুরী। তাঁহার জন্মস্থান নাটোরের রাজবাড়ী। মহারাণী কৃষ্ণমণি দেবী এবং আমার পিতামহী দুই সহোদরা ভগ্নী।…
>
> আমরা কাপ ও মৈত্র, নবাব-প্রদত্ত উপাধি চতুর্ধুরীণ ও বহু বংশপরম্পরায় ঐ খেতাব চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই এক্ষণে সংক্ষিপ্ত আকারে চৌধুরী পদবীতে পরিণত হইয়াছে।..'

ইন্দিরা দেবীর 'জীবনকথা'য় তাঁর স্বামীর অগ্রজ অনুজ ভ্রাতা ভগিনীদের ভ্রাতৃবধূদের কথা বার বার উল্লেখ আছে। এখানে একটি কথা বলা দরকার। প্রমথ চৌধুরীর এক অকালমৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের কথা প্রসন্নময়ীর 'পূর্ব্বকথা'তে পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে 'সর্বকনিষ্ঠ ভগ্নী সৌদামিনী'র নামও 'পূর্ব্বকথা'তে আছে। প্রমথ চৌধুরী আত্ম-কথা' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৩৫১) লিখেছেন '…সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগ্নী উভয়েই কলেরায় আক্রান্ত হন। বোনটি সেখানেই মারা গেল।' অকালমৃত এই দুই পুত্র কন্যাকে ধরে দুর্গাদাস চৌধুরীর সন্তানসংখ্যা এগারোটি। সংক্ষিপ্ত বংশলতিকা দেওয়া হল—

কালীকান্ত চৌধুরী
ধনমণি দেবী (পত্নী)

দুর্গাদাস চৌধুরী
মগ্নময়ী দেবী

১ প্রসন্নময়ী দেবী — কৃষ্ণকুমার বাগচী
২ আশুতোষ চৌধুরী — প্রতিভা দেবী
৩ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী — সরসীবালা দেবী
৪ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী — (অকালমৃত)
৫ কুমুদনাথ চৌধুরী — রাধারাণী দেবী
৬ প্রমথনাথ চৌধুরী — ইন্দিরা দেবী
৭ মন্মথনাথ চৌধুরী — লীলা দেবী
৮ মৃণালিনী দেবী — উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৯ সৌদামিনী দেবী — (অকালমৃত)
১০ সুহৃৎনাথ চৌধুরী — নলিনী দেবী
১১ অমিয়নাথ চৌধুরী — প্রমীলা দেবী

'জীবনকথা'র সম্পাদনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

সমগ্র স্মৃতিকথাটিতে ইন্দিরা দেবী খ্যাত-অখ্যাত বহু ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সমস্তই স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন, ফলে কোথাও কোথাও প্রমাদ লক্ষ করা যাবে। লেখিকা নিজেও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এতে পাঠকের কাছে এই রচনার প্রকৃত মূল্যের কোনো হানি হবে না, এই বিশ্বাস। সম্পাদনা কালে কোনো কোনো প্রমাদের সংশোধন করা হয়েছে। কোনো কোনো ব্যক্তি ও ঘটনা-পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে গেল, বর্তমান সংকলয়িতার সাধ্যাতীত হিসেবেই এগুলি গণ্য করতে হবে। সম্পাদনার কোনো ত্রুটি লক্ষগোচর হলে পত্রিকা-সম্পাদককে অনুগ্রহ ক'রে জানালে সংকলয়িতা উপকৃত হবেন।

পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বিবেচনায় ব্যক্তি ও ঘটনা-পরিচিতি যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা হয়েছে। এ-কালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে বিস্তারিত পরিচয় জেনে নেওয়া শ্রমসাধ্য হবে না।

মূল রচনার কোনো অংশই বর্জন করা হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখিকা-কর্তৃক বর্জিত অংশ রচনা-ধৃত প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে, বর্জিত অংশের মধ্যে জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, এই বিবেচনায়। লেখিকার বানান রীতি যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। রচনার মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি; এইসব ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীযুক্ত অনুমিত শব্দটি বসানো হয়েছে। দু'একটি ক্ষেত্রে ছিন্ন অংশ বিন্দুচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

ইন্দিরা দেবী রচনামধ্যে তাঁদের কলকাতার ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়ির নম্বর ১॥. লিখেছেন। পঠনীয় ১নং ব্রাইট স্ট্রিট। অন্য একটি রচনায় তিনি ঐ বাড়ি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন '১নং ব্রাইট স্ট্রীটের সুন্দর দেড়তলা বাড়ি' হিসেবে। দেড়তলা বাড়িকে ১॥ নং উল্লেখ করাকে প্রমাদ না বলে রসবোধের পরিচয় হিসেবেই গ্রহণ করব।

এক্ষণের ১৩৯৯ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'জীবনকথা'র লেখিকা-পরিচিতি অংশের (পৃ ৯১) দ্বিতীয়-তৃতীয় ছত্রটি এরূপ হবে—'১৮৭৭ খৃস্টাব্দে মে মাসে বালিকা ইন্দিরা তাঁর মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ কবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড যান।'

'জীবনকথা'র পাণ্ডুলিপির বিষয়ে প্রথম অবহিত হই আনুমানিক ১৯৫৯ সালে, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে এটি প্রদানের পূর্বেই, প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া পূর্ণিমা ঠাকুরের সৌজন্যে। ইন্দিরা দেবীকে তাঁর স্মৃতিকথা রচনা বিষয়ে অন্যতম প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন পুলিনবিহারী সেন। পাণ্ডুলিপিটি যে পুলিনবিহারী পড়েছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক তিনি প্রকাশ করেন নি বা ইচ্ছা থাকলেও তা ক'রে উঠতে পারেন নি।

এত কাল পর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে এর প্রকাশ সম্ভব হল, সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি 'এক্ষণ'-সম্পাদকের দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে এটি প্রকাশের আগ্রহ।

...

১. বালিগঞ্জ ১ নম্বর রেনি পার্ক স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরীর বিবাহ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে।

২. দিমু। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫)।

৩-৪. সরলাদি। সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫)। ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর বিবাহ ব্যাপারে অন্যতম উদ্যোক্তা জানা যায়। প্রমথ চৌধুরীর 'আত্ম-কথা' (প্রকাশ ১৩৫১) গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। এরূপ কথা অন্য সূত্র থেকে জানা গেলেও প্রকাশিত 'আত্ম-কথা'য় তার সন্ধান পাওয়া গেল না। অনুমান করা যেতে পারে, অগ্রন্থিত পত্রিকা-নিবদ্ধ আত্মকথায় বা পাণ্ডুলিপিতে এর উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালের 'আত্মকথা'র পাণ্ডুলিপি ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে নিয়ে কোনো সম্পাদক যে ফেরত দেন নি, এ-তথ্য তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায়।

৫. 'রী কোম্পানি'। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রদত্ত চৌধুরী পরিবারের সংক্ষিপ্ত সরস নামকরণ। 'জীবনকথা'র প্রথম পর্ব (এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৯, পৃ ৭৯-৮০) দ্রষ্টব্য।

৬. দীপনারায়ণ সিংহ। ভাগলপুরের জমিদার প্রমথ চৌধুরীর বন্ধু। দীপনারায়ণ তারকনাথ পালিতের কন্যা লীলাকে (লিল্) বিবাহ করেন।

৭. 'বিবাহপূর্ব জীবনের চিঠি প্রকাশযোগ্য এবং প্রকাশ করাও হয়েছে।' দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা. বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪।

৮. সুহৃৎ। সুহৃৎনাথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীর ভ্রাতা।

৯. জ্যোৎস্নাদাদা। তাঁর পুত্রবধূ। জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠপুত্র। জ্যোৎস্নানাথের পুত্র অজিতকুমারের স্ত্রী স্টেলা।

১০. তারকবাবু। তারকনাথ পালিত (১৮৩১-১৯১৪)। সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু।

১১. রবীন্দ্রস্মৃতিভাণ্ডার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত Tagore Memorial Fund। সেক্রেটারি: তেজবাহাদুর সাপ্রু, প্রেসিডেন্ট: প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দ্রষ্টব্য, বিজ্ঞপ্তি Visva Bharati News, Nov. 1941.

১২. পিসতুতো ভাই সত্যদাদা। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯৩৩)। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর পুত্র।

১৩. দ্বিপুদাদা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪. কে. জি গুপ্ত। স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

১৫. সুরেন বাঁড়ুয্যে। বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬? - ১৯১২)।

১৬. '.. মেজমামীর [সত্যপ্রসাদের মেজমামী জ্ঞানদানন্দিনী] সঙ্গে হয়ত বনবে না, যেন সাবধানে চলেন।' সত্যপ্রসাদের এই সাবধানবাণী সত্য হয় নি। জ্ঞানদানন্দিনী ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা জ্ঞানদানন্দিনীর একটি অপ্রকাশিত পত্র উদ্ধৃত হল —

ওঁ

প্রমথ, ইস্টারের ছুটীতে তোমাদের দুজনের রাঁচিতে আস্‌বার কথা বোলে এসেছিলুম মনে আছে ত? সে সময়ে কত দিনের ছুটী যোগাড় করতে পারবে, এখানে দিন পনের থাক্‌তে পারবে ত? এবারে আমি আর উনি আমরা ত দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে থেকে এলুম। আমি যে এই মাসকতক তোমাদের সঙ্গে ছিলুম, আমার প্রতি তোমার দৈনিক ব্যবহারে আমি প্রতিদিন আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হয়ে যেতুম, কোনও দিন একটী বারও তোমার কোনও কথায় বা ব্যবহারে আমার প্রতি তোমার তাচ্ছিল্য বা বিরক্তিভাব দেখ্‌তে পাই নি, তাই আমি অসঙ্কোচে যখন যা মনে হোতো তোমাকে বল্‌তুম জিজ্ঞেস করতুম, আর প্রতিবারেই তুমি সুপ্রসন্নভাবে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে, যা বুঝিনে তা সুন্দররূপে যত্নের সহিত বুঝিয়ে দিতে, আমার প্রতি তোমার এই সদাসুপ্রসন্ন ভাব আমার অন্তরকে যে কিরকম আর কতখানি পরিতৃপ্ত করতো তা তোমাকে বোলে বোঝাতে পারব না। তোমার আর বিবির সঙ্গে সুখে, স্বচ্ছন্দে অসঙ্কোচে একত্রে বাসের দুর্লভ সুখের স্মৃতি, আমার জীবনের আর দুচারটী দুর্লভ সুখের স্মৃতির সঙ্গে, আমার অন্তরবেদীতে স্থাপিত থাকবে। তোমরা বেশ ভাল আছ ত?

১৪ই মার্চ — জ্ঞানদা

[পোস্টমার্ক ১৪ মার্চ ১৯১৯]

১৭. '৬ নংয়ের ছেলেবাবুরা অধিকাংশ বাড়ীতে পাজামা কুর্ত্তা…।' ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকেই সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের আদবকায়দা-আচরণরীতির অনুসরণ চলে আসছিল, একাধিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও এর উল্লেখ করেছেন।

১৮. প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৪)। প্রমথ চৌধুরীর বড়দিদি প্রসন্নময়ীর প্রতিভাময়ী কন্যা।

১৯. জ্যাঠাইমা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী সর্বসুন্দরী দেবী।

২০. শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১-১৯২০)। ইন্দিরা দেবীর বাল্যবন্ধু। স্বামী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। এই সাহিত্যরসিক দম্পতির সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের অন্তরঙ্গতা সর্বজনবিদিত।

২১. 'আধ-আধ ভাষিণী'। ইন্দিরা দেবী সে-কালের কোনো কোনো নারী সম্পর্কে এই বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। শরৎকুমারী চৌধুরানীর কোনো রচনাংশ বলে অনুমিত।

২২. 'চিনির শুল্ক'। এই শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধ রচয়িতা লোকেন্দ্রনাথ পালিত। প্রকাশ, 'ভারতী', বৈশাখ ১৩০৬। এর উত্তরে প্রমথ চৌধুরী লেখেন 'চিনির শুল্ক / অপর পক্ষ', প্রকাশ 'ভারতী', আষাঢ় ১৩০৬। পুনরায় লোকেন্দ্রনাথ 'চিনির শুল্ক / পূর্ব্বপক্ষ' নামে প্রমথ চৌধুরীর উত্তর দিয়েছেন আষাঢ় সংখ্যাতেই। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটি তাঁর কোনো গ্রন্থে বা প্রবন্ধ সংকলনে এ পর্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

২৩. সংজ্ঞা। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর মেজ মেয়ে সংজ্ঞা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী।

২৪. নতুন ঠাকুরপো। মন্মথনাথ চৌধুরী।

২৫. প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯)। প্রমথ চৌধুরীর দিদি, প্রিয়ম্বদা দেবীর মা প্রসন্নময়ী-রচিত জীবনস্মৃতি-মূলক রচনা 'পূর্ব্বকথা'য় (পুনর্মুদ্রণ, 'এক্ষণ' শারদীয় ১৩৮৬) তাঁর পরিবার ও তৎকালীন সমাজের বহু তথ্য জানা যায়।

২৬. দুর্গাদাস চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীর পিতা, পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম-নিবাসী। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

২৭. কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মিলন। কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (মাঘ ১৩৪৪)। সভাপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। 'সভাপতির অভিভাষণ' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

২৮. 'সেই জাহাজেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর [আশুতোষ চৌধুরীর] আলাপ হয়।' 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন। ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরীর রচনাতেও এর উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্ব্বকথা' থেকে এই প্রসঙ্গটি সংকলন করা গেল —
'আশুর বিলাত যাত্রার সমুদ্রপথে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়। ঐ একই জাহাজে তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুত সত্যপ্রকাশ গাঙ্গুলীও যাইতেছিলেন। একে স্বদেশীয় তাহাতে উভয়ই সাহিত্যানুরাগী, কাজে কাজেই আত্মীয়তাটা শীঘ্র গাঢ়তর হইয়া উঠে এবং সেই বন্ধুত্বের ভাবী ফল সুখজনক কুটুম্বিতায় পরিণত হয়। ভ্রাতার

প্রবাস পথের অধিকাংশ পত্রই রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ হইয়া আসিত। আমরা তখন "তাঁহার নাম মাত্র শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই"। নামের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে "ভগ্ন হৃদয়" হস্তগত হয়। '

প্রবাস যাত্রাকালীন পথিমধ্যে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্রীর যোগ্যতর পাত্র, হস্তের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ভবিষ্যৎ শুভকার্য্যের জন্য পূর্ব্বেই যে মৌখিক রিটেনার দিয়াছিলেন, তাহারই সফলতায় অদ্য এই অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে।...'

২৯. সেজঠাকুর। কুমুদনাথ চৌধুরী। ব্যারিস্টর, শিকারী হিসেবে খ্যাতি ছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের চতুর্থ কন্যা রাধারানী দেবীকে বিবাহ করেন। রচিত গ্রন্থ 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার' (মূল গ্রন্থ পত্রাকারে ইংরেজিতে রচিত, বঙ্গানুবাদ প্রিয়ম্বদা দেবী-কৃত। প্রকাশ ১৯২৪)

৩০ 'নলিনী···মেয়ের বিয়ে শেষে হিঁদুমতে দিল ··।' দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা নলিনী দেবী, তাঁর কন্যা অপর্ণার সঙ্গে নরেন্দ্রর বিবাহ।

৩১. উত্তরপাড়ার বাড়ি বিক্রি করে···।' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যবসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য যে বিপুল ঋণ করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত সম্পত্তি বিক্রি ক'রে শোধ করতে হয়।

৩২. 'আমরা দু'জন এবং ঠাকুরঝি ও সুহৃৎ নলিনী দুই বাচ্ছা সহ টিওারিয়ায় বেড়াতে যাই।' ইন্দিরা-প্রমথ, মৃণালিনী, সুহৃৎ-নলিনী চৌধুরীদের পারিবারিক ভ্রমণ দার্জিলিং জেলার তিনধরিয়ায়।

৩৩ বড় ঠাকুর। আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)।

৩৪. মহারাণী সুনীতি। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২)। স্বামী, কুচবিহারপতি নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

৩৫. কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের।

৩৬. 'সত্যদাদার শাশুড়ী সুরসুন্দরী পিসিমা ছিলেন ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে।' চোরবাগানের ঠাকুরগোষ্ঠীর কন্যা সুরসুন্দরী, নরেন্দ্রবালা দেবীর মা।

৩৭ প্রতিমা, কমল, মীরা। প্রতিমা দেবী, রথীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী। কমলা ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী। মীরা দেবী, রবীন্দ্রনাথের কন্যা।

৩৮. কেশববাবুর বড় ছেলে। করুণাচন্দ্র সেন।

৩৯. 'গ্রীয়র পার্ক, লাটপত্নীকে পঞ্চরানী পাঁচ এয়োর মত···।' কলকাতায় ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের পাশে গ্রীয়র পার্ক, পরে লেডিস পার্ক। পঞ্চরানী প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী, নাটোর দিঘাপতি নদীয়া সন্তোষের জমিদারপত্নীর কথা জানিয়েছেন। পঞ্চম জমিদারপত্নী বা এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হল না।

৪০. ডব্লিউ. সি. বাঁড়ুয্যের মেজমেয়ে সুশীলা। সুশীলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪১. 'টাব্লো' [Tableau] জিনিষটা আমাদের সেকালে খুব হত।' ১০৮ সংখ্যক রচনা-পরিচিতির (সরলা দেবী প্রসঙ্গ) উদ্ধৃত অংশের পর ইন্দিরা দেবী Tableau বিষয়ে যে অংশটুকু লিখে বর্জন করেছিলেন, এখানে প্রাসঙ্গিক বোধে তা উদ্ধৃত হল—

মূকাভিনয় বা টাব্লো

একবার মনে আছে কোন বিদেশিনী সভার নৈমিত্তিক অধিবেশনের পালা কলকাতায় পড়ায় সরলাদিদি (আমরা আদর করে তাঁকে ডাকতুম 'সল্লি', তাই নিয়ে এখনকার ছেলেরা হাসত) এবং আমি দুজনেরই উপর অতিথি বিনোদনের ভার পড়েছিল। তিনি তখন 'সম্মানী' নামে এক গোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন, তার থেকে 'জীমূতবাহন' এই জঁাকালো নাম দিয়ে বর্ষাঋতুর [সময়] গ্রাম্যলোকের নানা চাষবাসঘটিত জীবনযাত্রার এক মূকাভিনয় দেখিয়েছিলেন, কতকটা চলচ্চিত্রগতিক, একেবারে স্থির নয়।

আমি মনে ২ ভাবলুম স্ত্রীলোক নিয়েই যখন কারবার, তখন বিদেশিনীর কাছে আমাদের স্বদেশিনীর মহিমাকীর্ত্তন করাই প্রশস্ত। তাই যুগে ২ ভারত-নারীর এক ২ মহিমময়ী প্রতীকের অবতারণা করলুম, যথা: (১) বৈদিক যুগে মৈত্রেয়ী, (২) পৌরাণিক যুগে সীতা ও সাবিত্রী, (৩) বৌদ্ধযুগে মালিনী, (৪ মধ্যযুগে মীরাবাই, (৫) মুসলমানযুগে অহল্যাবাই, (৬) বৃটিশযুগে রাণী ভবানী—এই কজনই বোধ হয় ছিলেন। প্রত্যেকের জীবনের একটি প্রধান ঘটনার চিত্র দেখিয়েছিলুম। যথা, মৈত্রেয়ীর সন্ন্যাসগ্রহণ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি। আমারও মূকাভিনয়ের সঙ্গে সামান্য চলাবলা ছিল—বিশেষত মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত উক্তি 'যেনাহং নামৃতস্যাম' না বলে যাব না।

তখনকার কালে আমাদের মূকাভিনয় বা জীবন্তচিত্রের খুব চল ছিল। এখন তেমন নেই, কেন কে জানে। তারকবাবুর (পালিতের) মেয়ে লিল (লিলিয়ান) একবার প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে রামায়ণের টাব্লো করিয়েছিল, সম্ভবতঃ কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে। তার পরে আমাদের বিলেতফেরৎ সমাজের এক জন মুখ্য গৃহস্বামিনী ললিতা রায় (মিসেস পি. এল. তাঁর কথা হয়ত আগে বলেছি) তাঁর নিজের বাড়িতে ঘরোয়া নিমন্ত্রণে এক বার বুদ্ধদেবের জীবনীর জীবন্ত চিত্র করিয়েছিলেন, তাতে দিনু বুদ্ধদেব আর স্যর কে. জি গুপ্তের পুত্রবধূ হিরণ যশোধরা সেজেছিল মনে আছে। আর এক বার শকুন্তলা করিয়েছিলেন। তাতে মনে হয় যেন আমি শকুন্তলা সেজেছিলুম, তবে ঠিক মনে নেই। কিন্তু এটা বেশ মনে আছে যে, আমি একবার ঐ রকম কোন স্ত্রীসভা (বোধহয় N. I. A.) খাতিরে শকুন্তলার টাব্লো করিয়েছিলুম। আর মজা এই যে, সেটা পর্দাপাটি ছিল ব'লে সইসকোচমানকে পর্য্যন্ত গাড়ি-

বারান্দায় ঢুকতে দেওয়া হল না, আর আয়া দিয়ে চা করানো হল ; কিন্তু যখন দোতলার হল ঘরে রঙ্গমঞ্চে শকুন্তলার মূকাভিনয় হচ্ছে, তখন দেখি সব পুরুষ চাকর মায় সইসকোচমান সিঁড়ির মাথায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে ! হায় পর্দা ! তোমার কিবা বহুরূপ এই দীর্ঘ জীবনে দেখলুম ও শুনলুম। সেই ঘেরাটোপ-দেওয়া পালকিসুদ্ধ মেয়েদের গঙ্গায় চোবানো থেকে আরম্ভ ক'রে আর কলকাতা সহরের রাস্তায় রণযাত্রা করা পর্য্যন্ত ! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি ! কিন্তু এখন ত তুমি প্রায় শূন্যে মিলিয়ে গেছ। চোখে একটু থাকলেই বাঁচি, তার বাইরে থাকবার আর দরকার নেই।

৪২. প্যারী রায়। প্যারীলাল রায়। লাকুটিয়ার জমিদার বংশীয়, ব্যারিস্টার। দ্বারকানাথ যে কয়েকজন বাঙালি যুবককে উচ্চশিক্ষার্থে বিলেতে পাঠান, তাঁদের অন্যতম গুডীভ চক্রবর্তী। গুডিভের কন্যা অ্যানি চক্রবর্তীর সঙ্গে প্যারীলালের বিবাহ হয়। তৎকালীন ইঙ্গবঙ্গ সমাজে উভয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পান। ইন্দিরা দেবী-লিখিত 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিক সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (প্রকাশ ১৩৭৯) গ্রন্থ। প্রবন্ধ থেকে এই তথ্য জানা যায়।

৪৩. তারকবাবুর মেয়ে লিল। লিলিয়ান। লীলা পালিত। স্বামী ভাগলপুরের জমিদার, প্রমথ চৌধুরীর বন্ধু দীপনারায়ণ সিংহ।

৪৪. জগদীশ বসু-দম্পতি। জগদীশচন্দ্র বসু-অবলা বসু।

৪৫. রমেশ দত্ত-পরিবার। রমেশচন্দ্র দত্ত, পত্নী মাতঙ্গিনী ওরফে মোহিনী দত্ত। এঁদের সঙ্গে পরিবারস্থ আরো কেউ কেউ গিয়ে থাকতে পারেন।

৪৬. করুণা সেন। কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র।

৪৭. প্রিয়কৃষ্ণ মজুমদার।…

৪৮. মিস কর্ণীলিয়া সোরাবজী। বোম্বাই প্রদেশে থাকাকালীন এঁর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর পরিচয় হয়। সোরাবজী-পরিবারের বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো উল্লেখ করেন নি। ইঙ্গবঙ্গ সমাজে কর্ণীলিয়ার আধিপত্য ছিল জানা যায়।

৪৯. 'মিস মেয়োর বই।' মার্কিন লেখিকা Katherine Mayo (1868-1940)। তাঁর রচিত, তৎকালে বিশেষ বিতর্কিত গ্রন্থ *Mother India* (1927)।

৫০. ছোটকাকিমা। সৌদামিনী দেবী, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা।

৫১. নলিনী। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা নলিনী দেবী।

৫২. পূর্ণিমা। নলিনী দেবী ও সুহৃৎ চৌধুরীর কন্যা পূর্ণিমা ঠাকুর (১৯০৮-১৯৯২)।

৫৩. রংপুর সাহিত্য সম্মিলন। রংপুর, উত্তরবঙ্গ রায়ত কনফারেন্স (১৯২৬)

প্রমথ চৌধুরী সভাপতিরূপে বৃত হয়েছিলেন। তাঁর অভিভাষণ 'রায়তের কথা' গ্রন্থভুক্ত। অনুমান করা যায়, লেখিকা এখানে সেই সম্মিলনের কথা বলেছেন।

৫৪ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (১৮৬৩-১৯২৮)। প্রমথ চৌধুরীর বন্ধুস্থানীয়।

৫৫ নলিনীর মেজ মেয়ে অপু। অপর্ণা ঠাকুর। স্বামী নরেন্দ্র ঠাকুর।

৫৬. বেহারী গুপ্ত। সিবিলিয়ন বিহারীলাল গুপ্ত (১৮৪৯-১৯১৬)।

৫৭ মটরু। কুলপ্রসাদ সেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা জয়শ্রীর স্বামী।

৫৮ রাজেন মুখুয্যে, সুরেন্দ্র বাড়ুয্যে। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪-১৯৩৬)। বিশিষ্ট শিল্পপতি, যন্ত্রবিদ্। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)। প্রখ্যাত দেশনেতা।

৫৯. রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারস্থ রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

৬০ ঠাকুরঝি, আর্য্যকুমার, রণেন্দ্রবাবুর সন্তান লীলা। প্রতিভা দেবী। আশুতোষ চৌধুরী-প্রতিভাদেবীর পুত্র আর্যকুমার। আর্যকুমারের স্ত্রী লীলা, রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা।

৬১. অলক। সেজদিদি। অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুহাসিনী দেবী।

৬২. ওকাকুরা কাকুজো (১৮৮২-১৯১৩)। জাপানের প্রখ্যাত শিল্পী। বাংলায় বিপ্লবচেতনার সূচনাপর্বে ওকাকুরার নাম উল্লেখযোগ্য। জোড়াসাঁকো পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ কয়েকজন তাঁর বিপ্লবাদর্শে প্রণোদিত হয়েছিলেন।

৬৩. ব্যারিস্টার পি মিত্র। প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০)। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন।

৬৪. রাধারাণী দেবী। কুমুদনাথ চৌধুরীর স্ত্রী।

৬৫. সরলাদিদি। সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫)।

৬৬. সূর্য্যকান্ত। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার, দেশপ্রেমিক সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী (১৮৫১-১৯০৮)।

৬৭. প্রমীলা। প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৮. সুবীর। সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫-১৯৫৩)।

৬৯ অমলা দাশ। চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী, সুগায়িকা।

৭০ 'কলকাতার কংগ্রেসে বন্দে মাতরং।' অমলা দাশ ১৯১৭ খৃস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে বন্দে মাতরং গানটি গেয়ে মুগ্ধ করেন, এই তথ্য প্রধানত স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া গিয়েছে।

৭১. 'ছোটকাকিমার সঙ্গিনী হিসেবে [অমলা]…।' অমলা দাশের অগ্রজা উর্মিলা দেবী লিখেছেন, 'আমার দিদি প্রায়ই জোড়াসাঁকোয় যেতেন,

কখনো একসঙ্গে দু'-তিন মাসও থেকেছেন… ।'
দ্রষ্টব্য, উর্মিলা দেবী, 'কবিপ্রিয়া', বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২ ।

৭২. 'প্রমীলার প্রথম ছেলে মুচু (ওরকে জয়ন্তের)।' উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা প্রমীলার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত চৌধুরী, পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে স্থলবাহিনীর প্রধান।

৭৩ সুরমা ও সঞ্জীব। সুহৃৎনাথ চৌধুরীর পুত্র ও কন্যা।

৭৪. মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা।

৭৫. সুকুমার হালদার, পত্নী সুপ্রভা। রাখালদাস হালদারের পুত্র সুকুমার। শরৎকুমারীর জামাতা। শরৎকুমারীর কন্যা সুপ্রভা।

৭৬. 'শান্তিধামের ভিত পত্তন।' রাঁচির অনতিদূরে মোরাবাদি পাহাড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাসস্থল 'শান্তিধাম', প্রতিষ্ঠাকাল ২ বৈশাখ ১৮৩২ শক (১৯১০ খৃ.)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এর বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত। এই আশ্রম নির্মাণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাস্তুবিদ বন্ধু হাওড়ার মহেন্দ্রনাথ দত্ত সহায়তা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য।

৭৬ক. নিরুপমা দেবী (১৮৯৫-১৯৮৪)। বিবাহ: কুচবিহারের রাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ (১৯১১) এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয় বিবাহ: শিশিরকুমার সেন (১৯২৫)।

৭৭. প্রমথনাথ বসু (১৮৫৫-১৯৩৫)। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ। শিক্ষাজীবনের সূচনা কৃষ্ণনগরে। স্বদেশের একাধিক স্থানে খনিজ আকরের আবিষ্কর্তা। অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রেও কৃতবিদ্য।

৭৮. প্রতিভাদি। প্রতিভা চৌধুরী। আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা।

৭৯ গগনদা। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮)।

৮০ নবু। নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথের পুত্র।

৮১. '…সব শেষ হয়ে গেল [গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যু]।' ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গগনেন্দ্রনাথ প্যারালিসিসে আক্রান্ত হন এবং ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে মৃত্যু ঘটে। গগনেন্দ্রনাথের অসুস্থতার সূচনা বিষয়ে পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়ের 'ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর' ও দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ' গ্রন্থদ্বয়ে বিবরণ আছে।

৮২. কল্যাণ ও প্রবীর। কল্যাণ চৌধুরী, প্রবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮৩. প্রিয়। প্রিয়ম্বদা দেবী।

৮৪. হেমলতা বৌঠান। হেমলতা ঠাকুর, দ্বিপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী।

৮৫. 'সবুজপত্রের উদ্‌গম'। বালিগঞ্জে কমলালয় গৃহে বাসকালে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্রে'র প্রকাশ।

৮৬. 'মণিলালের বৈষয়িক সুপরিচালনার অভাবে'। 'সবুজপত্র' মুদ্রণ ও বাণিজ্যিক দিকটি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে ন্যস্ত ছিল। নানা অব্যবস্থায় ক্রমাগত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে থাকায় পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

৮৭. নারীর উক্তি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী রচিত প্রবন্ধ-সংকলন 'নারীর উক্তি'। প্রকাশ, ১৯২০, সংস্করণ ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ।

৮৮. 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য সংকলনে 'ভদ্রতা' ...।' ইন্দিরা দেবী-রচিত 'ভদ্রতা' প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশ 'সবুজপত্র' পৌষ ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। 'নারীর উক্তি' গ্রন্থে (১৯২০) সংকলিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বাংলা পাঠক্রমে কিছুকাল পাঠ্য বিষয়রূপে স্থান লাভ করে।

৮৯. 'মহাযুদ্ধে আমার দেবর ডাক্তার সুহৃৎনাথ ও পরে মন্মথনাথের যোগ ...।' সুহৃৎ মন্মথ, প্রমথ চৌধুরীর দুই অনুজ। উল্লেখযোগ্য, চৌধুরী পরিবারে অনেকেই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

৯০. 'সম্প্রতি শোকের বাজ'। সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৯১৩)-প্রসঙ্গ।

৯১. রমা দেবী। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের মাধুর্যবিষয়ে অনেকের রচনায় উল্লেখ আছে।

৯২. অপর্ণা। সুহৃৎনাথ চৌধুরীর মেজ মেয়ে। রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ দক্ষতা ছিল।

৯৩. 'চলমান জীবন'। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'চলমান জীবন' (প্রকাশ ১৩৫৯)।

৯৪. কালিপ্রসাদ / কালীবাবু। প্রমথনাথের অগ্রজ কুমুদনাথ চৌধুরীর পুত্র কালীপ্রসাদ। ইয়োরোপে ১৭ জুন ১৯৪১ খৃস্টাব্দে বিমানযুদ্ধে নিহত হন। এঁর মৃত্যুতে প্রমথ চৌধুরী যে গভীর শোক পেয়েছিলেন তা তাঁর কবিতায়, গ্রন্থোৎসর্গে, দিনপঞ্জীর অনেক রচনার মধ্যে প্রকাশিত। 'এক্ষণ' শারদীয় ১৩৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'দিনপঞ্জী' বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৯৫. য়োকয়ামা টাইকন ও হিসিদা। কলকাতায় ১৯ নম্বর স্টোর রোডের প্রধান ঘটনাবলির কথা লিখতে গিয়ে ইন্দিরা দেবী 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে লিখেছেন, '১৯ নং বাড়ির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব জাপানী বন্ধুদের আগমন। তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ওকাকুরা কাকুজো—স্বনামধন্য জ্ঞানী ও শিল্পী, তিনি ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে একজন বিশিষ্ট নৈপথ্য নেতা ছিলেন এবং সেই সূত্রে

সুরেনের সঙ্গে যে আলাপ হয়, সেটা ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। আরো দু-তিন জন জাপানী অতিথি ১৯নং বাড়িতে এসে থাকেন। তাঁদের মধ্যে য়োকায়ামা টাইক্কান পরে খুব বিখ্যাত হন। তিনি ও হিসিদা নামক আর একজন শিল্পী দুজনে ১৯ নম্বরে মাটিতে বসে কত পৌরাণিক ছবি এঁকেছেন –'

ইন্দিরা দেবী 'জীবনকথা'য় '১৯ নংয়ে অনেক জাপানী এসে জুটেছিলেন, কি সূত্রে ঠিক জানি নে' লিখলেও সূত্রটি তাঁর জানা ছিল মোটামুটি। এরূপ মন্তব্য যেখানে করেছেন ('জাপানী' শীর্ষক অধ্যায় , তার আগে 'স্বদেশী ও ওকাকুরা' নামে বর্জিত অনুচ্ছেদটি এখানে সংকলনযোগ্য –

'এই কমলালয় বাড়ীতে আর একটি জিনিষের সূত্রপাত হয়েছিল – ১৯০৫-এর স্বদেশী। এবং তার সূত্রধার ছিলেন জাপানী গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী ওকাকুরা কাকুজো। আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথকে তিনি খুব ভালোবাসতেন, ১৯নং স্টোর রোডেও কিছুদিন ছিলেন। ওঁরা দুজনে আবার ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এই সব আলোচনার জন্য অন্যত্র মিলিত হতেন। আমি অবশ্য সেখানে যেতুম না। বাড়ীতেও ওঁদের বন্ধ ঘরের সভায় উপস্থিত থাকতুম না ; তবে এদিকে ওদিকে কিছু ২ ত শুনতে পেতুম। ওঁদের দলের আর একজন ছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। চিত্ত দাসও হয়ত মাঝে ২ উপস্থিত থাকতেন। বয়কটাদির ইতিহাস ত সকলের জানা আছে সে বিষয় আর বেশি কি বলব। আমরা যেমন আলগামুখ, সর্ব্বদাই বকবক করছি, জাপানীরা তেমনি অল্পভাষী, সংযত, ধীর শান্ত এবং অতি ভদ্র। ওকাকুরার Ideals of the East, Book of Tea প্রভৃতি বইগুলি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই তাঁর কদর বুঝবেন। তাঁর ভাষায় হয়ত ইংরিজী ব্যাকরণের ভুল থাকতে পারে, সেগুলি আমাদের ১৯ নংয়ে ভগিনী নিবেদিতা দেখেশুনে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। '

৯৬. হোরি। Yoshinari Hori। ওকাকুরার মধ্যস্থতায় জাপানদেশীয় শিক্ষার্থী হোরি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য ছাত্ররূপে যোগ দেন। অনুমান করা যায়, এখানে তাঁর কথাই লেখিকা বলেছেন। বিদ্যালয়ে তিনি অল্পকালই ছিলেন। ভারতবর্ষেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে।

৯৭. 'সুরেনের সকুরা পুষ্প'। 'একটি বসন্ত-প্রাতের প্রস্ফুটিত সকুরা-পুষ্প'/ সত্য-মূলক জাপানী গল্প। শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত দি ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৫। সংজ্ঞা দেবী লিখেছেন, '[ইংরেজি] বইটি থেকে তর্জনা করে করে আমাকে চিঠি লিখে পুরো

গল্পটাই চিঠির মারফৎ আমাকে শোনালেন।…বইটি আমাকেই উৎসর্গ করেছিলেন। প্রথম সংস্করণে লেখা ছিল—যার মনোরঞ্জনার্থে বই লেখা হল, তাকেই দিলাম।'—দ্রষ্টব্য স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শতবার্ষিক সংকলন (১৩৭৯)।

৯৮. 'স্মৃতিকথাও লিখেছিলেন'। স্বরেন্দ্রনাথ-লিখিত 'Kakuzo Okakura/ Some Reminiscences', *Visva-Bharati Quarterly*, August 1936 সংখ্যায় প্রকাশিত।

৯৯. 'নিবেদিতাকে আমাদের ওখানে নিয়ে আসা।' স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু ৪ জুলাই ১৯০২। অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দর মৃত্যুর অনতিবিলম্বেই নিবেদিতাকে 'কমলালয়' বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। স্বরেন্দ্রনাথই সম্ভবত নিয়ে আসার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১০০. 'Web of Indian Life'। নিবেদিতা লিখিত *The Web of Indian Life* (1904) গ্রন্থ।

১০১. 'নিবেদিতা স্কুল স্থাপন করে…'। স্বামী বিবেকানন্দর অনুপ্রেরণায় কলকাতায় বাগবাজার বোসপাড়া লেনে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরে বিদ্যালয়টি নিবেদিতার নামাঙ্কিত হয়।

১০২. 'প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত আনন্দসভা'। প্রতিভা দেবী-প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত সঙ্ঘ', 'আনন্দসংগীত পত্রিকা'র সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো ঘরোয়া সভা বলে অনুমিত, সম্ভবত অল্পকালই এটি চলেছিল।

১০৩. ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০-১৯০৫)। নববিধানপন্থী বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা। সাহিত্যে ও দর্শন বিষয়ে অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

১০৪. 'জ্যোতিকামশায়ের অশ্রুমতী নাটক'। 'প্রেমের কথা আর বোল না'। 'পুরানো সে দিনের কথা'। 'অশ্রুমতী নাটক', প্রকাশ ৪ নভেম্বর ১৮৭৯ খৃস্টাব্দ। বিলাতপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত।

প্রমথ চৌধুরী 'আত্মকথা'য় উল্লিখিত 'প্রেমের কথা আর বোলো না' গানটির স্বর প্রসঙ্গে লিখেছেন, '… জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান ইস্কুলের ছেলেরা গাইত। তার প্রথম কথাগুলি 'প্রেমের কথা আর বোলো না'। শুনলুম এর স্বরের নাম ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। ঝিঁঝিট আমি জানতুম, কিন্তু ইটালিয়ান ঝিঁঝিট কাকে বলে জানতুম না। এর থেকে আমার ধারণা হয় যে, কলকাতার ছেলেরা সঙ্গীতছুট।…'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'প্রেমের কথা আর বোলো না' গানটির রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। গানটির স্বরের উল্লেখ বর্তমান কালে 'ইটালিয়ান ঝিঁঝিটের গৎভাঙা স্বরে স্থাপিত'।

রবীন্দ্র-রচিত 'পুরানো সে দিনের কথা' বিষয়ে ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্র-

সংগীতের ত্রিবেণী সংগম' (১৩৬১) গ্রন্থে জানা যায় 'বিলাতী সংগীতের আদর্শে' মিশ্র খেমটা সুরে রচিত।

'জীবনকথা'র আলোচ্য অনুচ্ছেদের পর লেখিকা-কর্তৃক বর্জিত অংশ — 'তাই যদি ছোট মুখে বড় কথার কথাই উঠল, তবে সমকালীন মানময়ী নাটক অভিনয়ে ঘরের লোকের দিয়ে অভি [অভিজ্ঞা দেবীর] মুখে শুনে ২ যে চমৎকার গানটি গেয়ে ২ বেড়াতুম, যথা—

সজনী লো বল কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না,
এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারি নে।

সেইটিই বা কোন্ বালিকাসুলভ ভাবব্যঞ্জক ? মোট কথা ছেলেরা যা শোনে তাই না বুঝে সুঝে তোতাপাখীর মত আওড়ায়।

যেমন 'মানময়ী' তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক ঘরোয়াভাবে বন্ধুসভার চিত্তবিনোদন। সে [ই] জোড়াসাঁকোর হলঘরে বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে দ্বৈত কৌতুক নাটিকা অভিনয় করেছিলেন, এই দুটিই বোধ হয় আমাদের গীতিনাট্য সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথকে সুন্দর ছেলে দেখে একজন অভিজাত নিমন্ত্রিত [পাইকপাড়ার কান্তিচন্দ্র সিংহ] তাকে কোলে নিয়ে উক্ত অভিনয় দেখে এত হাসলেন (হাস্যরসের সঙ্গে হয়ত অপর কোন রসও একটু মেশানো ছিল !) যে সুরেন কক্ষচ্যুত হয়ে তাঁর চৌকির তলায় পড়ে গেল ! সেই অবধি গানের মত অভিনয়ও আমাদের নিত্যসাথী। স্বর্ণপিসিমার (স্বর্ণকুমারী দেবীর) 'বসন্ত উৎসব' নামক গীতিনাটিকাও আমাদের ছেলেবেলা থেকে পরিচিত ছিল। তার সেই 'ধর লো ধর লো ডালা' নামক প্রথম গানের সুরটি এখনো কানে বাজছে। এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে তার স্টেজের পশ্চাৎপট সাজাবার সময় সুরেন ও জ্যোৎস্নাদা শুকনো ঘাসের গায়ে ডিমের খোলার প্রদীপ জ্বালিয়ে জোনাকী পোকার নকল করতে গিয়ে কি রকম অনিবার্য অগ্নিকাণ্ড বাধিয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।'

১০৫. সখী সমিতি। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৬ খৃস্টাব্দ)। নামটি রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত। বিভিন্ন প্রকার সমাজসেবা, স্ত্রীশিক্ষামূলক কার্য এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। একাধিক মহিলা শিল্পমেলা এই সমিতির উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ 'সখী সমিতি'র সাহায্যার্থে, সরলা রায়ের অনুরোধে 'মায়ার খেলা' গীতিনাটিকা রচনা করেছিলেন।

১০৬. মহিলা সমিতি। সখী শিল্পসমিতি। হিরণ্ময়ী দেবী-প্রতিষ্ঠিত বিধবা শিল্পাশ্রম (১৯০৬) প্রতিষ্ঠানের পরিচালনদায়িত্ব যখন স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রহণ করেন তখন এর অধ্যক্ষসভার নাম দেওয়া হয় 'সখী শিল্পসমিতি'। মহিলা সমিতি অনুরূপ একটি শাখা-সভা অনুমান করা চলে।

১০৭. 'মায়ার খেলা গীতিনাটিকার স্বত্বাধিকার'। 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থের 'মায়ার খেলা' অধ্যায়ে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, '…রবিকাকা শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে সখী সমিতির সাহায্যার্থে এই গীতিনাটিকা রচনা করেন।'

'মায়ার খেলা' প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সখী সমিতি মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি কর্তৃক মুদ্রিত হইল।… মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার-স্বরূপে সমর্পণ করিলাম। '

১০৮. ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল। ১৮১০ খৃস্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনকালে সরলা দেবী নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন আহ্বান করেন। এরই সূত্রে 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলে'র প্রতিষ্ঠা। অন্তঃপুরবাসিনীদের বিবিধ উপায়ে শিক্ষা দান এর উদ্দেশ্য ছিল, নানা-স্থানে এর শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, সরলা দেবী পরবর্তীকালে সেটিকে সক্রিয় ক'রে তোলেন।

১০৯. '[সরলা দেবীর] ১৯০৬-খৃঃ এ বিয়ে হয়েছিল ·।' ১৯০৫ খৃস্টাব্দে সরলা দেবীর বিবাহ হয় পাঞ্জাবের প্রখ্যাত আইনজীবী, জাতীয়তাবাদী নেতা, সমাজসংস্কারক পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে।

১১০. পণ্ডিতজী। পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরী।

১১১. মিহির। সুরেন্দ্রনাথ-সংজ্ঞা দেবীর পুত্র মিহিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১২. হিরণদিদি। হিরণ্ময়ী দেবী (১৮১৮-১৯২৫)। স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। লেখিকা, 'বিধবা শিল্পাশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাত্রী।

১১৩. ত্রিপুরার বড়াঠাকুর সমরেন্দ্র দেববর্মণ। ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের ধাতা 'বড়ঠাকুর' সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা (১৮৬২-১৯৩ঃ)। এই রাজ-পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের বিশেষ যোগ ছিল।

১১৪. নতুন জা লীলা। মন্মথনাথ চৌধুরীর স্ত্রী লীলা দেবী।

১১৫. 'মহর্ষিও নাকি [বিবাহ অনুষ্ঠানে হোম] বাদ দিয়েছেন।' এই প্রসঙ্গে 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একমাত্র শালগ্রাম শিলা এবং হোম (অগ্নিপূজা) বাদ দিয়ে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির আর সব খুঁটিনাটি আচার-বিচার, মায় জাতিভেদ প্রথা পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে রক্ষা করেছিলেন।'

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, 'ব্রাহ্মবিবাহবিধির আন্দোলন')।

১১৬. 'গ্রন্থবিলাসী প্রিয়নাথ সেনের সমস্ত ফরাসী গ্রন্থ কিনে…'। প্রমথ চৌধুরী 'আত্ম-কথা' গ্রন্থে লিখেছেন, ' রবীন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের একটি চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। তাঁর সংগৃহীত ফরাসী বই আমি কিনি।…' বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থ-সংগ্রহ সযত্নে রক্ষিত আছে।

১১৭. কুমুদনাথ চৌধুরী (১২৬৯-১৩৪০)। ২৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৮. রাণু মুখুজ্যের বিয়ে। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণু [প্রীতি] অধিকারীর বিবাহ হয় ২৮ জুন ১৯২৫ তারিখে কলকাতায়।

১১৯. প্রিয়। প্রিয়ম্বদা দেবী। ৮৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১২০. স্যর নীলরতন। নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩)। প্রখ্যাত চিকিৎসক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। স্বদেশের বহু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১২১. হিরণ দিদি। হিরণ্ময়ী দেবী। ১১২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১২২. বউ। সংজ্ঞা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী।

১২৩. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ২৫ মে ১৯১৪ খৃস্টাব্দে, পাটনায়।

১২৪. কালীবাবু। কালীপ্রসাদ চৌধুরী। ৯৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৫. Paul Richot [Richard]। অরবিন্দ শিষ্য Mirra Richard (মীরা রিশর / শ্রীমা)-এর স্বামী।

১২৬. সুবীর। সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬৮ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৭ প্রতিমা। প্রতিমা দেবী।

১২৮. দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনী। ১৯২৬-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনী (পঞ্চম অধিবেশন) দিল্লি, পৌষ ১৩৩৩। সভাপতি, প্রমথ চৌধুরী।

১২৯. স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৫-১৯২৬)। দেশনেতা ও সমাজসেবী। গুরুকুল বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতবর্ষের সম্প্রদায়গত ঐক্য সাধনে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। শ্রদ্ধানন্দ ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে 'শুদ্ধি' প্রথায় পুনরায় স্ব-ধর্মে ফেরানোর যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তার ফলে আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণে প্রাণ হারান। এই ঘটনায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর স্মরণে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' ('কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত)। কলকাতার মির্জাপুর পার্ক তাঁর স্মরণে হয়েছে 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পার্ক'।

১৩০. অসিত হালদার (১৮৯০-১৯৬৪)। পিতা সুকুমার হালদার, মাতা সুপ্রভা। অসিতকুমার অবনীন্দ্র-শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম।

১৩১. অমল হোমের স্ত্রী ইলা দেবী, শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী।

১৩২. সোমনাথ মৈত্র। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, প্রাবন্ধিক। প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র-বিষয়ক উদ্ধৃত রচনাটি সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতিসভায় পঠিত এবং অপ্রকাশিত।

১৩৩. 'সঙ্গীতের মুক্তি তিনি [রবীন্দ্রনাথ] প্রমথনাথের আমন্ত্রণে...।' উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশ 'সবুজপত্র' ভাদ্র ১৩২৪ সংখ্যায়, 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থভুক্ত। প্রদত্ত তথ্য অনুসারে জানা যায়, 'সার্ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে. কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পঠিত হয়। প্রবন্ধটি বিচিত্রা সভায় পঠিত হইবার সম্ভাবনার কথা "ছন্দ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠপরিচয়ে আলোচিত হইয়াছে।' এই তথ্য সোমনাথ মৈত্র জানিয়েছিলেন।
'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে ইন্দিরা দেবী – 'প্রতিভাদিদির স্থাপিত 'সংগীতসংঘে' রবিকাকা তাঁর "সংগীতের মুক্তি" নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। উদাহরণগুলি নিজেই গেয়েছিলেন।' – এ-তথ্যও জানা যায়।

১৩৪. স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যু। ৩ জুলাই ১৯৩২, প্রায় ৭৭ বৎসর বয়সে।

১৩৫. '[সুবীরেন্দ্র] এল্মহার্স্ট সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শ্রীনিকেতনে দিনকতক শিক্ষালাভ করে।' L. K. Elmhirst রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন কর্মকেন্দ্র শ্রীনিকেতনের দায়িত্ব নেন ১৯২২ খৃস্টাব্দে। সুবীরেন্দ্রনাথ প্রায় বৎসর কাল শিক্ষালাভ করেছিলেন।

১৩৬. 'নতুন কাকিমার [কাদম্বরী দেবী] একটি নিজ হাতে আঁকা পেন্সিলের ছবি...' উল্লিখিত ছবিটি পরবর্তীকালে কার কাছে রক্ষিত অথবা বিনষ্ট হয়েছে কি না – কোনো তথ্যই জানা গেল না।

১৩৭. '...অবশেষে বি. ভারতী [বিশ্বভারতী] কিনে নিয়েছে।' কলকাতা রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে বিক্রি করা হয়েছে। শিল্পমূল্য ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লিখিত চিত্রাবলির ইতিহাসমূল্যও যে অপরিসীম, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৩৮. বুবু। পূর্ণিমা ঠাকুর (১৯০৮-১৯৯২)।

১৩৯. অশোকা। আশুতোষ চৌধুরীর কন্যা অশোকা দেবী।

১৪০. মঞ্জু। জয়া। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রী। তাঁদের স্বামী, যথাক্রমে, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও কুলপ্রসাদ সেন।

১৪১. 'মায়ের জীবনী'। জ্ঞানদানন্দিনী-কথিত আত্মস্মৃতি 'আমার জীবনকথা', অনুলেখন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। 'পুরাতনী' গ্রন্থভুক্ত (প্রকাশ ১৯৫৭) পুনর্মুদ্রণ, 'এক্ষণ' শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭।

১৪২. ডাঃ মৃগেন মিত্র। মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৬৭-১৯৩৪)। প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক।

১৪৩. 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি'। প্রকাশ 'সবুজপত্র', নবম বর্ষ ১৩৩২-৩৩। প্রথম গ্রন্থভুক্ত 'নানা চর্চা' (১জুন ১৯৩২)।

১৪৪. 'এক মহিলা সমিতি'। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দিরা দেবী স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাসের জন্য আসেন। এখানে এসে বিভিন্ন কল্যাণমূলক যে-সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হন তার অন্যতম 'আলাপিনী মহিলা সমিতির' সংগঠন। মহিলা-পরিচালিত পত্রিকা 'ঘরোয়া' প্রকাশের প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখনীয়।

১৪৫. বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত নানাবিদ্যাবিষয়ে সর্বসাধারণের জন্য সহজ ভাষায় রচিত গ্রন্থমালা। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' (প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০) বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের প্রথম গ্রন্থ।

১৪৬ জয়া। জয়শ্রী সেন।

১৪৭. 'ফাল্গুনী যখন জোড়াসাঁকোয় প্রথম হয়…।' জোড়াসাঁকো বাড়ির উঠানে অভিনয় ১৬ মাঘ ১৩২২ বঙ্গাব্দে, 'বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষাকল্পে।'

১৪৮. 'পত্রচ্ছলে লেখা এক ইংরিজি শিকার কাহিনী ·।' কুমুদনাথ চৌধুরীর পত্রাকারে রচিত, পরে ইংরেজিতে 'শিকার' নামে প্রকাশিত গ্রন্থ, পরে প্রিয়ম্বদা দেবী-কৃত বঙ্গানুবাদ 'ঝিলেজঙ্গলে শিকার' (প্রকাশ ১৯২৪)।

১৪৯. 'ফ্রেনোলজি, জ্যোতিকাকামশার দৌলতে…।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এককালে মানুষের মাথার আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে মনুষ্যচরিত্র বিচারের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন (শিরোমিতিবিদ্যা), এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। 'বালক' পত্রিকায় 'মুখ চেনা' নামে রচনায় অংশত প্রকাশিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মানুষের মুখাবয়ব অঙ্কনে (পেন্সিল স্কেচই প্রধানত) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত।

১৫০. নলিনী সরকার। নলিনীরঞ্জন সরকার (১৮৮২-১৯৫৩)। ১৯২৩-১৯৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দেশের রাজনীতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি।

১৫১. সুপ্রিয়। সুবীরেন্দ্র ও পূর্ণিমা ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপ্রিয় ঠাকুর।

১৫২. শিবু, কালীবাবু। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা দেবীর পুত্র শিবকুমার চৌধুরী। রাধারানী দেবীর পুত্র কালীপ্রসাদ চৌধুরী।

১৫৩. গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জুশ্রীর পুত্র।

স্বীকৃতি

রচনা-ধৃত প্রসঙ্গ লেখায় প্রধানত এই সমস্ত গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি—

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ; ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, 'রবীন্দ্রস্মৃতি' ; সরলা দেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা' ; প্রমথ চৌধুরী, 'আত্ম-কথা' ; 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শতবার্ষিক সংকলন', ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী জন্মশতবর্ষপুর্তি সংকলন ('ইন্দিরা' প্রকাশিত) ; সুভাষ চৌধুরী-সম্পাদিত, 'ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী' ; চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' ; 'ভারতকোষ' ; 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' ; প্রশান্তকুমার পাল, 'রবি-জীবনী' ।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারের সকল কর্মীর সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থ ব্যবহারে এবং তথ্যসন্ধানের সহযোগিতাও সমভাবে উল্লেখনীয়। নানা বিষয়ে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা হলেন সুপ্রিয়া রায়, রণিতা দত্ত, সুপ্রিয় ঠাকুর, আশিস হাজরা ও বিশ্বনাথ রায়।

স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখনীয় তিনজনের নাম : আশিস হাজরা, প্রশান্তকুমার পাল ও ইন্দ্রনাথ মজুমদার। আশিস হাজরা অনেকগুলি তথ্য অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সন্ধান ক'রে দিয়েছেন। প্রশান্তকুমার পাল অনেকগুলি সম্পর্কসূত্র ধরিয়ে দিয়ে এবং তথ্যের সন্ধান দিয়ে উপকৃত করেছেন। ইন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সুবর্ণরেখা' থেকে যে-কোনো প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি।

এঁদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি।

—

সংশোধন

৬৮ পৃষ্ঠার ৯ সংখ্যক লাইনে মুদ্রণ-প্রমাদটি সংশোধনযোগ্য। লাইনটি পড়তে হবে : '—সুতরাং সে কর্তার উপর খুব যে ভক্তি হয় তা নয়।'

—

ক্রোড়পত্র সমাপ্ত।

TWO STORIES

by

Satyajit Ray

First Reprint of the Earliest
Literary Contributions, 1941 & 1942

...

· An EKSHAN Supplement ·

...

Copyright : Bijoya Ray, Sandip Ray

ABSTRACTION

He was twenty-four, tall and lean. He had lean limbs, a lean face and a leaner purse. He was an artist.

The story starts at a moment when a casual observer could see him sitting on a three-legged chair in an attitude of utmost inertia. A half-consumed cigarette hung precariously from his lips, and his hands held a book which seemed to absorb all his attention.

The same observer would see nothing unusual in the scene. But a closer inspection by one not so casual would reveal the one inexplicable touch in the picture. The book in his hand was held upside down.

This startingly unusual way of perusing a novel is explained by the fact that he was not reading at all. He was not even looking at the book. He was merely gazing at what is called the 'middle distance'. His eyes had that particular, wide-open stare which reveals that a person is preoccupied. He was, in fact, thinking of the Exhibition.

It was an insertion in the morning papers which told him about it. The Fine Arts Exhibition, 'on a scale infinitely bigger than has hitherto been possible', was to open its doors to the public on the fifteenth of January. A wide range of subjects and an unlimited choice of medium were two conspicuous features of the Exhibition. This gave the artists considerable scope for displaying their talents.

It was this announcement about the Exhibition which occupied his mind now. So cold and matter-of-fact in print, it had proved to be an unusually exciting bit of news for him. He had waited long and patiently for an opportunity like this. It was the one and only chance of his gaining a certain amount of public recognition as a fairly adept wielder of the brush. Not that he had any illusions about his talents. Far from it. He knew that he could barely hope for an official commendation of his work, far less for one of the substantial cash prizes which were being offered. But he must see his picture

hung all the same, and let the public see it.

And, of course, there is always the possibility that the critics would just happen to mention your name in the review columns. You never can tell! 'Of no little interest', they might perhaps write, 'is Mr. – 's canvas entitled "A Family Group". An attractive composition, executed with a judicious choice of colours' and so on.

In that attitude of languid relaxation, with the inverted book in his hand, he gave himself up to meditation. He had to think out a subject for his painting.

* * *

If he had any leaning in his personal views on Art, it was towards Realism. Like a strip of adhesive tape, he stuck to it faithfully and tenaciously. Those horrible distortions of Nature which seemed to be the essence of Modern Art enraged his aesthetic sense. He dreaded that thing called Surrealism. And 'Abstractions', a term used for those fantastic combinations of lines and forms drawn with a lunatic incoherence, left him utterly cold and unmoved. Among his friends who dabbled in Art either in the capacity of amateur critics or as painters, those who were modern in their viewpoints reproached him for his narrow outlook. 'It's ridiculous, old man!' They would say, 'you can't carry on with those out-moded notions of yours! You must study and appreciate the moderns, you have to. How can you ignore geniuses like'—and here an avalanche of metallic sounding names would descend upon him, which left his ears ringing but his opinion unchanged.

More than once in the past, he had made attempts to read books on Modern Art, but each time he found the pictures in them so ridiculous that it speedily rendered such attempts null and void. He remembered once having seen such an illustration: It seemed to him a rather amateurish attempt at drawing a Neanderthal woman with elephantiasis and a giraffe's neck. The title put the finishing touch to it : 'Le Beau Ideal', it was called. He considered it the funniest joke he had ever come across.

* * *

The following day he set to work on his picture. It would be a water colour, that particular medium being his forte. He had decided about the subject during the previous evening's meditation. It was to be a pictorial representation of one of his favourite scenes from Shakespeare. He would draw Lady Macbeth walking in her sleep, and call it 'The Somnambulist'.

Never before had he felt so much enthusiasm in commencing work on a picture as he felt now. He whistled softly as he tried various colour combinations on a sheet of paper. After he had hit upon a satisfactory scheme, the actual work on the contemplated masterpiece began.

* * *

For the ten days that his picture took, he was rarely seen outside the gloomy, depressing little room which served as his studio. For the first time he was putting all his heart and soul into a picture. The patience and energy which he put into his work now was most unusual in a man so sluggish and slovenly in his ways.

The last touches were put on the fifth of January. It was approaching darkness when he finally put down his brushes and stretched his arms to relieve the tension of his muscles.

Then he went a few steps backwards and gazed at the easel from a distance, appraising the finished work.

He kept looking at it for full five minutes—his eyes half closed and his head hanging sideways. The longer he looked, the more it grew in his estimation. The colour, the expression, the composition,—they all seemed to bear testimony to his inspiration.

With a sudden thrill he realised that he had excelled himself. It was a far finer thing that met his eye now than he had ever imagined himself to be capable of. It gave him a keen sense of satisfaction to know that ten days of concentrated labour had not been in vain.

But he could not afford to waste time in idle appreciation

of his own work. It was the last day for sending the entries, and he must post the thing that very night. After all, it was more important that the critics should see all that he saw.

Going over to the easel, he unmounted the picture and went in search of a piece of string and brown paper ..

* * *

When he came out of the Post Office, his eyes were aching and his temples throbbing. It was a natural reaction.

With slow, heavy steps he proceeded towards the more secluded part of the city. He needed fresh air very badly.

The cool evening breeze did him good, and he returned home, after an hour, feeling considerably refreshed.

* * *

The following morning found him minus the last traces of fatigue. He felt a thoroughly invigorated man. While breakfasting he had a casual glance at the newspaper. There was a small announcement by the Society of Fine Arts to the effect that they were gratified to see the unusually large number of entries they received. The Exhibition, they assured, was going to prove an unqualified success.

He had half a mind to go up and arrange his studio a bit. He knew it was in a hopeless mess, but at the same time he felt too lazy to do it. After a bit of mental argument he decided in favour of relaxation, feeling that the arrangement might come later.

It was late in the evening when he went up to his studio. Groping in the darkness for a moment, he switched on the light. The room presented a sad spectacle, with tubes thrown here and there, brushes flung far and wide in moments of haste, and little bits of rag and paper strewn all over the place.

He was surveying this chaotic confusion of objects when a sheet of paper caught his eye. It was lying on the ground just below the easel. Somehow it seemed alarmingly familiar. Stooping down, he picked it up.

For a moment the world seemed to grow dark around him, and he clutched at the easel to support himself. For his hand

held his beloved masterpiece—'The Somnambulist'; it was Lady Macbeth—his very own creation—who was staring at him now with those glassy, unseeing eyes which he had himself given her !

When the first numbing shock of surprise passed away, a mist of black, brooding despair enveloped him. It did not take him long to realise what had happened. Once more he was a victim of absent-mindedness. It was not a new thing with him. He had been guilty of it more than once in the past. But those occasional fits of preoccupation, and the consequences thereof, had always had a touch of the ludicrous in them. They never brought any serious consequences in their wake.

No, this time it was different. It was tragic and mercilessly so.

He felt sick and feverish. How the Committee must have laughed when they received a parcel which contained a stiff cardboard, and a small piece of paper with his name and the title of a picture—without the picture itself !

The cruel humour of it made him grind his teeth, and he solemnly cursed himself and his fate.

The Picture he tore to pieces and threw the bits into the wastepaper busket···

* * *

During the week that followed he made every effort to forget about the 'disaster'. To this end he resorted to all sorts of diversions which he had never tried his hand at before. He had all but succeeded when, on the morning of the fifteenth of January, the opening day of the Exhibition, he received a letter. He was breakfasting when a blue oblong envelope was handed to him. The neat crest on it revealed its source. It was a communication from the Society of Fine Arts.

He speculated momentarily on its contents before tearing open the envelope. It was most likely, he felt, that the Society was making an enquiry about the 'mysterious' parcel. It was perhaps a mere routine with them.

Very carefully, with fingers as steady as he could manage to

make them, he took the note out.

'Dear Sir,' he read, 'We feel pleasure in congratulating you'···It was incredible! He could hardly believe his own eyes. Briefly, in a semi-formal manner, the Society informed him that his production, 'The Somnambulist', was the proud winner of a first prize. The note concluded with an invitation to the opening ceremony of the Exhibition.

His brain was in a whirl now. He felt more perplexed than pleased. The first ecstatic thrill passed away, giving way to a realistaion of the utter improbability of the whole thing ··

*   *   *

He reached the Tower Hall half an hour later, breathless and gasping with a suppressed excitement.

The imposing gates were now open to the public, and people had started coming in. He jostled past two substantial Art connoisseurs who seemed to be unnecessarily blocking the traffic.

The Exhibition was on the first floor. He raced up the magnificent carpeted staircase, taking three steps at a time.

The hall presented a truly 'colourful' spectacle. All the four walls of it were teeming with pictures – pictures of varying sizes, from the smallest miniatures to the most colossal canvases.

With a heart beating wildly with excitement he started scanning the pictures. Each of the prize-winning works had a neat label attached to its bottom, announcing the name of the artist and the title of the picture. He decided to concentrate on those little bits of paper.

After an hour's scrutiny he had exhausted the North, the East and the South walls. Landscapes, Figures, Still Life studies, Sketches in various media – nothing had escaped him. The thing was proving an ordeal for his eyes, which were now red and aching. Only his determination to solve the mystery helped him to carry on.

But it was with an ebbing enthusiasm that he faced the West wall. His heart sank lower still when he saw what confronted

him. They were those dreadful, nightmarish paintings – those Abstractions !

Reluctantly – somewhat mechanically – he glanced at the label below the first picture, which was the first prize winner.

The name seemed familiar – why, it was his own name ! And the title ? – 'The Somnambulist.'

But what was this bizarre looking thing – this weird conglomeration of multi-coloured brush stokes ? Surely, he had never drawn anything. – but a sudden flash of recognition told him.

It was the paper he had tried his colour scheme on.

—Amrita Bazar Patrika, 18 May 1941.

SHADES OF GREY

I emerged from the musty obscurity of the second-hand bookshop and came out on the street, carrying my 'acquisition' under my arm. It was one of those gloomy, oppressive August evenings which weigh down on a person like a heavy load. But there was an unmistakable jauntiness in my steps as I walked homewards. I noticed, too, that the slight touch of the doldrums I had the day before had vanished. And why not ? It was one of my luckier evenings, and my frantic search in the dusty shelves of the bookshop was rewarded with a 'find' which would make any connoisseur's mouth water. It was a rare French treatise on Chinese Ceramics – a magnificent tome, superbly illustrated. And the ridiculous price I paid for it ! It made me wonder whether those booksellers ever care to know just what they are selling.

Musing on the prospects of a fortnight's interesting study, I took the usual turning near the Post Office. I was preoccupied, and walked, as preoccupied people are prone to do, with my eyes on the pavement. It was a sixth sense perhaps, which prompted me to look up. I looked up, and a few yards ahead of me, a strange man was walking with the pace of a crippled tortoise. On looking more carefully I had the feeling that he might not be so strange, after all. In fact, he had a slouch which vividly recalled a very close friend of mine whom I had lost touch with since a decade. I strode up close enough to have a glance at his features and verify my suspicions.

Yes, it was my long-lost friend – strangely, pathetically transformed, but still recognisable. I touched him on his shoulder, and he turned to me, startled. My God, what a change ! He looked a shadow, a mere spectre of his old self. He was apparently too moved for words – and so was I. There was a cafe nearby and I dragged him into it. We chose a table in one of the dimmer and quieter corners and seated ourselves in silence.

Over a cup of tea I threw my mind back to the past ··

We were at school together, and at college. It was our mutual interest in art which brought us so close together. Even while at college he had a remarkable flair for daubing paints on canvases and turning out masterpieces, one after another. I was the critic keen, fearless and impartial, weighing every picture of his with all the precision I could command, and setting forth my frank views on them. He was a colourist par excellence – a wizard with pigments. It was wonderful the way he smeared paints on a canvas, seemingly with an utter disregard for final effects. It always made the finished thing look like a phenomenon.

But, and it is a significant 'but', like all progressive young intellectuals of the modern age, he was a 'Leftist'. A 'Leftist', that is, in his paintings – a fact which made him an outcast from the circle of those cosy conservatives in his line. It was only natural that it should have been so, and he ignored the fact altogether. And it was only known to me how he loathed anything which smacked of the Academy.

His views on art, progressive as they were, found an echo in me. For I was a down-and-out 'Modern' myself. I could see and appreciate the vital mind that was behind all his paintings I remembered that he had once held a public exhibition of his paintings which had ended up in a miserable fiasco, disillusioning him forever as to the heights to which the level of public intelligence was capable of rising. Thenceforth the venue of his exhibitions had been his own studio. And they were essentially a one-spectator-one-critic affair. I myself working in both the capacities.

It was not such a bad life the two of us led with our respective artistic metiers complementing each other. In his case, the question of earning money hardly arose. For his father had been a businessman of repute and had left him a considerable amount of money, which gave him enough rope to carry on Art for Art's sake, without having to bother about how best to use it for money-making purposes. For my own part, I managed, shortly after graduation, to get the post of librarian in my own *alma mater* – an unfamed occupation which, never-

theless, did not stand in the way of my pursuit of art.

During the years which I had spent in close touch with him I had watched him mature with an astonishing rapidity. He had revealed such unmistakable signs of consummate genius that I was only waiting for the time when he would suddenly, inevitably leap into fame as one of the most versatile minds in the world of Modern Art. I could clearly see that it was not far off.

But I was wrong. I was very wrong. Some unforeseen thing happened which caused us to drift apart, taking him to some remote region which was far, far away from fame, from his art, from humanity.

It started in mere pleasantry. On a very cold January evening, ten years ago, I had gone over to his flat for our usual evening causerie. It was not customary for him to work in the evenings : his myopia stood in the way. But that evening he seemed to be particularly absorbed in splashing colours on a fairly big canvas—so absorbed, in fact, that he was quite unaware of my arrival. I was intrigued, and approached the easel from his back. What I saw on the canvas roused my curiosity to a degree. A magnificient figure of a woman—one of those spacious, exotic type—was being painted with the exuberance of a Renoir. He was evidently putting all his passion into the work. I hemmed significantly, and asked him who that sinuous Senorita was supposed to be. Was it a creature of his own imagination, or did she exist in reality ? He turned to me and smiled a slow, enigmatic smile, which revealed a lot more than spoken words would have done.

With a little more sounding I got the story out of him. I had never imagined that my friend was susceptible to the softer emotions. But I was evidently wrong. It seemed that the very first sight he had of this woman had caused him to totter dangerously. But as he had made no efforts at recovering himself he was now completely out of depth. I had found it rather funny at first, and told him so. I could not bring myself to believe that he could fall for a woman who was little more than an obvious mantrap. But there it was.

And it was far more serious than I thought. A week later I received a hurriedly written note which said that they were married the previous day and were heading for one of those obscure tropic isles. He would, he promised, write from there.

But the promised letter never came. Instead of it came a shocking bit of news in the form of an obituary notice in the newspaper. It recorded the death of my friend's wife – 'drowned while swimming.'

I wondered what might have happened to my friend. I had a conviction that he would come back home – and to his senses. But with the passage of years it dwindled into nothingness and once more, I gave myself up to the study of Art, this time alone.

And here he was back to his old place, a sad, sombre, emaciated ghost of his former self ! I had never known that he had loved his wife so much – that her death could bring such a tragic transformation.

I watched him as he sipped his tea. All the vivacity, vitality of his former self seemed to have been squeezed forcibly out of him. He really looked no better than a middle-aged physical wreck, although he was hardly more than thirty-five.

It was hard to start a conversation under the circumstances. But I spoke first, asking him when he had arrived.

'This morning,' he replied, in a soulless voice. Was he putting up at his former place ?

'No'···the same cold, mechanical tone.

His condition, it seemed, was anything but satisfactory. He had no money. What little he had was spent in his journey back. He had been starving the whole day, had no home, and no idea where he was going to spend the night

* * *

So I brought him along with me to my flat. As if I could do any less for one who had once been my closest friend !

Even while staying with me he continued to be the same brooding, lifeless man as I found him. He slept little, ate even less and spoke on rare occasions. With one object in view,

that of bringing him back to his old, his normal, self, I placed all my art treasures at his complete disposal. But the very mention of art brought an expression of such intense resentment on his face that I had soon to give up hope, leaving it to time to heal things…

The great temptation for a final effort at revitalising my friend came to me one evening. Art had been pushed to the background for sometime past. Owing to an unusual pressure of work in the library, it was a chance glance at a poster which brought it forcibly back to my mind. The Gallery, true to its tradition, was holding an exhibition of French paintings from Cezanne onwards.

The past came back rushing to me – the time when the two of us would spend hours in the Gallery, feasting on the glorious masterpieces which adorned their walls annually. Even after he had left me I had gone to their exhibition every year; but somehow I was never able to enjoy it quite as thoroughly as I did when I used to have him with me, adding his voice to my excited eulogies.

I found him sitting on an easy chair, staring vacantly at the ceiling, his legs stretched out in front of him and his arms dangling limply by his sides.

I blurted out the news without unnecessary overtures.

'The Gallery has done it again', I announced, hoping to see some signs of enlightenment.

'Eh ?' he said, looking at me, still vacantly.

I made myself a little more explicit.

'There's an exhibition on at the Gallery. Late nineteenth and twentieth century French stuff, if you want to see the details…It's the usual annual affair, don't you remember ?'

'Exhibition ?' he questioned dubiously. There was a far away look in his eyes, as if he was trying to collect scattered memories.

It was incredible that he shoud forget about it all. I told him so.

'Don't tell me you've managed to forget all about those exciting hours we spent in the Gallery ? Don't you remember that Matisse 'Odalisque' you went into raptures over ?'

'In any case,' I added, with an air of finality, 'you are coming with me tomorrow in the afternoon. It will be the least crowded then…'

* * *

We were standing in front of a masterly Seurat. The subtle, almost scientific precision of his colour harmonies reminded me of the intricate harmonies of music. I was so absorbed in the galaxy of great paintings around me that I hardly paid any attention to my friend. I was literally struck dumb by the extravagance of masterpieces.

But a glorious Cezanne lossened my tongue, and I burst into rapturous praise of it.

I wonder how long I dwelled on its merits. It struck me suddenly that my friend had not spoken a single word since we entered the hall. I turned towards him, and the expression on his face froze the eulogistic torrent in my mouth.

I had never seen a man look more a picture of stark tragedy than he did now. I feared that he might collapse any moment, so pale and ghastly did he look.

Holding him by the hand, I gently led him to the gate, and out into the street. It was approaching evening, and the vast masses of cumuli in the sky were bathed in an unearthly orange glow…I had no idea we were inside the hall so long.

'Are you ill ?' I asked him. 'You're not looking well at all.'

He faced me, looking straight into my eyes for the first time since he came back.

And then he spoke :

'I must tell you all,' he said, and his voice was grave and ominous. 'I had no wish to, but I can't stand the strain any longer.'

He paused, and drew in a deep breath.

'It is not my wife's death, as you may imagine, that has brought the change in me… Oh ! She was a wretched woman !'

'No, it is not her death at all, for that was good riddance. It was the thing which came after it…'

He paused again and seemed to be making a violent effort.

'One fine morning,' he went on, 'not long after her death, I woke up from sleep and found myself looking at a strange world. Everything around me had a strangely monotonous and mouldy appearance. I jumped up from bed and looked at the mirror. My face was looking pale and bleached.

'I had the terrible fear that I was losing my eyesight. Trembling in mortal terror, I ran to the physician.

'He saw me, saw my eyes, and asked me questions. And do you know what he told me, do you know ? He said I was not going blind—no, no ; it was not so bad as all that—but I was going colour-blind ! Imagine—I, I, whose language was colour, was going colour-blind !···

'Do you think I was too weak because I crumpled down under my own fate ? Myself, I am amazed that I didn't take my own life. Perhaps I love it too dearly or I may be a coward. For what is life to me ? What is art ? What are Cezanne and Matisse and Renoir to a man who sees no other hue than grey—dull, drab, appalling shades of grey ?'

—Amrita Bazar Patrika, 22 March 1942.

—

সত্যজিৎ রায় : প্রথম দু'টি গল্প

কুড়ি বছর বয়সে সত্যজিৎ রায় প্রথম গল্প লেখেন। ইংরেজিতে। ১৯৪১-এর ১৮ মে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প—এস্. রায় নামে—'অ্যাবসট্র্যাক্শন'। এক বছর পার হওয়ার আগেই একই দৈনিকপত্রে এবং একই এস. রায় নামে ১৯৪২ এর ২২ মার্চ ছাপা হল 'শেড্স অফ গ্রে' সত্যজিতের দ্বিতীয় গল্প।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সময়টায় অমৃতবাজারের রবিবারের ক্রোড়পত্রটি অভিহিত হতো : দা সানডে অমৃতবাজার পত্রিকা, ম্যাগাজিন সেক্শন'। চার পাতার ক্রোড়পত্র. তার তৃতীয় পৃষ্ঠায় একটি ক'রে গল্প ছাপার রেওয়াজ ছিল। প্রবোধকুমার সান্যাল, শান্তা দেবী প্রমুখ পরিচিত লেখকদের কিছু গল্প চোখে

পড়ে। এমন কি সুনীল জানার একটি গল্পও (The Ghost of Ram Bans, 8.3.42) দেখতে পাই। বাকি লেখকদের অধিকাংশই আজ অজ্ঞাতকুলশীল। তার সম্ভাব্য একটা কারণ, বাংলায় লেখা গল্পের অনুবাদ ছাপা হতো না।

এই পর্বের যাবতীয় গল্পের মতো সত্যজিতের গল্প দু'টিরও ইলাস্‌ট্রেটর 'শৈল'। গোটা গোটা ইংরেজি ক্যাপিটাল হরফে স্বাক্ষর করতেন তিনি। 'A' বর্ণদ্বয়ের পেট দু'টি শুধু সরলরেখা যোগে যুক্ত নয়, বৃত্ত সহযোগে। প্রথম গল্পের ইলাস্‌ট্রেশনে বিমূর্ত চিত্রকলা-বিদ্বেষী নায়ককে দেখা যায় চারুশিল্প প্রদর্শনী কক্ষে। ছবির ক্যাপশন : 'The name seemed familiar—why it is his own name! And the title?—The Somnambulist!' দ্বিতীয় গল্পের ইলাস্‌ট্রেশনেও একটি প্রদর্শনী-কক্ষের সঙ্গে আংশিক পরিচয় ঘটে। কিন্তু গল্পটি দায়সারা ভাবে পড়ে ছবিটি আঁকা হয়। সেজান, মাতিস প্রমুখ ফ্রেঞ্চ মাস্টার্সদের প্রদর্শনী দেখতে এসেছিল গল্পের দুই মুখ্য চরিত্র। গল্পচিত্রকার কিন্তু প্রায় রবি বর্মার ঢঙে আঁকা একটি পৌরাণিক চিত্রকে টাঙিয়ে দিয়েছেন সেই প্রদর্শনীতে। ছবির ক্যাপশন : 'I feared that he might collapse at any moment, so pale and ghastly did he look?'

১৯৬১-তে পিতা-পিতামহের পত্রিকা 'সন্দেশ'কে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলার পর সত্যজিৎ তাঁর প্রথম গল্পটি লিখেছিলেন, এত দিন এ-কথাই সবাই জানত। ইংরেজি গল্প দু'টি প্রমাণ করছে যে, 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' তাঁর লেখা প্রথম গল্প নয়, প্রথম বাংলা গল্প। ইংরেজি ও বাংলায় লেখা সত্যজিতের প্রথম দু'টি গল্পের মধ্যে দুই দশকের ব্যবধান। কিন্তু সত্যজিতের গল্পের সাবালক পাঠকরা তাঁর কুড়ি-একুশ বছরের রচনাদু'টির মধ্যেই কিছু উপাদান ও নির্মাণ-রীতির সন্ধান পাবেন যা লেখকের পরবর্তী কালের 'ডজন' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত কিছু গল্পকে মনে পড়িয়ে দেয়।

'অ্যাবসট্র্যাকশন' নামে সরস গল্পটির বয়নের মধ্যে রয়েছে সত্যজিতের স্বভাব-সিদ্ধ রহস্যপ্রিয়তা—নানা ধরনের পরিণতির ইংগিত দিয়েও শেষ ছত্র অবধি কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখা। দ্বিতীয় গল্পটি গম্ভীর মেজাজের। প্রথম গল্পটিতে 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট' আর্ট নিয়ে রসিকতা করা হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে 'রিয়ালিস্ট' স্কুলের শিল্পী সেখানে হাস্যকর চরিত্র। দ্বিতীয় গল্পটি এক প্রতিভাসম্পন্ন, প্রথাবিরোধী, 'লেফটিস্ট' আধুনিক শিল্পী এবং তার ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী। কিন্তু লক্ষণীয়, আধুনিকতা' এখানেও 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট' অর্থে প্রযুক্ত নয়। সেজান ও তাঁর উত্তরপর্বের ফরাসি দিক্‌পাল শিল্পীর দ্বারা অনুপ্রাণিত এই আধুনিকতা।

প্রকাশকালের সাক্ষ্য অনুসারে গল্প দু'টির রচনাকালে তিনি কলাভবনের ছাত্র। ১৯৪০-এর জুলাইয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। গল্প দু'টির বিষয়ও মনে করিয়ে দেয়—নন্দলাল,বিনোদবিহারী ও রামকিংকরের সান্নিধ্য ও উপদেশ-

ধন্য 'গ্যাং অফ ফোর্'-এর সেকালের কীর্তিকলাপ। গ্যাং অফ ফোর বলতে দিনকর কৌশিক, পৃথ্বীশ নিয়োগী, এম. মুখ্‌স্বামী ও সত্যজিৎ রায়। দিনকর কৌশিকের 'কলাভবনের কিছু স্মৃতি' থেকে পৃথ্বীশ নিয়োগীর একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করছি : 'কিংকর-দা ফর্ম-এর মধ্য দিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্‌টের দিকে যান। আর বিনোদ-দা অ্যাবস্ট্রাক্‌টের দিক থেকে বেরিয়ে ফর্ম-এর দিকে আসেন।' (এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৮)। এই রচনা থেকে নন্দলাল বসুর প্রতিক্রিয়াও জানতে পারি আমরা : 'আমাদের এই সব আলোচনা মাস্টার মশাই বেশি পছন্দ করতেন না। ছবি মূর্তি সব হাতে-কলমে করবার জিনিস কথা দিয়ে ছবি হয় না। ছবির নিজেরই কথন আছে, সেটি রং ও রেখায় প্রতিফলিত হয়। কিংকর দা-র দেখাদেখি একটু মর্ডান হবার প্রবণতা কেউ দেখালে মাস্টার মশাই তার সমালোচনা করতেন। বলতেন, "পিকাসো-টিকাসো চলবে না—চোখ দিয়ে দেখতে হয়, প্রাণ দিয়ে বুঝতে হয় এবং হাত দিয়ে আয়ত্ত করতে হয়, অমনি কিছু হয় না"।'

কলাভবনের শিক্ষাক্রম অসমাপ্ত রেখে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন (ডিসেম্বর ১৯৪২), কিন্তু মাস্টার মশাই নন্দলাল বসুর কাছে ঋণ স্বীকারে তিনি অকুণ্ঠ। অন্য দিকে, অ্যাকাডেমিক আলোচনা বা তর্ক-বিতর্কে তাঁর অনীহার কথাও সুবিদিত। 'অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন' গল্পটির পট প্রসঙ্গে এর পরেও আরো একটা কথা যোগ করার আছে। দিনকর কৌশিক লিখেছেন : 'পৃথ্বীশ এই সময়ে ওয়ারিংগর-এর (Worringer) "এমপ্যাথি অ্যাণ্ড অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন" বইটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলত।'

'অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন' যখন ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথ জীবিত। পিতা-পিতামহের ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের ও মায়ের ইচ্ছাকে সম্মান দিতেই প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরনোর পর সত্যজিৎ কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলেন। চারুশিল্পের চর্চায় পূর্ণ অধিকার ও দক্ষতা সত্ত্বেও তখন থেকেই সত্যজিৎকে কিন্তু আকৃষ্ট করেছে গ্রন্থচিত্রণ। আর ইলাস্ট্রেটর-এর দায়িত্ব পালন করার সূত্রে অন্তত দু'টি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ছবি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। বোম্বাইয়ের শিবাজী কাস্‌লের তেরো তলায়, স্মাগলার মিস্টার গোরে-র ড্রয়িংরুমের দেওয়ালে ছিল একটি ভাঙাচোরা নারীর আবক্ষ রেখাচিত্র (বোম্বাইয়ের বোম্বেটে) এবং প্রফেসর শঙ্কুর গিরিডির বাসভবনের দেওয়ালে জ্যাকসন পোলক্‌-জাতীয় রঙিন পেইন্টিং (অশ্চর্জন্তু)। আন্তর্জাতিক খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে শঙ্কুর এককালের অনাড়ম্বর ঘরটির রূপ বদলেছে। মনে করা সংগত, এই বিমূর্ত চিত্রটি শঙ্কু কোনো বিদেশী বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন।

সিদ্ধার্থ ঘোষ